ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

মূল : শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.)

অনুবাদ ঃ
মুহাঃ আবদুল্লাহ্ আল কাফী ও
মুহাঃ আবদুল্লাহ শাহেদ

সম্পাদনা ঃ
আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল 'উসাইমীন

অনুবাদ ঃ
মুহাঃ আবদুল্লাহ্ আল কাফী ও
মুহাঃ আবদুল্লাহ শাহেদ

সম্পাদনা ঃ আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

প্রকাশনায় ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স,
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ 7112762, 01711-646396

www.pathagar.com

ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান

প্রকাশনায় ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স,
৯০ হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ 7112762, 01190368272, 01711-646396

প্রথম প্রকাশ ঃ রবীউল আউওয়াল ১৪২৮ হিজরী
এপ্রিল ২০০৭ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জিলক্বাদ ১৪২৮ হিজরী,
ডিসেম্বর ২০০৭ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব ঃ অনুবাদক কর্তৃক অনুবাদ স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ হেরা প্রিন্টার্স

গ্রাফিক্স, কম্পোজ সেটিং ও মুদ্রণ সহযোগিতা ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স,
৯০ হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
ফোন ঃ 7112762, 01190368272, 01711-646396

মূল্য ঃ তিনশত বিশ টাকা মাত্র।

আমাদের রয়েছে কম খরচে ও অতি দ্রুত সময়ে পার্সেলে বা ভিপি যোগে বই

www.pathagar.com

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

জন্ম তারিখ ও নাম ঃ তাঁর নাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আত্-তামীমী। তিনি হিজরী ১৩৪৭ সালের ২৭ রামাযানের রাত্রিতে সঊদী আরবের আল ক্বাসীম প্রদেশের উনাইযা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন ঃ শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি তাঁর নানার কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করেন। অতঃপর আরবী ভাষা, অংক শাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই কুরআন মজীদ মুখস্ত করেন এবং হাদীছ ও ফিক্হসহ কতিপয় পুস্তিকাও মুখস্ত করেন।

অতঃপর তিনি তাওহীদ, ফিক্হ এবং নাহু শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার পর শায়খ আবদুর রাহমান বিন নাসির আল-সা'দী (রহঃ)এর পাঠশালায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফারায়েয, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ এবং আরবী ব্যকরণ অধ্যয়ন করেন। যে সমস্ত শায়খদের ইলম, আকীদাহ এবং পাঠদান পদ্ধতির দ্বারা তিনি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ আব্দুর রাহমান বিন নাসের আল-সা'দী (রহঃ) সর্বপ্রথম।

উনাইযাতে থাকাবস্থায় তিনি শায়খ আব্দুর রাহমান বিন আলী বিন আওদান (রহঃ)এর নিকট ইলমে ফারায়েয এবং শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফীফী (রহঃ) এর নিকট ইলমে নাহু এবং ইলমে বালাগাত শিক্ষা করেন।

রিয়াদ শহরে ইসলামিক শিক্ষা ইন্সটিটিউট খোলা হলে তিনি বন্ধুদের পরামর্শক্রমে এবং তাঁর উস্তাদ শায়খ আব্দুর রাহমান সা'দীর অনুমতিক্রমে তথায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি দু'বছর অধ্যয়ন কালে শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকীতী, আব্দুল আজীজ নিব নাসের বিন রাশীদ এবং শায়খ আব্দুর রাহমান আল-আফ্রিকীসহ অন্যান্য উস্তাদদের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পান। এ সময়ই আল্লামা ইবনে বায (রহঃ)'র কাছে উপস্থিত হয়ে ছহীহ বুখারী এবং ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ)'র লিখিত বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে হাদীছ এবং ফিকহী মাজহাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে যাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন ইবনে বায (রহঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়।

অতঃপর তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি একাডেমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে উনাইযায় ফেরত এসে উনাইযা জামে মসজিদে পাঠ দান শুরু করেন। তাঁর উস্তাদ আব্দুর রাহমান সা'দী ইন্তেকাল করার পর উনায়যা জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালনসহ উস্তাদের প্রতিষ্ঠিত উনায়যা জতীয় লাইব্রেরীতে শিক্ষা

www.pathagar.com

স্থান দেয়া অসম্ভব হওয়ায় মসজিদেই ক্লাশ নেওয়া শুরু করেন। এ পর্যায়ে সঊদী আরবের বাইরে থেকেও বিপুল সংখক ছাত্রের আগমণ ঘটতে থাকে। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তিনি অত্র মসজিদে শিক্ষা দানে ব্যস্ত ছিলেন। সাঊদী সরকারের উলামা পরিষদেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

ব্যক্তিগত আমল-আখলাক ঃ শায়খ একজন উঁচু মানের আলেম হওয়ার সাথে সাথে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, বিনয়ী, নম্র এবং আল্লাহ ভীরু। জীবনের প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল ﷺএর সুন্নাত বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। ফতোওয়া দানের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করতেন। তিনি মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সচেষ্ট থাকতেন। বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক সংগঠনকে তিনি বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করতেন।

দাওয়াতী কর্মতপরতা ঃ তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত একজন আলেম এবং দাঈ। প্রথিবীতে এমন কোন তালেবে ইলম পাওয়া যাবেনা, যে শায়খ ইবনে উছাইমীন সম্পর্কে অবগত নয়। প্রচন্ড রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি মক্কা শরীফে দারস্ এবং তালীমের কাজ আন্‌জাম দিতেন। মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে তিনি চিকিৎসার জন্য আমেরিকা সফরে গিয়ে বিভিন্ন ইসলামী সেন্টারে উপস্থিত হয়ে লেকচার প্রদান করেন। তথায় তিনি জুমআর খুৎবা দেন এবং ইমামতি করেন। সাঊদী আরব আল কুরআন রেডিওতেও তিনি নিয়মিত শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন।

ইলমী খিদমত ঃ ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম ছাড়াও তাঁর রচিত কিতাব ও পুস্তিকার সংখ্যা অনেক। তাঁর লেখনীর মধ্যে রয়েছেঃ-

১) শারহুল আকীদাতুল ওয়াসিতীয়াহ। ২) কাশফুশ্ শুবহাত। ৩) আল কাওয়ায়েদুল মুছলা। শারহুল আরবাঈন আন নাবুবীয়াহ। ৪) কিতাবুল ইলম। ৫) আশ্ শারহুল মুমতিউ (সাত ভলিওম) ৬) শারহু ছালাছাতু উসূল ৭) আল উছূল মিন ঈলমিল উছূল। এছাড়া রয়েছে তাঁর আরো অসংখ্য ক্যাসেট ছোট ছোট পুস্তিকা, যা তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ইবনে উছাইমীন কল্যাণ সংস্থা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে থাকে। বর্তমানে তাঁর ইসলামের খিদমত সমূহ ওয়েব সাইটেও পাওয়া যায়। ঠিকানা ঃ **www.binothaimeen.com**

পরলোক গমণ ঃ এই স্বনামধন্য ও বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন দীর্ঘ দিন ইসলামের খেদমত আন্‌জাম দেয়ার পর ১৪২১ হিঃ শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ মাগরিবের নামাযের সামান্য পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে সঊদী আরবের বাদশাসহ রাজ পরিবারের সকল সদস্য, সে দেশের সকল আলেম এবং সর্বস্তরের জনগণ শোকাহত হন। বিশ্ব এক অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করে।

আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন শায়খের সমস্ত দ্বীনি খেদমত কবুল

www.pathagar.com

দানের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের দলীল দেয়ার বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজন অনুভব করে না তাই সাধারণ জনগণও তথা ডাক্তার, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সৈনিক, মেম্বার, চেয়ারম্যান, দলীয় নেতা, পাড়াগ্রামের মাতব্বর, কৃষক, ব্যবসায়ী, রিক্সাওয়ালা, কুলী, ড্রাইভার সবাই ফাতাওয়া বা ধর্মীয় সমাধান দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করেন না। কারণ, উপরোক্ত ফাতওয়া দানকারীদের মত একটা বললেই চলে।

আবার অনেক সচেতন মহলকে নামকরা আলিমদেরকেই জিজ্ঞাসা করতে আগ্রহী দেখা যায়। এ কারণে বহু পেপার পত্রিকা, ম্যাগাজিন, টিভি চ্যানেল, ও বেতারকেন্দ্র ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্নোত্তর প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে। আবার অনেকে এলাকা ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ফাতাওয়া ও রিসার্চ সেন্টার খুলেছে। উত্তরদাতাগণের মধ্যেও অনেকে বিনা দলীলে যাচ্ছেতাই বলে মুসলিম সমাজে ভুল ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে স্বচ্ছ ও সহীহ জ্ঞান প্রচারের মানসিকতার অধিকারী হলেও জ্ঞান ভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা ও অপবিপক্কতার কারণে বহু সঠিক ফাতাওয়ার পাশাপাশি অনেক ভুল ভ্রান্তিও ছড়াচ্ছেন।

এমন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের (সৌদী আরবের) এ নামকরা আলিমের সংকলিত বইখানা ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করলে বাংলাভাষী মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনের বিরাট সম্বল হিসেবে কাজ করতো। এই কিতাবখানা আমি নিজেও অনুবাদ করে প্রচারের ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন এই কিতাবটির অনূদিত কম্পিউটার সফট কপি হাতে পেলাম। সম্পাদনার জন্য পাঠিয়েছিল সউদী আল-জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার থেকে এর অন্যতম অনুবাদক আবদুল্লাহিল কাফী। বইখানা অনূদিত অবস্থায় দেখে যারপর নাই খুশী হয়েছি এবং যথাসম্ভব এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছি। আমার দৃষ্টিতে অনুবাদের মান ভালই মনে হয়েছে। আমি বই খানার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। সেই সাথে আল্লাহ যেন কিতাব খানার মূল লেখক, অনুবাদক এবং যারা মুদ্রণ ও প্রচার প্রসারের কাজে অর্থ, পরামর্শ ও পরিকল্পনা দানের মাধ্যমে সহযোগিতা দান করেছেন তাদের ইহকাল ও পরকালে সার্বিক সফলতা দান করেন। জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি ও জান্নাত লাভের অসীলা বানিয়ে দেন "আমীন"।

আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

www.pathagar.com

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনিত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।" (সূরা আল ঈমরান-১৯)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করবে, ওটা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (সূরা আল ঈমরান-৮৫)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের উপর। ১) একথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ২) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা ৩) যাকাত প্রদান করা ৪) মাহে রামাযানে ছিয়াম পালন করা এবং ৫) সাধ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম ধর্মের এই পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই। জিজ্ঞাসার শেষ নেই। তাই **নির্ভরযোগ্য** প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, যুগের অন্যতম সেরা গবেষক আল্লামা শায়খ **মুহাম্মাদ বিন ছালেহ্ আল উছাইমীন** (রহঃ) ঐ সকল জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক **নির্ভরযোগ্য** জবাব প্রদান করেছেন। প্রতিটি জবাব পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর বিশুদ্ধ হাদীছ ও পূর্বসূরী **নির্ভরযোগ্য** উলামাদের মতামত থেকে দেয়া হয়েছে। সেই জবাবগুলোকে একত্রিত করে বই আকারে বিন্যস্ত করেছেন জনাব 'ফাহাদ বিন নাসের বিন ইবরাহীম আস-সুলাইমান'। নাম দিয়েছেন **'ফতোয়া আরকানুল ইসলাম'**। ইসলামী জ্ঞানের জগতে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়াই বাংলা ভাষায় আমরা তা অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করি। তাছাড়া বাংলা ভাষী কমনিটির জন্য এধরণের দলীল নির্ভর পুস্তকের খুবই অভাব।

www.pathagar.com

তাই বইটিকে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জুবাইল দা'ওয়া সেন্টারের মহাপরিচালক শায়খ ইয়াহইয়া আল্ গামেদীর এবং বিশেষ করে দা'ওয়া বিভাগের পরিচালক শায়খ খালেদ নাসের আল উমাইরির। তাঁরা বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মুহতারাম শায়খ আকরামুজ্জামান সাহেবের। যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, মুদ্রন জনিত কোন ভ্রম নজরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন। যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যায়। হে আল্লাহ্ এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, তত্ত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত কর। সকলকে মার্জনা কর এবং এ কাজটিকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবূল কর। আমীন॥

নিবেদক
মুহা আবদুল্লাহ্ আল কাফী
ও
আবদুল্লাহ্ বিন শাহেদ
জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার
পোঃ বক্স নং ১৫৮০, সউদী আরব।

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার প্রাপ্য। সলাত ও সালাম নাযিল হোক তার প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যিনি নাবী ও রাসূল হওয়ার পাশাপাশি মানব ও দানব জাতির শিক্ষক হিসেবেও প্রেরিত হয়েছিলেন। তার বংশধর সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের উপরও রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

অতঃপর মুহতারাম শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন[1] (রহ.) সংকলিত ও জুবাইল দাওয়াহ সেন্টারে কর্মরত আবদুল্লাহিল কাফী ও আবদুল্লাহ শাহেদ কর্তৃক অনুদিত "ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম" গ্রন্থখানা ইসলামী গ্রন্থরাজীর মধ্যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। মুসলিমগণ প্রায় প্রতিদিনই ধর্মীয় কোন না কোন বিষয় নিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করে থাকেন এবং অন্যজন উত্তর দেন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ মুফতী উপাধীধারী, ইমাম, খতীব, মাদরাসার শিক্ষক, পীর-দরবেশ এমনকি দাড়ি টুপি পাঞ্জাবী ও লম্বা জামা পরিহিত (হুজুরদের) জিজ্ঞেস করা হয়। জিজ্ঞাসা ও জওয়াবের শুদ্ধা শুদ্ধির মাপকাঠির কোন বালাই নেই।

যার জন্য জিজ্ঞাসা জওয়াবের মধ্য দিয়ে ইসলামের নামে অনেক ভুল তথ্য মুসলিম সমাজে ছড়িয়েছে ও ছড়াচ্ছে। যার ফলে অনেক সময় ভুলকে সঠিক ও সঠিককে ভুল, সুন্নাত ও সওয়াবের কাজকে গুনাহ ও বিদআতের কাজ ধারণা করা হয়। তাওহীদকে শিরক এবং শিরককে তাওহীদ মনে করা হয়। হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা হয়। কোন প্রশ্নকারী কুরআন হাদীসের দলীল ভিত্তিক জওয়াব চায় না, এই সুযোগে উপরোক্ত ফাতওয়া দানকারীদের অধিকাংশ (শতকরা ৯৯ জনেরও বেশী) বিনা দলীলে ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। ফলে তাদের ফাতাওয়াগুলোর বিশুদ্ধতা ভাগ্যের বিষয়, ইলমী বিষয় থাকে না। মুফতী, ইমাম ও আলিমগণ কুরআন হাদীসকে লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করেন, রিফারেন্স হিসেবে নয়। যেহেতু ফাতাওয়া ও জবাব

---

[1] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ.) সৌদী আরবের প্রথম সারির বিশ্ববিখ্যাত 'আলিমগণের একজন। তাঁর রচিত ও সংকলিত বহু বিতাব রয়েছে। এমন কি ১৪/১৫ খণ্ড বিশিষ্ট অনেক কিতাবও রয়েছে। আমার জানা মতে বাংলাদেশের মাটিতে এপর্যন্ত এধরণের একজন 'আলিমেরও জন্ম হয়নি। আর এদেশের শিক্ষাগত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এরূপ 'আলিম তৈরী হওয়া আশাও করা যায় না। তিনি মাত্র কয়েক বছর পূর্বে পরলোক গমণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন– আমীন॥

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১	প্রশ্ন ঃ (১) তাওহীদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?	·46
	মক্কার কাফিরদের শির্ক কোন ধরনের ছিল?	56
২	প্রশ্ন ঃ (২) যাদের কাছে নবী ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের শির্ক কি ধরনের ছিল?আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি কি?	56
৩	প্রশ্ন ঃ (৩) আকীদাহ ও অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতিগুলো কি কি?জান্নাতী দলের পরিচয় ঃ	58
৪	প্রশ্ন ঃ (৪) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কারা?	60
৫	প্রশ্ন ঃ (৫) নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর উম্মাত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। সম্মানিত শায়খের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।	60
৬	প্রশ্ন ঃ (৬) নাজাতপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য কি? কোন ব্যক্তির মাঝে উক্ত বৈশিষ্টসমূহের কোন একটি অবর্তমান থাকলে সে ব্যক্তি কি নাজাতপ্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে যাবে?	61
৭	প্রশ্ন ঃ (৭) দ্বীনের ভিতরে মধ্যম পন্থা বলতে কি বুঝায়?	64
৮	প্রশ্ন ঃ (৮) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ঈমান অর্থ কি? ঈমান কি বাড়ে এবং কমে?	66
	হাদীসে জিবরীল এবং আবদুল কায়েসের হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ঃ	
৯	প্রশ্ন ঃ (৯) হাদীসে জিবরীল এ ঈমানের ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ বলেছেন, ঈমান হল আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং তাঁর রাসূলসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা, পরকালের উপর বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখার নাম। অথচ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীসে নবী ﷺ ঈমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঈমান হল আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, সলাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা। উপরের উভয় হাদীসের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় করব?	70
	ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে	71
১০	প্রশ্ন ঃ (১০) রাসূল ﷺ হাদীসে জিবরাঈলে বলেছেন, ঈমান হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস, রাসূলদের উপর বিশ্বাস, পরকালের উপর বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন। অন্য হাদীসে রয়েছে, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। উভয় হাদীসের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় করব?	71

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১	প্রশ্ন ঃ (১১) হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মাসজিদে আসার অভ্যাস আছে এমন ব্যক্তিকে কি আমরা মু'মিন হিসেবে সাক্ষ্য দিতে পারি?	72
	আল্লাহ্ সম্পর্কে শয়তানের ওয়াস্ ওয়াসা (কুমন্ত্রণা)	73
১২	প্রশ্ন ঃ (১২) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে শয়তান একজন মানুষকে এমন ওয়াস্ ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) প্রদান করে যে, সে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে। এ সম্পর্কে আপনার উপদেশ কি?	73
১৩	প্রশ্ন ঃ (১৩) কাফিরের উপর কি ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব?	76
১৪	প্রশ্ন ঃ (১৪) যে ব্যক্তি 'ইল্‌মে গায়েব দাবী করবে, তার বিধান কি?	78
	মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন	79
১৫	প্রশ্ন ঃ (১৫) বর্তমান কালের ডাক্তারগণ মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান আছে না কন্যা সন্তান বলে দিতে পারে। .... অর্থাৎ কোন অবস্থাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও মাতৃগর্ভের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখতে পারে?	79
১৬	প্রশ্ন ঃ (১৬) সূর্য কি পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে?	81
১৭	প্রশ্ন ঃ (১৭) সম্মানিত শাইখ! আল্লাহকে এক বলে সাক্ষ্য দেয়া এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ কি?	85
১৮	প্রশ্ন ঃ (১৮) 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কিভাবে তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে?	90
১৯	প্রশ্ন ঃ (১৯) মানুষ এবং জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?	90
	আল্লাহর কাছে দু'আ কবূল হওয়ার শর্ত	91
২০	প্রশ্ন ঃ (২০) কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকে। কিন্তু দু'আ কবূল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব"। তাহলে মানুষ কিভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তা কবূল হবে?	91
	ইবাদাতে ইখলাস এবং জান্নাত লাভের কামনা	96
২১	প্রশ্ন ঃ (২১) ইখলাস অর্থ কি? কোন মানুষ যদি ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করে, তবে তার বিধান কি?	96
২২	প্রশ্ন ঃ (২২) আশা এবং ভয়ের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত কি?	99
	উপায় অবলম্বন আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়	100
২৩	প্রশ্ন ঃ (২৩) উপায় গ্রহণ অবলম্বন করা কি আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী? উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কেউ কেউ উপায় অবলম্বন করেছে। আবার কতক লোক এ বলে উপায় অবলম্বন করা বাদ দিয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?	100

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪	প্রশ্ন ঃ (২৪) ইসলামে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার হুকুম কি?	102
২৫	প্রশ্ন ঃ (২৫) ঝাড়-ফুঁকের বিধান কি? কুরআনের আয়াত লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার হুকুম কি?	103
২৬	প্রশ্ন ঃ (২৬) ঝাড়-ফুঁক করা কি আল্লাহর উপর (তাওয়াক্কুল) ভরসা করার পরিপন্থী?	104
২৭	প্রশ্ন ঃ (২৭) তাবীজ ব্যবহার করার হুকুম কি?	105
২৮	প্রশ্ন ঃ (২৮) পানাহারের পাত্রে চিকিৎসা স্বরূপ আয়াতুল কুরসী বা কুরআনের অন্য কোন আয়াত লিখে রাখা জায়েয আছে কি?	105
	কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা।	105
২৯	প্রশ্ন ঃ (২৯) কোন কোন ইসলামী দেশে মাদরাসার ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব হল কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা জ্ঞানার্জনের মাদরাসাকে ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্রদের মাদরাসা এবং আশআরীদের মাদরাসা, এ দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকে। এভাবে বিভক্ত করা কি সঠিক? যে সমস্ত আলিমরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করে থাকে, তাদের ব্যাপারে একজন মুসলিমের অবস্থান কি রকম হওয়া দরকার?	105
	আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ	110
৩০	প্রশ্ন ঃ (৩০) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ কি? নাম ও গুণের মধ্যে পার্থক্য কি? আল্লাহর প্রতিটি নাম কি একটি করে তার গুণকে আবশ্যক করে? অনুরূপভাবে সিফাতও কি নামকে আবশ্যক করে?	110
৩১	প্রশ্ন ঃ (৩১) আল্লাহর নাম কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত?	111
	আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন উপরে আছেন।	113
৩২	প্রশ্ন ঃ (৩২) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যে উপরে আছেন, সে ব্যাপারে সালফ্‌দের মাযহাব কি? যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছয়টি দিক থেকে মুক্ত এবং তিনি মু'মিন বান্দার অন্তরে আছেন, তার হুকুম কি?	113
	আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন	122
৩৩	প্রশ্ন ঃ (৩৩) আল্লাহ তা'আলার শানে যেভাবে প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই আরশের উপরে আছেন- এটাই কি সালাফে সালিহীনের ব্যাখ্যা?	123

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪	'আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত' এ কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা।	124
৩৫	প্রশ্ন ঃ (৩৪) সম্মানিত শায়খ! আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন! আপনি বলেছেন, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া বিশেষ এক ধরনের সমুন্নত হওয়া, যা কেবলমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে প্রযোজ্য। আমরা কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাই	124
৩৬	প্রশ্ন ঃ (৩৫) কোন ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বলতে হবে না?	125
৩৭	প্রশ্ন ঃ (৩৬) ইরাদাহ বা আল্লাহর ইচ্ছা কত প্রকার?	126
৩৮	প্রশ্ন ঃ (৩৭) আল্লাহর নামের ভিতরে ইলহাদ (إلحاد) কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?	127
	আল্লাহর 'চেহারা', আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি সম্পর্কে	129
৩৯	প্রশ্ন ঃ (৩৮) আল্লাহর চেহারা, আল্লাহর হাত এ জাতীয় যে সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয় তা কত প্রকার?	129
৪০	প্রশ্ন ঃ (৩৯) আল্লাহর কোন নাম বা গুণ অস্বীকার করার হুকুম কি	129
৪১	প্রশ্ন ঃ (৪০) আল্লাহর গুণাবলী কি মানুষের গুণাবলীর মতই?	130
	শেষ রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন– এ কথার ব্যাখ্যা	131
৪২	প্রশ্ন ঃ (৪১) আমরা জানি যে, ভূপৃষ্ঠের উপরে রাত ঘূর্ণীয়মান। আর আল্লাহ রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। এ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা রাতভর দুনিয়ার আকাশে থাকেন। এর উত্তর কি?	131
৪৩	আল্লাহকে দেখার মাসআলায় সালাফে সালিহীনের অভিমত কি?	132
৪৪	প্রশ্ন ঃ (৪২) আল্লাহকে দেখার মাসআলায় সালাফে সালিহীনের অভিমত কি? যারা বলে যে, চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় বরং আল্লাহকে দেখার অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানের নামান্তর, তাদের হুকুম কি?	133
৪৫	প্রশ্ন ঃ (৪৩) জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় কি?	134
৪৬	প্রশ্ন ঃ (৪৪) জিনেরা কি গায়েব জানে?	136
৪৭	প্রশ্ন ঃ (৪৫) যারা আল্লাহর নবী ﷺ-কে হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর হাবীব) বলে তাদের হুকুম কি?	137
৪৮	প্রশ্ন ঃ (৪৬) ব্যবসায়ী স্বার্থ হাসিলের জন্য নবী -এর প্রশংসা করার হুকুম কি?	137
৪৯	নবী ﷺ কি নূরের তৈরী?	138

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫০	প্রশ্ন ঃ (৪৭) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবী ﷺ প্রার্থনা করে এ বিশ্বাসে যে, তিনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, তার হুকুম কি? এ ধরনের লোকের পিছনে সলাত আদায় করা জায়েয আছে কি?	138
৫১	প্রশ্ন ঃ (৪৮) ইমাম মাহ্দীর আগমন সংক্রান্ত হাদীসগুলো কি সহীহ?	140
৫২	প্রশ্ন ঃ (৪৯) ইয়া'জূজ-মা'জূজ কারা?	141
৫৩	প্রশ্ন ঃ (৫০) নবীগণ কেন তাঁদের উম্মাতকে দাজ্জালের ফিত্না থেকে সাবধান করেছেন? অথচ দাজ্জাল তো শেষ যামানাতেই বের হবে।	143
৫৪	প্রশ্ন ঃ (৫১) যারা পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস করে, তাদের কিভাবে বুঝানো সম্ভব?	144
৫৫	প্রশ্ন ঃ (৫২) কবরের আযাব কি সত্য?	149
৫৬	স্বাভাবিক দাফন না হলেও কবরে আযাব হবে।	150
৫৭	প্রশ্ন ঃ (৫৩) মৃত লাশকে যদি হিংস্র পশুরা খেয়ে ফেলে কিংবা আগুনে পুড়ায়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয় তবুও কি কবরের আযাব হবে?	150
৫৮	কবরের আযাব অস্বীকার করার বিধান	150
৫৯	প্রশ্ন ঃ (৫৪) এক শ্রেণীর লোক কবরের আযাব অস্বীকার করার পক্ষে দলীল পেশ করে যে, কবর খনন করলে দেখা যায় যে, লাশ রয়ে গেছে, কোন পরিবর্তন হয়নি, কবর সংকীর্ণ অথবা প্রশস্তও হয়নি। আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?	150
৬০	প্রশ্ন ঃ (৫৫) পাপী মু'মিনের কবরের আযাব কি হালকা করা হবে?	152
৬১	প্রশ্ন ঃ (৫৬) শাফাআত কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?	154
৬২	১) সাধারণ শাফাআত ঃ ২) বিশেষ ও নির্দিষ্ট সুপারিশ ঃ ২) শরীয়ত বিরোধী শাফাআত ঃ প্রশ্ন ঃ (৫৭) মু'মিনদের শিশু বাচ্চাদের পরিণাম কি? মুশরিকদের যে সমস্ত শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে, তাদের অবস্থা কি হবে?	157
৬৩	প্রশ্ন ঃ (৫৮) জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল মহিলাদের জন্য কি আছে?	158
৬৪	প্রশ্ন ঃ (৫৯) মহিলারা বেশী সংখ্যায় জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ কি?	159
৬৫	তাকদীরের মাসআলা এড়িয়ে চলার বিধান।	159
৬৬	প্রশ্ন ঃ (৬০) পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যারা তাকদীরের মাসআলাসহ আকীদার বিভিন্ন বিষয় পাঠ করা পছন্দ করেন না, তাদের জন্য আপনার উপদেশ কি?	159

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৭	মানুষ কি নিজ কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন?	161
৬৮	প্রশ্ন ঃ (৬১) সম্মানিত শায়খ! তাকদীরের মাসআলা বর্ণনা করুন। মানুষের মূল কাজ কি পূর্ব নির্ধারিত এবং কাজটি পালন করার নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ কি স্বাধীন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন মানুষের জন্য যদি নির্ধারিত থাকে যে, সে একটি মাসজিদ বানাবে। সে অবশ্যই মাসজিদ বানাবে। তবে কিভাবে বানাবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। এমনিভাবে পাপ কাজ নির্ধারিত থাকলে তা অবশ্যই করবে। কিভাবে করবে তা নির্ধারিত হয়নি। মোট কথা মানুষের তাকদীরের যে সমস্ত কর্ম নির্ধারিত আছে, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন কথাটি কি ঠিক?	161
৬৯	প্রশ্ন ঃ (৬২) সৃষ্টির পূর্বে মানুষের ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, তা কি দু'আর মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব?	166
৭০	প্রশ্ন ঃ (৬৩) রিয্ক এবং বিবাহ কি লাওহে মাহফূজে লিখিত আছে?	166
৭১	প্রশ্ন ঃ (৬৪) মুসীবত নাযিল হলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার হুকুম কি?	168
৭২	রোগ কি একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়? কোন কিছু দেখে বা শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করার বিধান।	169
৭৩	প্রশ্ন ঃ (৬৫) সম্মানিত শায়খ! নবী ﷺ-এর বাণী, (لا عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر) "একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয় না। পাখী উড়িয়ে বা পাখীর ডাক শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণের নিয়ম ইসলামে নেই। সফর মাসেরও কোন অতিরিক্ত সম্মান নেই" এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাই? হাদীসে বর্ণিত জিনিসগুলোর প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলো কোন্ ধরনের অস্বীকার? নবী ﷺ-এর বাণী, "কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন কর যেভাবে তুমি বাঘ থেকে ভয়ে পলায়ন কর"। এ হাদীস ও প্রথমোক্ত হাদীসের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করব?	169
৭৪	বদ নজরের প্রকৃতি এবং তার চিকিৎসা কি?	173
৭৫	প্রশ্ন ঃ (৬৬) মানুষের উপর কি বদ নজর লাগে? লাগলে তার চিকিৎসা কি? এ থেকে বেঁচে থাকা কি আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী?	173
৭৬	প্রশ্ন ঃ (৬৭) আকীদার মাসআলায় কি মানুষের অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য?	175
৭৭	প্রশ্ন ঃ (৬৮) যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের হুকুম কি?	185
৭৮	গাইরুল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করা বড় শির্ক।	190
৭৯	প্রশ্ন ঃ (৬৯) গাইরুল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করার হুকুম কি? গাইরুল্লাহ্‌র নামে যবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয কি?	190

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮০	প্রশ্ন ঃ (৭০) আল্লাহ তা'আলা বা তাঁর রাসূল অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার হুকুম কি?	191
৮১	প্রশ্ন ঃ (৭১) কবরবাসীর কাছে দু'আ করার বিধান কি?	192
৮২	আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কি?	194
৮৩	প্রশ্ন ঃ (৭২) কাউকে আল্লাহর ওলী ভেবে তার কাছে বিপদে উদ্ধার কামনা করার জন্য ফরিয়াদ করার বিধান কি? আল্লাহর ওলী হবার সঠিক আলামত কি?	194
৮৪	প্রশ্ন ঃ (৭৩) যাদু কাকে বলে? যাদু শিক্ষার হুকুম কি?	195
৮৫	প্রশ্নঃ (৭৪) যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মিশের ব্যবস্থা করার হুকুম কি?	197
৮৬	প্রশ্ন ঃ (৭৫) গণক কাকে বলে? গণকের কাছে যাওয়ার বিধান কি?	197
৮৭	প্রশ্ন ঃ (৭৬) রিয়া বা মানুষকে দেখানো ও শুনানোর নিয়তে ইবাদাত করার বিধান কি?	199
৮৮	প্রশ্ন ঃ (৭৭) কুরআনের শপথ করার হুকুম কি?	200
৮৯	গাইরুল্লাহ্র নামে শপথ করার বিধান কি?	202
৯০	প্রশ্ন ঃ (৭৮) নবীর নামে, কা'বার নামে এবং মান-মর্যাদা ও জিম্মাদারীর নামে শপথ করার বিধান কি?	202
৯১	প্রশ্ন ঃ (৭৯) যে ব্যক্তি কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করে, কবরবাসীর কাছে দু'আ করে এবং তাদের জন্য নযর-মানৎ পেশ সহ অন্যান্য ইবাদাত করে থাকে, তার হুকুম কি?	203
৯২	নবী ﷺ -এর কবর মাসজিদের ভিতরে হওয়ার জবাব	207
৯৩	প্রশ্ন ঃ (৮০) যে সমস্ত কবর পূজারী নবী ﷺ-এর কবর মাসজিদের ভিতরে হওয়াকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?	207
৯৪	প্রশ্ন ঃ (৮১) কবরের উপরে গম্বুজ নির্মাণের বিধান কি?	207
৯৫	প্রশ্ন ঃ (৮২) মাসজিদে দাফন করার বিধান কি?	208
৯৬	প্রশ্ন ঃ (৮৩) নবী -এর কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করার হুকুম কি?	208
৯৭	কবরের মাধ্যমে বরকত কামনা এবং তার চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা হারাম	209
৯৮	প্রশ্ন ঃ (৮৪) কবরের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা বা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কিংবা নৈকট্য হাসিলের জন্য কবরের চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার হুকুম কি?	209

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৯	প্রশ্ন ঃ (৮৫) প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে সলাত আদায়ের বিধান কি?	211
১০০	প্রশ্ন ঃ (৮৬) ঘরের দেয়ালে ছবি ঝুলানোর বিধান কি?	211
১০১	প্রশ্ন ঃ (৮৭) ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি উঠানোর বিধান কি?	212
১০২	ইসলামে বিদ'আতের কোন স্থান নেই।	212
১০৩	প্রশ্ন ঃ (৮৮) (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোন সুন্নাত চালু করল, তার জন্য সাওয়াব রয়েছে, এ হাদীসকে যে সমস্ত বিদ'আতী তাদের বিদ'আতের পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?	212
১০৪	প্রশ্ন ঃ (৮৯) ঈদে মীলাদুন্ নবী পালনের হুকুম কি?	214
১০৫	প্রশ্ন ঃ (৯০) মাতৃ দিবসের ঈদ পালন করার হুকুম কি?	215
১০৬	প্রশ্ন ঃ (৯১) সন্তানদের জন্ম দিবস উপলক্ষে উৎসব পালন করা এবং বিবাহ উপলক্ষে উৎসব পালন করার হুকুম কি?	217
১০৭	কোন ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গল মনে করা প্রসঙ্গে	217
১০৮	প্রশ্ন ঃ (৯২) জনৈক লোক একটি ঘরে বসবাস শুরু করার পর থেকেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হয়েছে আরো বড় বড় কয়েকটি মুসীবতে, যার কারণে সে এ ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গলের কারণ হিসেবে মনে করছে। তার জন্য কি ঘর ছেড়ে দেয়া জায়েয?	217
১০৯	প্রশ্নঃ (৯৩) উসীলার হুকুম কি?	217
১১০	প্রশ্ন ঃ (৯৪) কাউকে বন্ধু বা শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার মূলনীতি কি?	223
১১১	প্রশ্ন ঃ (৯৫) অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার হুকুম কি? পর্যটনের উদ্দেশে দেশ ভ্রমণের বিধান কি?	225
১১২	প্রশ্ন ঃ (৯৬) যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে চাকুরী করে, তার জন্য আপনার উপদেশ কি?	225
১১৩	প্রশ্ন ঃ (৯৭) কাফিরদের কাছে যে সমস্ত প্রযুক্তি রয়েছে তা দ্বারা কিভাবে আমরা উপকৃত হব?	226
১১৪	প্রশ্ন ঃ (৯৮) আরব উপদ্বীপে অমুসলিমদের প্রবেশ করানোর হুকুম কি?	227
১১৫	দ্বীন-ধর্ম প্রত্যাখ্যানই কি উন্নতির চাবিকাঠি?	227
১১৬	প্রশ্ন ঃ (৯৯) কিছু সংখ্যক মানুষ দাবী করে যে, দ্বীনের অনুসরণই মুসলিমদেরকে উন্নতি থেকে পিছিয়ে রেখেছে। তাদের দলীল হলো পাশ্চাত্য দেশসমূহ সকল প্রকার দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেই বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এও বলে যে, পাশ্চাত্য বিশ্বেই বেশী করে বৃষ্টি ও ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।	227

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৭	প্রশ্ন ঃ (১০০) কতক লোক বলে যে, অন্তর ঠিক থাকলে শব্দের উচ্চারণ ঠিক করার বেশী গুরুত্ব নেই। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?	230
১১৮	প্রশ্ন ঃ (১০১) আল্লাহ আপনাকে চিরস্থায়ী করুন- এ কথাটি বলা কি ঠিক?	230
১১৯	প্রশ্ন ঃ (১০২) আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে কোন কিছু চাওয়া জায়েয আছে কি?	230
১২০	প্রশ্ন ঃ (১০৩) আপনি দীর্ঘজীবি হোন– এ কথা বলার হুকুম কি?	231
১২১	একত্রে (الله) এবং (محمد) লেখার বিধান কি?	231
১২২	প্রশ্ন ঃ (১০৪) আমরা অনেক সময় দেখি যে, গাড়ী বা দেয়ালে, কাগজে বা পুস্তকে বা কুরআনের উ এক দিকে (الله) এবং অন্য দিকে (محمد) লেখা থাকে, এ রকমভাবে লেখা কি ঠিক?	231
১২৩	প্রশ্ন ঃ (১০৫) আল্লাহ আপনার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন– এ বাক্যটি বলা যাবে কিনা?	231
১২৪	মৃত ব্যক্তিকে মরহুম বলার হুকুম কি?	231
১২৫	প্রশ্ন ঃ (১০৬) মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মরহুম বলা বা আল্লাহ তাকে রহমত দ্বারা ঢেকে নিয়েছেন অথবা অমুক ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের দিকে চলে গেছেন– এ ধরনের কথা বলার হুকুম কি?	231
১২৬	প্রশ্ন ঃ (১০৭) ভাষণের শুরুতে দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে বলছি– এ কথাটি বলা কি ঠিক?	232
১২৭	প্রশ্ন ঃ (১০৮) অনেক মানুষ বলে থাকে, "আপনি আমাদের জন্য বরকত স্বরূপ" এভাবে বলার হুকুম কি?"	232
১২৮	প্রশ্ন ঃ (১০৯) মানুষ বলে থাকে "তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে"– এ ধরনের কথা বলার বিধান কি?	233
১২৯	"চিন্তার স্বাধীনতা"– কথাটি কতটুকু সঠিক?	233
১৩০	প্রশ্ন ঃ (১১০) "চিন্তার স্বাধীনতা" সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি এবং পত্রিকায় পড়ে থাকি। মূলতঃ এটি আকীদা গ্রহণের স্বাধীনতার দিকে আহবান মাত্র। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?	233
১৩১	প্রশ্ন ঃ (১১১) মুফতীর নিকট "এ বিষয়ে ইসলামের হুকুম কি বা ইসলামের দৃষ্টিতে কি"- এ ধরনের বাক্য দিয়ে প্রশ্ন করার বিধান কি?	234
১৩২	প্রশ্ন ঃ (১১২) "পরিস্থিতির ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে" "তাকদীদেরর ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে"– এ ধরনের কথা বলার হুকুম কি?	234
১৩৩	প্রশ্ন ঃ (১১৩) কাউকে শহীদ বলার হুকুম কি?	234

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩৪	প্রশ্ন ঃ (১১৪) 'হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল', 'হঠাৎ এসে গেলাম'- এ জাতীয় কথা বলা জায়েয কি না?	236
১৩৫	প্রশ্ন ঃ (১১৫) সম্মানিত শায়খ! ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী চিন্তাবিদ- এ ধরনের কথা বলা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?	236
১৩৬	প্রশ্ন ঃ (১১৬) দ্বীনকে খোসা এবং মূল এভাবে ভাগ করা কি ঠিক?	237
১৩৭	প্রশ্ন ঃ (১১৭) "তাকে সর্বশেষ বিছানায় দাফন করা হল" মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলার হুকুম কি?	238
১৩৮	প্রশ্ন ঃ (১১৮) নাসারাদেরকে মাসীহী বলা কি ঠিক?	238
১৩৯	প্রশ্ন ঃ (১১৯) আল্লাহ না করেন- এ কথাটি বলার হুকুম কি?	240
১৪০	প্রশ্ন ঃ (১২০) মানুষ মারা গেলে (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) অর্থাৎ হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার প্রভুর দিকে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে- এ কথাটি বলা কি ঠিক?	240

সলাত বিষয়ক ফাতাওয়া

	অধ্যায় ঃ পবিত্রতা	
১৪১	প্রশ্ন ঃ (১২১) অপবিত্রতা ও বাহ্যিক নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার প্রকৃত উপায় কি?	242
১৪২	প্রশ্ন ঃ (১২২) বাহ্যিক অপবিত্র বস্তু পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পবিত্র করা যাবে কি? ভাপের বা ধোয়ার (Dry clean) মাধ্যমে কি কোট ইত্যাদি পবিত্র করা যায়?	242
১৪৩	প্রশ্ন ঃ (১২৩) দীর্ঘকাল কোন স্থানে পানি জমা থাকার কারণে তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ পানির বিধান কি?	243
১৪৪	প্রশ্ন ঃ (১২৪) পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার হিকমত কি?	243
১৪৫	প্রশ্ন ঃ (১২৫) স্বর্ণের দাঁত লাগানোর বিধান কি?	245
১৪৬	প্রশ্ন ঃ (১২৬) ওযূ করার স্থানে প্রস্রাব করার বিধান কি? বিশেষ করে যদি এতে লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে?	246
১৪৭	প্রশ্ন ঃ (১২৭) দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রস্রাব করার বিধান কি?	246
১৪৮	প্রশ্ন ঃ (১২৮) কুরআন মাজীদে সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করার বিধান কি?	247
১৪৯	প্রশ্ন ঃ (১২৯) আল্লাহর নাম সম্বলিত কাগজ সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করার বিধান কি?	247

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫০	প্রশ্নঃ (১৩০) টয়লেটের মধ্যে ওযূ করার দরকার হলে সে সময় কিভাবে 'বিসমিল্লাহ্' বলবে?	247
১৫১	প্রশ্ন ঃ (১৩১) প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলা সামনে বা পিছনে রাখার বিধান কি?	247
১৫২	প্রশ্ন ঃ (১৩২) বায়ু নিঃস্বরণ হলে কি ইস্তিন্জা করা আবশ্যক?	249
১৫৩	প্রশ্ন ঃ (১৩৩) কখন মিসওয়াক ব্যবহার করার গুরুত্ব বেশী? খুতবা চলাবস্থায় সলাতের অপেক্ষাকারীর মিসওয়াক করার বিধান কি?	250
১৫৪	প্রশ্ন ঃ (১৩৪) ওযূর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলা কি ওয়াজিব?	250
১৫৫	প্রশ্ন ঃ (১৩৫) পুরুষ ও নারীর খাত্না করার বিধান কি?	250
১৫৬	প্রশ্ন ঃ (১৩৬) কোন মানুষের যদি কৃত্রিম দাঁত থাকে, তবে কুলি করার সময় কি তা খুলে রাখা ওয়াজিব?	252
১৫৭	প্রশ্ন ঃ (১৩৭) কান মাসেহ করার জন্য কি নতুন করে পানি নিতে হবে?	252
১৫৮	প্রশ্ন ঃ (১৩৮) ওযূতে ধারাবাহিকতার অর্থ কি? ওযূতে মুওয়ালাত বা পরস্পর অর্থ কি? এ দু'টি কথার বিধান কি?	252
১৫৯	প্রশ্ন ঃ (১৩৯) ওযূর সময় কেউ যদি কোন একটি অঙ্গ ধৌত করতে ভুলে যায়, তবে তার বিধান কি?	254
১৬০	ওযূ অবস্থায় পানি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার পানি পাওয়া গেল।	255
১৬১	প্রশ্ন ঃ (১৪০) ওযূ চলছে এমন সময় পানি বন্ধ হয়ে গেল। পানি যখন ফিরে এল তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে গেছে। এখন ওযূ কি নতুন করে করতে হবে নাকি বাকী অঙ্গসমূহ ধৌত করলেই চলবে?	255
১৬২	প্রশ্ন ঃ (১৪১) নখ পালিশ ব্যবহার করে ওযূ করার বিধান কি?	256
১৬৩	প্রশ্ন ঃ (১৪২) শরীয়ত সম্মত ওযূর পদ্ধতি কি?	257
১৬৪	অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি	259
১৬৫	প্রশ্ন ঃ (১৪৩) পবিত্রতায় সতর্কতার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকবার ওযূ করার সময় সুতার মোজা খোলার বিধান কি?	262
১৬৬	প্রশ্ন ঃ (১৪৪) সুতার মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা গণনা কখন থেকে শুরু করতে হবে?	262
১৬৭	মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা ঃ	264
১৬৮	কখন মোজার উপর মাসেহ বাত্বিল হবে?	265
১৬৯	প্রশ্ন ঃ (১৪৫) পাতলা বা ছেঁড়া মোজাতে মাসেহ করার বিধান কি?	266

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭০	প্রশ্ন ঃ (১৪৬) পট্টির উপর মাসেহ করার বিধান কি?	266
১৭১	প্রশ্ন ঃ (১৪৭) পট্টি বা ব্যান্ডেজের উপর কি একই সাথে মাসেহ ও তায়াম্মুম করতে হবে?	267
১৭২	প্রশ্ন ঃ (১৪৮) ওযূ শেষে প্রথমে ডান পা ধৌত করে মোজা পরিধান করা তারপর বাম পা ধৌত করে মোজা পরিধান করার বিধান কি? এভাবে মোজা পরলে কি তার উপর মাসেহ করা যাবে?	267
১৭৩	প্রশ্ন ঃ (১৪৯) মুক্বীম অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করে সফর আরম্ভ করলে কি সফরের সময়সীমা অনুযায়ী আমল করতে হবে?	268
১৭৪	প্রশ্ন ঃ (১৫০) প্রথমবার কখন মাসেহ করেছে– এ ব্যাপারে কোন মানুষ যদি সন্দেহে পড়ে, তবে সে কি করবে?	268
১৭৫	প্রশ্ন ঃ (১৫১) কোন মানুষ যদি পায়ের লম্বা জুতায় (যা পায়ের টাখনু ঢেকে পরা হয়) মাসেহ করার পর তা খুলে ফেলে এবং মোজার উপর মাসেহ করে, তবে তার মাসেহ বিশুদ্ধ হবে কি?	269
১৭৬	প্রশ্ন ঃ (১৫২) কোন মানুষ যদি মোজা খুলে ফেলে তারপর ওযূ বিনষ্ট হওয়ার আগেই তা আবার পরিধান করে নেয়, তবে তার উপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি না?	269
১৭৭	মাসেহের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর তাতে মাসেহ করা	270
১৭৮	প্রশ্ন ঃ (১৫৩) মাসেহ বৈধ হওয়ার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ যদি তাতে মাসেহ করে সলাত আদায় করে, তবে তার সলাতের বিধান কি?	270
১৭৯	প্রশ্ন ঃ (১৫৪) ওযূ বিনষ্টের কারণগুলো কী কী?	270
১৮০	প্রশ্ন ঃ (১৫৫) স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?	272
১৮১	পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা	274
১৮২	প্রশ্ন ঃ (১৫৬) জনৈক শিক্ষক ছাত্রদের কুরআনের দারস্ প্রদান করেন। মাদ্‌রাসায় বা তার আশেপাশে পানি নেই। এখন তিনি কি করবেন? কেননা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া তো কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না?	274
১৮৩	প্রশ্ন ঃ (১৫৭) কি কি কারণে গোসল ফরয হয়?	275
১৮৪	প্রশ্ন ঃ (১৫৮) স্ত্রীকে স্পর্শ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করলে কি গোসল করতে হবে?	277
১৮৫	প্রশ্ন ঃ (১৫৯) নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে কি করবে?	278
১৮৬	প্রশ্ন ঃ (১৬০) নাপাক অবস্থায় কি কি বিধান প্রযোজ্য?	279
১৮৭	প্রশ্ন ঃ (১৬১) গোসল করার পদ্ধতি কি?	280
১৮৮	প্রশ্ন ঃ (১৬২) গোসলের সময় কুলি না করলে বা নাক না ঝাড়লে গোসল বিশুদ্ধ হবে কি?	281

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৯	প্রশ্ন ঃ (১৬৩) পানি ব্যবহার করতে অপারগ হলে, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে?	281
১৯০	প্রশ্ন ঃ (১৬৪) ঠাণ্ডার সময় কেউ যদি নাপাক হয়, তবে কি সে তায়াম্মুম করবে?	282
১৯১	প্রশ্ন ঃ (১৬৫) যে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা হয় তাতে কি ধূলা থাকা শর্ত? আল্লাহর বাণী "তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় তা দ্বারা মুছে ফেল।" এখানে "তা দ্বারা" বলতে কি বুঝা যায় তায়াম্মুম করার সময় অবশ্যই ধূলা থাকতে হবে?	283
১৯২	প্রশ্ন ঃ (১৬৬) মাটি না পেয়ে দেয়ালে বা বিছানায় তায়াম্মুম করলে বিশুদ্ধ হবে কি?	283
১৯৩	প্রশ্ন ঃ (১৬৭) ছোট্ট শিশুর প্রস্রাব যদি কাপড়ে লাগে, তবে তার বিধান কি?	284
১৯৪	পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম হওয়ার পর নারীর ঋতু স্রাবের বিধান	284
১৯৫	প্রশ্ন ঃ (১৬৮) জনৈক নারী পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করেছে। কিন্তু পরিচিত নিয়মেই তার স্রাব প্রবাহিত হচ্ছে। আরেক পঞ্চাশোর্ধ নারীর স্রাব পরিচিত নিয়মে হয় না; বরং হলদে রং বা মেটে রঙ্গের পানি নির্গত হয়। এদের বিধান কি?	284
১৯৬	প্রশ্ন ঃ (১৬৯) গর্ভবতীর রক্তস্রাব দেখা গেলে তা কি ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে?	285
১৯৭	প্রশ্ন ঃ (১৭০) ঋতুর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট দিন বলে কি কিছু আছে?	286
১৯৮	প্রশ্ন ঃ (১৭১) ঔষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে ঋতুস্রাব চালু করে সলাত পরিত্যাগ করার বিধান কি?	287
১৯৯	প্রশ্ন ঃ (১৭২) ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয কি?	287
২০০	হায়েযের রক্ত না ইস্তিহাযার রক্ত সন্দেহ হলে কি করবে?	287
২০১	প্রশ্ন ঃ (১৭৩) নির্গত স্রাবের ব্যাপারে নারী যদি সন্দিহান হয় যে, এটা কি হায়েযের রক্ত না কি ইস্তিহাযার রক্ত নাকি অন্য কিছুর রক্ত? এবং সে পার্থক্যও করতে পারে না। তবে সে তা কি গণ্য করবে?	287
২০২	প্রশ্ন ঃ (১৭৪) সলাতের সময় আরম্ভ হওয়ার পর ঋতু শুরু হলে তার বিধান কি?	288
২০৩	প্রশ্ন ঃ (১৭৫) জনৈক নারীর ঋতুর নির্দিষ্ট দিন ছিল ছয় দিন। অতঃপর এ দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গেছে। সে এখন কি করবে?	289

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৪	হায়েযের দিনসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে হলে কি করবে?	289
২০৫	প্রশ্ন ঃ (১৭৬) জনৈক নারী মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সলাত শুরু করেছে। এভাবে নয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার স্রাব দেখা গেছে। তিনদিন স্রাব প্রবাহমান ছিল। তখন সলাত পড়েনি। তারপর পবিত্র হলে গোসল করে এগার দিন সলাত আদায় করেছে। তারপর আবার তার স্বাভাবিক মাসিক শুরু হয়েছে। সে কি ঐ তিন দিনের সলাত কাযা আদায় করবে? নাকি তা হায়েযের দিন হিসেবে গণ্য করবে?	289
২০৬	প্রশ্ন ঃ (১৭৭) ঋতু শুরু হওয়ার দু'দিন পূর্বে নারীর গর্ভ থেকে যে হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ নির্গত হয় তার বিধান কি?	290
২০৭	প্রশ্ন ঃ (১৭৮) পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হওয়ার বিধান কি?	290
২০৮	প্রশ্ন ঃ (১৭৯) ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ (ট্যাবলেট) ব্যবহার করার বিধান কি?	291
২০৯	প্রশ্ন ঃ (১৮০) চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও নিফাসের স্রাব চলতে থাকলে কি করবে?	292
২১০	প্রশ্ন ঃ (১৮১) নিফাসের চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার আগেই পবিত্র হয়ে গেলে বা চল্লিশ দিনের পর পুনরায় স্রাব দেখা গেলে কি করবে?	293
২১১	অকাল গর্ভপাত হলে কি করবে?	294
২১২	প্রশ্ন ঃ (১৮২) জনৈক নারীর তৃতীয় মাসেই গর্ভপাত হয়ে গেছে। সে কি সলাত আদায় করবে না সলাত পরিত্যাগ করবে?	294
২১৩	ইস্তিহাযা হলে নারী কি করবে?	294
২১৪	প্রশ্ন ঃ (১৮৩) অসুস্থতার কারণে যদি কোন নারীর রক্তস্রাব নির্গত হতেই থাকে, তবে কিভাবে সে সলাত ও সওম আদায় করবে?	294
২১৫	প্রশ্ন ঃ (১৮৪) ইসলামে সলাতের বিধান কি? কার উপর সলাত ফরয?	295
২১৬	প্রশ্ন ঃ (১৮৫) বেহুঁশ এবং স্মৃতিশক্তিহীন ব্যক্তির জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা কি আবশ্যক?	298
২১৭	যে ব্যক্তি দু'মাস যাবত সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে সলাত-সওম কিছুই আদায় করতে পারেনি তার বিধান।	299
২১৮	প্রশ্ন ঃ (১৮৬) জনৈক ব্যক্তি দু'মাস যাবৎ কোন কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে না সলাত আদায় করেছে না রামাযানের সওম পালন করেছে। এখন তার করণীয় কি?	299
২১৯	সলাতের শর্ত পূর্ণ করতে গিয়ে সময় পার হয়ে গেলে কি করবে?	300

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২০	প্রশ্ন ঃ (১৮৭) সলাতের কোন একটি শর্ত (যেমন পানি সংগ্রহ) পূর্ণ করতে গিয়ে যদি সলাতের সময় পার হয়ে যায় তবে তার বিধান কি?	300
২২১	প্রশ্ন ঃ (১৮৮) রাত জাগার কারণে সূর্য উঠার পর সলাত আদায় করলে কবূল হবে কি? অন্যান্য সলাত সে সময়মতই আদায় করে। সেগুলোর বিধান কি?	301
২২২	বিলম্ব করে ফজরের সলাত আদায় করার বিধান কি?	302
২২৩	প্রশ্ন ঃ (১৮৯) যে ব্যক্তি ফজরের সলাত বিলম্ব করে আদায় করে এমনকি তার সময় পার হয়ে যায়। তার বিধান কি?	302
২২৪	সলাত ত্যাগী যুবকের সাথে মেয়ের বিবাহ দেয়া কি বৈধ?	303
২২৫	প্রশ্ন ঃ (১৯০) জনৈক যুবক এক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, সে সলাত আদায় করে না। কিন্তু বলা হচ্ছে, 'ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তাকে হেদায়াত করবেন।' এই যুবকের সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়া কি বৈধ?	303
২২৬	পরিবারের সলাত ত্যাগকারী লোকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার বিধান কি?	310
২২৭	প্রশ্ন ঃ (১৯১) জনৈক ব্যক্তি পরিবারের লোকদেরকে সলাতের আদেশ করছে। কিন্তু কেউ তার কথা শুনে না। এ অবস্থায় সে কি করবে? সে কি তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করবে নাকি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে?	310
২২৮	সলাত ত্যাগকারী স্বামীর সাথে সলাত আদায়কারী স্ত্রীর বসবাস করার বিধান?	313
২২৯	প্রশ্ন ঃ (১৯২) সলাত ত্যাগকারী স্বামীর সাথে সলাত আদায়কারী মুসলিম স্ত্রীর বসবাস করার বিধান কি? তাদের কয়েকজন সন্তানও আছে। সলাত ত্যাগকারী সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়ার বিধান কি?	313
২৩০	প্রশ্ন ঃ (১৯৩) তাওবা করার পর কি ছেড়ে দেয়া সলাতের কাযা আদায় করতে হবে?	314
২৩১	প্রশ্নঃ (১৯৪) সলাত ত্যাগকারী সন্তানদের ব্যাপারে পরিবারের কর্তার কর্তব্য কি?	315
২৩২	প্রশ্ন ঃ (১৯৫) সফর অবস্থায় আযান দেয়ার বিধান কি?	315
২৩৩	প্রশ্ন ঃ (১৯৬) একক ব্যক্তির জন্য আযান ও ইক্বামাতের বিধান কি?	316
২৩৪	প্রশ্ন ঃ (১৯৭) কোন ব্যক্তি যদি যোহর ও আসর সলাত একত্রিত আদায় করে, তবে কি প্রত্যেক সলাতের জন্য আলাদাভাবে ইক্বামাত দিবে? নফল সলাতের জন্য ইক্বামাত আছে কি?	316
২৩৫	প্রশ্ন ঃ (১৯৮) "আস্‌সলাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম" কথাটি কি ফজরের প্রথম আযানে বলতে হবে না দ্বিতীয় আযানে?	317

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩৬	প্রশ্ন ঃ (১৯৯) টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে আযান দিলে আযান হবে কি?	319
২৩৭	প্রশ্ন ঃ (২০০) মাসজিদে প্রবেশ করার সময় দেখলাম, আযান হচ্ছে– এ সময় কোন কাজটি উত্তম?	319
২৩৮	প্রশ্ন ঃ (২০১) আযানের জবাবে 'রাযিতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলা-মি দী-না, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা।' দু'আটি কখন বলতে হবে?	319
২৩৯	প্রশ্ন ঃ (২০২) আযানের দু'আর শেষে "ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল মী'আ-দ" বাক্যটি বৃদ্ধি করে পড়া কি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?	320
২৪০	প্রশ্ন ঃ (২০৩) ইক্বামাতের শব্দগুলো কি মুক্তাদীদেরকেও বলতে হবে?	320
২৪১	প্রশ্ন ঃ (২০৪) ইক্বামাতে 'ক্বাদক্বামাতিস্ সলাত' বলার সময় 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা কি ঠিক?	320
২৪২	প্রশ্ন ঃ (২০৫) সলাত আদায় করার জন্য উত্তম সময় কি? প্রথম সময়ই কি সর্বোত্তম?	321
২৪৩	প্রশ্ন ঃ (২০৬) অজ্ঞতাবশতঃ সময় হওয়ার আগেই সলাত আদায় করে নেয়ার বিধান কি?	323
২৪৪	ক্বাযা সলাতের তারতীব বা ধারাবাহিকতা।	323
২৪৫	প্রশ্ন ঃ (২০৭) ভুল এবং অজ্ঞতার কারণে ক্বাযা সলাত সমূহের তারতীব বা ধারাবাহিকতা কি রহিত হয়ে যাবে?	323
২৪৬	প্রশ্ন ঃ (২০৮) এশা সলাতের জন্য মাসজিদে প্রবেশ করে মনে পড়ল, মাগরিব সলাত বাকী আছে, এখন তার করণীয় কি?	324
২৪৭	একাধিক সলাত ছুটে গেলে কাযা আদায় করার নিয়ম কি?	324
২৪৮	প্রশ্ন ঃ (২০৯) নিদ্রা বা ভুলে যাওয়ার কারণে যদি আমার এক বা ততোধিক ফরয সলাত ছুটে যায়, তবে তা কাযা আদায় করার নিয়ম কি? প্রথমে কি বর্তমান সময়ের সলাত আদায় করব তারপর কাযা সলাত আদায় করব? নাকি আগে কাযা সলাতসমূহ তারপর বর্তমান সলাত আদায় করব?	324
২৪৯	অধিক পাতলা পোশাকে সলাত আদায় করার বিধান কি?	326
২৫০	প্রশ্ন ঃ (২১০) কোন কোন লোক এমন পাতলা পোশাকে সলাত আদায় করে যে, বাইরে থেকে তার শরীরের রং বুঝা যায়। নীচে রানের আধাআধি পর্যন্ত ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়া পরিধান করে। পাতলা কাপড়ের কারণে রানের বাকী অর্ধেক অংশ স্পষ্টই দেখা যায়। এদের সলাতের বিধান কি?	326
২৫১	সামনে, পিছনে ও উভয় পার্শে খোলা থাকে এমন পোশাক পরে নারীর সলাত হবে কি?	327

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫২	প্রশ্ন ঃ (২১১) অনেক মহিলা পোশাক পরিধান করে। যার সামনে, পিছনে ও উভয় পার্শে খোলা থাকে। ফলে পায়ের অনেকাংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এদের কথা হচ্ছে, আমরা তো শুধু নারীদের সামনেই এরূপ পোশাক পরিধান করি? এদের এ পোশাকের বিধান কি?	327
২৫৩	প্রশ্ন ঃ (২১২) নিক্বাব ও হাত মোজা পরিধান করে কি নারীর সলাত আদায় করা বৈধ?	328
২৫৪	প্রশ্ন ঃ (২১৩) অজানা অবস্থায় কাপড়ে নাপাকি নিয়ে সলাত আদায় করলে তার বিধান কি?	329
২৫৫	টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করার শাস্তি কি?	330
২৫৬	প্রশ্ন ঃ (২১৪) টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা যদি অহংকারবশতঃ হয় তবে তার শাস্তি কি? কিন্তু যদি অহংকারবশতঃ না হয় তবে তার শাস্তি কি? আবূ বাক্‌রের হাদীস দ্বারা যারা দলীল পেশ করে তাদের দাবীর কি জবাব?	330
২৫৭	ফরয গোসল না করেই সলাত পড়ে ফেললে করণীয় কি?	333
২৫৮	প্রশ্ন ঃ (২১৫) এক ব্যক্তি সলাত সম্পন্ন করার পর জানল যে, সে জুনুব (গোসলাবশ্যকাবস্থায়) ছিল, অর্থাৎ তার উপর গোসল ফরয ছিল। এখন তার করণীয় কি?	333
২৫৯	প্রশ্ন ঃ (২১৬) সলাত রত অবস্থায় নাক থেকে রক্ত বের হলে কি করবে?	333
২৬০	প্রশ্ন ঃ (২১৭) কোন মাসজিদে কবর থাকলে সেখানে সলাত আদায় করার বিধান কি?	334
২৬১	টয়লেটের ছাদের উপর সলাত আদায় করার বিধান কি?	336
২৬২	প্রশ্ন ঃ (২১৮) টয়লেটের ছাদের উপর সলাত আদায় করার বিধান কি? নাপাক উচ্ছিষ্ট একত্রিত করা হয় এমন ঘরের ছাদে সলাত আদায় করার বিধান কি?	336
২৬৩	প্রশ্নঃ (২১৯) মাসজিদুল হারামের জমিনে (Floor) জুতা নিয়ে হাঁটার বিধান কি?	336
২৬৪	প্রশ্ন ঃ (২২০) ক্বিবলা থেকে সামান্য সরে গিয়ে সলাত আদায় করলে কি সলাত ফিরিয়ে পড়তে হবে?	337
২৬৫	প্রশ্ন ঃ (২২১) একদল লোক ক্বিবলামুখী না হয়েই সলাত আদায় করে নিয়েছে। তাদের এ সলাতের কি হবে?	338
২৬৬	প্রশ্ন ঃ (২২২) নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার বিধান কি?	339
২৬৭	প্রশ্ন ঃ (২২৩) নফল আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ফরয সলাত আদায় করার বিধান কি? যেমন তারাবীহ্‌র সলাতের ইমামের পিছনে এশা সলাত আদায় করা?	340

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬৮	মুসাফিরের মুকীম ইমামের পিছনে সলাত আদায়ের বিধান	340
২৬৯	প্রশ্ন ঃ (২২৪) মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের শেষ দু'রাক'আতে সলাতে শরীক হয়। তবে কসরের নিয়ত করে উক্ত দু'রাক'আত শেষে ইমামের সাথে সালাম ফেরানো জায়েয হবে কি?	340
২৭০	প্রশ্ন ঃ (২২৫) সলাতে শামিল হওয়ার জন্য দ্রুত পায়ে হেঁটে আসার বিধান কি?	341
২৭১	প্রশ্ন ঃ (২২৬) জামা'আত চলাবস্থায় ইমামের সাথে রাক'আত ধরার জন্য দ্রুত চলার বিধান কি?	341
২৭২	প্রশ্ন ঃ (২২৭) মুসল্লীদের মনোযোগে ব্যাঘাত হয় এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করার বিধান কি?	341
২৭৩	তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাতের বিধান	342
২৭৪	প্রশ্ন ঃ (২২৮) অনেক মানুষ ইকামাতের পূর্বে মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত শুরু হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আদায় করে না। এরূপ করার বিধান কি?	342
২৭৫	মাসজিদুল হারামে নারী-পুরুষের কাতারের নিয়ম	342
২৭৬	প্রশ্ন ঃ (২২৯) মাসজিদুল হারামে দেখা যায় অনেক পুরুষ ফরয সলাতের জামা'আতে নারীদের পিছনেই কাতারবন্দী হয়। তাদের সলাত কি বিশুদ্ধ হবে? তাদের জন্য আপনি কিছু নসীহত করবেন?	342
২৭৭	প্রশ্ন ঃ (২৩০) কাতার থেকে শিশু-কিশোরদেরকে সরিয়ে দেয়া জায়েয কি?	343
২৭৮	প্রশ্ন ঃ (২৩১) দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে সলাত আদায় করার বিধান কি?	344
২৭৯	নারীদের জন্য উত্তম কাতার কোন্‌টি?	344
২৮০	প্রশ্ন ঃ (২৩২) নারীদের কাতারের বিধান কি? তাদের জন্য উত্তম কাতার শেষেরটি এবং অনুত্তোম কাতার প্রথমটি এ কথাটি কি সর্বাবস্থায় নাকি এ কথা নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী স্থানে কোন আড়াল না থাকলে?	344
২৮১	প্রশ্ন ঃ (২৩৩) মাসজিদের বাইরে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় সলাত আদায় করার বিধান কি?	344
২৮২	কাতারে মুসল্লীদের পরস্পর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর বিধান কি?	345
২৮৩	প্রশ্ন ঃ (২৩৪) কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা কি? মুসল্লীদের পরস্পর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো কি আবশ্যক?	345
২৮৪	সলাতে রফউল ইয়াদায়ন বা হাত উত্তোলনের বিধান কি?	346

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮৫	প্রশ্ন ঃ (২৩৫) সলাতে চারটি স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হাত উত্তোলনের কথা কি প্রমাণিত হয়েছে? অনুরূপভাবে জানাযা ও দু'ঈদের সলাতের তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করার কি বিধান?	346
২৮৬	প্রশ্ন ঃ (২৩৬) কোন মুসল্লী যদি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পায়, তখন কি দু'টি তাকবীর দিতে হবে?	347
২৮৭	সলাতে কোথায় হাত বাঁধতে হবে?	348
২৮৮	প্রশ্ন ঃ (২৩৭) ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তা কি বুকের উপর বা অন্তরের (heart) উপর রাখবে নাকি নাভীর নীচে রাখবে? হাত বাঁধার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?	348
২৮৯	প্রশ্ন ঃ (২৩৮) স্বশব্দে "বিসমিল্লাহ্..." পাঠ করার বিধান কি?	349
২৯০	প্রশ্ন ঃ (২৩৯) দু'আ ইস্তিফতাহ্ বা সলাত শুরুর দু'আ (সানা) পাঠ করার হুকুম কি?	350
২৯১	প্রশ্ন ঃ (২৪০) 'আমীন' বলা কি সুন্নাত?	351
২৯২	প্রশ্ন ঃ (২৪১) (ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন) পাঠ করার সময় 'আমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাই'– এরূপ কথা বলার বিধান কি?	351
২৯৩	প্রশ্ন ঃ (২৪২) সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার বিধান কি?	351
২৯৪	ইমামের পিছনে মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে?	
২৯৫	প্রশ্ন ঃ (২৪৩) মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে? ইমামের ফাতিহা পাঠ করার সময়? নাকি ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করে অন্য সূরা পাঠ শুরু করলে?	355
২৯৬	প্রশ্ন ঃ (২৪৪) সলাত বা কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিভাবে অন্তর নম্র করা যায়?	355
২৯৭	প্রশ্ন ঃ (২৪৫) সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর কিছুক্ষণ চুপ থাকার বিধান কি?	356
২৯৮	প্রশ্ন ঃ (২৪৬) ফজরের এক রাক'আত সলাত ছুটে গেলে বাকী রাক'আতটি কি স্বশব্দে না নীরবে পাঠ করবে?	356
২৯৯	রুকূ থেকে উঠার পর আবার হাত বাঁধার মাসআলা।	357
৩০০	প্রশ্ন ঃ (২৪৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পদ্ধতির উপর লিখিত একটি পুস্তকে পড়লাম, রুকূ থেকে উঠার পর আবার হাত বাঁধা একটি বিভ্রান্তকর বিদ'আত। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা কি? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।	357
৩০১	প্রশ্ন ঃ (২৪৮) 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু' বলার পর 'ওয়াশ্ শুক্রু' শব্দ বৃদ্ধি করে বলার বিধান কি?	358

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০২	প্রশ্ন ঃ (২৪৯) সাজদায় যাওয়ার পদ্ধতি কি?	359
৩০৩	প্রশ্ন ঃ (২৫০) সামনের দিকে অতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে সাজদা করার বিধান কি?	360
৩০৪	প্রশ্ন ঃ (২৫১) সাজদার কারণে কপালে দাগ পড়া কি নেক লোকের পরিচয়?	360
৩০৫	প্রশ্ন ঃ (২৫২) দু'সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানোর বিধান কি?	361
৩০৬	প্রশ্ন ঃ (২৫৩) জালসা ইস্তিরাহা করার বিধান কি?	362
৩০৭	প্রশ্ন ঃ (২৫৪) তাশাহ্হুদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তর্জনী আঙ্গুল নড়ানোর বিধান কি?	364
৩০৮	প্রশ্ন ঃ (২৫৫) মুসল্লী কি প্রথম তাশাহ্হুদে শুধু তাশাহ্হুদের শব্দগুলো পাঠ করবে? নাকি দরূদও পাঠ করবে?	365
৩০৯	প্রশ্ন ঃ (২৫৬) সলাতে তাওয়াররুক করার বিধান কি? এ বিধান কি নারী-পুরুষ সবার জন্যই?	365
৩১০	প্রশ্ন ঃ (২৫৭) শুধুমাত্র ডান দিকে একবার সালাম ফেরানো কি যথেষ্ট হবে?	366
৩১১	প্রশ্ন ঃ (২৫৮) সলাত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কি ইমাম উঠে চলে যেতে পারেন? নাকি কিছুটা অপেক্ষা করবেন?	366
৩১২	প্রশ্ন ঃ (২৫৯) সলাত শেষ করেই পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর সাথে মুসাফাহা করা ও 'তাক্বাব্বালাল্লাহু' (আল্লাহ কবূল করুন) বলা সম্পর্কে আপনার মত কি?	367
৩১৩	প্রশ্ন ঃ (২৬০) তাসবীহ্ দানা দ্বারা তাসবীহ্ পড়ার বিধান কি?	367
৩১৪	প্রশ্ন ঃ (২৬১) সলাতের পর সুন্নাত সম্মত যিক্‌রসমূহ কি কি?	367
৩১৫	প্রশ্ন ঃ (২৬২) সলাতের পর হাত উত্তোলন করে দু'আ করার বিধান কি?	370
৩১৬	প্রশ্ন ঃ (২৬৩) ফরয সলাতান্তে সমস্বরে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি পাঠ করার বিধান কি?	371
৩১৭	প্রশ্ন ঃ (২৬৪) টয়লেট সারতে গেলে জামা'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে কি করবে?	371
৩১৮	প্রশ্ন ঃ (২৬৫) সলাত আদায়ের সময় চোখ বন্ধ রাখার বিধান কি?	372
৩১৯	প্রশ্ন ঃ (২৬৬) সলাতরত অবস্থায় ভুলক্রমে আঙ্গুল ফুটালে কি সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে?	372
৩২০	ওয়াজিব নড়াচড়া ঃ	372
৩২১	সুন্নাত নড়াচড়া ঃ	372

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩২২	মাকরূহ নড়াচড়া ঃ	373
৩২৩	হারাম নড়াচড়া ঃ	373
৩২৪	জায়েয নড়াচড়া ঃ	373
৩২৫	প্রশ্ন ঃ (২৬৭) সুতরার বিধান কি? এবং এর সীমা কতটুকু?	373
৩২৬	প্রশ্ন ঃ (২৬৮) মাসজিদে হারামে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার বিধান কি? সলাত ফরয হোক বা নফল। মুসল্লী মুক্তাদী হোক বা একাকী হোক।	373
৩২৭	প্রশ্ন ঃ (২৬৯) সলাতের সময় মুসল্লীদের সম্মুখে বৈদ্যুতিক হিটার (শীতকালে ঠাণ্ডা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হিটার) রাখার বিধান কি? এক্ষেত্রে কি কোন শরঈ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে?	374
৩২৮	প্রশ্ন ঃ (২৭০) সলাতের ক্বিরাআতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা আসলে জান্নাতের প্রার্থনা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করা জায়েয কি?	374
৩২৯	প্রশ্ন ঃ (২৭১) সাহু সাজদা করার কারণসমূহ কি কি?	374
৩৩০	সলাত পূর্ণ হওয়ার আগেই সালাম ফেরানো ঃ	376
৩৩১	সলাতেহ্রাস হওয়াঃ	377
৩৩২	প্রশ্ন ঃ (২৭২) ইমাম ভুলক্রমে এক রাক'আত সলাত বৃদ্ধি করেছেন। আমি মাসবূক হিসেবে ইমামের অতিরিক্ত সলাত আমার সলাতের সাথে মিলিয়ে নিয়েছি। আমার সলাত কি বিশুদ্ধ হয়েছে? আর যদি ঐ রাক'আতের হিসাব না ধরি তবে তার বিধান কি?	380
৩৩৩	প্রশ্ন ঃ (২৭৩) তাহাজ্জুদ সলাতে ভুলক্রমে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লে করণীয় কি?	381
৩৩৪	প্রশ্ন ঃ (২৭৪) প্রথম তাশাহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে পড়লে করণীয় কি? এক্ষেত্রে কখন সাহু সাজদা করতে হবে?	381
৩৩৫	প্রশ্ন ঃ (২৭৫) বিতর সলাতের বিধান কি? তা কি শুধু রামাযান মাসের জন্যই?	382
৩৩৬	প্রশ্ন ঃ (২৭৬) দু'আ কুনূতের জন্য কি বিশেষ কোন দু'আ আছে? এ সময় দু'আ কি দীর্ঘ করা যায়?	382
৩৩৭	প্রশ্ন ঃ (২৭৭) দু'আ কুনূত পাঠ করার সময় হাত উত্তোলন করা কি সুন্নাত? দলীলসহ জবাব চাই।	383
৩৩৮	প্রশ্ন ঃ (২৭৮) ফরয সলাতে কুনূত পড়ার বিধান কি? যদি মুসলিমদের কোন বিপদ আসে তখন করণীয় কি?	383
৩৩৯	প্রশ্ন ঃ (২৭৯) তারাবীহ্ সলাতের বিধান কি? এর রাক'আত সংখ্যা কত?	383

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪০	প্রশ্ন ঃ (২৮০) রামাযান মাসে তারাবীহ্ সলাতে কুরআন খতম করার দু'আ পাঠ করার বিধান কি?	386
৩৪১	প্রশ্ন ঃ (২৮১) প্রতি বছরে কি লায়লাতুল কদর নির্দিষ্ট এক রাতেই হয়ে থাকে? নাকি তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাতে হয়ে থাকে?	386
৩৪২	প্রশ্ন ঃ (২৮২) তারাবীহ্ সলাতে কুরআন হাতে নিয়ে ইমামের পড়ার অনুসরণ করার বিধান কি?	388
৩৪৩	তারাবীহ্ সলাতে কণ্ঠস্বর সুন্দর করে কুরআন পাঠ	388
৩৪৪	প্রশ্ন ঃ (২৮৩) কোন কোন ইমাম তারাবীহ্ সলাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে মানুষের অন্তর নরম ও তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে। কোন কোন মানুষ এটাকে অপছন্দ করে। আল্লাহ্ আপনার হেফাযত করুন- এ ক্ষেত্রে আপনার মত কি?	388
৩৪৫	ফরয সলাতের পূর্বাপর সংশ্লিষ্ট সুন্নাত সলাতের সময়	389
৩৪৬	প্রশ্ন ঃ (২৮৪) কোন কোন বিদ্বান বলেন, ফরয সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতসমূহের সময় হচ্ছে ফরয সলাতের সময় হওয়ার পর। ফরযের সময় শেষ হলে সুন্নাতের সময়ও শেষ। আবার কেউ বলেন, পূর্বের সুন্নাতগুলো ফরয শেষ হলেই শেষ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা কি?	389
৩৪৭	প্রশ্ন ঃ (২৮৫) ফজরের পূর্বের সুন্নাত ফরযের পর আদায় করা যাবে কি?	389
৩৪৮	তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করার পর কি পুনরায় কোন নফল আদায় করা যায়?	390
৩৪৯	প্রশ্ন ঃ (২৮৬) আযানের পূর্বে যদি মাসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আদায় করে। তবে আযানের পর কি পুনরায় কোন নফল সলাত আদায় করতে হবে?	390
৩৫০	প্রশ্ন ঃ (২৮৭) সুন্নাত সলাতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তা কি কাযা আদায় করা যায়?	390
৩৫১	প্রশ্ন ঃ (২৮৮) সুন্নাত আদায় করার জন্য স্থান পরিবর্তন করার কোন দলীল আছে কি?	391
৩৫২	প্রশ্ন ঃ (২৮৯) চাশতের সলাত ছুটে গেলে তার কি কাযা আদায় করা যায়?	391
৩৫৩	প্রশ্ন ঃ (২৯০) তিলাওয়াতের সাজদা দেয়ার জন্য তাহারাত বা পবিত্রতা কি আবশ্যক? এ সাজদায় কি দু'আ পাঠ করতে হবে?	392
৩৫৪	প্রশ্ন ঃ (২৯১) কখন আল্লাহ্র জন্য সাজদা শুক্র দিতে হয়? এর পদ্ধতি কি? এর জন্য ওযূ করা কি আবশ্যক?	393

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৫৫	প্রশ্ন ঃ (২৯২) সলাতে ইস্তিখারার বিধান কি? তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা সুন্নাত সলাত পড়ে কি ইস্তিখারার দু'আ পড়া যায়?	393
৩৫৬	প্রশ্ন ঃ (২৯৩) সলাতুত্ তাসবীহ্ সলাত কি?	394
৩৫৭	প্রশ্ন ঃ (২৯৪) বিবাহের সময় দু' রাক'আত সলাত আদায়ের বিধান কি? বিশেষ করে বাসর রাতে এ দু' রাক'আতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়?	395
৩৫৮	প্রশ্ন ঃ (২৯৫) সলাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ কি কি? মাগরিবের পূর্বে মাসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আযানের পূর্বে না আযানের পর আদায় করবে?	395
৩৫৯	প্রশ্ন ঃ (২৯৬) জামা'আতে সলাত আদায় করার বিধান কি?	396
৩৬০	বাসস্থানের মধ্যে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা কি জায়েয?	398
৩৬১	প্রশ্ন ঃ (২৯৭) একদল লোক কোন স্থানে বসবাস করে। ঐ বাসস্থানে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা কি তাদের জন্য জায়েয হবে? নাকি মাসজিদে গমন করা আবশ্যক?	398
৩৬২	কর্মক্ষেত্রে কর্মচারী কিভাবে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আদায় করবে?	399
৩৬৩	প্রশ্ন ঃ (২৯৮) কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীর জন্য কোনটি উত্তম- আযান শোনার সাথে সাথে সলাতে যাওয়া? নাকি কিছুটা অপেক্ষা করে কিছু কাজ সম্পাদন করে সলাত আদায় করা। আর সুন্নাতে মুআক্কাদা ছাড়া অন্যান্য নফল সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে তার বিধান কি?	400
৩৬৪	ছুটে যাওয়া রাক'আতের কাযা আদায় করতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে কি?	400
৩৬৫	প্রশ্ন ঃ (২৯৯) কারো যদি প্রথম এক রাক'আত বা দু' রাক'আত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালামের পর সে কি ছুটে যাওয়া রাক'আতের কাযা আদায় করার জন্য সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে? নাকি শুধু সূরা ফাতিহাই পাঠ করবে?	400
৩৬৬	প্রশ্ন ঃ (৩০০) মাসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে শেষ তাশাহুদে পেলে কি সলাতে শামিল হবে? নাকি দ্বিতীয় জামা'আত কায়েম করার জন্য অপেক্ষা করবে?	400
৩৬৭	প্রশ্ন ঃ (৩০১) নফল বা সুন্নাত সলাত শুরু করে দিয়েছি, এমন সময় ফরয সলাতের ইক্বামাত হয়ে গেল– এখন কি করব?	401
৩৬৮	প্রশ্ন ঃ (৩০২) মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার পূর্বে ইমাম রুকূতে চলে গেলে মুক্তাদীর করণীয় কি?	402
৩৬৯	সর্বাবস্থায় ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীর উপর আবশ্যক	402

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৭০	প্রশ্ন ঃ (৩০৩) মুক্তাদী যদি ইমামকে সাজদা অবস্থায় পায়, তবে কি ইমামের সাজদা থেকে উঠার অপেক্ষা করবে? নাকি সাজদা অবস্থাতেই সলাতে শামিল হবে?	402
৩৭১	প্রশ্ন ঃ (৩০৪) নীরব সলাতে মুক্তাদীর ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করার বিধান কি?	403
৩৭২	প্রশ্ন ঃ (৩০৫) ইমামের আগে আগে কোন কাজ করার বিধান কি?	403
৩৭৩	ইমামের আগ বেড়ে কোন কিছু করা ঃইমামের সাথে সাথে করা ঃইমামের অনুসরণ করা ঃইমামের পিছনে পিছনে করা ঃপ্রশ্ন ঃ (৩০৬) গুনাহ্গার (ফাসেক) লোকের পিছনে সলাত আদায় করা কি জায়েয?	404
৩৭৪	প্রশ্ন ঃ (৩০৭) নফল আদায়কারীর পিছনে কি ফরয আদায় করা জায়েয হবে? অথবা ফরয আদায়কারীর পিছনে কি নফল আদায় করা চলবে?	404
৩৭৫	সামনের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিয়ে পিছনে কাতার বানানোর বিধান?	405
৩৭৬	প্রশ্ন ঃ (৩০৮) একটি বিষয় নিয়ে মুসল্লীদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, জনৈক লোক সলাত কয়েম হওয়ার পর মাসজিদে প্রবেশ করে দেখে কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কাতারে কোন জায়গা নেই। সে কি আগের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিয়ে তাকে নিয়ে নতুন কাতার করবে? নাকি একাকী কাতারে দাঁড়াবে? না কি করবে?	405
৩৭৭	প্রশ্ন ঃ (৩০৯) মাসজিদের উপর তলার লোকেরা নীচের তলার লোকদের দেখতে না পেলে সলাত বিশুদ্ধ হবে কি?	407
৩৭৮	প্রশ্নঃ (৩১০) রেডিও-টিভিতে প্রচারিত সলাতের অনুসরণ করা জায়েয আছে কি?	407
৩৭৯	অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সলাত আদায় করবে?	407
৩৮০	প্রশ্ন ঃ (৩১১) সলাত উড়োজাহাজে আদায় করার পদ্ধতি কি?	409
৩৮১	প্রশ্ন ঃ (৩১২) কতটুকু দূরত্বে গেলে মুসাফির সলাত কসর করতে পারে? কসর না করেই কি দু'সলাতকে একত্রিত করা যায়?	410
৩৮২	প্রশ্ন ঃ (৩১৩) জনৈক ব্যক্তি লেখা-পড়ার জন্য জুমু'আর দিন সন্ধ্যায় রিয়াদ গমন করে ও সোমবার দিন প্রত্যাবর্তন করে। সে কি মুসাফিরের মত সলাত কসর করে আদায় করবে?	412
৩৮৩	প্রশ্ন ঃ (৩১৪) জুমু'আর সাথে আসরের সলাত একত্রিত করার বিধান কি? যারা শহরের বাইরে থাকে তাদের জন্য কি একত্রিত করা জায়েয?	413
৩৮৪	দু'সলাতকে একত্রিত করার বিধান ঃ	413

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮৫	একটি পত্র ঃ বিগত দিনগুলোতে ব্যাপক আকারে দু'সলাতকে একত্রিত করা এবং এক্ষেত্রে মানুষের অতিরিক্ত শিথিলতা লক্ষ্য করা গেছে। অত্যধিক ঠাণ্ডাই কি এর কারণ? আপনি কি মনে করেন?	413
৩৮৬	প্রশ্ন ঃ (৩১৫) সফর অবস্থায় কি কি বিষয়ে রুখসত বা অবকাশ রয়েছে?	416
৩৮৭	প্রশ্ন ঃ (৩১৬) শুক্রবার দিবসের প্রথম প্রহর কখন থেকে শুরু হয়?	417
৩৮৮	প্রশ্ন ঃ (৩১৭) ইমামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে কি নিজ গৃহে থেকে জুমু'আর সলাত আদায় করা জায়েয হবে?	418
৩৮৯	প্রশ্ন ঃ (৩১৮) জুমু'আর দিন মহিলারা কত রাক'আত সলাত আদায় করবে?	418
৩৯০	প্রশ্ন ঃ (৩১৯) যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাত আদায় করবে সে কি যোহরও আদায় করবে?	418
৩৯১	মুসাফিরের জন্য জুমু'আর সলাতের বিধান	420
৩৯২	প্রশ্ন ঃ (৩২০) আমরা সমুদ্রের মধ্যে (জাহাজে) কাজ করি। জুমু'আর সলাতের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু যোহরের আযানের সময় হওয়ার আধা ঘণ্টা পর স্থলে এসে আযান দিয়ে জুমু'আর সলাত আদায় করা কি আমাদের জন্য জায়েয হবে?	420
৩৯৩	প্রশ্ন ঃ (৩২১) জুমু'আর সলাতের শেষ তাশাহুদে ইমামের সাথে সলাতে শামিল হলে কি করবে?	421
৩৯৪	প্রশ্ন ঃ (৩২২) জুমু'আর খুতবার শেষ প্রান্তে ইমাম যখন দু'আ করেন, তখন 'আমীন' বলা কি বিদ'আত?	421
৩৯৫	প্রশ্ন ঃ (৩২৩) জুমু'আর খুতবায় দু'আর সময় হাত উত্তোলন করার বিধান কি?	422
৩৯৬	প্রশ্ন ঃ (৩২৪) আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা প্রদানের বিধান কি?	422
৩৯৭	প্রশ্ন ঃ (৩২৫) জুমু'আর দিবসে গোসল করার বিধান কি- নারী ও পুরুষের সকলের জন্য? এ দিনের দু' এক দিন পূর্বে গোসল করার বিধান কি?	422
৩৯৮	প্রশ্ন ঃ (৩২৬) খুতবার জন্য দ্বিতীয় আযানের সময় মাসজিদে প্রবেশ করলে করণীয় কি?	423
৩৯৯	প্রশ্ন ঃ (৩২৭) জুমু'আর দিবসে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়ার বিধান কি?	423
৪০০	প্রশ্ন ঃ (৩২৮) ইমামের খুতবার সময় (মাসজিদে প্রবেশ কালে) সালাম দেয়ার এবং সালামের জবাব দেয়ার বিধান কি?	424
৪০১	প্রশ্ন ঃ (৩২৯) ঈদের দিন কি বলে একে অপরকে অভিনন্দন জানাবে?	424
৪০২	প্রশ্ন ঃ (৩৩০) ঈদের সলাতের বিধান কি?	425

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪০৩	প্রশ্ন ঃ (৩৩১) এক শহরে একাধিক ঈদের সলাত অনুষ্ঠিত করার বিধান কি?	426
৪০৪	প্রশ্ন ঃ (৩৩২) দু'ঈদের সলাতের পদ্ধতি কিরূপ?	426
৪০৫	প্রশ্ন ঃ (৩৩৩) ঈদের সলাতের পূর্বে দলবদ্ধভাবে মাইক্রোফোনে তাকবীর প্রদান করার বিধান কি?	427
৪০৬	প্রশ্ন ঃ (৩৩৪) ঈদের তাকবীর কখন থেকে পাঠ করতে হবে? তাকবীর পড়ার পদ্ধতি কি?	427
৪০৭	প্রশ্ন ঃ (৩৩৫) সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত আদায় করার বিধান কি?	428
৪০৮	প্রশ্ন ঃ (৩৩৬) সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের সলাত ছুটে গেলে কিভাবে তা কাযা আদায় করবে?	429
৪০৯	ইস্তিস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) সলাতে চাদর উল্টানোর বিধান।	430
৪১০	প্রশ্ন ঃ (৩৩৭) ইস্তিস্কার সলাতে চাদর উল্টিয়ে নেয়ার কাজটি কখন করতে হবে? দু'আর সময় নাকি গৃহ থেকে বের হওয়ার সময়? আর এ চাদর উল্টানোর হিকমত কি?	430
৪১১	প্রশ্ন ঃ (৩৩৮) কোন কোন লোক বলে থাকে, "তোমরা ইস্তিস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ না করলেও বৃষ্টি হবে"– এ কথা সম্পর্কে আপনার মত কি?	430
৪১২	প্রশ্ন ঃ (৩৩৯) কোন ব্যক্তি নিজের দাফনের ব্যাপারে স্থান নির্ধারণ করে ওসীয়ত করলে তার বিধান কি?	431
৪১৩	প্রশ্ন ঃ (৩৪০) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কখন 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলার তালক্বীন দিতে হবে?	432
৪১৪	প্রশ্ন ঃ (৩৪১) দূর-দূরান্ত থেকে নিকটাত্মীয়দের উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে বিলম্ব করার বিধান কি?	433
৪১৫	প্রশ্ন ঃ (৩৪২) জানাযার সলাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবকে সংবাদ দেয়া কি নিষিদ্ধ 'নাঈ' তথা ঘটা করে মৃত্যু সংবাদ প্রচারের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি তা বৈধ?	433
৪১৬	প্রশ্ন ঃ (৩৪৩) মৃত ব্যক্তির গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই?	434
৪১৭	প্রশ্ন ঃ (৩৪৪) দুর্ঘটনাকবলিত মৃত্যু, আগুনে পুড়া প্রভৃতি কারণে শুধুমাত্র দু'একটি অঙ্গ পাওয়া গেলে তার জানাযাহ ও গোসলের নিয়ম কি?	435
৪১৮	চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর গর্ভপাত হলে জানাযা পড়তে হবে?	435

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪১৯	প্রশ্ন ঃ (৩৪৫) জনৈক মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের বয়স ছয় মাস হলে তা পড়ে যায়। সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর ও ক্লান্তিকর কাজ করতো এবং সেই সাথে রামাযান মাসে সিয়ামও পালন করতো। তার আশংকা হচ্ছে এ গর্ভপাতের কারণ সে নিজেই। কারণ, গর্ভ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতো। তাছাড়া জানাযা না পড়েই উক্ত মৃত সন্তানকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। তার জানাযা না পড়া কি ঠিক হয়েছে? আর এ মহিলাই বা কি করবে, যে কঠিন পরিশ্রম করার কারণে বাচ্চা মারা গেছে এ অনুশোচনায় ভুগছে?	435
৪২০	প্রশ্ন ঃ (৩৪৬) জানাযা সলাত আদায় করার পদ্ধতি কি?	437
৪২১	সলাত পরিত্যাগকারীর জানাযা পড়া জায়েয নয়	439
৪২২	প্রশ্ন ঃ (৩৪৭) মৃত ব্যক্তি যদি সলাত ত্যাগকারী হয় বা সলাত ত্যাগকারী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে বা সে মূলতঃ সলাত আদায়কারী বা সলাত ত্যাগকারী তার বিষয়টি অজানা থাকে, তবে তার জানাযা পড়ার বিধান কি?	439
৪২৩	জানাযার জন্য সময় এবং স্থান নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়	439
৪২৪	প্রশ্ন ঃ (৩৪৮) জানাযা সলাতের জন্য কোন সময় নির্ধারিত আছে কি? রাতে কি দাফন করা জায়েয। জানাযার উপস্থিতিতে লোক সংখ্যার কি কোন সীমারেখা আছে?	439
৪২৫	প্রশ্ন ঃ (৩৪৯) গায়েবানা জানাযার বিধান কি?	440
৪২৬	মৃত ব্যক্তিকে দাফনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কি?	441
৪২৭	প্রশ্ন ঃ (৩৫০) কোন কোন দেশে মৃত ব্যক্তিকে পিঠের উপর শুইয়ে হাত দু'টো পেটের উপর রেখে দাফন করা হয়। দাফনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পদ্ধতি কি?	441
৪২৮	প্রশ্ন ঃ (৪৫১) গোরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দু'আ করার বিধান কি?	442
৪২৯	প্রশ্ন ঃ (৩৫২) কবর যিয়ারত করার নিয়ম কি? নারীদের কবর যিয়ারত করার বিধান কি?	443
৪৩০	প্রশ্ন ঃ (৩৫৩) মৃতের বাড়ীতে কোরানখানী অনুষ্ঠান করার বিধান কি?	444
	যাকাত বিষয়ক ফাতাওয়া	
৪৩১	প্রশ্ন ঃ (৩৫৪) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী কি?	448
৪৩২	প্রশ্ন ঃ (৩৫৫) প্রতি মাসে প্রাপ্য বেতনের যাকাত কিভাবে প্রদান করতে হবে?	450
৪৩৩	প্রশ্ন ঃ (৩৫৬) শিশু ও পাগলের সম্পদে কি যাকাত ওয়াজিব হবে?	450
৪৩৪	প্রশ্ন ঃ (৩৫৭) প্রদত্ব ঋণের যাকাত আদায় করার বিধান কি?	451

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৩৫	প্রশ্ন ঃ (৩৫৮) মৃত ব্যক্তির ঋণ কি যাকাত থেকে পরিশোধ করা যাবে?	451
৪৩৬	প্রশ্ন ঃ (৩৫৯) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সদাকা করা কি ঠিক হবে? ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন ধরনের শরীয়তের দাবী থেকে মুক্তি পাবে?	452
৪৩৭	প্রশ্ন ঃ (৩৬০) জনৈক ব্যক্তি চার বছর যাকাত আদায় করেনি। এখন তার করণীয় কি?	454
৪৩৮	প্রশ্ন ঃ (৩৬১) বছরের অর্ধেক সময় পশু চারণ ভূমিতে চরে খেলে তাতে কি যাকাত দিতে হবে?	454
৪৩৯	বাড়ী-ঘরের আশেপাশে ফলদার বৃক্ষের ফলে যাকাত	455
৪৪০	প্রশ্ন ঃ (২৬২) তিন বছর আগে আমি বাড়ী ক্রয় করেছি। (আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ্) বাড়ীর সীমানার মধ্যে তিনটি খেজুর গাছ আছে। প্রত্যেক গাছে প্রচুর পরিমাণে খেজুর পাওয়া যায়। এ খেজুরে কি যাকাত দিতে হবে? যাকাত দেয়া ওয়াজিব হয়ে থাকলে তো এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঃ	455
৪৪১	১) খেজুরগুলো নিসাব পরিমাণ হল কিনা তা জানার উপায় কি? আমি তো বিভিন্ন সময় খেজুর পেড়ে থাকি?	456
৪৪২	২) কিভাবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে? প্রত্যেক প্রকার খেজুরের যাকাত কি আলাদাভাবে বের করতে হবে? নাকি সবগুলো একত্রিত করে যে কোন এক প্রকার থেকে যাকাত দিলেই চলবে?	456
৪৪৩	৩) খেজুর থেকে যাকাত না দিয়ে এর বিনিময় মূল্য দিলে চলবে কি?	456
৪৪৪	৪) বিগত বছরগুলোতে তো যাকাত বের করিনি তার কি হবে?	456
৪৪৫	প্রশ্ন ঃ (৩৬৩) স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নিসাব কি? আর কিলোগ্রাম হিসেবে নবী ﷺ-এর সা' এর পরিমাণ কত?	456
৪৪৬	প্রশ্ন ঃ (৩৬৪) মেয়েদেরকে দেয়া স্বর্ণ একত্রিত করলে নিসাব পরিমাণ হয়। একত্রিত না করলে নিসাব হয় নয়। করণীয় কি?	456
৪৪৭	প্রশ্ন ঃ (৩৬৫) নিজের প্রদত্ত যাকাত থেকে গ্রহীতা যদি উপহার স্বরূপ কিছু প্রদান করে, তা কি গ্রহণ করা যাবে?	456
৪৪৮	প্রশ্ন ঃ (৩৬৬) সম্পদের যাকাতের পরিবর্তে কাপড় ইত্যাদি প্রদান করা কি জায়েয হবে?	456
৪৪৯	প্রশ্ন ঃ (৩৬৭) স্বর্ণের সাথে মূল্যবান ধাতু হীরা প্রভৃতি থাকলে কিভাবে স্বর্ণের যাকাত দিবে?	456
৪৫০	প্রশ্ন ঃ (৩৬৮) যাকাতের অর্থ দ্বারা মাসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি? ফক্বীর বা অভাবী কাকে বলে?	457
৪৫১	প্রশ্ন ঃ (৩৬৯) ভাড়া বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত গাড়ীতে কি যাকাত আবশ্যক?	457

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৫২	প্রশ্ন ঃ (৩৭০) ভাড়া দেয়া হয়েছে এমন বাড়ীর যাকাত দেয়ার বিধান কি?	458
৪৫৩	বসবাসের উদ্দেশে জমিন খরিদ করার পর তা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করলে তার যাকাত	458
৪৫৪	প্রশ্ন ঃ (৩৭১) জনৈক ব্যক্তি বসবাসের উদ্দেশে একটি জমিন খরিদ করেছে। তিন বছর পর সে তা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করল। এখন উক্ত তিন বছরের কি যাকাত দিতে হবে?	458
৪৫৫	প্রশ্ন ঃ (৩৭২) রামাযানের প্রথম দশকে যাকাতুল ফিত্‌র (ফিত্‌রা) আদায় করার বিধান কি?	459
৪৫৬	প্রশ্ন ঃ (৩৭৩) সদাকার নিয়তে বেশী করে ফিত্‌রা আদায় করা জায়েয হবে কি?	460
৪৫৭	চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করা	460
৪৫৮	প্রশ্ন ঃ (৩৭৪) কতিপয় বিদ্বান মনে করেন, যে সমস্ত বস্তু দ্বারা ফিতরা দেয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা যেহেতু বর্তমানে পাওয়া যায়, তাই চাউল দ্বারা ফিতরা দেয়া বিধিসম্মত নয়। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই?	460
৪৫৯	মৃত ব্যক্তির ওসীয়তকৃত সম্পদে এবং ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত	461
৪৬০	প্রশ্ন ঃ (৩৭৫) কারো নিকট যদি মৃত ব্যক্তির ওসীয়তকৃত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থাকে এবং ইয়াতীমের কিছু সম্পদ থাকে, তাতে কি যাকাত দিতে হবে?	461
৪৬১	প্রশ্ন ঃ (৩৭৬) ব্যক্তিগত গাড়ীতে কি যাকাত দিতে হবে?	462
৪৬২	প্রশ্ন ঃ (৩৭৭) যাকাত দেয়ার সময় কি বলে দিতে হবে যে, এটা যাকাত?	462
৪৬৩	প্রশ্ন ঃ (৩৭৮) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাকাত স্থানান্তর করার বিধান কি?	462
৪৬৪	অন্য স্থানে বসবাসকারী পরিবারের লোকদের ফিতরা আদায় করা।	
৪৬৫	প্রশ্ন ঃ (৩৭৯) জনৈক ব্যক্তি মক্কায় থাকে আর তার পরিবার রিয়াদে। সে কি নিজ পরিবারের লোকদের ফিতরা মক্কায় আদায় করতে পারবে?	463
৪৬৬	প্রশ্ন ঃ (৩৮০) ঋণগ্রস্তের হাতে যাকাত দেয়া উত্তম নাকি তার পাওনাদারের নিকট গিয়ে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা উত্তম?	463
৪৬৭	প্রশ্ন ঃ (৩৮১) যারাই যাকাত গ্রহণের জন্য হাত বাড়ায় তারাই কি তার হকদার?	463
৪৬৮	প্রশ্ন ঃ (৩৮২) জনৈক ধনী ব্যক্তি একজন লোককে বলল আপনি যাদেরকে হকদার মনে করেন তাদের কাছে আমার এই যাকাত বণ্টন করে দিন। এখন এ ব্যক্তি কি যাকাতের কাজে নিযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের হকদার হবে?	466
৪৬৯	প্রশ্ন ঃ (৩৮৩) দুর্বল ঈমানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে ঈমান শক্তিশালী করার জন্য যাকাত দেয়া যাবে কি? সে কিন্তু কোন এলাকার নেতা বা সরদারও নয়।	466

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৭০	প্রশ্নঃ (৩৮৪) ইসলামী জ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রকে যাকাত দেয়ার বিধান কি?	466
৪৭১	যদি প্রশ্ন করা হয় বিবাহে অপরাগ ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে?	468
৪৭২	প্রশ্ন ঃ (৩৮৫) মুজাহিদদেরকে যাকাত প্রদান করা কি জায়েয?	468
৪৭৩	প্রশ্ন ঃ (৩৮৬) মাসজিদ নির্মাণের কাজে যাকাত প্রদান করার বিধান কি?	468
৪৭৪	প্রশ্ন ঃ (৩৮৭) নিকটাত্মীয়দের যাকাত প্রদান করার বিধান কি?	469
৪৭৫	প্রশ্ন ঃ (৩৮৮) যাকাত সদাকা আদায় করা কি শুধু রামাযান মাসের জন্যই বিশিষ্ট?	469
৪৭৬	সদাকায়ে জারিয়া কাকে বলে?	471
৪৭৭	প্রশ্ন ঃ (৩৮৯) মানুষ তার জীবদ্দশায় যা দান করে তাকেই কি সদাকায়ে জারিয়া বলে? নাকি মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের দানকে সদাকায়ে জারিয়া বলে?	471
৪৭৮	স্বামীর সম্পদ থেকে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান করা জায়েয নয়	471
৪৭৯	প্রশ্ন ঃ (৩৯০) স্ত্রী যদি স্বামীর সম্পদ থেকে নিজের জন্য দান করে বা তা মৃত নিকটাত্মীয়ের জন্য দান করে, তবে তা জায়েয হবে কি?	471
৪৮০	বণ্টনের জন্য যাকাত নিয়ে এসে নিজের কাছেই রেখে দেয়া	472
৪৮১	প্রশ্ন ঃ (৩৯১) জনৈক ফক্বীর এক ধনী লোকের যাকাতের টাকা নিয়ে এসে এ কথা বলে যে, তার পক্ষ থেকে সে তা বিতরণ করে দিবে। তারপর তা সে নিজের কাছেই রেখে দেয়। তার এ কাজের বিধান কি?	472
	সওম বিষয়ক ফাতাওয়া	
৪৮২	প্রশ্ন ঃ (৩৯২) সওম ফরয হওয়ার হিকমত কি?	474
৪৮৩	সারাবিশ্বে একসাথে রামাযানের সওম শুরু করা	475
৪৮৪	প্রশ্ন ঃ (৩৯৩) মুসলিম জাতির একতার লক্ষ্যে কেউ কেউ চাঁদ দেখার বিষয়টিকে মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। তারা বলে মক্কায় যখন রামাযান মাস শুরু হবে তখন বিশ্বের সবাই সওম পালন করবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?	475
৪৮৫	**মানুষ যে এলাকায় থাকবে সে এলাকায় চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে সওম ভঙ্গ করবে।**	477
৪৮৬	প্রশ্ন ঃ (৩৯৪) সওম পালককারী যদি এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হয়, কিন্তু আগের দেশে ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সে কি এখন সওম ভঙ্গ করবে? উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় দেশে ঈদের চাঁদ এখনও দেখা যায়নি।	477
৪৮৭	কষ্টকর কঠিন কাজ করার কারণে সওম ভঙ্গ করা জায়েয নয়।	478
৪৮৮	প্রশ্ন ঃ (৩৯৫) যে ব্যক্তি কষ্টকর কঠিন কাজ করার কারণে সওম পালন করতে অসুবিধা অনুভব করে তার কি সওম ভঙ্গ করা জায়েয?	478
৪৮৯	ঋতুর দিনগুলোতে ছেড়ে দেয়া সওম কাযা আদায় করা আবশ্যক।	478

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৯০	প্রশ্ন ঃ (৩৯৬) জনৈকা বালিকা ছোট বয়সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। সে অজ্ঞতাবশতঃ ঋতুর দিনগুলোতে সওম পালন করেছে। এখন তার করণীয় কি?	478
৪৯১	প্রশ্ন ঃ (৩৯৭) জনৈক ব্যক্তি নিজের জীবিকা এবং পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে রামাযানের সওম পরিত্যাগ করেছে। এর বিধান কি?	478
৪৯২	প্রশ্ন ঃ (৩৯৮) সওম ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ কি কি?	479
৪৯৩	প্রশ্ন ঃ (৩৯৯) রামাযান মাস শুরু হয়েছে কিনা এ সংবাদ না পেয়েই জনৈক ব্যক্তি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে সে সিয়ামের নিয়ত করেনি ফজর হয়ে গেছে। ফজরের সময় সে জানতে পারল, আজ রামাযানের প্রথম দিন। এ অবস্থায় তার করণীয় কি? উক্ত দিনের সওম কি কাযা আদায় করতে হবে?	481
৪৯৪	প্রশ্ন ঃ (৪০০) ওযরবশতঃ কোন ব্যক্তি যদি সওম ভঙ্গ করে আর দিন শেষ হওয়ার আগেই উক্ত ওযর দূর হয়ে যায়। সে কি দিনের বাকী অংশ সওম অবস্থায় কাটাবে?	481
৪৯৫	প্রশ্ন ঃ (৪০১) জনৈক মহিলা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ডাক্তারগণ তাকে সওম রাখতে নিষেধ করেছে। এর বিধান কি?	482
৪৯৬	প্রশ্ন ঃ (৪০২) কখন এবং কিভাবে মুসাফির সলাত ও সওম আদায় করবে?	483
৪৯৭	প্রশ্ন ঃ (৪০৩) সফর অবস্থায় কষ্ট হলে সওম রাখার বিধান কি?	485
৪৯৮	প্রশ্ন ঃ (৪০৪) আধুনিক যুগের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ও আরামদায়ক হওয়ার কারণে সফর অবস্থায় সওম রাখা মুসাফিরের জন্য কষ্টকর নয়। এ অবস্থায় সওম রাখার বিধান কি?	486
৪৯৯	প্রশ্ন ঃ (৪০৫) সওম অবস্থায় মুসাফির যদি মক্কায় পৌঁছে। তবে উমরা আদায় করতে শক্তি পাওয়ার জন্য সওম ভঙ্গ করা জায়েয হবে কি?	487
৫০০	প্রশ্ন ঃ (৪০৬) সন্তানকে দুগ্ধদানকারিণী কি সওম ভঙ্গ করতে পারবে? ভঙ্গ করলে কিভাবে কাযা আদায় করবে? নাকি সওমের বিনিময়ে খাদ্য দান করবে?	488
৫০১	প্রশ্ন ঃ (৪০৭) কঠিন ক্ষুধা ও পিপাসায় অতিরিক্ত ক্লান্তির সাথে যদি সওম পালনকারী দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে, তবে সওমের বিশুদ্ধতায় কি এর কোন প্রভাব পড়বে?	489
৫০২	প্রশ্ন ঃ (৪০৮) রামাযানের প্রত্যেক দিনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কি নিয়্যাত করা আবশ্যক? নাকি পূর্ণ মাসের নিয়্যাত একবার করে নিলেই হবে?	489
৫০৩	প্রশ্ন ঃ (৪০৯) খানা-পিনা গ্রহণ না করে সওম ভঙ্গের জন্য অন্তরে দৃঢ় নিয়ত করলেই কি সওমকারীর সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে?	490

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫০৪	প্রশ্ন ঃ (৪১০) ভুলক্রমে পানাহার করলে তার সিয়ামের বিধান কি? কেউ এটা দেখলে তার করণীয় কি?	490
৫০৫	প্রশ্ন ঃ (৪১১) সওম রেখে সুরমা ব্যবহার করার বিধান কি?	491
৫০৬	প্রশ্ন ঃ (৪১২) সওম অবস্থায় মিসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করার বিধান কি?	492
৫০৭	প্রশ্ন ঃ (৪১৩) সওম ভঙ্গকারী বিষয় কি কি?	493
৫০৮	প্রশ্ন ঃ (৪১৪) সওম অবস্থায় শ্বাসকষ্টের কারণে স্প্রে (nabulijer) ব্যবহার করার বিধান কি? এ দ্বারা কি সওম ভঙ্গ হবে?	499
৫০৯	প্রশ্ন ঃ (৪১৫) বমি করলে কি সওম ভঙ্গ হবে?	499
৫১০	প্রশ্ন ঃ (৪১৬) সওম পালনকারীর দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হলে কি সওম নষ্ট হবে?	500
৫১১	প্রশ্ন ঃ (৪১৭) ঋতুবতী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে, তবে তার সওমের বিধান কি?	500
৫১২	প্রশ্ন ঃ (৪১৮) সওম অবস্থায় দাঁত উঠানোর বিধান কি?	501
৫১৩	প্রশ্ন ঃ (৪১৯) সওম রেখে রক্ত পরীক্ষা (Blood test) করার জন্য রক্ত প্রদান করার বিধান কি? এতে কি সওম নষ্ট হবে।	501
৫১৪	প্রশ্ন ঃ (৪২০) সওম পালনকারীর হস্ত মৈথুন করলে কি সওম ভঙ্গ হবে? তাকে কি কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে?	501
৫১৫	প্রশ্ন ঃ (৪২১) পালনকারীর জন্য আতর-সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়ার বিধান কি?	502
৫১৬	প্রশ্নঃ (৪২২) নাকে ভাপ টানা এবং চোখে বা নাকে ড্রপ দেয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?	502
৫১৭	প্রশ্ন ঃ (৪২৩) পালনকারীর নাকে, কানে ও চোখে ড্রপ ব্যবহার করার বিধান কি?	502
৫১৮	প্রশ্ন ঃ (৪২৪) সওম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি সওম বিশুদ্ধ হবে?	503
৫১৯	প্রশ্ন ঃ (৪২৫) পালনকারীর ঠান্ডা ব্যবহার করার বিধান কি?	503
৫২০	প্রশ্ন ঃ (৪২৬) সওম পালনকারী কুলি করা বা নাকে পানি নেয়ার কারণে যদি পেটে পৌঁছে যায়, তবে কি তার সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে?	503
৫২১	প্রশ্ন ঃ (৪২৭) পালনকারীর আতরের সুঘ্রাণ ব্যবহার করার বিধান কি?	504
৫২২	প্রশ্ন ঃ (৪২৮) নাক থেকে রক্ত বের হলে কি সওম নষ্ট হবে?	504
৫২৩	প্রশ্ন ঃ (৪২৯) রামাযানের কোন কোন ক্যালেন্ডারে দেখা যায় সাহুরের জন্য শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে একটি এবং তার প্রায় দশ/পনের মিনিট পর ফজরের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সুন্নাতে কি এর পক্ষে কোন দলীল আছে নাকি এটা বিদআত?	504

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫২৪	প্রশ্ন ঃ (৪৩০) এয়ারপোর্টে থাকাবস্থায় সূর্য অস্ত গেছে মুয়ায্যিন আযান দিয়েছে, ইফতারও করে নিয়েছে। কিন্তু বিমানে চড়ে উপরে গিয়ে সূর্য দেখতে পেল। এখন কি পনাহার বন্ধ করতে হবে?	505
৫২৫	প্রশ্ন ঃ (৪৩১) সওম পালনকারীর কফ অথবা থুথু গিলে ফেলার বিধান কি?	505
৫২৬	প্রশ্ন ঃ (৪৩২) খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করলে কি সওম নষ্ট হবে?	506
৫২৭	প্রশ্ন ঃ (৪৩৩) রামাযানের সওম রেখে হারাম বা অশ্লীল কথাবার্তা উচ্চারণ করলে কি সওম নষ্ট হবে?	506
৫২৮	প্রশ্ন ঃ (৪৩৪) মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়ার বিধান কি? এটা কি সওম নষ্ট করে?	507
৫২৯	প্রশ্ন ঃ (৪৩৫) সিয়ামের আদব কি কি?	507
৫৩০	প্রশ্ন ঃ (৪৩৬) ইফতারের জন্য কোন দু'আ কি প্রমাণিত আছে? সওম পালনকারী কি মুয়ায্যিনের জবাব দিবে নাকি ইফতার চালিয়ে যাবে?	508
৫৩১	প্রশ্ন ঃ (৪৩৭) কারো সওম কাযা থাকলে তার জন্য শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখার বিধান কি?	509
৫৩২	প্রশ্ন ঃ (৪৩৮) জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি রামাযানে সওম কাযা করেছে। কিন্তু পরবর্তী মাস শুরু হওয়ার চারদিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। তার পক্ষ থেকে কি কাযা রোযাগুলো আদায় করতে হবে?	510
৫৩৩	প্রশ্ন ঃ (৪৩৯) জনৈক ব্যক্তির রামাযানের একটি সওম বাকী ছিল। তার কাযা না করেই পরবর্তী রামাযান এসে যায়। সে এখন কি করবে?	511
৫৩৪	প্রশ্ন ঃ (৪৪০) শাওয়ালের ছয়টি সওম পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি কি?	511
৫৩৫	প্রশ্ন ঃ (৪৪১) শাওয়ালের ছয়টি সওম রাখার জন্য কি ইচ্ছামত দিন নির্ধারণ করা জায়েয? নাকি তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা আছে? এ দিনগুলো সওম রাখলে কি তা ফরযের মত হয়ে যাবে এবং প্রতি বছর আবশ্যিকভাবে সওম পালন করতে হবে?	512
৫৩৬	প্রশ্ন ঃ (৪৪২) আশুরা সিয়ামের বিধান কি?	512
৫৩৭	প্রশ্ন ঃ (৪৪৩) শাবান মাসে সওম রাখার বিধান কি?	513
৫৩৮	প্রশ্ন ঃ (৪৪৪) কোন লোকের যদি অভ্যাস থাকে নফল সওম একদিন রাখা একদিন ছাড়া। কিন্তু তার সওমের দিন শুক্রবার পড়ে গেল। তার জন্য উক্ত দিন সওম রাখা জায়েয হবে কি?	514
৫৩৯	প্রশ্ন ঃ (৪৪৫) বিসাল সওম বা অবিচ্ছিন্ন সওম কাকে বলে? এটা কি শরীয়ত সম্মত?	514
৫৪০	প্রশ্ন ঃ (৪৪৬) বিশেষভাবে জুমু'আর দিবস সওম নিষেধ। এর কারণ কি? কাযা সিয়ামও কি এদিন রাখা নিষেধ?	514

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৪১	প্রশ্ন ঃ (৪৪৭) কোন মানুষ যদি নফল সওম ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করে ফেলে, তবে কি গুনাহগার হবে? যদি সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করে, তবে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?	516
৫৪২	প্রশ্ন ঃ (৪৪৮) ই'তিকাফির বিধান কি? ই'তিকাফকারীর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা পানাহার বা ঔষধ সেবনের জন্যে বাইরে যাওয়া কি জায়েয? ই'তেকাফির সুন্নাত কি? নবী থেকে ই'তেকাফির সহীহ পদ্ধতি কি?	516
	হাজ্জ বিষয়ক ফাতাওয়া	
৫৪৩	প্রশ্ন ঃ (৪৪৯) যে ব্যক্তি সলাত পড়ে না সওম রাখেনা তার হাজ্জের বিধান কি? যদি এ ব্যক্তি তওবা করে, তবে সমস্ত ইবাদাত কি কাযা আদায় করতে হবে?	520
৫৪৪	প্রশ্ন ঃ (৪৫০) ব্যাপকভাবে দেখা যায় অনেক মুসলমান বিশেষ করে অনেক যুবক ফরয হাজ্জ আদায় করার ব্যাপারে শীথিলতা প্রদর্শন করে। এবছর নয় ঐ বছর এভাবে বিলম্ব করে। কখনো কর্ম ব্যস্ততার ওযর পেশ করে। এদেরকে আপনার নছীহত কি?	521
৫৪৫	কখনও দেখা যায় কোন কোন পিতা যুবক ছেলেদেরকে ফরয হাজ্জ আদায় করতে বাধা দেয় এই যুক্তিতে যে, এখনো তাদের বয়স হয়নি, হাজ্জের ক্লান্তি সহ্য করতে পারবে না। অথচ হাজ্জের পূর্ণ শর্ত তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। পিতার এ কাজের বিধান কি? এ ধরনের পিতার আনুগত্য করার বিধান কি?	521
৫৪৬	প্রশ্ন ঃ (৪৫১) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির কি হাজ্জ করা আবশ্যক?	522
৫৪৭	প্রশ্ন ঃ (৪৫২) মায়ের পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করার জন্য জনৈক লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে; কিন্তু পরে জানা গেল এ লোক আরো কয়েকজনের হাজ্জ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছে। এ সময় করণীয় কি? এ লোকের বিধান কি?	522
৫৪৮	প্রশ্ন ঃ (৪৫৩) অতিবৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছার পর উমরা আদায় করতে অপারগ হয়ে গেছে এখন সে কি করবে?	523
৫৪৯	প্রশ্ন ঃ (৪৫৪) বদলী হাজ্জ সম্পাদন করার পর যদি কিছু অর্থ রয়ে যায়, তবে সেটা কি ফেরত দিতে হবে? না নিতে পারবে?	524
৫৫০	প্রশ্ন ঃ (৪৫৫) পুত্র যদি পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ বা উমরা সম্পাদন করে, তবে নিজের জন্য দু'আ করতে পারবে কি?	525
৫৫১	প্রশ্ন ঃ (৪৫৬) হাজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করার বিধান কি?	525
৫৫২	প্রশ্ন ঃ (৪৫৭) মৃতের পক্ষ থেকে উমরা আদায় করা কি জায়েয?	527

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৫৩	প্রশ্ন ঃ (৪৫৮) মাহরাম ছাড়া কোন নারী যদি হাজ্জ সম্পাদন করে, তবে কি তা বিশুদ্ধ হবে? বুদ্ধিমান বালক কি মাহরাম হতে পারে। মাহরাম ব্যক্তির মধ্যে কি কি শর্ত আবশ্যক?	527
৫৫৪	প্রশ্ন ঃ (৪৫৯) জনৈক নারীর কথা হচ্ছে, আমি রামাযানে উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। কিন্তু আমার সাথে থাকছে আমার সহদোর বোন, তার স্বামী ও আমার মা। এই উমরায় যাওয়া কি আমার জায়েয হবে?	529
৫৫৫	প্রশ্ন ঃ (৪৬০) হাজ্জের মাস কি কি?	530
৫৫৬	প্রশ্ন ঃ (৪৬১) হাজ্জের মাস সমূহ আসার পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধার বিধান কি?	530
৫৫৭	প্রশ্ন ঃ (৫৬২) হাজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান সমূহ কি কি?	531
৫৫৮	প্রশ্ন ঃ (৪৬৩) বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কি?	533
৫৫৯	প্রশ্ন ঃ (৪৬৪) 'লাব্বাইক্' বলাটাই কি ইহরামে প্রবেশ করার নিয়ত?	533
৫৬০	প্রশ্ন ঃ (৪৬৫) আকাশপথে আগমণকারী কিভাবে ইহরাম বাঁধবে?	533
৫৬১	প্রশ্ন ঃ (৪৬৬) উমরার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কি?	534
৫৬২	মানুষ কিভাবে উড়োজাহাজে সলাত আদায় করবে? এবং কিভাবে ইহরাম বাঁধবে?	534
৫৬৩	উড়োজাহাজে সলাত আদায়ের পদ্ধতি	534
৫৬৪	উড়োজাহাজে হাজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি	536
৫৬৫	প্রশ্ন ঃ (৪৬৭) কোন ব্যক্তি যদি নিজ দেশ থেকে জেদ্দা সফর করে অতঃপর উমরা আদায় করার ইচ্ছা করে। সে কি জেদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে?	536
৫৬৬	প্রশ্ন ঃ (৪৬৮) ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর গোসল করার বিধান কি?	537
৫৬৭	প্রশ্ন ঃ (৪৬৯) মৃত দাদার পক্ষ থেকে হাজ্জ করার বিধান কি? অবশ্য তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায়কারী নিজের হাজ্জ সম্পাদন করেছে।	537
৫৬৮	প্রশ্ন ঃ (৪৭০) ইহরামের জন্য বিশেষ কোন সলাত আছে কি?	537
৫৬৯	প্রশ্ন ঃ (৪৭১) কোন ব্যক্তি যদি হাজ্জের মাসে উমরা আদায় করে মদীনা সফর করে, অতঃপর যুলহুলায়ফা থেকে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে, তবে সে কি তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে?	537
৫৭০	প্রশ্ন ঃ (৪৭২) কোন ব্যক্তি যদি শাওয়াল মাসে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা পূর্ণ করে। কিন্তু সে সময় সে হাজ্জের নিয়ত করেনি। কিন্তু হাজ্জের সময় তার হাজ্জ করার সুযোগ হল। সে কি তামাত্তুকারী গণ্য হবে?	538
৫৭১	প্রশ্নঃ (৪৭৩) নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত তালবিয়াটি কি? উমরা এবং হাজ্জের ক্ষেত্রে কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে?	538

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৭২	প্রশ্ন ঃ (৪৭৪) ইহরাম করে কি মাথা আঁচড়ানো জায়েয আছে?	539
৫৭৩	প্রশ্ন ঃ (৪৭৫) জনৈক হাজী সাহেব অজ্ঞতা বশতঃ মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে হালাল হয়ে গেছে। তার উপর আবশ্যক কি?	540
৫৭৪	প্রশ্ন ঃ (৪৭৬) মক্কার বাইরের কোন লোক যদি প্রশাসনকে ফাঁকি দেয়ার জন্য বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করে অতঃপর মক্কা পৌঁছে ইহরাম বাঁধে, তার হাজ্জ কি বিশুদ্ধ হবে?	541
৫৭৫	প্রশ্ন ঃ (৪৭৭) তামাত্তুকারী যদি নিজ দেশে ফেরত গিয়ে আবার হাজ্জের জন্য সফর করে, তবে কি ইফরাদকারী হিসেবে গণ্য হবে?	542
৫৭৬	প্রশ্ন ঃ (৪৭৮) ইহরাম অবস্থায় ছাতা ব্যবহার করার বিধান কি? অনুরূপভাবে সিলাইকৃত বেল্ট ব্যবহার করা যাবে কি?	542
৫৭৭	প্রশ্ন ঃ (৪৭৯) শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী জনৈক ব্যক্তি ইহরামের কাপড় পরতে সক্ষম নয়। সে কি করবে?	543
৫৭৮	প্রশ্ন ঃ (৪৮০) হাজ্জের ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার হাজ্জের বিধান কি?	543
৫৭৯	প্রশ্ন ঃ (৪৮১) ইহরাম অবস্থায় নারী কিভাবে পর্দা করবে? পর্দা মুখ স্পর্শ করতে পারবে না এ রকম কোন শর্ত আছে কি?	547
৫৮০	প্রশ্ন ঃ (৪৮২) হাজ্জ পালনকারী জনৈক নারী বিদায়ী তওয়াফ করার পূর্বে ঋতুবতী হয়ে যায়। এখন তার করণীয় কি?	547
৫৮১	প্রশ্ন ঃ (৪৮৩) জনৈক নারী স্বামীর সাথে ঋতু অবস্থাতেই ইহরাম বাঁধে। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর কোন মাহরাম ছাড়াই সে উমরার কাজ সমাধা করে। কাজ শেষ হলে আবার রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। এর বিধান কি?	548
৫৮২	প্রশ্ন ঃ (৪৮৪) জনৈক নারী তওয়াফে এফাযা করেনি। ইতোমধ্যে সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। তার ঠিকানা সউদী আরবের বাইরে। হাজ্জ কাফিলাও চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই দেরী করা সম্ভব হবে না। এবং পরবর্তীতে মক্কা ফিরে আসাটাও তার জন্য দুরহ ব্যাপার। এখন সে কি করবে?	549
৫৮৩	প্রশ্ন ঃ (৪৮৫) জনৈক নারী উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু ঋতুবতী হয়ে যাওয়ার কারণে উমরা না করেই মক্কা থেকে ফেরত চলে গেছে। এর বিধান কি?	550
৫৮৪	প্রশ্ন ঃ (৪৮৬) ইহরাম অবস্থায় নারী কি স্বীয় কাপড় বদল করতে পারবে? নারীর জন্য কি ইহরামের বিশেষ কোন পোষাক আছে?	550
৫৮৫	প্রশ্ন ঃ (৪৮৭) ইহরামকারী নারীর কি হাত মোজা এবং পায়ের মোজা পরিধান করা জায়েয আছে?	551

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৮৬	প্রশ্ন ঃ (৪৮৮) জনৈক নারী ঋতুবতী অবস্থায় মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছে। মক্কায় আগমন করে বিলম্ব করে পবিত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করেছে। তার এই উমরার বিধান কি?	551
৫৮৭	প্রশ্ন ঃ (৪৮৯) মীকাত থেকে ঋতুবতী অবস্থায় জনৈক নারী ইহ্‌রাম বাঁধে। মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহ্‌রাম বস্ত্র সে খুলে ফেলে। এর বিধান কি?	552
৫৮৮	প্রশ্ন ঃ (৪৯০) হাজ্জের সময় নিকাব দিয়ে নারীর মুখ ঢাকার বিধান কি? আমি একটি হাদীস পড়েছি যার অর্থ হচ্ছেঃ "ইহ্‌রামকারী নারী নেকাব পরবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।" আয়েশা (রাঃ)এর অন্য একটি কথা পড়েছি। তিনি বলেন, "আমাদের সামনে কোন পুরুষ এলে আমরা মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন আমরা ওদের সামনে চলে যেতাম, তখন মুখমণ্ডল খুলে রাখতাম" সে সময় তারা হাজ্জে ছিলেন। দু'টি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য কি?	552
৫৮৯	প্রশ্ন ঃ (৪৯১) কোন মানুষ যদি ভুল ক্রমে অথবা অজ্ঞতা বশতঃ ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেলে, তবে তার বিধান কি?	553
৫৯০	প্রশ্ন ঃ (৪৯২) জনৈক হাজ্জপালনকারী হাজ্জ আদায় করার ক্ষেত্রে ভুলে লিপ্ত হয়েছে। ভুলের কাফ্‌ফারা দেয়ার জন্য তার কাছে তেমন কিছু ছিল না। সে দেশে ফেরত চলে গেছে। উক্ত কাফ্‌ফারা কি নিজ দেশে আদায় করা জায়েয হবে? নাকি মক্কাতেই পাঠাতে হবে? যদি মক্কাতেই পাঠাতে হয়, তবে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া কি জায়েয হবে?	554
৫৯১	প্রশ্ন ঃ (৪৯৩) তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা কি জায়েয?	555
৫৯২	প্রশ্ন ঃ (৪৯৪) রামাযানে বারবার উমরা করার বিধান কি? এ রকম কোন সময় কি নির্দিষ্ট আছে যে, এতদিন পরপর উমরা করতে হবে?	555
৫৯৩	প্রশ্ন ঃ (৪৯৫) তওয়াফ চলাবস্থায় যদি সলাতের ইকামত হয়ে যায়, তবে কি করবে? তওয়াফ কি পুনরায় শুরু করবে? পুনরায় শুরু না করলে কোথা থেকে তওয়াফ পূর্ণ করবে?	556
৫৯৪	প্রশ্ন ঃ (৪৯৬) জনৈক ওম রাক'আরী তওয়াফের পূর্বে সাঈ করেছে, তারপর তওয়াফ করেছে। এখন তার করণীয় কি?	556
৫৯৫	প্রশ্ন ঃ (৪৯৭) ইয্‌তেবা' কাকে বলে? এ কাজ কোন সময় সুন্নাত?	556
৫৯৬	প্রশ্ন ঃ (৪৯৮) নফল সাঈ করা কি জায়েয আছে?	557
৫৯৭	প্রশ্ন ঃ (৪৯৯) অজ্ঞতা বশতঃ কেউ যদি তওয়াফে এফাযা ছেড়ে দেয়, তবে তার করণীয় কি?	557
৫৯৮	প্রশ্ন ঃ (৫০০) অনেক তওয়াফকারীকে দেখা যায় ভীড়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে তাদের নারীদেরকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য পাঠায়। তাদের জন্য কোনটি উত্তম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা? নাকি পুরুষদের ভীড় থেকে দূরে অবস্থান করা।	557

www.pathagar.com

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৯৯	প্রশ্ন ঃ (৫০১) জনৈক নারী স্বামীর সাথে তামাত্তু হাজ্জ করতে এসেছে। তারা উমরার তওয়াফ করার সময় ৬ষ্ঠ চক্করে স্বামী বললেন, এটাই ৭ম চক্কর। এবং তিনি নিজ মতের উপর অটল ছিলেন। এখন স্ত্রীর করণীয় কি?	559
৬০০	প্রশ্ন ঃ (৫০২) উমরা বা হাজ্জকারী যদি দু'আ না জানে, তবে তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতির সময় কি কোন বই হাতে নিয়ে দেখে দেখে দু'আ পাঠ করা জায়েয হবে?	559
৬০১	প্রশ্ন ঃ (৫০৩) হাজ্জ-উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করার জন্য তওয়াফ-সাঈতে কি বিশেষ কোন দু'আ আছে?	560
৬০২	প্রশ্ন ঃ (৫০৪) উমরা শেষ করার পর জনৈক ব্যক্তি তার ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পেল। এখন সে কি করবে?	561
৬০৩	প্রশ্ন ঃ (৫০৫) মাক্বামে ইবরাহীমে যে পদচিহ্ন দেখা যায়, তা কি প্রকৃতই ইবরাহীম (আঃ)এর পায়ের চিহ্ন?	563
৬০৪	প্রশ্ন ঃ (৫০৬) কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে দু'আ বা কান্নাকাটি করা জায়েয কি?	564
৬০৫	প্রশ্ন ঃ (৫০৭) উমরায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার বিধান কি? এ দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম?	564
৬০৬	প্রশ্ন ঃ (৫০৮) জনৈক হাজী তামাত্তু হাজ্জ করতে এসে, উমরার তওয়াফ ও সাঈ শেষ করে ইহরাম খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করে নিয়েছে। মাথা মুন্ডন করেনি বা চুল ছোট করেনি। হাজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ করার পর এ সম্পর্কে সে জানতে চেয়েছে। এখন তার করণীয় কি?	565
৬০৭	প্রশ্ন ঃ (৫০৯) তামাত্তু হাজ্জ করার জন্য ইহরাম বাঁধার পর উমরা শেষ করে চুল ছোট করেনি বা মুণ্ডনও করেনি। পরে হাজ্জের সমস্ত কাজ শেষ করেছে। তাকে কি করতে হবে?	565
৬০৮	প্রশ্ন ঃ (৫১০) তামাত্তুকারী কুরবানী দিতে পারেনি। হাজ্জে সে তিনটি সওম রেখেছে। কিন্তু হাজ্জ থেকে ফিরে এসে সাতটি সওম রাখে নি। এভাবে তিন বছর কেটে গেছে। তার করণীয় কি?	565
৬০৯	প্রশ্ন ঃ (৫১১) উমরা করে জনৈক লোক নিজ দেশে গিয়ে মাথা মুন্ডন করেছে। তার উমরার বিধান কি?	565
৬১০	প্রশ্নঃ (৫১২) তামাত্তু হাজ্জ করার জন্য উমরার ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে হাজ্জের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে। তাকে কি কোন কাফ্ফারা দিতে হবে?	566
৬১১	প্রশ্ন ঃ (৫১৩) তামাত্তু হাজ্জের ইহরাম বাঁধার পর উমরা শেষ করে অজ্ঞতা বশতঃ হালাল হয়নি। এভাবে হাজ্জের কাজ শেষ করে কুরবানী করেছে। তার করণীয় কি? তার হাজ্জ কি বিশুদ্ধ?	566
৬১২	প্রশ্ন ঃ (৫১৪) একদল লোক আরাফাতের ময়দান থেকে ফেরার পথে মুযদালিফার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। রাত একটার দিকে তারা মাগরিব ও এশা সলাত আদায় করে। মুযদালিফা পৌঁছার সময় ফজরের আযান হয়ে যায়। সেখানে তারা ফজর সলাত আদায় করে। এখন তাদেরকে কি কোন জরিমানা দিতে হবে?	567

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬১৩	প্রশ্ন ঃ (৫১৫) জনৈক নারী মুযদালিফা থেকে শেষ রাত্রে রাওয়ানা দিয়েছে। এবং সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নিজের ছেলেকে তার পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব প্রদান করেছে। এর বিধান কি?	567
৬১৪	প্রশ্ন ঃ (৫১৬) জনৈক হাজী পূর্ব দিক থেকে জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মেরেছে। কিন্তু তা হাওয বা গর্তের মধ্যে পড়েনি। ঘটনাটি ছিল ১৩ তারিখে। তাকে কি তিনটি জামরাতেই পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে?	569
৬১৫	প্রশ্ন ঃ (৫১৭) সাতটি কঙ্করের মধ্যে থেকে যদি একটি বা দু'টি কঙ্কর জামরায় না পড়ে এবং এ ভাবে এক বা দু'দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে কি তাকে সবগুলো জামরায় পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে?	569
৬১৬	প্রশ্ন ঃ (৫১৮) বলা হয়, যে কঙ্কর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা নাকি আবার নিক্ষেপ করা যাবে না। এ কথাটি কি ঠিক? এর কোন দলীল আছে কি?	570
৬১৭	প্রশ্ন ঃ (৫১৯) তওয়াফে এফাযার পূর্বে হাজ্জের সাঈ করা কি জায়েয?	571
৬১৮	প্রশ্ন ঃ (৫২০) কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলে আদায় হবে? এবং কখন মারলে কাযা মারা হবে?	572
৬১৯	প্রশ্ন ঃ (৫২১) বিশেষ করে ঈদের দিনের তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা কি জায়েয?	572
৬২০	প্রশ্ন ঃ (৫২২) সাঈ আবশ্যক ছিল কিন্তু তওয়াফ করার পর সরাসরি সাঈ না করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। পরে তাকে বিষয়টি জানানো হলো, সে কি এখন শুধু সাঈ করবে? নাকি পুনরায় তওয়াফ করার পর সরাসরি সাঈ করবে?	573
৬২১	প্রশ্ন ঃ (৫২৩) উমরা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মাথার এদিক ওদিক থেকে অল্প করে চুল কাটে, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?	573
৬২২	প্রশ্ন ঃ (৫২৪) কঙ্কর মারার সময় কি?	574
৬২৩	প্রশ্ন ঃ (৫২৫) জনৈক হাজী আরাফাত দিবসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে মীনায় রাত কাটায়নি, কঙ্কর নিক্ষেপ করেনি এবং তাওয়াফে এফাযাও করেনি। তাকে এখন কি করতে হবে?	575
৬২৪	প্রশ্ন ঃ (৫২৬) মুযদালিফার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কেউ যদি বাইরে অবস্থান করে, তবে তার করণীয় কি?	576
৬২৫	প্রশ্ন ঃ (৫২৭) এফরাদ হাজ্জকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ করে নেয়, তবে তওয়াফে এফাযার পর তাকে কি আবার সাঈ করতে হবে?	576
৬২৬	প্রশ্ন ঃ (৫২৮) ক্বিরাণকারীর জন্য একটি তওয়াফ ও একটি সাঈ যথেষ্ট হবে?	576
৬২৭	প্রশ্ন ঃ (৫২৯) জনৈক ব্যক্তি রাত বরোটা পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে মক্কা চলে গেছে, ফজরের পূর্বে আর মিনায় ফেরত আসেনি। তার বিধান কি?	577

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬২৮	প্রশ্ন ঃ (৫৩০) কোন মানুষ যদি তাড়াহুড়া করার নিয়তে ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে। কিন্তু কাজ থাকার কারণে সূর্যাস্তের পর আবার মিনায় ফিরে আসে। এখন কি মিনায় রাত থাকা তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে?	577
৬২৯	প্রশ্ন ঃ (৫৩১) সঊদী আরবের বাইরে অবস্থান করে এমন জনৈক হাজী হাজ্জের কাজ সম্পাদন করেছে। জিলহাজ্জের ১৩ তারিখে আছর তথা বিকাল চারটার সময় তার সফরের সময় নির্দিষ্ট। কিন্তু ১২ তারিখ কঙ্কর মারার পর সে মিনা থেকে বের হয়নি। ১৩ তারিখের রাত সেখানেই অবস্থান করেছে। এখন ১৩ তারিখ সকালে কঙ্কর মেরে মিনা থেকে বের হওয়া তার জন্য জায়েয হবে কি? উল্লেখ্য যে, যোহরের পর কঙ্কর মেরে বের হলে নির্ঘাত তার সফর বাতিল হয়ে যাবে, ফলে সে বিরাট অসুবিধায় পড়বে। এর উত্তর যদি না জায়েয হয়, তবে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারার ব্যাপারে কি কোন মত পাওয়া যায় না?	577
৬৩০	প্রশ্ন ঃ (৫৩২) জনৈক ব্যক্তি ১২ তারিখে কঙ্কর না মেরেই মিনা ছেড়েছে এ ধারণায় যে, এটাই অনুমদিত তাড়াহুড়া। এবং বিদায়ী তওয়াফও করেনি। তার হাজ্জের কি হবে?	579
৬৩১	প্রশ্ন ঃ (৫৩৩) মিনায় স্থান না পাওয়ার কারণে কোন লোক যদি সেখানে শুধুমাত্র রাতের বেলায় আগমন করে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করে। তারপর মক্কা চলে যায় এবং রাত ও দিনের অবশিষ্ট অংশ তথায় অবস্থান করে তবে কি হবে?	580
৬৩২	প্রশ্ন ঃ (৫৩৪) জনৈক ব্যক্তি সকালে বিদায়ী তওয়াফ করে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আছরের পর সফর করার ইচ্ছা করে। তাকে কি কিছু করতে হবে?	581
৬৩৩	প্রশ্ন ঃ (৫৩৫) উমরাকারীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ করার বিধান কি?	582
৬৩৪	প্রশ্ন ঃ (৫৩৬) জনৈক ব্যক্তি মীক্বাত থেকে হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছে সে প্রশাসন (ডিউটি পুলিশ) কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেননা সে হাজ্জের অনুমতি পত্র নেয়নি। এখন তার করণীয় কি?	583
৬৩৫	প্রশ্ন ঃ (৫৩৭) হাজ্জের ইচ্ছা করার পর যদি তাকে নিষেধ করে দেয়া হয়, তবে তার করণীয় কি?	584
৬৩৬	প্রশ্ন ঃ (৫৩৮) কিছু কিছু হাজী সাহেব যে পাপের কাজে লিপ্ত হয় তাতে কি হাজ্জের সওয়াব কমে যাবে?	585
৬৩৭	প্রশ্ন ঃ (৫৩৯) কেউ যদি নকল বা মিথ্যা পাসপোর্ট বানিয়ে হাজ্জ করে, তার হাজ্জ হবে কি?	585

www.pathagar.com

فتاوى العقيدة

আক্বীদাহ্ বিষয়ক ফাতাওয়া

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১) তাওহীদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ- তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসকে একক হিসাবে নির্ধারণ করা। 'না' বাচক ও 'হ্যাঁ' বাচক উক্তি ব্যবহার করা ব্যতীত এটির বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ অন্য সব বস্তু হতে কোন বিধানকে নাকচ করে যাকে এক বলে স্বীকার করা হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর জন্যই সে বিধানকে স্বীকার করা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, "আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই" একথার সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাওহীদ পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তু হতে উলুহিয়্যাতকে (ইবাদাত) অস্বীকার করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করবে। কারণ শুধুমাত্র نفي নাফী (না বাচক) বাক্যের মাধ্যমে কোন বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে গুণাগুণ থেকে মুক্ত করা হয়। আর শুধুমাত্র হ্যাঁ বোধক বাক্যের মাধ্যমে কোন বস্তুর জন্য কোন বিধান সাব্যস্ত করলে সেই বিধানে অন্যের অংশ গ্রহণকে বাধা প্রদান করে না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ আপনি যদি বলেন, "অমুক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে"। এ বাক্যে আপনি তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকাকে সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু এ কথার দ্বারা আপনি শুধুমাত্র সে-ই দাঁড়িয়ে আছে তা সাব্যস্ত করলেন না। কারণ, হতে পারে আরো অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ তার সাথে অন্য ব্যক্তিরাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আর যদি বলেন, "যায়েদ ব্যতীত আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই" তাহলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকাকে শুধুমাত্র যায়েদের সাথেই সীমিত (খাস) করে দিলেন। এ বাক্যে আপনি যায়েদের এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকাকে সাব্যস্ত করার সাথে সাথে অন্যদের দাঁড়িয়ে থাকাকে অস্বীকার করলেন (নাকোচ করলেন)। এভাবেই তাওহীদের প্রকৃত রূপ বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। অর্থাৎ নাফী (না বাচক) ও ইসবাত (হ্যাঁ বাচক) বাক্যের সমন্বয় ব্যতীত তাওহীদ কখনো প্রকৃত তাওহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। মুসলিম বিদ্বানগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

তাওহীদুর রুবূবীয়াহ

তাওহীদুল উলুহীয়াহ

তাওহীদুল আসমা অস্ সিফাত

কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে গবেষণা করে আলিমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাওহীদ উপরোক্ত তিন প্রকারের মাঝে সীমিত।

প্রথমতঃ তাওহীদুর রুবূবীয়্যার বিস্তারিত পরিচয়ঃ

সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসেবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদুর রুবূবীয়্যা।

www.pathagar.com

১- সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্ব ঃ আল্লাহ একাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা আছে কি? যে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন হতে জীবিকা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। (সূরা ফাতির ঃ ৩)

কাফিরদের অন্তসার শূন্য মা'বূদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ﴾

অর্থ ঃ সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (সূরা নাহল ঃ ১৭)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির ভিতরে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কর্ম এবং মাখলুকাতের কর্মসমূহ। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের কর্মসমূহও সৃষ্টি করেছেন- এ কথার উপর ঈমান আনলেই তাকদীরের উপর ঈমান আনা পূর্ণতা লাভ করবে।

যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকেও সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আস-সাফ্‌ফাত ঃ ৯৬)

মানুষের কাজসমূহ মানুষের গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কোন জিনিসের স্রষ্টা উক্ত জিনিসের গুণাবলীরও স্রষ্টা।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও তো সৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকর্তা। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১৪)

রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কণকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে রূহের সঞ্চার কর।[১] উপরোক্ত

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল লিবাস।

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহর মতো করে কোন মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম। মানুষের পক্ষে কোন অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দেয়া সম্ভব নয়। কোন মৃত প্রাণীকেও জীবন দান করা সম্ভব নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের তৈরী করার অর্থ হল নিছক পরিবর্তন করা এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা মাত্র। মূলতঃ তা আল্লাহরই সৃষ্টি। ফটোগ্রাফার যখন কোন বস্তুর ছবি তুলে, তখন সে তাকে সৃষ্টি করে না। বরং বস্তুটিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর করে মাত্র। যেমন সে মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করে এবং অন্যান্য জীব-জন্তু বানায়। সাদা কাগজকে রঙ্গীন কাগজে পরিণত করে। এখানে মূলবস্তু কালী (রং) ও সাদা কাগজ তো আল্লাহরই সৃষ্টি। এটাই হল আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য।

২- রাজত্বে আল্লাহর একত্ব ঃ

মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

অর্থ ঃ সেই মহান সত্তা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (সূরা মুল্ক ঃ ১)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর কোন আশ্রয় দাতা নেই। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৮৮)

সুতরাং সর্বসাধারণের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বাদশাহ বলা হলে তা সীমিত অর্থে বুঝতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যের জন্যেও রাজত্ব সাব্যস্ত করেছেন। তবে তা সীমিত অর্থে। যেমন তিনি বলেন,

﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾

অর্থ ঃ অথবা তোমরা যার চাবি-কাঠির (নিয়ন্ত্রণের) মালিক হয়েছ।

(সূরা নূর ঃ ৬১)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

অর্থ ঃ তবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা মালিকানাধীন দাসীগণ ব্যতীত।

(সূরা মু'মিনূনঃ ৬)

www.pathagar.com

আরো অনেক দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরও রাজত্ব রয়েছে। তবে এই রাজত্ব আল্লাহর রাজত্বের মত নয়। সেটা অসম্পূর্ণ রাজত্ব। তা ব্যাপক রাজত্ব নয়। বরং তা একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতরে। তাই উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যায়েদের বাড়ীতে রয়েছে একমাত্র যায়েদেরই কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তাতে আমরের হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নেই এবং বিপরীত পক্ষে 'আম্রের বাড়ীতে যায়েদও কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তারপরও মানুষ আপন মালিকানাধীন বস্তুর উপর আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে থেকেই রাজত্ব করে থাকে। এজন্যই রাসূল ﷺ অকারণে সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾

অর্থ ঃ তোমাদের যে সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তোমাদের জীবন ধারনের উপকরণ স্বরূপ দান করেছেন, তা তোমরা নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিও না। (সূরা নিসা ঃ ৫)

মানুষের রাজত্ব ও মুলূকিয়ত খুবই সীমিত। আর আল্লাহর মুলূকিয়ত ও রাজত্ব সর্বব্যাপী এবং সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী। তিনি তাঁর রাজত্বে যা ইচ্ছা, তাই করেন। তাঁর কর্মের কৈফিয়ত তলব করার মত কেউ নেই। অথচ সকল মানুষ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩- পরিচালনায় আল্লাহর একত্ব ঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলুকাত এবং আকাশ-জমিনের সকল বিষয় পরিচালনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ ঃ সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা অতীব বরকতময়। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪)

আল্লাহর এই পরিচালনা সর্বব্যাপী। কোন শক্তিই আল্লাহর পরিচালনাকে রুখে দাঁড়াতে পারে না। কোন কোন মাখলুকের জন্যও কিছু কিছু পরিচালনার অধিকার থাকে। যেমন মানুষ তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। কিন্তু এ কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট একটি সীমার ভিতরে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হল যে, তাওহীদুর রুবূবীয়াতের অর্থ সৃষ্টি, মালিকানা এবং পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদুল উলুহীয়াত ঃ

এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম তাওহীদুল উলুহীয়াহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে ইবাদাতের জন্য গ্রহণ না করা। তাওহীদুল উলুহীয়াতের ভিতরেই ছিল আরবের মুশরিকদের গোমরাহী। তাদের সাথে জিহাদ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের জান-মাল, ঘরবাড়ী ও জমি জায়গা হরণ করা হালাল মনে করেছিলেন। তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। এই প্রকার তাওহীদ দিয়েই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। যদিও তাওহীদুর রুবূবীয়াত এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতও নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নবীগণ তাদের স্বজাতীয় লোকদেরকে তাওহীদুর উলুহীয়ার প্রতি আহবান জানাতেন। মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদাতের কোন অংশই পেশ না করে, সদাসর্বদা রাসূলগণ তাদের উম্মাতদেরকে এই আদেশই দিতেন। চাই সে হোক নৈকট্যশীল ফেরেশতা, আল্লাহর প্রেরিত নবী, আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ অলী বা অন্য কোন মাখলুক। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার তাওহীদের ত্রুটি করবে, সে কাফির মুশরিক। যদিও সে তাওহীদুর রুবূবীয়াহ এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতের স্বীকৃত প্রদান করে থাকে। সুতরাং কোন মানুষ যদি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক, কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতে যদি অন্য কাউকে শরীক করে, তবে তার এই স্বীকৃত ও বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না। যদি ধরে নেয়া হয় যে, একজন মানুষ তাওহীদুর রুবূবীয়াতে এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতে পূর্ণ বিশ্বাস করে, কিন্তু সে কবরের কাছে যায় এবং কবরবাসীর ইবাদাত করে কিংবা তার জন্য কুরবানী পেশ করে, তাহলে সে কাফির এবং মুশরিক। মৃত্যুর পর সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)

www.pathagar.com

কুরআনের প্রতিটি পাঠকই এ কথা অবগত আছে যে, নবী ﷺ যে সমস্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদের জান-মাল হালাল মনে করেছেন এবং তাদের নারী-শিশুকে বন্দী করেছেন ও তাদের দেশকে গণীমত হিসেবে দখল করেছেন, তারা সবাই এ কথা স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তারা এতে কোন সন্দেহ পোষণ করত না। কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অন্যেরও উপাসনা করত, তাই তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং তাদের জান-মাল হরণ করা হালালে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত ঃ

তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতের অর্থ হল, আল্লাহ্ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ্‌কে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেয়া। আল্লাহ্ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন– কোন পরিবর্তন, বাত্বিল, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোনরূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আসল অর্থ আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে তার উপর ঈমান আনতে হবে। কোন প্রকার ধরণ বর্ণনা করা বা দৃষ্টান্ত পেশ করা ব্যতীরেকেই। এই প্রকারের তাওহীদের আহলে কিবলা তথা মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র সিফাতকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এর কারণে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর এক শ্রেণীর লোক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। আর এক শ্রেণীর লোক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কাছাকাছি। কিন্তু সালাফে সালেহীনের[১] মানহাজ[২] হল, আল্লাহ্ নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছেন এবং নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, সে গুণের উপর ঈমান আনয়ন করা।

---

[১] - এই কিতাবের যেখানেই "সালাফে সালিহীন" বা শুধুমাত্র "সালাফ" কথাটি উল্লেখিত হবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণ।

[২] - মানহাজ বলতে আকীদাহ ও আমলের ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের গৃহীত নির্ভেজাল নীতিকে বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহর কতিপয় নামের দৃষ্টান্ত ঃ

১) (الحي القيوم) আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম হচ্ছে, "আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম" এই নামের উপর ঈমান রাখা আমাদের উপর ওয়াজিব। এই নামটি আল্লাহর একটি বিশেষ গুণকে শামিল করে। তা হচ্ছে, আল্লাহর পরিপূর্ণ হায়াত। যা কোন সময় অবর্তমান ছিল না এবং কোন দিন শেষও হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী। তিনি সব সময় আছেন এবং সমস্ত মাখলুকাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোন ধ্বংস বা ক্ষয় নেই।

২) আল্লাহ নিজেকে اَلسَّمِيْعُ (আস্ সামী'উ) নামে অভিহিত করেছেন। তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। শ্রবণ করা আল্লাহর একটি গুণ। তিনি মাখলুকাতের সকল আওয়াজ শ্রবণ করেন। তা যতই গোপন ও অস্পষ্ট হোক না কেন।

আল্লাহর কতিপয় সিফাতের দৃষ্টান্ত ঃ

আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

অর্থ ঃ ইয়াহূদীরা বলে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উন্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।

(সূরা মায়িদা ঃ ৬৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। সুতরাং আল্লাহর দু'টি হাত আছে। এর উপর ঈমান আনতে হবে। কিন্তু আমাদের উচিত আমরা যেন অন্তর দিয়ে আল্লাহর হাত সম্পর্কে কোন কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন উহার ধরণ বর্ণনা না করি এবং মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থ ঃ কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা শূরা ঃ ১১)

আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসঙ্গত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) হারাম করেছেন। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৩)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

অর্থ ঃ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ের অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে"। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর হাত দু'টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে আল্লাহর বাণী "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়" এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং আল্লাহর বাণী

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না। (সূরা নাহলঃ ৭৪)

এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর নির্দিষ্ট কোন কাইফিয়ত[১] বর্ণনা করল, সে আল্লাহর ব্যাপারে বিনা 'ইল্মে কথা বলল এবং এমন বিষয়ের অনুসরণ করল, যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই।

আল্লাহর সিফাতের[২] আরেকটি উদাহরণ পেশ করব। তা হল আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া। কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে তিনি আরশের উপরে বিরাজমান। প্রত্যেক স্থানেই (استوى على العرش) ইসতাওয়া আলাল আরশি" বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি আরবী ভাষায় ইসতিওয়া শব্দটি অনুসন্ধান করতে যাই তবে দেখতে পাই

---

[১] - আল্লাহর গুণাবলীর বিশেষ কোন ধরন, গঠন বা পদ্ধতি বর্ণনা করাকে"তাকয়ীফ" বা "কাইফিয়াত" বলা হয়। যেমন কেউ বলল আল্লাহর হাত এ রকম এ রকম। এভাবে আল্লাহর সিফাতসমূহের কাইফিয়াত বর্ণনা করা হারাম।

[২] - আল্লাহর গুণাবলী এবং আল্লাহর কর্মসমূহকে আল্লাহর সিফাত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যে,(استوى) শব্দটি সব সময় (على) অব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবহার হয়ে থাকে। আর (استوى) শব্দটি এ ভাবে ব্যবহার হলে সমুন্নত হওয়া এবং উপরে হওয়া ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হয় না। সুতরাং الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى এবং এর মত অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতের উপরে সমুন্নত হওয়া ছাড়াও আরশের উপরে বিশেষ একভাবে সমুন্নত। প্রকৃতভাবেই আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত। আল্লাহর জন্য যেমনভাবে সুমন্নত হওয়া প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই আরশের উপরে সমুন্নত। আল্লাহর আরশের উপরে হওয়া এবং মানুষের খাট-পালঙ্কে ও নৌকায় আরোহণের সাথে কোন সামঞ্জস্যতা নেই। এমনিভাবে মানুষের যানবাহনের উপরে চড়া এবং আল্লাহর আরশের উপরে হওয়ার মাঝে কোন সামঞ্জস্যতা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের আরোহনের জন্য সৃষ্টি করেন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা তার উপর আরোহণ করতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো। (সূরা যুখরুফ ঃ ১২-১৪)

সুতরাং মানুষের কোন জিনিসের উপরে উঠা কোন ক্রমেই আল্লাহর আরশের উপরে হওয়ার সদৃশ হতে পারে না। কেননা আল্লাহর মত আর কেউ নেই।

যে ব্যক্তি বলে যে, আরশের উপরে আল্লাহর কোন কিছু হওয়ার অর্থ আরশের অধিকারী হয়ে যাওয়া, সে প্রকাশ্য ভুলের মাঝে রয়েছে। কেননা এটা আল্লাহর কালামকে আপন স্থান থেকে পরিবর্তন করার শামিল এবং সাহাবী এবং তাবেয়ীদের ইজমার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের কথা এমন কিছু বাত্বিল বিষয়কে আবশ্যক করে, যা কোন মু'মিনের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া সঙ্গত নয়। কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

অর্থ ঃ আমি এ কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা যুখরুফ ঃ ৩)

আরবী ভাষায় ইসতাওয়া শব্দের অর্থ সমুন্নত হওয়া এবং স্থির হওয়া। আর এটাই হল ইসতিওয়া শব্দের আসল অর্থ। সুতরাং আল্লাহর বড়ত্বের শানে আরশের উপর যেভাবে বিরাজমান হওয়া প্রযোজ্য, সেভাবেই তিনি বিরাজমান। যদি ইসতিওয়ার (সমুন্নত হওয়ার) অর্থ ইসতিওলা (অধিকারী) হওয়ার মাধ্যমে করা হয়, তবে তা হবে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার শামিল। আর যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে কুরআনের ভাষা যে অর্থের উপর প্রমাণ বহণ করে, তা অস্বীকার করল এবং অন্য একটি বাত্বিল অর্থ সাব্যস্ত করল।

তাছাড়া "ইসতিওয়া" এর যে অর্থ আমরা বর্ণনা করলাম, তার উপর সালাফে সালিহীন ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন। কারণ, উক্ত অর্থের বিপরীতে অর্থ তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। কুরআন এবং সুন্নায় যদি এমন কোন শব্দ আসে এবং সালাফে সালিহীন থেকে সে শব্দের প্রকাশ্য অর্থ বিরোধী কোন তাফসীর বর্ণিত না পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হল উক্ত শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থের উপর অবশিষ্ট রাখতে হবে এবং তার মর্মার্থের উপর ঈমান রাখতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সালাফে সালিহীন থেকে কি এমন কোন কথা বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, "ইসতাওয়া" অর্থ "আলা" (আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন)? উত্তরে আমরা বলব হ্যাঁ, অবশ্যই তা বর্ণিত হয়েছে। যদি এ কথা ধরে নেয়া হয় যে, তাঁদের থেকে এর প্রকাশ্য তাফসীর বর্ণিত হয়নি, তবেও এ সমস্ত ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের মানহাজ হল, কুরআন এবং সুন্নাহর শব্দ যে অর্থ নির্দেশ করবে, আরবী ভাষার দাবী অনুযায়ী শব্দের সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

ইসতিওয়ার অর্থ ইসতিওলা দ্বারা করা হলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয়ঃ

১) ইসতিওলা অর্থ কোন বস্তুর মালিকানা হাসিল করা। তাই ইসতিওয়ার অর্থ ইসতিওলার মাধ্যমে করা হলে অর্থ দাঁড়ায় আকাশ-যমীন সৃষ্টির আগে আল্লাহ আরশের মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন সেই আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপরে সমুন্নত হলেন। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪)

২) "আর্-রাহমানু আ'লাল আরশি স্তাওয়া" অর্থ যদি ইসতাওলার মাধ্যমে করা শুদ্ধ হয় তাহলে এ কথাও বলা শুদ্ধ হবে যে, (الله استوى على الأرض) অর্থাৎ আল্লাহ জমিনের অধিকারী হয়ে গেলেন। এমনিভাবে অন্যান্য মাখলুকাতের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কথা প্রযোজ্য। এ ধরনের অর্থ আল্লাহর শানে শোভনীয় নয়।[১]

৩) এটি আল্লাহর কালামকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয়ার শামিল।

৪) এ ধরনের অর্থ করা সালাফে সালেহীনের ইজমার পরিপন্থী।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতের ক্ষেত্রে সার কথা এই যে, আল্লাহ নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কোন পরিবর্তন, বাতি্বল বা ধরণ কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই তার প্রকৃত অর্থের উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

মক্কার কাফিরদের শির্ক কোন ধরনের ছিল?

প্রশ্ন ঃ (২) যাদের কাছে নবী ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের শির্ক কি ধরনের ছিল?

উত্তর ঃ যাদের নিকট নবী ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা তাওহীদুর রুবূবীয়াতে আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করত না। কুরআনে কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, তারা কেবলমাত্র তাওহীদুর উলুহীয়াতে আল্লাহর সাথে শির্ক করত। রুবূবীয়াতের ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহই একমাত্র রব বা পালনকর্তা। তিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া প্রদানকারী এবং বিপদাপদ দূরকারী।

কিন্তু তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করত। এ ধরনের শির্ক মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কেননা তাওহীদুরর অর্থ

---

[১] - আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর তিনি একমাত্র মালিক। সূচনা থেকেই সকল বস্তুর উপর তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর মালিকানা বহাল থাকবে। আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ পূর্বে অমুক বস্তুর মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হয়ে গেলেন। এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা হলে, আল্লাহ যে মহান ক্ষমতাবান তাতে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

www.pathagar.com

হল আল্লাহকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একক করা। আল্লাহর জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট হক রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব। এই হকগুলো তিন প্রকারঃ

১) মালিকানার অধিকার
২) ইবাদাতের অধিকার
৩) নাম ও গুণাবলীর অধিকার

এই জন্যই উলামাগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তাওহীদুর রুবূবীয়াহ, তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত এবং তাওহীদুল উলুহীয়াহ। মুশরিকরা শেষ প্রকারের তাওহীদুর আল্লাহর সাথে শরীক করত, আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। (সূরা নিসাঃ ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা মায়িদাঃ ৭২)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। তবে এর চেয়ে নিম্ম পর্যায়ের গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা নিসাঃ ৪৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থ ঃ এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদাত করতে অহংকার করবে, তারা অচিরেই অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফেরঃ ৬০)

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাফিরূনে বলেন,

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ وَلاَ أَنَـا
عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾

অর্থ ঃ বল হে কাফিররা! আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর, এবং তোমরাও তার এবাদতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি এবং আমি এবাদতকারী নই তার, যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ।

(সূরা কাফিরূন ১০৯ ঃ ১-৫)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি কি?

প্রশ্ন ঃ (৩) আকীদাহ্ ও অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতিগুলো কি কি?

উত্তর ঃ আকীদাহ ও দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়িয়ে ধরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলুন যে, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

(সূরা আল-ইমরানঃ ৩১)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করল সে স্বয়ং আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে, আমি তাদের জন্য আপনাকে সংরক্ষণকারী হিসেবে প্রেরণ করিনি। (সূরা নিসাঃ ৮০)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

অর্থ ঃ এবং আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। (সূরা হাশর ঃ ৭)

www.pathagar.com

যদিও আয়াতটি গনীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তবে শরীয়তের অন্যান্য মাসায়েলের ক্ষেত্রেও উত্তমভাবে প্রযোজ্য হবে। নবী ﷺ জুমু'আর নামাজের খুৎবায় বলতেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضلالة فى النار

অর্থ ঃ অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ-এর নির্দেশনা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে দ্বীনের ভিতরে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা। প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী। আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।[১] রাসূল ﷺ বলেছেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعدي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থ ঃ তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং উহাকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়িয়ে ধরবে। আর তোমরা নতুন আবিস্কৃত বিষয় হতে সাবধান থাকবে। কারণ, প্রতিটি নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।[২] এ সম্পর্কে আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ হল আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পথকে আঁকড়িয়ে ধরা। তারা সদাসর্বদা দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করেন, এর ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করেন না।

আল্লাহ বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দ্বীনকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (আঃ) কে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং

---

[১] - মুসলিম।
[২] - আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ।

www.pathagar.com

যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)কে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে বিভেদ করো না। (সূরা শুরাঃ ১৩)

তাদের মাঝে কখনো মতবিরোধ পাওয়া গেলে তা কেবলমাত্র এমন ক্ষেত্রে, যাতে ইজতেহাদ[১] করা বৈধ আছে। এই ধরনের মতবিরোধ অন্তরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। ইজতেহাদী বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাদের মাঝে একতা এবং একে অপরের প্রতি ভালবাসা দেখতে পাবেন। যদিও ইজতেহাদের কারণে তাদের মাঝে কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ (৪) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কারা?

উত্তর ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তারাই, যারা আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ কারণেই তাদেরকে আহলে সুন্নাত রূপে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তাঁরা সুন্নাহর ধারক ও বাহক। তাদেরকে আহলে জামাআহ্ ও বলা হয়। কারণ, তাঁরা সুন্নাহর উপর জামাআতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ। আপনি যদি বিদ'আতীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, তারা আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাদের এ অবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা যে পরিমাণ বিদ'আত তৈরী করে সেই পরিমাণ সুন্নাত থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

জান্নাতী দলের পরিচয় ঃ

প্রশ্ন ঃ (৫) নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর উম্মাত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। সম্মানিত শায়খের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর ঃ নবী ﷺ সহীহ হাদীসের[২] মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইয়াহূদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে, নাসারারা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে। আর এই উম্মাতে মুহাম্মাদী বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। একটি দল ব্যতীত সমস্ত দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি হল সেই দল, যারা নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই দলটি দুনিয়াতে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি

[১] - কুরআন ও সুন্নায় দ্বীনের কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ না পাওয়া গেলে মুসলিম উম্মার বিজ্ঞ আলিমগণ কুরআন সুন্নাহকে সামনে রেখে গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তাকে ইজতেহাদ বলে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা বৈধ আছে। আর যে আলিম ইজতেহাদ করার যোগ্য, তাঁকে মুজতাহিদ বলা হয়।

[২] - আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান।

www.pathagar.com

পাবে। এটিই হল সাহায্যপ্রাপ্ত দল, যা কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর বিজয়ী থাকবে।

কোন কোন আলিম এই জাহান্নামী ৭২ ফির্কার পরিচয় নির্ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথমতঃ বিদ'আতীদেরকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক ভাগ থেকে শাখা-প্রশাখা বের করে নবী ﷺ কর্তৃক ঘোষিত ৭২টি ফির্কা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিছু কিছু আলিম ফির্কাগুলো নির্ধারণ না করাই উত্তম মনে করেছেন। কারণ, এই ফির্কা ৭২ এ নির্ধারিত থাকার পরও আরো অসংখ্য মানুষ গোমরা হয়েছে। তারা আরো বলেন এই সংখ্যা শেষ হবে না। শেষ যামানায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এর সর্বশেষ সংখ্যা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং উত্তম হল রাসূল ﷺ যা সংক্ষেপ (অস্পষ্ট) রেখেছেন, তা সংক্ষেপ রাখা। আমরা এভাবে বলব যে, এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২ দল জাহান্নামে যাবে এবং মাত্র একদল জান্নাতে যাবে। অতঃপর বলব, যে দলই রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহর বিরোধিতা করবে, সে এই ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন ঃ (৬) নাজাতপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য কি? কোন ব্যক্তির মাঝে উক্ত বৈশিষ্টসমূহের কোন একটি অবর্তমান থাকলে সে ব্যক্তি কি নাজাতপ্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ ফির্কা নাজীয়ার প্রধান বৈশিষ্ট হল আকীদাহ, ইবাদত, চরিত্র ও আচার ব্যবহারে নবী ﷺ-এর সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা।

আপনি দেখতে পাবেন যে, আকীদার ক্ষেত্রে তাঁরা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসারী। উলুহিয়াত, রুবূবীয়াত এবং আসমা ওয়াস্ সিফাতের[১] ক্ষেত্রে তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নকারী। ইবাদাতের প্রকার, পদ্ধতি, পরিমাণ, সময়, স্থান এবং ইবাদাতের কারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করাই তাদের বৈশিষ্ট। আপনি তাদের নিকট দ্বীনের ব্যাপারে কোন বিদ'আত খোঁজে পাবেন না। তাঁরা আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর সাথে আদব রক্ষা করে

---

১ - সকল প্রকার ইবাদাত একভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করাকে তাওহীদুল উলুহিয়াহ বলা হয়। আল্লাহর সৃষ্টিতে আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদুর রুবূবীয়াহ। আর কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর যেসমস্ত নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস করাকে তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত বলা হয়।

www.pathagar.com

চলেন। আল্লাহ্ অনুমতি দেননি, ইবাদাতের ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তারা আল্লাহ এবং রাসূলের অগ্রণী হয়না।

আখলাক-চরিত্রের ক্ষেত্রেও আপনি তাদেরকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী দেখতে পাবেন। মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা, অপরের জন্য উদার মনের পরিচয় দেয়া, মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা, উত্তম কথা বলা, বদান্যতা, বীরত্ব এবং অন্যান্য মহান গুণাবলী তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট।

পার্থিব বিষয়াদিতে আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা সততার সাথে সকল প্রকার লেন-দেন সম্পন্ন করে থাকেন। কাউকে ধোঁকা দেন না। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তারা দ্রব্যের আসল অবস্থা বর্ণনা করে দেন এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল ﷺ বলেছেন,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

অর্থ ঃ পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার রয়েছে। যদি তারা উভয়েই সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, আল্লাহ তাদের বেচা-কেনায় বরকত দান করেন। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ভিতর থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়[১]।

উপরে যে সমস্ত গুণাবলীর আলোচনা করা হল, কোন ব্যক্তির মাঝে উক্ত গুণাবলীর কোন বৈশিষ্ট অবর্তমান থাকলে এ কথা বলা যাবে না যে, সে নাজাত প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই আপন আপন আমল অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করবে। তবে তাওহীদুরর ক্ষেত্রে ত্রুটি করলে নাজাত প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ'আতের বিষয়টিও অনুরূপ। কিছু কিছু বিদ'আত এমন আছে, যা মানুষকে নাজী ফির্কা থেকে বের করে দেয়। তবে চরিত্র ও লেন-দেনের ভিতরে কেউ ত্রুটি করলে সে নাজাত প্রাপ্ত দল থেকে বের হবে না। বরং মর্যাদা কমিয়ে দিবে।

আখলাকের বিষয়টি একটু দীর্ঘ করে বর্ণনা করা দরকার। চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরস্পরে একতাবদ্ধ থাকা এবং আল্লাহ তা'আলা যে হকের উপর ঐক্য বদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছেন, তার উপর অটুট থাকা।

---

[১] - বুখারী ও মুসলিম। অধ্যায় ঃ কিতাবুল বুয়ূউ (ক্রয়-বিক্রয়)।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দ্বীনকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (আঃ)কে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)-কে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। (সূরা শুরাঃ ১৩)

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে, মুহাম্মাদ ﷺ তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে আপনি কোন ব্যাপারেই তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। (সূরা আনআ'মঃ ১৫৯)

সুতরাং ঐক্য বদ্ধ থাকা নাজী ফির্কার (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। তাদের মাঝে কোন ইজতেহাদী বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তাদের এই মতবিরোধ পরস্পরের মাঝে হিংসা-বিদ্ধেষ এবং শত্রুতার সৃষ্টি করে না। বরং তারা বিশ্বাস করে যে, তারা পরস্পরে ভাই। যদিও তাদের মাঝে এই মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি তাদের একজন এমন ইমামের পিছনেও সলাত আদায় করে থাকে, তার দৃষ্টিতে সেই ইমাম ওযূ বিহীন। আর ইমাম বিশ্বাস করে যে, সে ওযূ অবস্থায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোকেরা উটের গোশত খেয়ে ওযূ করে নাই এমন ইমামের পিছনেও সলাত আদায় করে থাকে। ইমাম মনে করে যে, উটের গোশত খেলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। আর মুক্তাদী মনে করে যে, ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। তা সত্বেও সে মনে করে উক্ত ইমামের পিছনে সলাত আদায় করা জায়েয আছে। এমনটি তারা এ জন্যই করে যে, ইজতেহাদের কারণে যে সমস্ত মতভেদ সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃতপক্ষে মতভেদ নয়। কেননা প্রত্যেকেই আপন আপন দলীলের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করেন তাদের কোন দ্বীনি ভাই দলীলের অনুসরণ করতে গিয়ে যদি কোন আমলে তাদের বিরোধিতা করেন প্রকৃত পক্ষে তারা বিরোধিতা করে নাই। বরং তাদের অনুরূপই করেছে। কারণ, তারাও দলীলের অনুসরণ করার প্রতি আহবান জানায়। যেখানেই তা পাওয়া

www.pathagar.com

যাক না কেন। অধিকাংশ আলিমের কাছে এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, রাসূল ﷺ-এর যুগে সাহাবাদের ভিতরে এ রকম অনেক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তিনি কাউকে ধমক দেন নি বা কারও উপর কঠোরতা আরোপ করেন নি। রাসূল ﷺ যখন খন্দকের যুদ্ধ হতে ফেরত আসলেন, তখন জিবরীল (আঃ) এসে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বানু কুরায়যার দিকে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন, তোমাদের কেউ যেন বানু কুরায়যায় না গিয়ে আসরের সলাত না পড়ে[১]। সাহাবীগণ এ কথা শুনে মদীনা হতে বের হয়ে বানু কুরায়যার দিকে রওনা দিলেন। পথি মধ্যে আসরের সলাতের সময় হয়ে গেল। তাদের কেউ সলাত না পড়েই বানু করায়যায় পৌঁছে গেলেন। এদিকে সলাতের সময় শেষ হয়ে গেল। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন, আসরের সলাত অবশ্যই বানী কুরায়যায় গিয়ে পড়তে হবে। তাদের কেউ সলাত ঠিক সময়েই পড়ে নিল। তাদের কথা হল রাসূল ﷺ আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বের হতে বলেছেন। তাঁর কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা সলাত আপন ওয়াক্তে না পড়ে পিছিয়ে নিব। এরাই সঠিক ছিল। তদুপুরি রাসূল ﷺ দুই দলের কাউকে ধমক দেননি। এই হাদীসটি বুঝতে গিয়ে যে মতভেদের সূচনা হয়েছিল, তার কারণে তাদের মধ্যে শত্রুতা বা দলাদলির সৃষ্টি হয়নি। এজন্য আমি মনে করি সুন্নী মুসলিমদের ঐক্য বদ্ধ হওয়া উচিত। তাদের মাঝে যেন কোন প্রকার দলাদলি না পাওয়া যায়। যাতে তারা পরস্পরে কাঁদা ছুড়াছুড়ি করবে, একে অপরকে শত্রু মনে করবে এবং ইজতেহাদী মাসআলায় মতভেদ হওয়ার কারণে একজন অপর জনকে ঘৃণা করবে। আমি মনে করি দলীলের ভিত্তিতে ইজতেহাদী কোন মাসআলায় মতভেদ হওয়া সত্বেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের ঐকবদ্ধ হওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কারণ, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শত্রুরা চায় যে, মুসলমানেরা পরস্পরে বিভক্ত হোক। সুতরাং আমাদের উচিত নাজী ফির্কার বৈশিষ্টে বৈশিষ্টমন্ডিত হয়ে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা।

প্রশ্ন ঃ (৭) দ্বীনের ভিতরে মধ্যম পন্থা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ দ্বীনের ভিতরে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের অর্থ এই যে, মানুষ দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়াবে না। যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এমনিভাবে দ্বীনের কোন অংশ কমাবে না। যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত দ্বীনের কিছু অংশ বিলুপ্ত করে দেয়।

[১] - বুখারী, মুসলিম।

নবী ﷺ-এর জীবনীর অনুসরণ করাও দ্বীনের মধ্যে মাধ্যম পন্থা অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জীবনাদর্শকে অতিক্রম করা দ্বীনের ভিতরে অতিরঞ্জনের শামিল। তাঁর জীবন চরিতের অনুসরণ না করা তাঁর শানে ত্রুটি করার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন লোক বলল আমি আজীবন রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদের সলাত পড়ব। রাত্রিতে কখনই নিদ্রা যাব না। কারণ, সলাত সর্ব শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। তাই আমি সলাতের মাধ্যমে বাকী জীবনের রাত্রিগুলো জাগরণ করতে চাই। আমরা তার উত্তরে বলব যে, এই ব্যক্তি দ্বীনের মাঝে অতিরঞ্জিতকারী। সে হকের উপর নয়। নবী ﷺ-এর যুগে এ রকম হয়েছিল। তিন জন লোক একত্রিত হয়ে একজন বলল, আমি সারা রাত্রি সলাত আদায় করব। আর একজন বলল আমি সিয়াম রাখব এবং কখনো তা ছাড়বনা। তৃতীয় জন বলল আমি স্ত্রী সহবাস করব না। নবী ﷺ-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন একদল লোকের কি হল তারা এ রকম কথা বলে থাকে। অথচ আমি সওম পালন করি এবং কখনো সওম পালন থেকে বিরত থাকি। রাত্রে ঘুমাই এবং আল্লাহর ইবাদাত করি। স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। এটি আমার সুন্নাত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহর বিরোধিতা করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে রাসূল ﷺ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা করলেন। কেননা তারা সওম পালন করা, সওম পালন না করা, রাত্রি জাগরণ করা, ঘুমানো এবং স্ত্রী সহবাস করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল।

দ্বীনের ক্ষেত্রে ত্রুটিকারী যে ব্যক্তি বলবে আমার নফল ইবাদাতের দরকার নেই। আসলে সেই ব্যক্তি ফরজের ভিতরেও ত্রুটি করে থাকে।

সঠিক পথের অনুসারী হল সেই ব্যক্তি যে রাসূল ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহর উপর চলবে।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত হল, মনে করুন তিন জন ভাল লোকের পাশে রয়েছে একজন ফাসেক ব্যক্তি। তিনজনের একজন বলল, আমি এই ফাসিককে সালাম দিব না। তার থেকে দূরে থাকব এবং তার সাথে কথা বলব না। অপর জন বলল, আমি এর সাথে চলব, তাকে সালাম দিব, হাসি মুখে তার সাথে কথা বলব, তাকে দাওয়াত দিব এবং তার দাওয়াতে আমিও শরীক হব। আমার নিকট সে অন্যান্য সৎ লোকের মতই। তৃতীয়জন বলল, আমি এই ফাসিক ব্যক্তিকে তার পাপাচারিতার কারণে ঘৃণা করি। তার ভিতরে ঈমান থাকার কারণে আমি তাকে ভালবাসি। তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করব না। তবে তাকে সংশোধনের কারণে বর্জন করা হলে তা ভিন্ন কথা। তাকে বর্জন করলে যদি তার পাপাচারিতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে আমি তাকে বর্জন করব

www.pathagar.com

না। এই তিনজনের প্রথম ব্যক্তি বেশী বাড়াবাড়ি করল। দ্বিতীয়জন ত্রুটি করল এবং তৃতীয়জন সঠিক পথের অনুসরণ করল।

অন্যান্য সকল ইবাদাত ও মানুষের মুআমালাতের[১] ক্ষেত্রেও অনুরূপ। মানুষ এতে ত্রুটি, বাড়াবাড়ি, এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

আরো একটি উদাহরণ ভাল করে শ্রবণ করুন। মনে করুন একজন লোক তার স্ত্রীর কথায় চলে। তার স্ত্রী তাকে যেখানে পাঠায় সেখানে যায়। সে তার স্ত্রীকে অন্যায় কাজ হতে বাধাঁ প্রদান করে না এবং ভাল কাজের উপরে উৎসাহ দেয়না। সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী তার উপর কতৃত্ব করছে এবং তার মালিক হয়ে বসেছে।

আরেক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই গুরুত্ব দেয়না। তার স্ত্রীর সাথে অহংকার করে চলে। যেন তার স্ত্রী তার কাছে কাজের মহিলার চেয়ে অবহেলিত। অন্য ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এবং আল্লাহ ও রাসূল ﷺ প্রদত্ত সীমা অনুযায়ী স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ্ বলেন

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

অর্থ ঃ তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের উপর হক রয়েছে যেমন তাদের উপর তোমাদের হক রয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ২২৮)

কোন পরুষ তার স্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তার স্ত্রীর কোন একটি চরিত্রকে অপছন্দ করলে হয়ত অন্য একটি গুণ দেখে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে[২]। শেষ ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী, প্রথম ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় শিথিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ত্রুটিকারী। হে পাঠক! আপনি সকল ইবাদাত ও মুআমালাতকে উক্ত উদাহরণগুলোর উপরে কিয়াস (অনুমান) করুন।

প্রশ্ন ঃ (৮) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ঈমান অর্থ কি? ঈমান কি বাড়ে এবং কমে?

উত্তর ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ঈমানের অর্থ হল অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল- এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম।

---

[১] - মানুষ পরস্পরে যে লেন-দেন, বেচা-কেনা, চুক্তি, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করে থাকে, তাকে ইসলামের পরিভাষায় মুআমালাত বলা হয়। এসবের সাথে ইবাদাতের কোন সম্পর্ক নেই। তবে এগুলো যদি ইসলামী নীতিমালার ভিতরে হয় এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, তবে তাও ইবাদাতে পরিণত হয়।

[২] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুর রাদা।

www.pathagar.com

যেহেতু উক্ত বিষয়সমূহের সমষ্টির নাম ঈমান সে হিসেবে, তা বাড়বে এবং কমবে এটিই স্বাভাবিক। অন্তরের বিশ্বাসেরও তারতম্য হয়ে থাকে। অতএব সংবাদ শুনে কোন কিছু বিশ্বাস করা আর আপন চোখে দেখে বিশ্বাস করা এক নয়। এজন্যই ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখান আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, বিশ্বাস তো অবশ্যই করি, কিন্তু আমার অন্তর যাতে পরিতৃপ্ত হয় এজন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই। (সূরা বাকারাঃ ২৬০)

কাজেই অন্তরের বিশ্বাস এবং প্রশান্তির দিক থেকে ঈমান বৃদ্ধি পায়। মানুষ তার অন্তরে ইহা সহজেই অনুভব করে থাকে। সে যখন ইসলামী অনুষ্ঠান বা ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনে, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এমন কি সে যেন জান্নাত- জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। সে যখন মজলিস থেকে উঠে যায়, তখন গাফলতি চলে আসে এবং এই বিশ্বাস কমতে থাকে।

এমনিভাবে মুখের আমল (যিক্র)-এর কারণেও ঈমান বৃদ্ধি পায়। কেননা যে ব্যক্তি দশবার আল্লাহর যিক্র করল, সে একশতবার যিক্রকারীর সমান নয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির আমল প্রথম ব্যক্তির আমলের চেয়ে অনেক বেশী। তাই তার ঈমান বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ইবাদাত সম্পন্ন করবে আর যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণভাবে তা সম্পন্ন করবে উভয়ে সমান নয়।

এমনিভাবে আমলের মাধ্যমেও ঈমান বাড়ে। কাজেই যে ব্যক্তি বেশী আমল করে তার ঈমান কম আমলকারীর চেয়ে বেশী। ঈমানের বেশী-কম হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ঠ দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি, যাতে কিতাবধারীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয় এবং মু'মিন দের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (সূরা মুদ্দাছিরঃ ৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

অর্থ ঃ আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করল? তবে যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের অন্তরে কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মৃত্যু করল। (সূরা তাওবাঃ ১২৪-২৫)

সহীহ্ হাদীসে নবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

অর্থ ঃ দ্বীন ও জ্ঞানে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানী পুরুষদের জ্ঞানকে তোমাদের চেয়ে অধিক হরণকারী আর কাউকে দেখিনি।[১] সুতরাং ঈমান বাড়ে এবং কমে। এখন প্রথমতঃ প্রশ্ন হল ঈমান বাড়ার কারণ কি? ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার অনেক কারণ রয়েছেঃ

প্রথম কারণঃ আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণাবলীসহ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাবে, নিঃসন্দেহে তার ঈমানও তত বৃদ্ধি পাবে। এ জন্যই যে সমস্ত আলিমগণ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা এ সম্পর্কে জ্ঞানহীন আলিমদের চেয়ে ঈমানের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী।

দ্বিতীয় কারণঃ সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে গবেষণা করা এবং আল্লাহ মানব জাতিকে যে জীবন বিধান দিয়েছেন, তার ভিতরে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিরাজি নিয়ে যতই চিন্তা করবে, ততই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল হাঈজ।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন,

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

অর্থ ঃ বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (সূরা যারিয়াতঃ ২০)

আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করলে যে ঈমান বৃদ্ধি পায়, এই মর্মে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

তৃতীয় কারণঃ বেশী বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করা। সৎ আমল যতই বৃদ্ধি পাবে, ঈমান ততই বৃদ্ধি পাবে। এই সৎ আমল মুখের কথার মাধ্যমে হোক, কিংবা কাজের মাধ্যমে হোক যেমন যিক্‌র-আযকার, সলাত, সওম এবং হাজ্জ। এসব কিছুই ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম।

ঈমান কমে যাওয়ার কারণসমূহঃ

প্রথম কারণঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ঈমান কমিয়ে দেয়। কারণ, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই কমবে, ঈমানও তত কমতে থাকবে।

দ্বিতীয় কারণঃ সৃষ্টিতে ও শরীয়তে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহর সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা না করা ঈমানের ঘাটতি হওয়ার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় কারণঃ গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া। কেননা গুনাহের কাজ করলে অন্তরে এবং ঈমানের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে।

এই জন্যই নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থ ঃ ব্যভিচারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।[১]

চতুর্থ কারণঃ সৎ আমল না করা ঈমান হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। কিন্তু যদি বিনা কারণে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে ঈমান কমার সাথে সাথে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু কোন গ্রহণযোগ্য কারণে ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিলে অথবা ওয়াজিব নয় এমন কাজ ছেড়ে দিলে ঈমানের ঘাটতি হবে, কিন্তু শাস্তির সম্মুখীন হবে না। এই জন্যই রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে জ্ঞান ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ বলেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের যখন মাসিকের রক্ত বের হয়, তখন তারা সলাত-রোযা থেকে বিরত

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল হুদূদ, মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান।

www.pathagar.com

থাকে। অথচ মাসিক অবস্থায় সলাত-রোযা থেকে বিরত থাকার কারণে তাদেরকে দোষারূপ করা হয় না। বরং তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পুরুষদের তুলনায় তাদের আমল কম হয়ে গেল, সে হিসেবে তারা পুরুষেরে চেয়ে কম ঈমানের অধিকারী।

হাদীসে জিবরীল এবং আবদুল কায়েসের হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ঃ

প্রশ্ন ঃ (৯) হাদীসে জিবরীল এ ঈমানের ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ বলেছেন, ঈমান হল আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং তাঁর রাসূলসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা, পরকালের উপর বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখার নাম।[১] অথচ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীসে নবী ﷺ ঈমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঈমান হল আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, সলাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা। উপরের উভয় হাদীসের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় করব?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর ভিতরে কোন পারস্পরিক দ্বন্দ নেই। কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের বিরোধী নয়। এমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর ক্ষেত্রেও একই কথা। কুরআন এবং সুন্নাহয় পরস্পর বিরোধী কোন জিনিসও নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

অর্থ ঃ তারা কি কুরআন গবেষণা করেনা? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে হত, তাহলে তারা তাতে অনেক মতভেদ দেখতে পেত। (সূরা নিসাঃ ৮২)

কুরআনের ভিতরে যেহেতু মত বিরোধ নাই, রাসূলের ﷺ হাদীসের ক্ষেত্রেও তাই। এক হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী নয়। রাসূল ﷺ যদি এক স্থানে ঈমানকে একভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং অন্য স্থানে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন, যা আপনার দৃষ্টিতে প্রথম ব্যাখ্যার বিরোধী মনে হয়, কিন্তু আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি কোন দ্বন্দ পাবেন না। হাদীসে জিবরীল (আঃ) নবী ﷺ দ্বীনকে ইসলাম, ঈমান, ইহসান এই তিনভাগে ভাগ করেছেন।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান।

www.pathagar.com

আর আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীসে শুধুমাত্র দ্বীনের একটি মাত্র প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে শুধুমাত্র ইসলামের কথা উল্লেখ হবে, সেখানে ঈমানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কারণ, মু'মিন হওয়া ব্যতীত ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। যেখানে শুধুমাত্র ইসলামের আলোচনা হবে, সেখানে ঈমানও অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার যেখানে শুধুমাত্র ঈমানের আলোচনা হবে, সেখানে ইসলামও অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং যেখানে ঈমান ও ইসলাম একই সাথে উল্লেখ হবে, সেখানে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হবে অন্তরের বিষয়সমূহ। আর ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বাহ্যিক আমলসমূহ। ইলম অর্জনকারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। শুধুমাত্র ইসলামের আলোচনা আসলে ঈমানও তার ভিতরে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

অর্থ ঃ ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ।

(সূরা আল-ইমরানঃ ১৯)

আর এটা জানা বিষয় যে, ইসলাম ধর্ম আক্বীদাহ, ঈমান ও বাহ্যিক আমলের সমষ্টি। এককভাবে ঈমানের উল্লেখ হলে ইসলামকে তার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দু'টি একসাথে উল্লেখ হলে ঈমানের অর্থ হবে অন্তরে বিশ্বাস করার বিষয়সমূহ আর ইসলামের অর্থ হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আমলসমূহ। এই জন্যই পূর্ববর্তী যুগের কোন কোন আলিম বলেছেন, ইসলাম প্রকাশ্য বিষয় এবং ঈমান গোপনীয় বিষয়। কারণ, তা অন্তরের ভিতরকার বিষয়। আপনি কখনো দেখতে পাবেন যে, মুনাফিক ব্যক্তি সলাত আদায় করেছে, সওম পালন করছে এবং সাদকা করছে। এই ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে মুসলমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনয়ন করেছি অথচ তারা মু'মিন নয়।

(সূরা বাকারাঃ ৮)

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে

প্রশ্ন ঃ (১০) রাসূল ﷺ হাদীসে জিবরাঈলে বলেছেন, ঈমান হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস, রাসূলদের উপর বিশ্বাস, পরকালের উপর বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন। অন্য হাদীসে রয়েছে, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। উভয় হাদীসের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় করব?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ যে ঈমানের মাধ্যমে আকীদা[১] উদ্দেশ্য, তার রুকন মোট ছয়টি। সেগুলো হাদীসে জিবরাঈলে উল্লেখিত হয়েছে। জিবরীল (আঃ) যখন নবী ﷺকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে নবী ﷺ বললেন, ঈমান হল তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলদের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি। অপর পক্ষে যেখানে ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা থাকার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ঈমানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সৎ আমল উদ্দেশ্য। এই জন্য সলাতকে ঈমানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু। (সূরা বাকারাঃ ১৪৩)

তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এখানে ঈমান দ্বারা বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে আদায় করা সলাত উদ্দেশ্য। কেননা সাহাবীগণ কা'বার দিকে মুখ করে সলাত আদায়ের পূর্বে বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে সলাত আদায় করতেন।

প্রশ্ন ঃ (১১) হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মাসজিদে আসার অভ্যাস আছে এমন ব্যক্তিকে কি আমরা মু'মিন হিসেবে সাক্ষ্য দিতে পারি?

উত্তর ঃ কোন সন্দেহ নাই যে, কোন ব্যক্তি যদি সলাতের জন্য মাসজিদে আসে তার মাসজিদে আসাটাই তার ঈমানের পরিচয় বহন করে। কারণ, তা না হলে কিসে তাকে ঘর থেকে বের করে মাসজিদে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য করল?

প্রশ্নকারী যে হাদীসটির দিকে ঈঙ্গিত করেছেন, তা হল নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ

অর্থ ঃ তোমরা যদি কোন ব্যক্তিকে মাসজিদে আসতে অভ্যস্থ দেখ, তবে তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য প্রদান কর।[২] কিন্তু এই হাদীসটি দুর্বল। রাসূল ﷺ হতে এই হাদীসটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

---

[১] - ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আকীদা বলা হয়। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে বিশ্বাস নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস ও অন্যান্য বিষয়সমূহ।

[২] - তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, সলাতের মর্যাদা অনুচ্ছেদ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সম্পর্কে শয়তানের ওয়াস্ ওয়াসা (কুমন্ত্রণা)

প্রশ্ন ঃ (১২) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে শয়তান একজন মানুষকে এমন ওয়াস্ ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) প্রদান করে যে, সে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে। এ সম্পর্কে আপনার উপদেশ কি?

উত্তর ঃ প্রশ্নকারী যে সমস্যার কথা ব্যক্ত করলেন, এবং যার পরিণতিকে ভয় করছেন, আমি তাকে বলব যে, হে ভক্ত! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। উক্ত সমস্যার ভাল ফলাফল ব্যতীত মন্দ কোন ফল হবে না। কেননা এই ওয়াস্ওয়াসা গুলোসহ শয়তান মু'মিন দের মাঝে প্রবেশ করায়, যাতে সে মানুষের ঈমানকে দূর্বল করে দিতে পারে এবং তাদেরকে মানষিক অস্থিরতায় ফেলতে পারে এবং ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। শুধু তাই নয় অনেক সময় মু'মিন দের সাধারণ জীবনকে বিপন্ন করে তুলে।

প্রশ্নকারী ব্যক্তির সমস্যাই মু'মিন দের প্রথম সমস্যা নয় এবং শেষ সমস্যাও নয়। বরং দুনিয়াতে একজন মু'মিন অবশিষ্ট থাকলেও এই সমস্যা বর্তমান থাকবে। সাহাবীগণও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

অর্থ ঃ সাহাবাদের একদল লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে আগমন করে জিজ্ঞাসা করল যে, আমরা আমাদের অন্তরে কখনো কখনো এমন বিষয় অনুভব করি যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয়। রাসূল ﷺ বললেন যে, সত্যিই কি তোমরা এ রকম পেয়ে থাক? তাঁরা বললেন হ্যাঁ, আমরা এ রকম অনুভব করে থাকি। রাসূল ﷺ বললেন, এটি তোমাদের ঈমানের প্রকাশ্য প্রমাণ।[১] রাসূল আরো বলেন,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

অর্থ ঃ তোমাদের একজনের কাছে শয়তান আগমন করে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলে কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারও অবস্থা এ রকম হলে সে যেন

---

[১] - মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরের ওয়াস্ ওয়াসা

www.pathagar.com

শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এ রকম চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত থাকে।[১] ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

অর্থ ঃ নবী ﷺ-এর কাছে একজন লোক আগমন করে বলল, আমার মনে কখনো এমন কথার উদয় হয়, যা উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পূড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশী ভাল মনে হয়। রাসূল ﷺ বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই বিষয়টিকে নিছক একটি মনের ওয়াস্ ওয়াসা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।[২]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) তাঁর কিতাবুল ঈমানে বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি শয়তানের ওয়াস্ওয়াসায় আবার কখনো কুফরীর ওয়াস্ওয়াসায় পতিত হয়। এতে তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺআমাদের কেউ কেউ তার অন্তরে এমন বিষয় অনুভব করে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আকাশ থেকে জমিনে পড়ে যাওয়াকে অধিক শ্রেয় মনে করে। এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, এটা ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত। অন্য বর্ণনায় নবী ﷺ বলেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি শয়তানের কুমন্ত্রণাকে নিছক একটি মনের ওয়াস্ওয়াসা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মু'মিন ব্যক্তি এই ধরনের ওয়াস্ওয়াসাকে অপছন্দ করা সত্বেও তার মনে এর উদয় হওয়া এবং তা প্রতিহত করতে প্রাণপন চেষ্টা করা তার ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন কোন মুজাহিদের সামনে শত্রু এসে উপস্থিত হল। মুজাহিদ শত্রুকে প্রতিহত করল এবং পরাজিত করল। এটি একটি বিরাট জিহাদ।[৩] এই জন্যই ইলম অর্জনকারী ও ইবাদাতে লিপ্ত ব্যক্তিগণ বেশী বেশী ওয়াস্ওয়াসা এবং সন্দেহে পতিত হয়ে থাকে। অথচ অন্যদের এ রকম হয়না। কেননা তারা আল্লাহর পথ অনুসরণ করে না। তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে গাফেল হয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত রয়েছে। শয়তানের উদ্দেশ্যও তাই। অপর পক্ষে যারা ইলম অর্জন এবং ইবাদাতের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের পথে চলে, শয়তান তাদের শত্রু। সে তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে চায়।

---

[১] -বুখারী, কিতাবু বাদইল খালক্, অনুচ্ছেদ ঃ ইবলিস ও তার সৈন্যদের আলোচনা

[২] - আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াস্ ওয়াসা প্রতিরোধ

[৩] - অনুরূপভাবে শয়তানের ওয়াস্ ওয়াসাকে প্রতিহত করাও একটি বড় জিহাদ।

www.pathagar.com

প্রশ্নকারীকে আমি বলব যে, যখন আপনি বুঝতে পারবেন, এটা শয়তানের কুমন্ত্রনা, তখন আপনি তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হোন। আর জেনে রাখুন যে, আপনি যদি তার সাথে সদা-সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, তার পিছনে না ছুটেন, তাহলে সে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ

অর্থ ঃ আমলে পরিণত করা অথবা এটা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মনের ওয়াস্‌ওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১] আপনাকে যদি বলা হয় শয়তান মনের ভিতরে ওয়াস্‌ওয়াসা দেয় তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? সেটাকে আপনি কি সত্য মনে করেন? আপনার মনে আল্লাহ্ সম্পর্কে যে ধরনের ওয়াস্‌ওয়াসার উদয় হয়, আপনার ধারণা কি তাই? উত্তরে আপনি অবশ্যই বলবেন, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা সম্পূর্ণ অনুচিত। হে আল্লাহ! আপনি পূত-পবিত্র। এটি একটি বিরাট অপবাদ। আপনি অন্তর দিয়ে মনের ওয়াস্‌ওয়াসাকে ঘৃণা করবেন এবং জবানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করবেন। আর আপনি এটা থেকে দূরে থাকবেন। সুতরাং এগুলো শুধুমাত্র মনের কল্পনা এবং ওয়াস্‌ওয়াসা, যা আপনার অন্তরে প্রবেশ করে থাকে। এটি একটি শয়তানের ফাঁদ। মানুষকে শির্কে লিপ্ত করার জন্যই সে এ ধরনের ফাঁদ পেতে রেখেছে। মানুষকে গোমরাহ করার জন্য শয়তান তাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে থাকে।

সামান্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় না। আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জনবসতিপূর্ণ বড় বড় শহরের কথা শ্রবণ করে থাকেন। এ সমস্ত শহরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় না। অথবা এ ধরনের সন্দেহ হয় না যে, শহরটি বসবাসের উপযোগী নয় অথবা শহরে কোন জন-মানুষ নেই। এ ক্ষেত্রে সন্দেহ না হওয়ার কারণ হল শয়তানের এতে কোন লাভ নেই। কিন্তু মানুষের ঈমানকে বরবাদ করে দেয়ার ভিতরে শয়তানের বিরাট স্বার্থ রয়েছে। জ্ঞানের আলো এবং হেদায়েতের নূরকে মানুষের অন্তর থেকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য ও তাকে সন্দেহ এবং পেরেশানীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করার জন্য শয়তান তার অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নবী ﷺ শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে বাঁচার উপযুক্ত ঔষধও আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। তা হল, এসব ধারণা থেকে বিরত থাকা এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

---

[১] - বুখারী, কিতাবুল ইত্‌ক, অনুচ্ছেদ ঃ তালাক এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে ভুল-ক্রটি প্রসঙ্গে। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ মনের কুমন্ত্রণা---------

www.pathagar.com

করা। মু'মিন ব্যক্তি যদি ওয়াস্ওয়াসা থেকে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় ইবাদাতে লিপ্ত হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় অন্তর থেকে তা চলে যাবে। সুতরাং আপনার অন্তরে এ জাতীয় যা কিছু উদয় হয়, তা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকুন। আপনি তো আল্লাহর ইবাদাত করেন, তাঁর কাছে দু'আ করেন এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করেন। আপনার অন্তরে যে সমস্ত কুধারণার উদয় হয়, তার বর্ণনা যদি অন্যের কাছ থেকে শুনেন, তাহলে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলতে ইচ্ছা করবেন। তাই যে সমস্ত ওয়াস্ওয়াসা মনের মধ্যে জাগে, তার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। বরং তা ভিত্তিহীন মনের কল্পনা মাত্র। এমনিভাবে পরিষ্কার-পরচ্ছন্ন পবিত্র কাপড় পরিধানকারী কোন ব্যক্তির মনে যদি এমন ওয়াস্ওয়াসার জাগ্রত হয় যে, হয়তো বা কাপড়টি নাপাক হয়ে গেছে, হয়তো বা এ কাপড় পরিধান করে সলাত আদায় করলে সলাত বিশুদ্ধ হবে না, এমতাবস্থায় সে উক্ত ওয়াস্ওয়াসার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। উপরোক্ত আলোচনার পর আমার সংক্ষিপ্ত নসীহত এই যে,

১। ওয়াস্ওয়াসার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নবী ﷺ-এর আদেশ মোতাবেক ওয়াস্ওয়াসা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

২। বেশী করে আল্লাহর যিক্র করবে।

৩। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে ইবাদাতে লিপ্ত থাকবে। যখনই বান্দা পরিপূর্ণরূপে ইবাদাতে মশগুল থাকবে, ইনশাআল্লাহ এ ধরনের কুচিন্তা দূর হয়ে যাবে।

৪। এ রোগ থেকে আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দু'আ করবে।

প্রশ্ন ঃ (১৩) কাফিরের উপর কি ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ প্রত্যেক কাফিরের উপরই ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব। চাই সে কাফির ইয়াহূদী হোক বা খৃষ্টান হোক।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন ঃ

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী! আমি আকাশ-জমিনের রাজত্বের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সবার নিকট প্রেরিত রাসূল। তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁর প্রেরিত নিরক্ষর নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।

(সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮)

সুতরাং রাসূল ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করা সমস্ত মানুষের উপর ওয়াজিব। তবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বিশেষ অনুগ্রহ করে অমুসলিমদেরকে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে মুসলিম দেশে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন।

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

অর্থ ঃ তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ এবং রোজ হাশরের উপর ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া (নিরাপত্তার কর) প্রদান করে। (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

সহীহ মুসলিমে বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ যখন কোন যুদ্ধে কাউকে আমীর নির্বাচন করতেন, তখন তাকে আল্লাহর ভয় এবং তার সাথীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, তাদের সামনে তিনটি বিষয় পেশ করবে, তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।[১] এ সমস্ত বিষয়সমূহের মধ্যে জিযিয়া গ্রহণ অন্যতম। অনেক আলিম ইয়াহূদী-খৃস্টান ছাড়াও অন্যান্য কাফির- মুশরিকদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ বৈধ বলেছেন।

মোট কথা অমুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইসলামী শরীয়তের কাছে নতি স্বীকার করে কর দিয়ে ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাস করবে।

---

[১] - সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ আমীর নির্বাচন

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১৪) যে ব্যক্তি ‘ইল্‌মে গায়েব দাবী করবে, তার বিধান কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ‘ইল্‌মে গায়েব দাবী করবে সে কাফির। কেননা সে আল্লাহ তা‘আলাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ﴾

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলে দিন, আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের সংবাদ জানে না এবং তারা জানে না যে, কখন পুনরুত্থিত হবে। (সূরা নামল ঃ ৬৫)

যেহেতু আল্লাহ তাঁর নবীকে এই মর্মে ঘোষণা করার আদেশ দিয়েছেন আকাশ-জমিনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না, এরপরও যে ব্যক্তি গায়েবের খবর জানার দাবী করবে, সে আল্লাহকে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল। যারা ‘ইল্‌মে গায়েবের দাবী করে তাদেরকে আমরা বলব, তোমরা কিভাবে এটা দাবী কর অথচ রাসূল ﷺ তা জানতেন না। তোমরা বেশী মর্যাদাবান না রাসূল ﷺ? যদি তারা বলে, আমরা রাসূল ﷺ হতে বেশী মর্যাদাবান তাহলে তারা এ কথার কারণে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বলে রাসূল ﷺ বেশী মর্যাদাবান, তাহলে আমরা বলব কেন তিনি গায়েবের সংবাদ জানেন না? অথচ তোমরা তা জান বলে দাবী করছ? আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ أَحَدًا إِلاَّ مَنْ ارْتَضٰى مِنْ رَسُوْلٍ فَإِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا﴾

অর্থ ঃ তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন। (সূরা জিন ঃ ২৬-২৭)

‘ইল্‌মে গায়েবের দাবীদারদের কাফির হওয়ার এটি দ্বিতীয় দলীল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে মানুষের জন্য ঘোষণা করতে বলেন যে,

﴿قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحٰى إِلَيَّ﴾

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার আছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য জগতের বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, আমার নিকট প্রেরণ করা হয়। (সূরা আন‘আম ঃ ৫০)

www.pathagar.com

মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহই ভাল জানেন

প্রশ্ন ঃ (১৫) বর্তমান কালের ডাক্তারগণ মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান আছে না কন্যা সন্তান বলে দিতে পারে। আর কুরআনে আছে, وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ অর্থ ঃ মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহই জানেন। ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন লোক নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, আমার স্ত্রী কি সন্তান প্রসব করবে? তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কাতাদা থেকেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। আল্লাহর বাণী, مَا فِي الْأَرْحَامِ "গর্ভে যা আছে", এ কথাটি ব্যাপক। এ ব্যাপকতা ভঙ্গকারী বিশেষ কোন দলীল আছে কি? অর্থাৎ কোন অবস্থাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যরাও মাতৃগর্ভের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখতে পারে?

উত্তর ঃ উপরের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমি বলতে চাই যে, কুরআনের কোন আয়াত কখনই বাস্তব সত্য কোন ঘটনার বিরোধী হতে পারে না। যদিও কখনো কোন ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে এ রকম কিছু দেখা যায়, তবে হয়তো এটা হবে নিছক অবাস্তব দাবী অথবা কুরআনের আয়াতটি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। কেননা কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত এবং প্রকৃত বাস্তব ঘটনা উভয়টিই অকাট্য। দু'টি অকাট্য বিষয়ের মধ্যে কখনো বিরোধ হতে পারে না।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি সত্য হয়ে থাকলে বলব যে, অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে তারা এখন জানতে পেরেছে যে, মাতৃগর্ভে কি আছে। বর্তমানে ডাক্তারগণ ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান হওয়া সম্পর্কে যে আগাম খবর প্রদান করে, তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলেও আয়াতের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই। আয়াতে একটি গায়েবী বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে। যা আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। শিশু মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় গায়েবী বিষয়গুলো হল সে কত দিন মায়ের পেটে থাকবে, কত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, কি রকম আমল করবে, সে কতটুকু রিযিক গ্রহণ করবে, সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে। গঠন প্রণালী পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ছেলে না মেয়ে হবে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর গঠন পূর্ণ হওয়ার পরে মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া 'ইল্‌মে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা গঠন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞানের মতই হয়ে গেল। তবে শিশুটি তিনটি অন্ধকারের ভিতরে লুকায়িত অবস্থায় রয়েছে। যদি অন্ধকারের আবরণগুলো অপসারণ করা হয়, তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমন শক্তিশালী যন্ত্র রয়েছে, যা এ তিনটি অন্ধকার ভেদ করতে সক্ষম। যাতে করে শিশুটি ছেলে না মেয়ে, তা জানা যায়। আর আয়াতে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান

www.pathagar.com

বা মেয়ে সন্তান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে- এ কথা বলা হয়নি। হাদীসেও এই মর্মে কোন সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত নেই।

আয়াতের শানে নুযূলের ক্ষেত্রে মুজাহিদ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা মুনকাতে।[১] কারণ তিনি তাবিয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

কাতাদার তাফসীরের অর্থ এই যে, গঠন হওয়ার পূর্বে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ ব্যতীত অন্যরাও জানতে পারে। ইবনে কাসীর সূরা লুকমানের আয়াতের তাফসীরে বলেন, মাতৃগর্ভে যা আছে তা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কি সৃষ্টি করতে চান, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কিন্তু যখন ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কিংবা সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার আদেশ দিয়ে দেন, তখন ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবেরাও জানে।

আল্লাহর বাণী, ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾

অর্থ ঃ মাতৃগর্ভে যা আছে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ থেকে মানুষ কোন কিছু জানতে পারে কিনা, জানলে তা কিসের মাধ্যমে? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব যে, আয়াতের মাধ্যমে যদি গঠন প্রণালী পূর্ণ হওয়ার পর ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমরা বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তা নির্ণয় করতে সক্ষম। আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝি যে, মাতৃগর্ভের ছোট-বড় যাবতীয় অবস্থা আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে অবগত আছেন। মানুষ শুধুমাত্র গঠন পূর্ণ হওয়ার পর ছেলে না মেয়ে এই একটি মাত্র অবস্থা জানতে পারে। আরো অসংখ্য অবস্থা এখনও রহস্যময় রয়ে গেছে। উসূলবিদগণ[২] উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপকার্থক বিষয়গুলো থেকে কোন জিনিসকে আলাদা করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর কোন দলীল কিংবা ইজমা[৩] বা কিয়াস[৪] বা বাস্তব উপলব্ধি অথবা বিশুদ্ধ বিবেকের[৫] দরকার। এ ব্যাপারে আলিমদের আলোচনা অত্যন্ত পরিষ্কার।

---

[১] - মুনকাতে সেই হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ হতে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়। হাদীসের সনদ হতে বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কারণে হাদীস দুর্বল হয়ে যায়।

[২] - কুরআন-সন্নাহর থেকে গবেষণা করে যারা দ্বীনের মাসায়েল বের করার মূলনীতি নির্ধারণ করেন তাদেরকে উসূলবিদ (উসূলী) বলা হয়।

[৩] - কুরআন-সুন্নাহ্‌র কোন বিধানের উপর মুসলিম উম্মার সকল আলিমদের একমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়।

[৪] - দ্বীনের কোন মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট দলীল না থাকলে সেখানে কিয়াসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

[৫] - বিশুদ্ধ বিবেক ও বাস্তব সত্য কখনও কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিরোধী হতে পারে না।

www.pathagar.com

আর আয়াতের মাধমে যদি সন্তান সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ডাক্তারদের কথা এবং কুরআনের আয়াতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। ডাক্তাররা সন্তান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বলতে পারে না যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে।

আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, পৃথিবীতে কুরআন-সুন্নাহ এর সুস্পষ্ট দলীল বিরোধী কোন বাস্তব ঘটনা পাওয়া যায়নি। ইসলামের শত্রুরা কিছু কিছু বাস্তব বিষয়ে বাহ্যিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ভেবে তাতে আঘাত করেছে। আল্লাহর কিতাব বুঝতে অক্ষম হওয়ার কারণে অথবা তাদের উদ্দেশ্য অসৎ হওয়ার কারণেই তারা এমনটি করে থাকে। কিন্তু মুসলিম উম্মার আলিমগণ তাদের এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। **উপরের মাসআলাটিতে মানুষেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে ঃ**

প্রথম শ্রেণীর লোকেরা কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য অর্থটিকে গ্রহণ করেছে এবং এর বিপরীতে প্রতিটি বাস্তব সত্য বিষয়কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। অথচ আয়াতটি উক্ত অর্থে সুস্পষ্ট নয়। এতে করে সে নিজের অক্ষমতার কারণে নিজের উপর কিংবা কুরআনের উপর দোষ টেনে এনেছে।

অন্য একটি দল কুরআনের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে পার্থিব বিষয়কেই গ্রহণ করার কারণে নাস্তিকে পরিণত হয়েছে।

অন্য দিকে মধ্যমপন্থী দলের লোকেরা কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে এবং বাস্তব সত্য বিষয়াবলীকেই সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তারা জানে যে, উভয়টিই সত্য। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো চাক্ষুষ বস্তুগুলোর বিরোধী হতে পারে না। তারা দলীল এবং বিবেক সম্মত বিষয়, উভয়টির উপরই আমল করে। এর মাধ্যমে তাদের দ্বীন এবং বিবেক উভয়টিই নিরাপদ থাকল। ঈমানদারগণ যখন সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের দ্বীনী ভাইদেরকে তাওফীক দান করুন এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী ও উম্মাতের জন্য সংশোধনকারী নেতা হিসেবে নির্ধারণ করুন। আমি আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই, তারই উপর ভরসা করি এবং তারই দিকে ফিরে যাব।

প্রশ্ন ঃ (১৬) সূর্য কি পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে?

উত্তর ঃ মান্যবর শায়খ উত্তরে বলেন যে, শরীয়তের প্রকাশ্য দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। এ ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে

দিবা-রাত্রির আগমন ঘটে। আমাদের হাতে এ দলীলগুলোর চেয়ে বেশী শক্তিশালী এমন কোন দলীল নেই, যার মাধ্যমে আমরা সূর্য ঘুরার দলীলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করে।

২) আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾

অর্থ ঃ অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল তখন বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত। (সূরা আন'আম ঃ ৭৮)

এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এ কথা বলা হয়নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘুরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

৩) আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَتَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾

অর্থ ঃ তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১৭)

পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। যদি পৃথিবী নড়াচড়া করত, তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।

www.pathagar.com

৪) আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

অর্থ ঃ এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৩)

ইবনে আব্বাস বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।

৫) আল্লাহ বলেন, ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾

অর্থ ঃ তিনি রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের মাধ্যমে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪)

উক্ত আয়াতে রাতকে দিনের অনুসন্ধানকারী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানকারী পিছনে পিছনে দ্রুত অনুসন্ধান করে থাকে। এটা জানা কথা যে, দিবা-রাত্রি সূর্যের অনুসারী।

৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾

অর্থ ঃ তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার ঃ ৫)

আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর উপরে দিবা-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরতো তাহলে তিনি বলতেন, দিবা-রাত্রির উপর পৃথিবীকে ঘুরান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান"। এ সমস্ত দলীলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চলমান বস্তুকে বশীভূত করা এবং কাজে লাগানো একস্থানে অবস্থানকারী বস্তুকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৭) আল্লাহ বলেন, ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾

অর্থ ঃ শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে। (সূরা আশ্-শামস্ ঃ ১-২)

www.pathagar.com

এখানে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র সূর্যের পরে আসে। এর ভিতরে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য এবং চন্দ্র চলাচল করে এবং পৃথিবীর উপর ঘুরে। পৃথিবী যদি চন্দ্র বা সূর্যের চারদিকে ঘুরত, তাহলে চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করত না। বরং চন্দ্র একবার সূর্যকে, আর একবার সূর্য চন্দ্রকে অনুসরণ করত। কেননা সূর্য চন্দ্রের অনেক উপরে। এ আয়াত দিয়ে পৃথিবী স্থির থাকার উপরে দলীল গ্রহণ করার ভিতরে চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে।

৮) মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

অর্থ ঃ সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮-৪০)

সূর্যের চলা এবং এ চলাকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এ চলাচলের কারণেই দিবা-রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মনযিল নির্ধারণ করার অর্থ এই যে, সে তার মনযিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মনযিল নির্ধারণ করা হত। চন্দ্রের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

৯) নবী ﷺ সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় আবূ যারকে বলেছেন,

أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا

অর্থ ঃ হে আবূ যার! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবূ যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং

পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।[১] এটি হবে কিয়ামাতের পূর্ব মুহূর্তে। আল্লাহ সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এ ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

১০) অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এ কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট পৃথিবী হতে নয়।

হয়তো এ ব্যাপারে আরো দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আমার এ মুহূর্তে মনে আসছে না। তবে আমি যা উল্লেখ করলাম, এ বিষয়টির দ্বার উন্মুক্ত করবে এবং আমি যা উদ্দেশ্য করেছি, তা পূরণে যথেষ্ট হবে। আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি!

প্রশ্ন ঃ (১৭) সম্মানিত শাইখ! আল্লাহকে এক বলে সাক্ষ্য দেয়া এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল– এ কথার ঘোষণা দেয়া ইসলামে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ। এই সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এজন্যই রাসূল ﷺ মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে পাঠানোর সময় আদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি সর্বপ্রথম এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

প্রথম বাক্যটি অর্থাৎ "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনি উপাস্য নেই। সেই সাথে মুখে এ কালেমাটির উচ্চারণ করবে।

যার দাসত্ব ও উপাসনা করা হয় তার নাম ইলাহ। (لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ) "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" এ বাক্যটির দু'টি অংশ। একটি না বাচক অংশ, অপরটি হ্যাঁ বাচক অংশ। "লা- ইলাহ" কথাটি না বাচক এবং "ইল্লাল্লাহ" কথাটি হ্যাঁ বাচক। প্রথমে সমস্ত বাতিল মা'বূদের জন্য কৃত সকল প্রকার ইবাদাতকে অস্বীকার করে দ্বিতীয় বাক্যে তা একমাত্র হক্ক মা'বূদ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

---

[১] - বুখারী- অধ্যায় ঃ বাদউল খাল্ক্ব, মুসলিম- অধ্যায় ঃ ঈমান

www.pathagar.com

"লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি কিভাবে বললেন আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই? অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাস্তবে আল্লাহ ব্যতীত অসংখ্য মা'বূদের উপাসনা করা হচ্ছে। আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করা হচ্ছে আল্লাহও তাদেরকে মা'বূদ হিসেবে নাম রেখেছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتِى يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা'বূদকে ডাকত, আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়বে, তখন কেউ কোন কাজে আসবে না।

(সূরা হূদ ঃ ১০১)

আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ স্থির করবেন না।

(সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৩৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বূদ ডেকো না। (সূরা কাসাস ঃ ৮৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদকে আমরা কখনই আহবান করব না। (সূরা কাহ্ফ ঃ ১৪)

উল্লেখ এখন আমরা কিভাবে বলতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য উলুহিয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর আমরাই বা কিভাবে গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত করতে পারি ? অথচ রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছেন,

﴿اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

অর্থ ঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নাই। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৯)

উপরোক্ত সমস্যার উত্তর এই যে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্যটির মধ্যে ইলাহা কথাটির পরে হাক্কুন শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে বাক্যটি এ রকম হবে, (لا اله حق الا الله) (লা- ইলা-হা হাক্কুন ইল্লাল্লাহ) হাক্কুন শব্দটি উহ্য মানলেই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তাই আমরা বলব আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তারাও মা'বূদ কিন্তু এগুলো বাত্বিল মা'বূদ। ইবাদাত বা দাসত্ব পাওয়ার তাদের কোন অধিকার নেই।

www.pathagar.com

এ কথার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

অর্থ ঃ এটাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের উপাসনা করে তারা সবাই মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ মহান। (সূরা লুকমান ঃ ৩০)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى, وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى, أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى, تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى, إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾

অর্থ ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও 'উয্যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসঙ্গত বন্টন। এগুলো কতগুলো নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তোমরা নিজেরা রেখেছ এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি।

(সূরা নাজ্‌ম ঃ ১৯-২৩)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা নামকরণ করে নিয়েছো। আল্লাহ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। (সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

সুতরাং 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি ব্যতীত অন্যান্য মা'বূদগুলো সত্য মা'বূদ নয়। বরং তা বাত্বিল উপাস্য।

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ এই যে, অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সমস্ত জ্বীন ও মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি বলে দিন যে, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও জমিনের রাজত তাঁর। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর উপর, তার প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর উপর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পার।

(সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

অর্থ ঃ পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন।

(সূরা ফুরকান ঃ ১)

মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হল ঃ

(১) তিনি যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা,

(২) তাঁর আদেশ মান্য করা,

(৩) তিনি যে বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা,

(৪) তাঁর নির্দেশিত শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা,

(৫) তাঁর শরীয়তের নতুন কোন বিদ'আত সৃষ্টি না করা।

এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়ার অন্যতম দাবী হল সৃষ্টি বা পরিচালনায় এবং প্রভূত্বে কিংবা ইবাদাতে রাসূল ﷺ-এর কোন অধিকার নেই। বরং তিনি 'আবদ্ বা আল্লাহর দাস ও বান্দা। মা'বূদ নন। তিনি সত্য রাসূল। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। তিনি নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোন ক্ষমতা রাখেন না। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের একমাত্র মালিক আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। (সূরা আন'আম ঃ ৫০)

www.pathagar.com

সুতরাং তিনি একজন আদেশপ্রাপ্ত বান্দা মাত্র। তাঁর প্রতি যা আদেশ করা হয় তিনি কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করে থাকেন।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

অর্থ ঃ বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি আশ্রয় স্থল পাব না। (সূরা জীন ঃ ২১-২২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কিন্তু আল্লাহ্ যা চান। আর আমি যদি গায়েবের খবর জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কখনো কোন অমঙ্গল হত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৮)

এটাই হল 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ'-এর প্রকৃত অর্থ।

হে পাঠক! এ অর্থের মাধ্যমেই আপনি জানতে পারলেন যে, রাসূল ﷺ বা অন্য কোন মাখলুক ইবাদাতের অধিকারী নয়। ইবাদাতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমার সলাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল মুসলিম। (সূরা আন'আম ঃ ১৬২-১৬৩)

নবী ﷺ-কে আল্লাহ্ তা'আলা যে, সম্মান দান করেছেন, তাতে অধিষ্ঠিত করাই নবী ﷺ-এর জন্য যথেষ্ট। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মর্যাদাবান হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সীমাহীন শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১৮) 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কিভাবে তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে?

উত্তর ঃ "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" এ পবিত্র বাক্যটি তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কখনো প্রকাশ্যভাবে আবার কখনো অপ্রকাশ্যভাবে। "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" বলার সাথে সাথে বাহ্যিকভাবে তাওহীদুর উলুহিয়াতকেই বুঝায়। তবে তা তাওহীদুর রুবুবিয়াতকেও শামীল করে। কেননা যারা আল্লাহর ইবাদাত করে তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতকে স্বীকার করে বলেই তা করে থাকে। এমনিভাবে তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, যার কোন ভাল নাম ও গুণাবলী নেই মানুষ কখনই তার ইবাদাত করতে রাজি হবে না। এজন্যই ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছেন,

﴿يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾

অর্থ ঃ হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদাত কেন কর? (সূরা মারইয়াম ঃ ৪২)

সুতরাং তাওহীদুর উলুহিয়াতের স্বীকৃতি তাওহীদুর রুবুবিয়াত ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশ্ন ঃ (১৯) মানুষ এবং জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আল্লাহর সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম এবং আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মটি বিধৃত হয়েছে আল্লাহর এ বাণী থেকে,

﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

অর্থ ঃ তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাহরীম ঃ ২)

আল্লাহর বাণী, ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা ঃ ২৪)

এছাড়া আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন এবং যার আদেশ প্রদান করেন তাতে তিনি মহা কৌশলী। তিনি যাই সৃষ্টি করেন না কেন, তার পিছনে রয়েছে এক বিরাট উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের জন্য যে শরীয়ত দিয়েছেন, তার ভিতরেও রয়েছে এক বিরাট হিকমত। চাই কোন বস্তু ওয়াজিব করার ভিতরে হোক কিংবা হারাম করার ভিতরে হোক। অথবা বৈধ করার মাঝেই হোক না কেন। এ হিকমত আমরা কখনো জানি আবার কখনো জানি না। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে কখনো কিছু লোকে জানে আবার অনেকে জানেই না। তাই আমরা বলব যে,

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা জীন এবং মানুষকে এক বিরাট উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন। তা হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থ ঃ আমি জ্বীন এবং মানুষকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ ঃ তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে এমনিই সৃষ্টি করেছি? আর তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না? (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১৫)

আল্লাহ আরো বলেন, ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾

অর্থ ঃ মানুষ কি ধারণা করে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? (সূরা কিয়ামাহ ঃ ৩৬)

এছাড়া আরো অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে, জীন-ইনসানের সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হল আল্লাহর ইবাদাত করা। ভালবাসা ও সম্মানের সাথে আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়ার নাম ইবাদাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

অর্থ ঃ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে আল্লাহর ইবাদাত করবে। (সূরা বাইয়িনাহ ঃ ৫)

এই হল মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করতে অহংকার করবে, সে ব্যক্তি এই হিকমত প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে গণ্য হবে। যার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা না করলে কি হবে তাদের কর্মসমূহ প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর কাছে দু'আ কবূল হওয়ার শর্ত

প্রশ্ন ঃ (২০) কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকে। কিন্তু দু'আ কবূল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা

www.pathagar.com

বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব"। তাহলে মানুষ কিভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তা কবূল হবে?

উত্তর ঃ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। দরূদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর। মুসলমান ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে আকীদাহ ও আমলের ক্ষেত্রে সঠিক পথের তাওফীক প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থ ঃ তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন/গাফির ঃ ৬০)

প্রশ্নকারী বলছেন যে, তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকেন। অথচ আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন না। ফলে তার কাছে এ অবস্থা কঠিন বলে মনে হয়। বিশেষ করে আল্লাহ তো ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে, আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন। আল্লাহ কখনই ওয়াদা খেলাফ করেন না। উক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব যে, দু'আ কবূলের জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা সর্ববস্থায় দু'আর উপর বর্তমান থাকতে হবে।

প্রথম শর্ত ঃ একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরায়ে, এ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করা যে, আল্লাহ কবূল করতে সক্ষম। দু'আ করার সময় এ আশা রাখবে যে, আল্লাহ তা কবূল করবেন।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ দু'আ করার সময় এ কথা অনুভব করবে যে, দু'আ কবূলের দিকে সে খুবই মুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয় বরং এ কথাও অনুভব করবে যে, একমাত্র আল্লাহই বিপদগ্রস্ত ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ শ্রবণ করেন এবং তিনিই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যদি এ কথা অনুভব করে যে, সে আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী নয় এবং আল্লাহর কাছে তার কোন প্রয়োজনও নেই, বরং দু'আ করাটা যেন একটা অভ্যাসমাত্র তাহলে এ ধরনের দু'আ কবূল না হওয়ারই উপযোগী।

তৃতীয় শর্ত ঃ হারাম খাওয়া থেকে দূরে থাকবে। কারণ, বান্দা এবং তার দু'আ কবূল হওয়ার মধ্যে হারাম রুযী প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَـــرَ بِـــهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُـــونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের (আঃ) প্রতি যা নির্দেশ দিয়েছে, মু'মিনদের প্রতিও তাই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ واعْمَلُوْا صَالِحاً﴾

অর্থ ঃ হে রাসূলগণ ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার্য গ্রহণ কর। এবং সৎ কর্ম কর। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৫১)

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী থেকে আহার গ্রহণ কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি। (সূরা বাকারা ঃ ১৭২)

অতঃপর রাসূল ﷺ সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলায়িত কেশ ও ধুলা মিশ্রিত পোশাক নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে থাকে, হে প্রতিপালক! হে রব!! অথচ সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় কি করে তার দু'আ কবূল হতে পারে ?[১]

দু'আ কবূলের সকল মাধ্যম অবলম্বন করা সত্ত্বেও নবী ﷺ এ লোকের দু'আ কবূল হওয়াকে অসম্ভব মনে করলেন। দু'আ কবূলের কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১) আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা আকাশে আরশের উপরে। আল্লাহর দিকে হাত উঠানো দু'আ কবূলের অন্যতম কারণ। হাদীসে এসেছে,

﴿إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا﴾

---

[১] - মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুয্ যাকাত

www.pathagar.com

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও সম্মানী। বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত উঠিয়ে দু'আ করে, তখন তিনি হাত দু'টিকে খালি অবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।[১]

২) এ লোকটি আল্লাহর একটি নাম রব্ব (رب) উচ্চারণ করে করে দু'আ করেছে। এ নামের উসীলা গ্রহণ করা দু'আ কবূলের অন্যতম কারণ। কেননা রব্ব অর্থ পালনকর্তা, সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টিকারী ও পরিচালনাকারী। তাঁর হাতেই আকাশ-জমিনের চাবিকাঠি। এজন্যই আপনি কুরআন মাজীদের অধিকাংশ দু'আতেই দেখতে পাবেন, রব্ব বা পালনকর্তা শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾

অর্থ ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামাতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দু'আ এই বলে কবূল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী লোক হোক। তোমরা সকল নারী-পুরুষই সমান।

(সূরা আল-'ইমরান ঃ ১৯৩-১৯৫)

সুতরাং আল্লাহর এ নামের (রব্ব) মাধ্যমে উসীলা দেয়া দু'আ কবূলের অন্যতম কারণ।

---

[১] তিরমিজী- অধ্যায় ঃ কিতাবুদ্ দা'ওয়াত

www.pathagar.com

৩) এ লোকটি মুসাফির ছিল। সফর করাকে অধিকাংশ সময় দু'আ কবূলের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা সফর অবস্থায় মানুষ আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। স্বদেশে অবস্থানকারীর চেয়ে মুসাফির আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মুসাফির এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট ও ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধানকারী হয়। মনে হয় সে নিজের নফসের প্রতি কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। আল্লাহর কাছে দু'আ করা ব্যতীত তার অন্য কোন উপায় নাই। সফরে থেকে এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট হয়ে ও ময়লাযুক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় দু'আ করা দু'আ কবূলের পক্ষে খুবই সহায়ক। হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন বিকাল বেলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং আরাফাতে অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, "প্রতিটি অঞ্চল হতে তারা আমার কাছে এসেছে, ধূলা-মলিন পোশাক নিয়ে এবং এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট অবস্থায়।[১]

যাই হোক দু'আ কবূলের উপরোক্ত কারণগুলো থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ হলো না। কারণ, একটাই তার খাদ্য-পানীয় ছিল হারাম, পোশাক ছিল হারাম এবং হারাম খেয়ে তার দেহ গঠিত হয়েছে। এজন্যই নবী ﷺ বলেছেন, কিভাবে তার দু'আ কবূল করা হবে? দু'আ কবূলের এ শর্তগুলো পাওয়া না গেলে দু'আ কবূলের কোনই সম্ভাবনা নেই। শর্তগুলো বর্তমান থাকার পরও যদি দু'আ কবূল না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কি কারণে দু'আ কবূল হয়নি, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। দু'আকারী এ বিষয়ে জানার কোন সুযোগ নেই। দু'আ কবূলের সকল শর্ত বর্তমান থাকার পরও দু'আ কবূল না হলে হতে পারে আল্লাহ তার উপর থেকে দু'আ কবূলের চেয়ে বড় কোন মুসিবত দূর করবেন। অথবা এও হতে পারে যে, কিয়ামাতের দিনের জন্য তার দু'আকে সঞ্চয় করে রাখবেন এবং সেদিন তাকে অধিক পরিমাণে বিনিময় দান করবেন। কেননা ব্যক্তি দু'আ কবূলের সকল শর্ত বাস্তবায়ন করে আল্লাহর কাছে দু'আ করার পরও দু'আ কবূল করা হয়নি এবং তার উপর থেকে বড় কোন মুসীবতও দূর করা হয়নি। হয়ত বান্দা দু'আ কবূলের সকল শর্ত পূরণ করে দু'আ করেছে। কিন্তু দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়ার জন্য তার দু'আ কবূল করা হয়নি। একটি পুরস্কার দু'আ করার কারণে এবং অন্য একটি পুরস্কার মুসীবত দূর না করার কারণে। সুতরাং তার জন্য দু'আ কবূলের চেয়ে মহান জিনিস তার জন্য সঞ্চয় করে রাখা হবে।

---

[১] মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুল হাজ্জ

www.pathagar.com

মানুষের উপর উচিত হল দু'আর ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়া না করা। কেননা তাড়াহুড়া করা দু'আ কবূল না হওয়ার অন্যতম কারণ। হাদীসে এসেছে,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوْا كَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ يَقُـــوْلُ دَعَوْتُ وَ دَعَوْتُ وَ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

অর্থ ঃ তোমাদের কেউ দু'আয় তাড়াহুড়া না করলে তার দু'আ কবূল হয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তাড়াহুড়া করা হয়ে থাকে? রাসূল ﷺ বললেন, বান্দা বলে থাকে কত দু'আ করলাম, কত দু'আ করলাম, কত দু'আ করলাম, কিন্তু কবূল তো হচ্ছে না।[১] তাই কারও জন্য দু'আতে তাড়াহুড়া এবং দু'আ করতে করতে ক্লান্তিবোধ করে দু'আ করা ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। বরং বেশী বেশী দু'আ করা উচিত। কারণ, দু'আ একটি ইবাদাত। যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে এবং প্রতিদান বৃদ্ধি করবে। কাজেই হে দ্বীনি ভাই! ছোট-বড় এবং কঠিন-সহজ সকল বিষয়ে আপনাকে বেশী বেশী দু'আ করার উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ্ সবাইকে তাওফীক দিন।

ইবাদাতে ইখলাস এবং জান্নাত লাভের কামনা

প্রশ্ন ঃ (২১) ইখলাস অর্থ কি? কোন মানুষ যদি ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করে, তবে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ বান্দা তার আমলে মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য কামনা করবে এবং জান্নাতে পৌছার চেষ্টা করবে।

আর যদি বান্দা তার আমলের অন্য কিছুর নিয়ত করে, তবে তাতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

১) যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের নৈকট্য লাভের নিয়ত করে এবং ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করে, তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ﴾

অর্থ ঃ আমি সমস্ত শরীকদের চেয়ে অংশীদারিত্ব থেকে অধিক প্রয়োজন মুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যাতে সে আমার সাথে অন্য

---

[১] বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবুদ্ দা'ওয়াত

www.pathagar.com

কোন কাউকে শরীক করল, আমি তাকে এবং সে যা শরীক করল, তাকে প্রত্যাখ্যান করব।[১]

২) যদি আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের নিয়ত করে যেমন- নেতৃত্ব লাভ, সম্মান লাভ ইত্যাদি তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ ধরনের আমল তাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হল সেসব লোক যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট। (সূরা হূদ ঃ ১৫-১৬)

প্রথম প্রকার শির্ক এবং এ প্রকার শির্কের মাঝে পার্থক্য এই যে, প্রথম লোকটি আল্লাহর ইবাদাতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করেছে। আর দ্বিতীয় লোকটি আল্লাহর ইবাদাতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করেনি। মানুষের প্রশংসার প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপও নেই।

৩) আমল শুরু করার সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করেছে। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ এমনিতেই চলে আসার সম্ভাবনা থাকে। যেমন পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে ইবাদাতের নিয়তের সাথে সাথে শরীর পরিষ্কারও করার নিয়ত করা, সলাতের মাধ্যমে শরীর চর্চার নিয়ত করা, সওমের মাধ্যমে শরীরের ওজন কমানো ও চর্বি দূর করা এবং হাজ্জের মাধ্যমে পবিত্র স্থান এবং হাজ্জপালনকারীদেরকে দেখার নিয়ত করা। এ রকম করাতে ইবাদাতে সাওয়াব কমে যাবে। আর যদি ইবাদাতের নিয়তটাই প্রবল হয়, তাহলে পরিপূর্ণ প্রতিদান ছুটে যাবে। আর ঐ পরিমাণ মিশ্রিত নিয়ত তার কোন ক্ষতি করবে না- মিথ্যা ও গুনাহ করার দ্বারা যেমন হয়। হাজ্জের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾

---

[১] মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুয যুহ্দ ওয়ার রাক'আয়িক

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)

আর যদি ইবাদাতের নিয়ত ছাড়া অন্য কোন নিয়ত প্রবল থাকে তাহলে দুনিয়াতে যা অর্জন করল সাওয়াব (প্রতিদান) হিসেবে কেবল তাই পাবে পরকালে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এ রকম করার কারণে সে ব্যক্তি পাপী হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা সে আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থের নিয়ত করেছে। এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সাদাকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। সাদাকা থেকে কিছু পেলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হয়। (সূরা তাওবা ঃ ৫৮)

আবূ দাউদে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক যদি দুনিয়ার কোন সম্পদ লাভের আশায় জিহাদে যায় তবে তার ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? নবী ﷺ বললেন, সে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। লোকটি কয়েকবার প্রশ্ন করল। নবী ﷺ প্রতিবারই বললেন, সে ব্যক্তি সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত তার নিয়ত অনুযায়ীই হবে।[1]

আর যদি তার কাছে উভয়টি সমান হয় অর্থাৎ ইবাদাতের নিয়ত কিংবা অন্য কোন নিয়তের কোনটিই প্রবল না হয়, তাহলেও বিশুদ্ধ কথা হলো সে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এবং অন্যের জন্য ইবাদাত করলে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

মোট কথা অন্তরের নিয়তের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বান্দা কখনো সিদ্দিকীনের স্তরে পৌঁছে যায় আবার কখনো নিকৃষ্টতম পর্যায়ে

[1] বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবু বাদ্‌য়িল ওহী, মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুল ইমারাত।

www.pathagar.com

পৌঁছে যায়। এজন্যই কোন কোন সালাফে সালিহীন বলেছেন, ইখলাসের ব্যাপারে আমি যতটুকু নাফসের সাথে জিহাদ করেছি, অন্য কোন ব্যাপারে আমার নাফসের সাথে ততটুকু জিহাদ করিনি।

আমরা আল্লাহর কাছে নিয়ত ও আমলে ইখলাস কামনা করি।

প্রশ্ন ঃ (২২) আশা এবং ভয়ের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত কি?

উত্তর ঃ মানুষ আশাকে ভয়ের উপর প্রাধান্য দিবে? না ভয়কে আশার উপর? এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) বলেছেন, মানুষের নিকট আশা এবং ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়। তিনি আরো বলেন, একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য দিলে বিপথগামী হবে। কেননা আশাকে প্রাধান্য দিলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। আর ভয়কে প্রাধান্য দিলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে।

কোন কোন আলিম বলেন, সৎ আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশাকে প্রাধান্য দিবে এবং পাপ কাজের প্রতি ধাবিত হওয়ার সময় আল্লাহর ভয়কে সামনে রাখবে। কেননা বান্দা আনুগত্যের কাজের দ্বারা আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা আবশ্যক হওয়ার কাজ করে থাকে। তাই আশার দিককে অর্থাৎ আমলটি কবূল হওয়ার আশাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। আর মনের ভিতরে যদি পাপ কাজের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন আল্লাহর ভয়কে প্রাধান্য দেয়া উচিত। যাতে পাপ কাজে লিপ্ত না হয়।

কিছু কিছু আলিম বলেছেন, সুস্থ ব্যক্তির ভয়কে প্রাধান্য দেয়া উচিত। আর অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আশার আলো থাকা দরকার। কেননা সুস্থ ব্যক্তির নিকটে ভয় বেশী থাকলে পাপের কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর রোগী ব্যক্তি আশাকে প্রাধান্য দিবে। কারণ, সে যদি আশাকে প্রাধান্য দেয়, তা হলে আল্লাহর সাথে ভাল ধারণা রাখা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।

এই মাসআলাতে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য কথা হল মানুষের অবস্থাভেদে হুকুম বিভিন্ন হবে। ভয়ের দিককে প্রাধান্য দিতে গেলে যদি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মন থেকে এ ধরনের ভয় দূর করে দিয়ে আশার দিককে স্থান দিবে। আর যদি আশঙ্কা থাকে যে, আশার দিককে প্রাধান্য দিতে গেলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবার ভয় রয়েছে, তাহলে ভয়কেই প্রাধান্য দিবে। মানুষ তার অন্তরের ডাক্তার। যদি তার অন্তর জীবিত থাকে। আর যদি অন্তর মৃত হয়ে থাকে, তাহলে তার কোন চিকিৎসা নেই।

www.pathagar.com

উপায় অবলম্বন আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়

প্রশ্ন ঃ (২৩) উপায় গ্রহণ অবলম্বন করা কি আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী? উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কেউ কেউ উপায় অবলম্বন করেছে। আবার কতক লোক এ বলে উপায় অবলম্বন করা বাদ দিয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ মু'মিনের উপর কর্তব্য হল অন্তরকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রাখা এবং কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূরিকরণে আল্লাহর উপর ভরসা করা। কেননা আকাশ-জমিনের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। তাঁর হাতেই মানুষের সকল বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহর নিকটেই আছে আকাশ ও জমিনের গোপন তথ্য, আর প্রত্যেকটি বিষয় প্রত্যাবর্তন করবে তাঁরই দিকে, অতএব তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা বে-খবর নন। (সূরা হূদ ঃ ১২৩)

মূসা (আঃ) স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

﴿وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

অর্থ ঃ আর মূসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এ যালিম সম্প্রদায়ের ফিতনার বিষয়ে পরিণত করো না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে এ কাফিরদের কবল হতে উদ্ধার করুন।

(সূরা ইউনুস ঃ ৮৪-৮৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

অর্থ ঃ মু'মিনদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভরসা করা।

(সূরা আল-'ইমরান ঃ ১৬০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা তালাক ঃ ৩)

সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হল তার মালিক এবং আকাশ-জমিনের মালিকের উপর ভরসা করবে এবং তাঁর প্রতি ভাল ধারণা রাখবে। সাথে সাথে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করবে এবং আত্মরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা কল্যাণ সংগ্রহের উপকরণ গ্রহণ করা এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার উপায় অবলম্বন করা আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। দেখুন সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসাকারী মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে তিনি সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস পাঠ করার মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য শরীরে ফুঁক দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের আঘাত থেকে শরীর হেফাযত করার জন্য লোহার পোশাক পরিধান করতেন। যখন মুশরিক সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণ করার জন্য তার চারপাশে একত্রিত হল, তখন মদীনাকে সংরক্ষণ করার জন্য তার চতুষ্পার্শ্বে খন্দক খনন করেছেন। যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ যে সমস্ত হাতিয়ার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী দাউদ (আঃ)-এর সম্পর্কে বলেন,

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾

অর্থ ঃ আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

(সূরা আম্বিয়া ঃ ৮০)

আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আঃ)-কে ভালভাবে যুদ্ধের বর্ম তৈরী করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা লম্বা করে তৈরী করতে বলেছেন। কারণ, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যুদ্ধের স্থানের কাছাকাছি অঞ্চলের লোকদের জন্য ক্ষতিকারক গ্যাস শরীরে প্রবেশের ভয় থাকলে তারা যদি উপযুক্ত পোশাক পরিধান করে, তা হলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ সমস্ত উপকরণ শরীরকে হেফাযত করবে। এমনিভাবে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখাতেও কোন অসুবিধা নেই। বিশেষ করে যদি প্রয়োজনের সময় এগুলো না পাওয়ার ভয় থাকে। সর্বোপুরি ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর। আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'আলা এ সমস্ত আসবাব[১] গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন তাই এ সমস্ত আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করা বৈধ। এজন্য নয় যে, এগুলোর ভিতরে কল্যাণ-অকল্যাণ বয়ে আনার ক্ষমতা আছে।

পৃথিবীতে মানুষের চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন এবং আমাদের ও আমাদের মু'মিন ভাইদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান এবং তাঁর উপর ভরসার বলে বলিয়ান করেন এবং এমন সব উপায় উপকরণ গ্রহণ সহজ করেন যা তার কর্তৃক অনুমোদিত ও মনোনীত।

প্রশ্ন ঃ (২৪) ইসলামে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা কয়েক প্রকার হতে পারে ঃ

১) যা মূলগতভাবেই তাওহীদের পরিপন্থী। তা এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন জিনিসের উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করল, বাস্তবে যার কোন প্রভাবই নেই। মুসীবতে পড়ে কবর পূজারীরা এমনটি করে থাকে। এটি বড় শির্ক। যারা এ ধরনের শির্কে লিপ্ত হবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)

২) শরীয়ত সম্মত উপায়-উপকরণের উপর ভরসা করা এবং আল্লাহ তা'আলাই যে এগুলোর সৃষ্টিকারী, তা একেবারে ভুলে যাওয়া। এটাও এক প্রকার শির্ক। তাবে এটা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

(৩) মানুষ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, এ উপকরণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তিনি ইচ্ছা করলে এটি ছিন্ন করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট রাখতে পারেন। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোনভাবেই তাওহীদের পরিপন্থী নয়।

---

[১] জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং বিপদাপদ হতে উদ্ধারের জন্য যে সমস্ত উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার, তাকে সবাব বা আসবাব বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মোট কথা এই যে, শরীয়ত সম্মত উপায়-উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এগুলোর উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করা ঠিক নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করতে হবে। সুতরাং কোন চাকরীজীবি যদি তার বেতনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী আল্লাহর উপর ভরসা করতে ভুলে যায়, তাহলে সে এক প্রকার শির্কে লিপ্ত হবে। আর যে কর্মচারী এই বিশ্বাস রাখে যে, বেতন কেবল একটি মাধ্যম মাত্র তাহলে এটা আল্লাহর উপর ভরসার বিরোধী হবে না। নবী ﷺ-ও আল্লাহর উপর ভরসা করার সাথে সাথে আসবাব গ্রহণ করতেন

প্রশ্ন ঃ (২৫) ঝাড়-ফুঁকের বিধান কি? কুরআনের আয়াত লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যাদু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি তা কুরআনের আয়াত বা অন্য কোন বৈধ দু'আর মাধ্যমে হয়ে থাকে। নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাহাবীদেরকে ঝাড়-ফুঁক করেছেন। নবী ﷺ থেকে ঝাড়-ফুঁকের বিভিন্ন দু'আও প্রমাণিত আছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি দু'আ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

﴿رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِي فِي السَّمَآءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَآءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ﴾

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার নাম পবিত্র। আকাশ এবং জমিনে আপনার আদেশ বাস্তবায়িত হয়। আকাশে যেমন আপনার রহমত বিস্তৃত রয়েছে, জমিনেও অনুরূপভাবে আপনার রহমত বিস্তার করুন। আপনি আমাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্রদের প্রভু এ রোগীর উপর আপনার রহমত ও শিফা অবতীর্ণ করুন। এভাবে ঝাড়-ফুঁক করলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠত।[১]

﴿بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ﴾

---

[১] - আবূ দাউদ- অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তিব্ব

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি। প্রতিটি এমন রোগ আরোগ্যর জন্য যা তোমাকে কষ্ট দেয়। প্রতিটি মানুষের অকল্যাণ এবং হিংসুকের বদ নজর থেকে আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করুন। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।[১]

﴿أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ﴾

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ এবং তাঁর কুদরতের উসীলায় আমার কাছে উপস্থিত ও আশঙ্কিতকারী অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২] রোগী ব্যক্তি শরীরের যেখানে ব্যথা অনুভব করবে, সেখানে হাত রেখে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। উপরের দু'আগুলো ছাড়াও হাদীসে আরো অনেক দু'আ বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনের আয়াত অথবা হাদীসে বর্ণিত দু'আ বা যিক্র লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কুরআন বা অন্য দু'আ পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁক দেয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রোগীর গলায় বা হাতে কুরআনের আয়াত লিখে ঝুলিয়ে রাখা কিংবা কুরআনের আয়াত লিখে বালিশের নীচে রেখে দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

প্রশ্ন ঃ (২৬) ঝাড়-ফুঁক করা কি আল্লাহর উপর (তাওয়াক্কুল) ভরসা করার পরিপন্থী?

উত্তর ঃ তাওয়াক্কুল অর্থ হল কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা। চেষ্টা করা বাদ দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর উপর ভরসাকারী কে? তবে উত্তর হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি কি ক্ষতি ও অকল্যাণ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন না? উত্তর হল, হ্যাঁ অবশ্যই করতেন। তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন, তখন তীর-তরবারির আঘাত হতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের পোশাক পরিধান করতেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি দু'টি লোহর বর্ম পরে বের হয়েছেন। সম্ভাব্য বিপদাপদ হতে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। অসুস্থ মানুষ নিজের উপর ঝাড়-ফুঁক

[১] - মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সালাম

[২] - মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সালাম

www.pathagar.com

করা, অন্যান্য অসুস্থ ভাইদের ঝাড়-ফুঁক করা তাওয়াক্কুলের[১] পরিপন্থী নয়। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী ﷺ সূরা ফালাক ও নাস পড়ে নিজের উপর এবং সাহাবীদের উপর ফুঁক দিতেন।

প্রশ্ন ঃ (২৭) তাবীজ ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ তাবীজ ব্যবহার দু'ধরনের হতে পারে।

প্রথমতঃ কুরআনের আয়াত লিখে তাবীজে ভর্তি করে ব্যবহার করা। কুরআনের আয়াত লিখে তাবীজ ব্যবহার নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। কুরআন পড়ে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন ছাড়া এমন কিছু লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখা, যার অর্থ বোধগম্য নয়। এ ধরনের কিছু ব্যবহার করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। কেননা সে লিখিত বস্তুর অর্থ অবগত নয়। কিছু কবিরাজ রয়েছে, যারা অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য ভাষায় লিখে থাকে। যা আপনার পক্ষে বুঝা বা পাঠ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের তাবীজ লেখা ও ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম এবং শির্ক।

প্রশ্ন ঃ (২৮) পানাহারের পাত্রে চিকিৎসা স্বরূপ আয়াতুল কুরসী বা কুরআনের অন্য কোন আয়াত লিখে রাখা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর কিতাবকে এত নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। একজন মু'মিন ব্যক্তি কুরআনের সবচেয়ে মহান আয়াতটি কিভাবে পানাহারের পাত্রে লিখে রাখতে পারে? যা ঘরের ভিতরে ফেলে রাখা হয়, শিশুরা তা নিয়ে খেলাধূলা করে থাকে। সুতরাং এ কাজটি বৈধ নয়। যার ঘরে পানাহারের পাত্রে এ রকম কিছু লেখা আছে, তার উচিত এ আয়াতগুলো মুছে ফেলা। কারণ, এভাবে কুরআনের আয়াত লিখে চিকিৎসা করার কথা সালাফে সালিহীন থেকে প্রমাণিত নয়।

কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

প্রশ্ন ঃ (২৯) কোন কোন ইসলামী দেশে মাদরাসার ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব হল কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা জ্ঞানার্জনের

---

[১] - আল্লাহর উপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।

www.pathagar.com

মাদরাসাকে ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্রদের মাদরাসা এবং আশআরীদের মাদরাসা, এ দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকে। এভাবে বিভক্ত করা কি সঠিক? যে সমস্ত আলিমরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করে থাকে, তাদের ব্যাপারে একজন মুসলিমের অবস্থান কি রকম হওয়া দরকার?

উত্তর ঃ যে ছাত্ররা এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব হল কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব। এ মাযহাব তাদের কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী এ মাযহাবই সত্য। সালাফে সালিহীনের বক্তব্যও তাই। সুস্থ বিবেক এ মাযহাবকেই সমর্থন করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা জ্ঞানার্জনের মাদরাসাকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। একটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্রদের মাদরাসা এবং অন্যটি আশআরী ও মাতুরিদীয়াদের মাদরাসা। ইবনে তাইমিয়ার মাদরাসার ছাত্রগণ কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করার বিরোধিতা করেন। আর আশআরী ও মাতুরিদীয়া ফির্কার লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অপব্যাখ্যা করে থাকে।

সুতরাং আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে উভয় মাদরাসার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যত আয়াত ও হাদীস এসেছে, কোন প্রকার পরিবর্তন করা ছাড়াই সেগুলোর ক্ষেত্রে ঈমান আনয়ন করে থাকেন। আর দ্বিতীয় মাদরাসার লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন আয়াতগুলোকে তার আসল অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করে থাকে। নিম্নের উদাহরণটির মাধ্যমে উভয় মাযহাবের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

অর্থ ঃ বরং তাঁর হাত দু'টি সদা প্রসারিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৪)

ইবলীস যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করল তখন আল্লাহ তাকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'টি হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সজদা করতে কিসে তোকে বারণ করল? । (সূরা সোয়াদ ঃ ৭৫)

উপরে বর্ণিত দুই মাদরাসার শিক্ষকরা আল্লাহর দুই হাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। প্রথম মাদরাসার লোকেরা বলেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে যে রকম হাত প্রযোজ্য, আল্লাহর জন্য সে রকম হাত সাব্যস্ত করতে হবে। আর দ্বিতীয় মাদরাসার ছাত্ররা বলে থাকে, হাতকে তার আসল অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। তাদের মতে আল্লাহর জন্য প্রকৃত হাত সাব্যস্ত করা হারাম। তাদের মতে হাতের উদ্দেশ্য হল কুদরাত অথবা নিয়ামত।

সুতরাং উভয় মাযহাবের ভিতরে এতো পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মাযহাব দু'টিকে একই কাতারে শামিল করা যায় না। মোট কথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর ছাত্রদের মাযহাবটি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফে সালিহীনদের মাযহাবের অনুরূপ। পক্ষান্তরে আশআরী সম্প্রদায়ের মাযহাব কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে সালিহীনদের মাযহাবের পরিপন্থী। তারা বলে থাকেন, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন আয়াতগুলোকে যদি এমন অর্থের মাধ্যমে তা'বীল (ব্যাখ্যা) করা হয়, যাতে অন্য কোন দলীলের বিরোধিতা হবে না, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

আমরা তাদের উত্তরে বলব যে, কুরআনের কোন শব্দকে বিনা দলীলে প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করাই কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করার নামান্তর এবং আল্লাহ সম্পর্কে বিনা দলীলে কথা বলা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহর ব্যাপারে বিনা 'ইল্মে কথা বলা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়, অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলাও হারাম, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾

অর্থ ঃ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করে, তাদের কাছে শরীয়তের কোন জ্ঞান নেই। এমনকি তারা সুস্থ্ বিবেক সম্পন্নও নয়।

বলা হয় যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) নিম্নলিখিত তিনটি স্থানে তা'বীল করেছেন ঃ (১) নবী ﷺ-এর হাদীস "বনী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে, (২) হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত এবং (৩)

আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

অর্থ ঃ তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। (সূরা হাদীদ ঃ ৪)

উত্তরে আমরা বলব যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে এ ধরনের কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, আবূ হামিদ ইমাম গাজ্জালী আহমাদ বিন হাম্বালের নামে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাত্র তিনটি স্থানে তা'বীল করেছেন। স্থান তিনটি হল, "হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত", "বনী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে" এবং "আমি যেন ইয়ামানের দিক থেকে আল্লাহর নিঃশ্বাস পাচ্ছি"। এ ধরনের কথা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

আর আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। (সূরা হাদীদ ঃ ৪)

আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) এ আয়াতটির তা'বীল করেননি। বরং তিনি আয়াত থেকে সাব্যস্ত কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি জাহ্মীয়া ফির্কার প্রতিবাদে আল্লাহর 'ইল্মকে সাব্যস্ত করেছেন। জাহ্মীয়া ফির্কার লোকেরা বলে আল্লাহ যদি সর্বত্র থাকেন, তাহলে আল্লাহ স্বশরীরে থাকা আবশ্যক হয়। এজন্যই তারা উক্ত আয়াতের উল্টা ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা বলি যে, আল্লাহ্ সাথে আছেন এ কথার অর্থ হল জ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত মাখলুকাতকে বেষ্টন করে আছেন। এটা নয় যে, সৃষ্টিকুলের সাথে মিশে আছেন। সাথে থাকার অর্থ স্থানভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, সে

আমাকে দুধের সাথে পানি পান করিয়েছে, আমি জামাআতের সাথেই সলাত আদায় করেছি, তার স্ত্রী তার সাথে আছে।

উপরের উদাহরণগুলোর প্রথম উদাহরণে দুধের সাথে পানির সংমিশ্রণ বুঝায়। দ্বিতীয় উদাহরণে একে অপরের সাথে মিশে যাওয়া ব্যতীত একই স্থানে এক সাথে কাজ করা বুঝায় এবং তৃতীয় উদাহরণে সাথে থাকার অর্থ একই স্থানে বা একই কাজে থাকাকে আবশ্যক করে না। সুতরাং আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন– এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ বান্দার সাথে মিশে আছেন অথবা একই স্থানে আছেন। এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, আল্লাহ রয়েছেন সমস্ত মাখলুকাতের উপরে। আল্লাহ আমাদের সাথে থাকার অর্থ এই যে, তিনি সাত আকাশের উপরে আরশে আযীমে থেকেও শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, রাজত্ব, শ্রবণ, দেখা এবং পরিচালনার মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টিজীবকে বেষ্টন করে আছেন। সুতরাং সাথে থাকাকে কোন ব্যাখ্যাকারী যদি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, তাহলে আয়াতের দাবী থেকে বের হয়ে আসবে না এবং সে অপব্যাখ্যাকারীও হবে না। তবে যে ব্যক্তি সাথে থাকাকে একসাথে সর্বস্থানে, সবসময় বিরাজমান থাকা বুঝাবে তার কথা ভিন্ন। সে অপব্যাখ্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে।

সমস্ত বানী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে, যেভাবে ইচ্ছা তিনি তা ঘুরান- হাদীসটি সহীহ মুসলিমে রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা এ হাদীসের ব্যাখ্যা করেননি। তারা আল্লাহর শানে যে ধরনের আঙ্গুল প্রযোজ্য তা সাব্যস্ত করেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের অন্তরগুলো আল্লাহর আঙ্গুলের সাথে লেগে আছে। মেঘমালা, আকাশ এবং জমিনের মাঝখানে থাকে। তা আকাশের সাথে মিশে থাকে না, জমিনের সাথেও নয়। তাই বানী আদমের অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলের সাথে মিশে থাকা জরুরী নয়।

হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত, যে তাতে স্পর্শ করল অথবা চুম্বন করল, সে যেন আল্লাহর হাতে স্পর্শ করল বা চুম্বন করল, এই হাদীসটি নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং তাকে তা'বীল বা ব্যাখ্যা করার প্রশ্নই আসে না।

সহীহ আকীদাহ ও 'ইল্‌ম শিক্ষার মাদরাসাকে ইবনে তাইমিয়াহর মাদরাসা হিসেবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। কারণ, তিনি নতুন কোন মাদরাসা তৈরী করেননি। তিনি সালাফে সালিহীনের পথই অনুসরণ করেছেন।

যারা আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত আয়াতসমূহকে ব্যাখ্যা করে, তাদের ব্যাপারে আমরা বলব যে, তাদের নিয়ত যদি ভাল হয় এবং দ্বীনের প্রতি আনুগত্যশীল বলে জানা যায়, তবে তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু তার

www.pathagar.com

কথা যে সালাফে সালিহীনের মাযহাব বিরোধী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তাঁরা সর্বক্ষেত্রে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর ঈমান এনেছেন। নিয়ত ভাল থাকা সত্ত্বেও কোন মানুষ যদি ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তবে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। বরং এতে সে ইজতিহাদের সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

অর্থ ঃ বিচারক যদি ইজতিহাদ করে সঠিক ফায়সালা দেয়, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে, আর যদি ইজতিহাদ করে ফায়সালা দিতে গিয়ে ভুল করে, তাহলে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে।

কাজেই আকীদার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে যারা ভুল করেছেন, তাদেরকে গোমরাহ বলা যাবে না। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, তার নিয়ত ভাল ছিল, সে দ্বীনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিল এবং সে সুন্নাহ্‌র অনুসরণকারী ছিল। অবশ্য তার মতামতকে গোমরাহী মতামত বলতে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ

প্রশ্ন ঃ (৩০) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ কি? নাম ও গুণের মধ্যে পার্থক্য কি? আল্লাহর প্রতিটি নাম কি একটি করে তার গুণকে আবশ্যক করে? অনুরূপভাবে সিফাতও কি নামকে আবশ্যক করে?

উত্তর ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ হল আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার, ধরণ বর্ণনা এবং উপমা পেশ করা ছাড়াই তার উপর বিশ্বাস করা। নাম ও গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, নাম হল আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেছেন এবং গুণ হল আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আল্লাহর প্রতিটি নাম একটি করে গুণকে আবশ্যক করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। এখানে (গাফুর) আল্লাহর একটি নাম।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ক্ষমাশীল। এই নামটির মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা করা গুণ প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে (রাহীম) নামটি রাহমত গুণটিকে আবশ্য করে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে যে মস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, তা থেকে নাম নির্বাচন করা আবশ্যক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কথা বলা আল্লাহর একটি গুণ। এ থেকে মুতাকাল্লিম (বক্তা) নাম বের করা বৈধ নয়। সুতরাং নামের তুলনায় গুণ অধিক প্রশস্ত। কারণ, প্রতিটি নামই একটি করে সিফাতকে সাব্যস্ত করে। কিন্তু প্রতিটি সিফাতের ক্ষেত্রে এমনটি নয়।

প্রশ্ন ঃ (৩১) আল্লাহর নাম কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত?

উত্তর ঃ আল্লাহর নামগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়। সহীহ হাদীসে এর দলীল হল,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِـــيَّ حُكْمُـــكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَـــدًا مِـــنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দার সন্তান। আমার ললাট (সমস্ত বিষয়) আপনার হাতে। আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আপনার ফায়সালাই ন্যায় সম্মত। আপনার প্রতিটি নামের উসীলা দিয়ে আপনার কাছে দু'আ করছি। যে নামের মাধ্যমে আপনি নিজের নাম রেখেছেন বা আপনার কোন সৃষ্টিকে (বান্দাকে) শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন অথবা যে নামগুলোকে আপনি নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছেন।

আর এ কথা শতসিদ্ধ যে, আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডারে যে সমস্ত নাম সংরক্ষিত রেখেছেন, তা একমাত্র আল্লহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যা অজ্ঞাত তা সীমিত হতে পারে না।

﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্থ করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১] হাদীসে এটা বুঝা যাচ্ছে না যে, আল্লাহর নাম মাত্র নিরানব্বইটি। বরং হাদীসের অর্থ এই যে, আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যা মুখস্থ করলে জান্নাতে

[১] - বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবুশ শুরুত

www.pathagar.com

যাওয়া যাবে। এতে বুঝা যায় যে, এই নিরানব্বইটি ব্যতীত আল্লাহর আরো নাম রয়েছে। এখানে (مَنْ أَحْصَاهَا) বাক্যটি পূর্বের বাক্যের পরিপূরক। নতুন বাক্য নয়। যেমন আরবদের কথা আমার একশটি ঘোড়া রয়েছে, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, তার কাছে ঘোড়ার সংখ্যা মাত্র একশটি। বরং তার কাছে এমন একশটি ঘোড়া আছে, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অন্য কাজের জন্য আরো ঘোড়া থাকতে পারে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই মর্মে হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্য সংকলন করেছেন যে, নাবী ﷺ থেকে নামসমূহের সংখ্যার বর্ণনা সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি। আর সত্যই বলেছেন তিনি (রহঃ)-এর প্রমাণ- উলামাদের মাঝে এ বিষয়ে বিরাট ইখতিলাফ রয়েছে। কারণ, যারা এ হাদীসকে সহীহ বলার চেষ্টা করেছেন, তারা বলেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত বিরাট। কারণ, তা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে বলা হয়েছে। সুতরাং সাহাবীগণ এ বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে নির্ধারণ করে চাইবেন না এটা হতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম নবী ﷺ থেকেই নির্ধারিত।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এটি আবশ্যক নয়। কারণ, নবী ﷺ থেকে যদি নির্ধারিত হত, তাহলে পরিষ্কারভাবে নামগুলো জানা থাকত এবং বুখারী-মুসলিমে এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে উল্লেখ থাকত। কারণ, এটি এমন বিষয় যা বর্ণনা এবং হেফাযত করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং কিভাবে তা সহীহ সূত্রে বর্ণিত না হয়ে দুর্বল এবং পরস্পর বিরোধী সূত্রে বর্ণিত হতে পারে? নবী ﷺ নামগুলো বিশেষ এক উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেননি। তাহলো মানষেরা যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত হতে খোঁজে বের করে। এতে করেই সৎকাজের দিকে কে প্রকৃত আগ্রহী এবং কে আগ্রহী নয়, তা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

আল্লাহর নামগুলো শুধু কাগজে লিখে মুখস্থ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল ঃ

১) ভালভাবে নামগুলো মুখস্থ করা।

২) নামগুলোর অর্থ অনুধাবন করা।

৩) নামগুলোর দাবী অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা। আর তা দু'ভাবে হতে পারে ঃ

(ক) আল্লাহর নামসমূহের উসীলা দিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সেই নামগুলোর উসীলায় তাঁর কাছে দু'আ কর। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮০)

আপনি যা কামনা করেন তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি নাম নির্বাচন করে সেই নামটি উল্লেখ করে দু'আ করবেন। যেমন ক্ষমা চাওয়ার সময় আপনি বলবেন, يا غفور اغفر لى

ইয়া গাফূর! ইগফিরলী।

অর্থ ঃ হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষমা চাওয়ার সময় এটা বলা কখনই উপযোগী নয় যে,

يا شديد العقاب اغفرلي

অর্থ ঃ হে কঠোর শাস্তি দাতা! আমাকে ক্ষমা করুন। এটা এক ধরনের ঠাট্টা করার শামিল। বরং বলতে হবে, হে কঠোর শাস্তি দাতা! আমাকে আপনার শাস্তি হতে রেহাই দিন।

২) আপনার ইবাদাতের মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই, যা আল্লাহর নামগুলোর দাবীকে আবশ্যক করে। রাহীম নামের দাবী হল রহমত করা। সুতরাং আপনি এমন আমল করবেন, যা আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার কারণ হয়। এটাই আল্লাহর নাম সমূহ মুখস্থ করার অর্থ। আল্লাহর নামসমূহের দাবীকে আবশ্যক করার মত আমলই জান্নাতে প্রবেশের মূল্য হতে পারে।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন উপরে আছেন।

প্রশ্ন ঃ (৩২) আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যে উপরে আছেন, সে ব্যাপারে সালফ্দের মাযহাব কি? যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ ছয়টি দিক থেকে মুক্ত এবং তিনি মু'মিন বান্দার অন্তরে আছেন, তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ সালফ্দের মাযহাব এই যে, আল্লাহ্ স্বীয় সত্তায় মাখলুকাতের উপরে আছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

অর্থ ঃ তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাক, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ্ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর নিকটে। (সূরা শূরা ঃ ১০)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

অর্থ ঃ মু'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর ঃ ৫১-৫২)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ ঃ অতএব তোমার পালকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেয়। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতাবোধ না করে এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল করে নেবে। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

সুতরাং জানা গেল যে, মতভেদের সময় ঈমানদারের পথ হল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্‌র দিকে ফেরত যাওয়া এবং তাদের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা। সাথে সাথে আল্লাহ এবং রাসূলের কথার বাইরে অন্য কারও কথা গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের কাছে কোন রূপ স্বাধীনতা না রাখা। এছাড়া কেউ ঈমানদার হতে পারবে না। পরিপূর্ণরূপে নিজেকে কুরআন ও

www.pathagar.com

সুন্নাহ্র কাছে সোপর্দ করতে হবে এবং অন্তর থেকে সংকীর্ণতা অবশ্যই দূর হতে হবে। এর বিপরীত করলে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

অর্থ ঃ হেদায়েতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে কেউ রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং ঈমানদারদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলবে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান। (সূরা নিসা ঃ ১১৫)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তায় মাখলুকের উপরে থাকার মাসআলাটি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্র দিকে ফেরানোর পর তা নিয়ে গবেষণাকারী অবশ্যই জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বসত্তায় সমস্ত মাখলুকাতের উপরে আছেন। বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ্য় এ বিষয়টি অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১) সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশের উপরে আছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

অর্থ ঃ তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কীকরণ। (সূরা মুলক ঃ ১৭)

নবী ﷺ রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার হাদীসে বলেন,

رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ

অর্থ ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। যিনি আকাশে আছেন।[১]

তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

অর্থ ঃ ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য ডাক দিলে স্ত্রী যদি বিছানায় যেতে অস্বীকার

[১] - আবূ দাঊদ- অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

www.pathagar.com

করে তাহলে যিনি আকাশে আছেন, স্বামী সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন।[১]

২) আল্লাহ উপরে আছেন, এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

অর্থ ঃ তিনিই প্রতাপন্বিত স্বীয় বান্দাদের উপরে আছেন। (সূরা আন'আম ঃ ১৮)

আল্লাহ আরো বলেন, ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾

অর্থ ঃ তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে। যিনি তাদের উপরে আছেন। (সূরা নাহ্ল ঃ ৫০)

নবী ﷺ-এর বাণী,

لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে। কিতাবটি তাঁর নিকটে আরশের উপরে রয়েছে।[২]

৩) আল্লাহর দিকে বিভিন্ন বিষয় উঠা এবং তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। উপরের দিকে উঠা সব সময় নীচের দিক থেকেই হয়ে থাকে। এমনিভাবে অবতরণ করা সাধারণত উপরের দিক থেকে নীচের দিকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

অর্থ ঃ তাঁরই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ উঠে থাকে এবং সৎ আমল তাকে উপরের দিকে তুলে নেয়। (সূরা ফাতির ঃ ১০)

আল্লাহ বলেন, ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

অর্থ ঃ ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয়। (সূরা মা'আরিজ ঃ ৪)

আল্লাহ বলেন, ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾

অর্থ ঃ তিনি আকাশে থেকেই জমিনে সকল কর্ম পরিচালনা করেন। (সূরা সিজদা ঃ ৫)

---

[১] - মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুন নিকাহ।

[২] - বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবু বাদইল খাল্ক।

www.pathagar.com

আল্লাহর বাণী,

﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

অর্থ ঃ এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

(সূরা ফুস্সিলাত ঃ ৪২)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ﴾

অর্থ ঃ আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। (সূরা তাওবা ঃ ৬)

তাই কুরআন আল্লাহর কালাম বা বাণী। তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এর দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় সত্তায় উপরে রয়েছেন। নবী ﷺ বলেন,

﴿يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ﴾

অর্থ ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আছে আমার কাছে দু'আ করবে? আমি তার দু'আ কবূল করব। কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে প্রদান করবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত আছি।[১] বারা বিন আযিব (রাঃ)-এর হাদীসে আছে, নবী ﷺ তাকে বিছানায় শয়নকালে পাঠ করার দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। সেই দু'আর মধ্যে এটাও আছে,

﴿آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ﴾

অর্থ ঃ আমি আপনার অবতারিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এ দু'আ পাঠ করার পর যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যু বরণ করবে।[২]

---

[১] - বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত।

[২] - বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত।

www.pathagar.com

৪) আল্লাহ্ তা'আলা উপরে হওয়ার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾

অর্থ ঃ আপনি আপনার সর্বোচ্চ ও সর্বমহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (সূরা আল-আ'লা ঃ ১)

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

অর্থ ঃ সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

নবী ﷺ-এর বাণী, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

অর্থ ঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার সুমহান প্রভুর।[১]

৪) নবী ﷺ আরাফার মাঠে ভাষণ দেয়ার সময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, ألا هل بلغت؟ আমি কি তোমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছি? উপস্থিত জনতা এক বাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তখন নবী ﷺ বললেন, (اللهم اشهد) হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এ কথা বলতে বলতে তিনি উপরের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলেন এবং মানুষের দিকে তা নামাতে লাগলেন। এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আকাশে। তা না হলে নবী ﷺ-এর উপরের দিকে হাত উঠিয়ে ইশারা করা অনর্থক বলে সাব্যস্ত হবে।

৬) নবী ﷺ জনৈক দাসীকে প্রশ্ন করেছেন, আল্লাহ কোথায়? দাসী বলল, আকাশে। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন,

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

অর্থ ঃ তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ঈমানদার।[২] হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত মু'আবীয়া বিন হাকাম আস্ সুলামী (রাঃ)-এর দীর্ঘ হাদীসের

---

[১] - আবূ দাঊদ- কিতাবুস্ সলাত।

[২] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল মাসাজিদ।

www.pathagar.com

অংশ বিশেষ। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় সত্তায় উপরে হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। কেননা (أين) শব্দটি দিয়ে কোন বস্তুর অবস্থান সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে। নবী ﷺ যখন মহিলাটিকে আল্লাহ কোথায়- এ কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন মহিলাটি বলল, আকাশে। নবী ﷺ তার এ কথাকে মেনে নিলেন এবং তিনি বললেন, এটাই ঈমানের পরিচয়। তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ, সে ঈমানদার। সুতরাং যতক্ষণ কোন মানুষ আল্লাহ উপরে হওয়ার বিশ্বাস না করবে এবং এ কথার ঘোষণা না দিবে ততক্ষণ সে ঈমানদার হতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তায় মাখলুকের উপরে হওয়ার ব্যাপারে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে উপরোক্ত দলীলগুলো উল্লেখ করা হল। এ ব্যাপারে আরো দলীল রয়েছে। যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত দলীলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সালাফে সালিহীন এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ স্বীয় সত্তায় মাখলুকের উপরে রয়েছেন। এমনিভাবে তারা আল্লাহর গুণাবলী সুউচ্চ হওয়ার উপরও একমত হয়েছেন।

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

অর্থ ঃ আকাশ ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা রূম ঃ ২৭)

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

অর্থ ঃ আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামসমূহ। কাজেই সেই নামসমূহ ধরেই (অসীলায়) তাঁকে ডাক। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮০)

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবগত আছেন আর তোমরা অবগত নও। (সূরা নাহল ঃ ৭৪)

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থ ঃ তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করো না।
(সূরা বাকারা ঃ ২২)

এমনিভাবে আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ এবং কর্মসমূহ পরিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে সুস্থ বিবেক এবং ফিতরাতও[১] আল্লাহর উপরে হওয়ার কথা স্বীকার করে নেয়।

বিবেক এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, উচ্চে হওয়া একটি পরিপূর্ণ ও উত্তম গুণ। অপরপক্ষে উপরে হওয়ার বিপরীতে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ গুণ। আল্লাহর জন্য সকল পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত। তাই আল্লাহর জন্য সুউচ্চে হওয়া বিবেক সম্মত। তাই উপরে হওয়াতে ত্রুটিপূর্ণ কোন গুণ সাব্যস্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আমরা বলব যে, উপরে হওয়া সৃষ্টিজীব দ্বারা বেষ্টিত হওয়াকে আবশ্যক করে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করবে, সে নিছক ধারণা করল এবং বিবেকভ্রষ্ট হিসেবে পরিগণিত হল।

মানুষের স্বভাবজাত ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহ মাখলুকের উপরে প্রমাণিত হয়। মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে তখন অন্তরকে আকাশের দিকে ধাবিত করে। এজন্যই মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তখন ফিতরাতের দাবী অনুযায়ী আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে। একদা হামদানী নামক জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীকে বলল, আপনি তো আল্লাহ উপরে হওয়াকে অস্বীকার করেন। আপনি আমাকে বলুন, আল্লাহ যদি উপরে না থাকেন, তাহলে আল্লাহর ভক্ত কোন মানুষ যখনই আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তখন তার অন্তরকে উপরের দিকে ফেরানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন? এ কথা শুনে জুওয়াইনী মাথায় হাত মারতে মারতে বলতে থাকল হামদানী আমাকে দিশেহারা করে দিয়েছে! হামদানী আমাকে দিশেহারা করে দিয়েছে! ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার সূত্র সঠিক হোক কিংবা ভুল হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রতিটি ব্যক্তির অনুভূতিও হামদানীর মতই। দু'আ করার সময় সবাই উপরের দিকে অন্তর ও হাত উঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলায়িত কেশ ও ধূলামলিন পোশাক নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! হে রব!! অথচ সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় কি করে

---

[১] - আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে যে সৃষ্টিগত স্বভাব এবং দ্বীন ইসলাম কবূল করার যে যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাকে ফিতরাত বলা হয়।

www.pathagar.com

তার দু'আ কবূল হতে পারে ?[১] এমনিভাবে সলাতে বান্দা তার অন্তরকে আকাশের দিকে ফেরায়। বিশেষ করে সে যখন সাজদায় যায় তখন বলে,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

অর্থ ঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার সুউচ্চ প্রভুর। যেহেতু সে জানে যে তার মা'বূদ আকাশে তাই সে এভাবে বলে থাকে।

যারা আল্লাহ্ আরশের উপরে হওয়াকে অস্বীকার করে তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা ছয়টি দিক থেকে মুক্ত। আমরা বলব এ কথাটি একটি বাতি্বল কথা। কেননা এটা এমন কথা যা আল্লাহ্ নিজের জন্য সাব্যস্তকৃত বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী নবী ﷺ আল্লাহর জন্য যে সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, তাও বাতি্বল করার আহ্বান জানায়। তা এই যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা উপরের দিকে রয়েছেন। আল্লাহ উপরে আছেন এ কথা অস্বীকার করা হলে আল্লাহকে অস্তিত্বহীন বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়ে যায়। কেননা দিক হল ছয়টি। উপর, নীচ, ডান, বাম, পশ্চাৎ এবং সম্মুখ। অস্তিত্ব সম্পন্ন যে কোন বস্তুকে এ ছয়টি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত রাখতে হবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিবেক সম্মত ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে যদি ছয়টি দিককে সমানভাবে অস্বীকার করা হয়, তাহলে আল্লাহ নেই এ কথাই আবশ্যক হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ্) কোন মানুষের সুস্থ মস্তিষ্ক এ ছয়টি দিকের বাইরে কোন জিনিসের অস্তিত্বকে সম্ভব মনে করতে পারে কি? কেননা বাস্তবে আমরা এ ধরনের কোন জিনিসের অস্তিত্ব খোঁজে পাইনি। আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ উপরে। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, সালাফে সালিহীনের ইজমা, সুস্থ বিবেক এবং ফিতরাতও তা সমর্থন করে। যেমন আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন, কিন্তু আল্লাহ্কে কোন বস্তুই পরিবেষ্টন করতে পারে না। কোন মু'মিনের জন্যই এটা বৈধ নয় যে, সে মানুষের কথাকে গ্রহণ করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করবে। সে মানুষটি যত বড়ই হোক না কেন। আমরা ইতোপূর্বে দলীলগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

যারা বলে আল্লাহ মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে আছেন, তাদের কথার পক্ষে আমাদের জানামতে কুরআন, সুন্নাহ কিংবা সালাফে সালিহীনের কোন উক্তি

---

[১] - সহীহ মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুদ্ দা'ওয়াত।

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহ বান্দার অন্তরে অবতীর্ণ হয়ে আছেন, তাহলে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট । আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে অনেক পবিত্র। বড় আশ্চর্যের কথা এই যে, কিভাবে একজন মানুষ কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভাষ্য মতে আল্লাহ তা'আলা আকাশে হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে থাকেন এ কথা মেনে নিতে পারে। অথচ এর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্‌র একটি দলীলও মিলে না।

আল্লাহ মু'মিন বান্দার অন্তরে আছেন- এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, মু'মিন ব্যক্তি সদা-সর্বদা অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে এ কথা সত্য। তবে বাক্যটি পরিবর্তন করা দরকার, যাতে বাত্বিল অর্থের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। এভাবে বলা উচিত যে, মু'মিন বান্দার অন্তরে সব সময় আল্লাহর যিক্‌র বিদ্যমান রয়েছে। তবে যারা এ কথা বলে তাদের কথা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ আকাশে আছেন এ কথাকে অস্বীকার করা এবং মু'মিনের অন্তরে আল্লাহর অবস্থানকে সাব্যস্ত করা। অথচ এটা বাত্বিল।

সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফে সালিহীনের ইজমা বাদ দিয়ে এমন বাক্য ব্যবহার থেকে সাবধান থাকা উচিত, যা সত্য-মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। মু'মিনদের উচিত প্রথম যুগের আনসার-মুহাজির সাহাবীদের পথ অনুসরণ করা। তবেই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থ ঃ আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান সফলতা। (সূরা তাওবা ঃ ১০০)

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর রহমত দান করুন। তিনিই মহান দাতা।

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩৩) আল্লাহ তা'আলার শানে যেভাবে প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই আরশের উপরে আছেন- এটাই কি সালাফে সালিহীনের ব্যাখ্যা?

উত্তর ঃ আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী যেভাবে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া শোভা পায়, তিনি সেভাবেই আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মুফাস্‌সিরগণের ইমাম আল্লামা ইবনে জারীর বলেন, ইসতিওয়া অর্থ হল সমুন্নত হওয়া, উপরে হওয়া।

আল্লাহর বাণী, ﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত। এই অর্থ ব্যতীত সালাফে সালিহীন হতে অন্য কোন অর্থ বর্ণিত হয়নি। তদুপরি 'ইসতিওয়া' শব্দটি ভাষাগত দিক থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

১) কোন কিছুর সাথে যুক্ত না হয়ে সাধারণভাবে ব্যবহার হলে অর্থ হবে, পরিপূর্ণ হওয়া।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوٰى﴾

অর্থ ঃ যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলেন এবং পরিপূর্ণতায় পৌছলেন।

(সূরা ক্বাসাস ঃ ১৪)

২) ইসতিওয়া শব্দটি আরবী অক্ষর (واو)-এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহার হলে অর্থ হবে সমান সমান হওয়া, একটি জিনিস অন্যটির বরাবর হওয়া। যেমন বলা হয় (استوى الماء والعتبة) পানি কাষ্ঠের সমান হয়ে গেছে।

৩) আরবী অব্যয় (إلى)-এর সাথে মিলিত হয়ে আসলে অর্থ হবে, ইচ্ছা করা, মনোনিবেশ করা।

যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ﴾

অর্থ ঃ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

(সূরা বাকারা ঃ ২৯)

৪) আরবী অব্যয় (على)-এর সাথে মিলিত হয়ে আসলে অর্থ হবে, সমুন্নত হওয়া, উপরে হওয়া।

যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত।

আবার কোন কোন সালফ বলেন ইসতিওয়া শব্দটি إلى এবং على এর মধ্যে থেকে যে কোন একটির সাথেই মিলিত হয়ে আসুক না কেন, অর্থের দিক

www.pathagar.com

থেকে কোন পার্থক্য নেই। একটি অন্যটির অর্থে ব্যবহার হয়। তাই উভয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত।

ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) খারিজা বিন মুসআব থেকে ইসতিওয়ার অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

'ইসতিওয়া' অর্থ বসা ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত এক মারফূ হাদীসে (جلـــوس) 'বসা' শব্দটি ইসতিওয়ার অর্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (সঠিক জ্ঞান আল্লাহর নিকটে!)

'আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত' এ কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন ঃ (৩৪) সম্মানিত শায়খ! আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন! আপনি বলেছেন, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া বিশেষ এক ধরনের সমুন্নত হওয়া, যা কেবলমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে প্রযোজ্য। আমরা কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর ঃ আমরা বলি যে, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি বিশেষ ধরনের সমুন্নত হওয়া। যা আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের উপরে হওয়ার সাথে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এজন্যই এ রকম বলা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ মাখলুকাতের উপর সমুন্নত হলেন অথবা আকাশের উপরে কিংবা জমিনের উপরে। অথচ তিনি সকল বস্তুর উপরে। অন্যান্য মাখলুকাতের ক্ষেত্রে আমরা বলি, আল্লাহ তা'আলা আকাশ-জমিনসহ সকল মাখলুকের উপরে আছেন। আর আরশের ক্ষেত্রে বলব যে, আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত (مســتو)। সুতরাং ইসতিওয়া (সমুন্নত হওয়া) গুণটি সাধারণভাবে উপরে হওয়া থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্যই আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া গুণটি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত এবং তা আল্লাহর কর্মগত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর মাখলুকের উপরে হওয়া আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পর্কিত গুণ, যা আল্লাহর সত্তা হতে কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া দুনিয়ার আকাশে আল্লাহর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসে এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছয়দিনে আকাশ-জমিন সৃষ্টি করার পর আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। তার পূর্বে তিনি আরশের উপরে ছিলেন না। ইসতিওয়া অর্থ বিশেষ এক ধরনের উপরে হওয়া। তাই কোন বস্তু অন্য বস্তুর উপরে সমুন্নত

www.pathagar.com

হওয়ার অর্থ বস্তুটি তার উপরে আছে। কিন্তু উপরে থাকলেই সমুন্নত হওয়া জরুরী নয়। এজন্যই প্রতিটি উপরের বস্তুকে সমুন্নত বলা যায় না। তার বিপরীতে প্রতিটি সমুন্নত বস্তুই অপর বস্তুর উপরে বিরাজমান।

আমাদের কথা, আল্লাহর শানে যে ধরনের সমুন্নত হওয়া প্রযোজ্য তিনি সে রকমভাবেই আরশে আযীমে সমুন্নত- এর অর্থ এই যে, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া আল্লাহর অন্যান্য সিফাতের মতই। আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহর ক্ষমতা ও বড়ত্ব অনুযায়ী তাঁর সাথে প্রতিষ্ঠিত। আরশের উপরে তাঁর সমুন্নত অন্য কোন মাখলুকাতের সমুন্নত হওয়ার মত নয়। আল্লাহর সত্তা যেহেতু অন্য কোন সত্তার মত নয়, তাই তাঁর সিফাতও অন্য কোন সিফাতের মত নয়।

আল্লাহ বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থ ঃ তাঁর মত আর কেউ নেই। তিনি সব কিছু দেখেন এবং শুনেন।

(সূরা শূরা ঃ ১১)

আল্লাহর সত্তার মত কোন সত্তা নেই এবং আল্লাহর গুণাবলীর মত কোন গুণাবলীও নেই। একজন বিদ'আতী লোক ইমাম মালিক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আল্লাহ আরশের উপরে কিভাবে সমুন্নত আছেন? উত্তরে মহামান্য ইমাম বললেন, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপরে ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। পরবর্তী বিদ্বানগণ সকল সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (রঃ)-এর এ উক্তিটিকে একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কখন 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হবে?

প্রশ্ন (৩৫) কোন ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বলতে হবে না?

উত্তর ঃ ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলা উত্তম।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

অর্থ ঃ কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এভাবে বলবে যে, যদি আল্লাহ চান। (সূরা কাহ্ফ ঃ ২৩-২৪)

www.pathagar.com

অতীত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলার দরকার নেই। যেমন কোন লোক যদি বলে গত রবিবারে রামাযান মাস এসেছে ইনশাআল্লাহ। এখানে ইনশাআল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা অতীত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ইনশাআল্লাহ আমি কাপড় পরিধান করেছি। এখানেও ইনশাআল্লাহ বলার দরকার নেই। কারণ, কাপড় পরিধান করা শেষ হয়ে গেছে। সলাত আদায় করার পর ইনশাআল্লাহ সলাত পড়েছি বলার দরকার নেই। কিন্তু যদি বলে ইনশাআল্লাহ মাকবূল সলাত পড়েছি তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, সলাত কবূল হল কি না তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

প্রশ্ন ঃ (৩৬) ইরাদাহ্ বা আল্লাহর ইচ্ছা কত প্রকার?

উত্তর ঃ ইরাদাহ (ইচ্ছা) দু'প্রকার

১) ইরাদাহ কাওনীয়া (সৃষ্টিগত ইচ্ছা)

২) ইরাদা শারঈয়া (শরীয়তগত ইচ্ছা)

আল্লাহর যে ইচ্ছা সৃষ্টি করার সাথে সম্পৃক্ত তাই ইরাদাহ কাওনীয়া। আর যে ইচ্ছা ভালবাসার সাথে সম্পৃক্ত তাকে ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিসকে ভালবেসে যে ইচ্ছা পোষণ করেন তাকে ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। ইরাদাহ শরঈয়ার উদাহরণ হল, আল্লাহর বাণী

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন।

এখানে ইচ্ছা করেন অর্থ ভালবাসেন। এখানে সৃষ্টিগত ইচ্ছা অর্থে ব্যবহার হয়নি। যদি তাই হত, তাহলে সকল মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন। এটা কখন হতে পারে না। কেননা অধিকাংশ বনী আদমই কাফির। সুতরাং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন অর্থ আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করা পছন্দ করেন। আল্লাহ কোন জিনিসকে ভালবাসার অর্থ এই নয় যে, তা অবশ্যই কার্যকরী হবে। তা কার্যকরী না হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য রয়েছে। ইরাদাহ কাওনীয়ার দৃষ্টান্ত হল,

﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾

অর্থ ঃ যদি আল্লাহই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন।

(সূরা হূদ ঃ ৩৪)

এখানে যে ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে, তাতে আল্লাহর ভালবাসা থাকা জরুরী নয়।

www.pathagar.com

যদি বলা হয় কার্যকরী হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে ইরাদাহ কাওনীয়া এবং ইরাদাহ শরঈয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? উত্তরে আমরা বলব যে, ইরাদাহ কাওনীয়াতে উদ্দিষ্ট বস্তু অবশ্যই কার্যকরী হবে। আল্লাহ কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চাইলে তা অবশ্যই করবেন। তার এ ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহর আদেশ তো এমনই যে, তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি বলেন, হয়ে যাও। আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়। (সূরা ইউনুস ঃ ৮২)

আর ইরাদা শরঈয়া বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা কার্যকরী হয় আবার কখনো কার্যকরী হয় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা শরীয়তগতভাবে জিনিসটি বাস্তবায়িত হওয়াকে পছন্দ করেন।

যদি কোন লোক জিজ্ঞেস করে যে, আল্লাহ কি পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন? উত্তর হল সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে পাপ কাজও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেন না এবং ভালবাসেন না। তবে আকাশ-জমিনে যা কিছু হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।

প্রশ্ন ঃ (৩৭) আল্লাহর নামের ভিতরে ইলহাদ (إلحاد) কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ ইলহাদের আভিধানিক অর্থ বাঁকা হয়ে যাওয়া বা এক দিকে ঝুঁকে পড়া। আল্লাহর বাণী,

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُوْنَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيْنٌ﴾

অর্থ ঃ যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (সূরা নাহল ঃ ১০৩)

লাহাদ কবর যেহেতু এক পাশ দিয়ে বাঁকা করে ভিতরের দিকে প্রবেশ করানো থাকে, তাই তাকে লাহাদ বলা হয়। সঠিক বিষয় জানা না থাকলে ইলহাদ জানা সম্ভব নয়। আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক কথা হল এগুলোকে আমরা আহলে সুন্নাতদের মূলনীতি অনুযায়ী কোন প্রকার পরিবর্তন, বাতিল এবং উপমা-দৃষ্টান্ত বর্ণনা ছাড়াই আল্লাহর শানে প্রযোজ্য অর্থে ব্যবহার করব। সুতরাং আমরা যখন সঠিক পথ জানতে পারলাম, তখন তার বিপরীত

www.pathagar.com

পথে যাওয়ার নামই ইলহাদ বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন। ইলহাদ কয়েক প্রকার ঃ

১) আল্লাহর কোন নাম বা কোন গুণকে অস্বীকার করা ঃ যেমন জাহিলী যুগের লোকেরা আল্লাহর 'রাহমান' নামটি অস্বীকার করেছিল কিংবা নামটির প্রতি ঈমান আনয়ন করল কিন্তু নামটি যে গুণের প্রতি প্রমাণ বহন করে, তা অস্বীকার করল। যেমন কোন কোন বিদ'আতী বলে থাকে, আল্লাহ দয়াবিহীন দয়ালু, শ্রবণশক্তিবিহীন শ্রবণকারী।

২) আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেননি, সে নামে তাঁকে নামকরণ করা ঃ এভাবে নাম রাখা ইলহাদ হওয়ার কারণ হল আল্লাহর নামসমূহ কুরআন এবং সুন্নাহ্তে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই মানতে হবে। কারও পক্ষে জায়েয নেই যে, নিজ থেকে আল্লাহর নাম রাখবে। কারণ, এটি আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাবশতঃ কথা বলার শামিল। যেমন খৃষ্টানেরা আল্লাহকে পিতা বলে এবং দার্শনিকরা ক্রিয়াশীল কারণ বলে থাকে।

৩) আল্লাহর নামসমূহকে সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর প্রতি নির্দেশকারী মনে করে উপমাদানসূচক বিশ্বাস করাও ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইলহাদ হওয়ার কারণ হল, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী মানুষের নামের মতই, সে তাকে তার আপন অর্থ হতে সরিয়ে ফেলল এবং সঠিক অর্থ বর্জন করে অন্য অর্থ গ্রহণ করল। এ রকম করা কুফরী।

আল্লাহ বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থ ঃ তাঁর মত আর কেউ নেই। তিনি সব কিছু জানেন এবং শুনেন।

(সূরা শূরা ঃ ১১)

আল্লাহ আরো বলেন, ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

অর্থ ঃ তাঁর সমকক্ষ কেউ আছে কি? (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৫)

ইমাম বুখারী (রঃ)-এর উস্তাদ নাঈম ইবনে হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করল, সে কুফরী করল। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন গুণকে অস্বীকার করল, সেও কুফরী করল। আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাতে মাখলুকের সাথে কোন তুলনা নেই।

৪) আল্লাহর নাম থেকে মূর্তির নাম বের করা ঃ যেমন ইলাহ থেকে লাত নাম বের করা, আজীজ থেকে উজ্জা এবং মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি। এখানে ইলহাদ হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহর নামগুলো শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য

www.pathagar.com

কোন মাখলুককে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদাতের অংশ প্রদান করার উদ্দেশে এগুলোর অর্থ স্থানান্তর করা জায়েয নেই।

আল্লাহর 'চেহারা', আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি সম্পর্কে

প্রশ্ন ঃ (৩৮) আল্লাহর চেহারা, আল্লাহর হাত এ জাতীয় যে সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয় তা কত প্রকার?

উত্তর ঃ আল্লাহর দিকে যা সম্বন্ধ করা হয়, তা তিন প্রকার। যথা ঃ (১) সুপ্রতিষ্ঠিত নির্ধারিত কোন বস্তু আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা ঃ এটি হল সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার দিকে সম্পর্কিত করার শ্রেণীভুক্ত। এটি কখনো সাধারণ ভঙ্গিতে হয়।

যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾

অর্থ ঃ আমার জমিন অতি প্রশস্ত। (সূরা 'আনকাবূত ঃ ৫৬)

কখনো কোন জিনিসের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন বলা হয়, (بيت الله) আল্লাহর ঘর, (ناقة الله) আল্লাহর উটনী ইত্যাদি। (২) ঐ বস্তু যার উপর অন্য বস্তু পতিষ্ঠিত। যেমন ঃ ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ এখানে রূহকে সম্মানের জন্য আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়।

আল্লাহ 'ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বলেন, ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾

অর্থ ঃ তিনি আল্লাহর রূহ। (সূরা নিসা ঃ ১৭১)

এখানে 'ঈসা (আঃ)-এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর রূহ-এর অর্থ হল আল্লাহ যে সমস্ত রূহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রূহও সে সমস্ত রূহের অন্তর্ভুক্ত। এ নয় যে, আল্লাহর রূহ 'ঈসা (আঃ)-এর রূহের ভিতরে প্রবেশ করে আছে।

৩)আল্লাহর সিফাতকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা ঃ কুরআনে ব্যাপকভাবে এ ভঙ্গিতে আল্লাহর সিফাতের বিবরণ এসেছে। আল্লাহর এ ধরনের সিফাতসমূহ সৃষ্টি নয়।

যেমন ঃ وجه الله আল্লাহর চেহারা, يد الله আল্লাহর হাত, قدرة الله আল্লাহর শক্তি বা ক্ষমতা عزة الله আল্লাহর ইজ্জত সম্মান।

প্রশ্ন ঃ (৩৯) আল্লাহর কোন নাম বা গুণ অস্বীকার করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর নাম ও গুণ অস্বীকার করা দু' ধরনের হতে পারে। (১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে অস্বীকার করা। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। সুতরাং

www.pathagar.com

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর কোন নামকে অস্বীকার করে অথবা কুরআন ও সুন্নাহ্য় বর্ণিত আল্লাহর কোন গুণকে অস্বীকার করে, যেমন বলল আল্লাহর কোন হাত নেই, এ ধরনের কথা মুসলমানের ঐকমত্যে সম্পূর্ণ কুফরী। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কুফরী এবং তা ইসলাম থেকে মানুষকে বের করে দেয়। (২) ব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্বীকার করা। তা হল সরাসরি অস্বীকার না করে ব্যাখ্যা করে অস্বীকার করা। এটি আবার দু'প্রকার। (১) ব্যাখ্যাটি আরবী ভাষা অনুপাতে হওয়া। এটি কুফরী নয়। (২) আরবী ভাষাতে ব্যাখ্যাটির পক্ষে কোন প্রকার যুক্তি না থাকা। এটি কুফরীকে আবশ্যক করে। ব্যাখ্যার কোন সুযোগ না থাকলে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ বলল, আল্লাহর প্রকৃতপক্ষে কোন হাত নেই। এমনকি নিয়ামত কিংবা শক্তি অর্থেও নেই। এ রকম বিশ্বাস পোষণকারী কাফির। কেননা সে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করল।

আর যদি আল্লাহর বাণী ঃ ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ﴾

বরং তাঁর দু'হাত প্রসারিত। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৪)

এর ব্যাখ্যায় কেউ বলে, এখানে আল্লাহর দু'হাত দ্বারা আকাশ-জমিন উদ্দেশ্য, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। কারণ আরবী ভাষাতে এ ধরনের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। আর এ ধরনের অর্থ শরঈ বাস্তবতার পরিপন্থী। কিন্তু হাতকে যদি নিয়ামতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে কিংবা শক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, তাহলে কাফির হবে না। কারণ, হাত কখনো কখনো নিয়ামত অর্থে ব্যবহার হয়। তবে বিদ'আতীদের দলভুক্ত অবশ্যই হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪০) আল্লাহর গুণাবলী কি মানুষের গুণাবলীর মতই?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর মতই সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কেননা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থ ঃ তাঁর মত আর কেউ নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা ঃ ১১)

দু'টি জিনিসের নাম ও গুণ এক হলেই জিনিস দু'টি সকল দিক থেকে এক হওয়া জরুরী নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা। মানুষের মুখ আছে। উটেরও মুখ আছে। মুখ দু'টি কি একই রকম? কখনই নয়। অনুরূপভাবে উটের হাত আছে পিপিলিকারও হাত আছে। হাত দু'টি কি সমান? তাহলে কেন আমরা

www.pathagar.com

বলব না যে, আল্লাহর চেহারা আছে। তা মাখলুকাতের চেহারার অনুরূপ নয়। আল্লাহর হাত আছে। কিন্তু তা মানুষের হাতের মত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾

অর্থ ঃ তারা যথার্থভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ও সম্মান বুঝতে পারেনি। কিয়ামাতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর ডান হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। (সূরা যুমার ঃ ৬৭)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾

অর্থ ঃ সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৪)

কোন মাখলুকের কি এ ধরনের হাত রয়েছে? কখনই নয়। সুতরাং আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিজীবের মত নয়। না সত্তায় না গুণাবলীতে।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থ ঃ তাঁর মত আর কেউ নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা ঃ ১১)

এজন্যই আল্লাহর কোন সিফাতের ধরন গঠন বা প্রকৃতি অনুসন্ধান করা ঠিক নয়। কিংবা এ রকম ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহর গুণসমূহ মানুষের গুণাবলীর মতই।

শেষ রাতে আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন– এ কথার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ঃ (৪১) আমরা জানি যে, ভূপৃষ্ঠের উপরে রাত ঘূর্ণীয়মান। আর আল্লাহ্ রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। এ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা রাতভর দুনিয়ার আকাশে থাকেন। এর উত্তর কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ কুরআন মাজীদে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং যে সমস্ত নামে নিজেকে নামকরণ করেছেন তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে রাসূল ﷺ আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকৃতি, ধরন নির্ধারণ করা বা উপমা পেশ করা ব্যতীত তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক।

www.pathagar.com

পরিবর্তন সাধারণতঃ হয়ে থাকে আয়াত ও হাদীসসমূহে। আর অস্বীকার হয়ে থাকে আকীদার ভিতরে। ধরন, উপমা বর্ণনা করা হয় সিফাত তথা গুণের ভিতরে।

সুতরাং উপরোক্ত চারটি দোষ হতে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিষ্কার হতে হবে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কেন, কেমন? এ ধরনের প্রশ্ন করা যাবে না। এমনিভাবে আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ধরন বর্ণনার চিন্তা করা থেকে মানুষ সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনেক বিষয় সহজ হয়ে যাবে। এটাই ছিল সালাফে সালিহীনের অবস্থা। ইমাম মালিক (রঃ)-এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আল্লাহ তো আরশের উপরে আছেন, তবে কিভাবে? উত্তরে ইমাম মালিক (রঃ) বললেন, আরশের উপরে থাকার বিষয়টি জ্ঞাত আছে। কিভাবে আছেন তা আমাদের জানার বাইরে। এ বিষয়ে ঈমান রাখা ওয়াজিব। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আমার মনে হচ্ছে তুমি একজন বিদ'আতী লোক।

যে ব্যক্তি বলে যেহেতু রাত সারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে আর আল্লাহ তা'আলা রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, তাই আল্লাহ সারা রাতই এ আকাশে থাকেন। কারণ, শেষ তৃতীয়াংশ তো এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রতিনিয়ত স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

উত্তরে আমরা বলব যে, এ প্রশ্নটি কোন সাহাবী করেননি। যদি প্রশ্নটি কোন মুসলিমের অন্তরে হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। আমরা বলব, পৃথিবীর কোন অংশে যতক্ষণ রাতের এক তৃতীয়াংশ থাকবে, ততক্ষণ সেখানে আল্লাহর অবতরণ বর্তমান থাকবে। রাত শেষ হয়ে গেলে তা শেষ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর অবতরণের ধরণ আমরা জানি না। তার সঠিক জ্ঞানও আমাদের কাছে নেই। আর আমরা জানি আল্লাহর মত আর কেউ নেই। আমাদের উচিত হবে আল্লাহর কিতাবের সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং এ কথা বলা যে, আমরা শুনলাম এবং ঈমান আনয়ন করলাম ও অনুসরণ করলাম। এটাই আমাদের করণীয়।[১]

আল্লাহকে দেখার মাসআলায় সালাফে সালিহীনের অভিমত কি?

---

১. এরপরও বলব, আল্লাহ তো সেই পাক জাতের নাম যার নিকট সকল প্রকারের অসম্ভব সম্ভব। মানুষের সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান ও বিবেকে যা ধরে না অতি সহজেই তা করতে পারেন। (সম্পাদক)

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪২) আল্লাহকে দেখার মাসআলায় সালাফে সালিহীনের অভিমত কি? যারা বলে যে, চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় বরং আল্লাহকে দেখার অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানের নামান্তর, তাদের হুকুম কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে কিয়ামাতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

অর্থ ঃ সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ ঃ ২২-২৩)

আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় যে, কিয়ামাত দিবসে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ্কে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, সকল দিক থেকে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যাবে।

﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

অর্থ ঃ তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে না। (সূরা ত্বোহা ঃ ১১০)

জ্ঞানের মাধ্যমে কোন জিনিসকে আয়ত্ব করার বিষয়টি চোখের মাধ্যমে দেখে আয়ত্ব করার চেয়ে অধিকতর প্রশস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾

অর্থ ঃ দৃষ্টিসমূহ তাঁকে অনুধাবন করতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে তার আয়ত্বে রাখতে পারেন। (সূরা আন'আম ঃ ১০৩)

প্রকৃতপক্ষেই মানুষ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবে। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এর অনেক উর্ধ্বে। এটাই সালাফে সালিহীনের মাযহাব। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকা জান্নাতবাসীর জন্য হবে সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

এজন্যই নবী ﷺ দু'আয় বলতেন,

أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ

উচ্চারণ ঃ আস্-আলুকা লায্যাতান্ নাযরি ইলা ওয়াজ্হিকা।[১]

---

[১] - নাসায়ী- কিতাবুস্ সাহু।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার পরিতৃপ্তি প্রার্থনা করছি।

আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর স্বাদ খুবই বিরাট। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করেছে, সে কেবলমাত্র তা অনুভব করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর দিদার লাভে ধন্য করেন। যারা ধারণা করে যে, আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয় বরং আল্লাহকে দেখার অর্থ পরিপূর্ণভাবে অন্তর দিয়ে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার নামান্তর, তাদের কথা বাত্বিল এবং দলীল বিরোধী। প্রকৃত অবস্থা এ ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কারণ, অন্তরের পরিপূর্ণ বিশ্বাস দুনিয়াতেই বর্তমান রয়েছে।

নবী ﷺ ইহসানের ব্যাখ্যায় বলেন,

﴿أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾

অর্থ ঃ ইহসান হল তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।[১]

তুমি এমন ঈমান নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। এটিই পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়। যে সমস্ত আয়াত ও হাদীসে আল্লাহকে দেখার কথা আছে, সেগুলোকে অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল এবং কুরআনের আয়াতকে তার আসল অর্থ হতে পরিবর্তন করার শামিল। যে ব্যক্তি এ ধরনের ব্যাখ্যা করবে তার প্রতিবাদ করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ (৪৩) জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর ঃ সন্দেহ নেই যে, জিনেরা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কষ্ট দিতে পারে। কখনো জিনেরা মানুষকে মেরে ফেলে। কখনো বা পাথর নিক্ষেপ করে এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়। জিনদের এ সকল কর্ম হাদীস এবং বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার মাধমে প্রমাণিত। নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধে জনৈক সাহাবীকে তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কারণ, তিনি নতুন বিবাহিত যুবক ছিলেন। ঘরে ফিরে যুবক দেখলেন, স্ত্রী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ দেখে তিনি তার প্রতি মনক্ষুণ্ন হলে স্ত্রী বললেন, ঘরে প্রবেশ করুন। ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন বিছানার উপরে একটি

[১] - বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান

www.pathagar.com

সাপ দেহ পেচিয়ে বসে রয়েছে। তার হাতেই ছিল বর্শা। বর্শা দিয়ে সাপকে আঘাত করার সাথে সাথে সাপটি মারা গেল এবং উক্ত সাহাবীও মৃত্যুবরণ করলেন। সাপ এবং সাহাবীর মধ্যে কে আগে মারা গেল, তা জানা যায়নি। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি ঘরের ভিতরের সাপগুলো মারতে নিষেধ করলেন। তবে পিঠের উপরে রেখা বিশিষ্ট এবং লেজহীন ছোট ছোট সাপগুলো ব্যতীত।[১] এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, জিনেরা মানুষের উপরে আক্রমণ করে এবং কষ্ট দেয়। মুতাওয়াতের[২] এবং মাশহুর[৩] সনদে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মানুষ কখনো কখনো পুরাতন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করলে পাথর নিক্ষিপ্ত হয়। অথচ সেখানে কোন মানুষ দেখতে পায় না। কখনো কখনো আওয়াজ এবং গাছের পাতার নাড়াচাড়া শুনতে পায়। এতে মানুষ কষ্ট পায়। এমনিভাবে আসক্ত হয়ে কিংবা কষ্ট দেয়ার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে জিন মানুষের শরীরেও প্রবেশ করে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ বলেন,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ﴾

অর্থ ঃ যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামাতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি শয়তান (জিন) আছর করে ভারসাম্যহীন পাগলবৎ করে দেয়।

(সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

কখনো জিনেরা মানুষের শরীরে মিশে গিয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বলে। জিনে ধরা রোগীর কাছে কবিরাজ যখন কুরআনের আয়াত পাঠ করে, তখন জিন তার সাথে কথা বলে। কবিরাজ জিনের কাছ থেকে পুনরায় না আসার অঙ্গীকার গ্রহণ করে। এ ধরনের আরো কথা হাদীসে বর্ণিত আছে এবং জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, জীনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সুন্নাহ্তে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করতে হবে। তার মধ্যে আয়াতুল কুরসী অন্যতম। কোন লোক রাত্রিতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ হতে একজন হিফাযতকারী থাকে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটেও আসতে পারে না।

---

[১] - বুখারী- অধ্যায় ঃ বাদউল খাল্ক

[২] - মুতাওয়াতির ঃ এমন হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনাকারী প্রতিটি স্তরের এত বেশী যে, তাদর মিথ্যা কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে একমত হওয়া অসম্ভব।

[৩] - মাশহুর ঃ এমন হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক তবে মুতাওয়াতির চেয়ে কম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪৪) জিনেরা কি গায়েব জানে?

উত্তর ঃ জ্বীনেরা গায়েব জানে না। আল্লাহ ব্যতীত আকাশ-জমিনের কোন মাখলুকই গায়েবের খবর রাখে না।

আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾

অর্থ ঃ যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জীনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এ লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। (সূরা সাবা ঃ ১৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি 'ইল্‌মে গায়েবের দাবী করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কাউকে 'ইল্‌মে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করবে, সেও কাফির। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।

আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ﴾

অর্থ ঃ বলুন আকাশ-যমীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। (সূরা নাম্‌ল ঃ ৬৫)

যারা ভবিষ্যতের সংবাদ জানে বলে দাবী করে, তাদেরকে গণক বলা হয়। নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে কোন কিছু জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত কবূল হবে না।[১] গণকের কথা বিশ্বাস করলে কাফিরে পরিণত হবে। কারণ, গণকের কথা বিশ্বাসের মাধ্যমে সে আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল।

আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ﴾

---

১ - মুসলিম- অধ্যায় ঃ কিতাবুস সালাম

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আকাশ-জমিনে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। (সূরা নামল ঃ ৬৫)

প্রশ্ন ঃ (৪৫) যারা আল্লাহ্র নবী ﷺ-কে হাবীবুল্লাহ (আল্লাহ্র হাবীব) বলে তাদের হুকুম কি?

উত্তর ঃ নবী ﷺ আল্লাহর বন্ধু। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর কাছে তিনি প্রিয়। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম গুণাবলী রয়েছে। তা হল খালীলুল্লাহ্ বা আল্লাহর নিকটতম বন্ধু। সুতরাং রাসূল ﷺ আল্লাহর বন্ধু। তিনি বলেন,

انَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً.

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১] যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে হাবীবুল্লাহ গুণে গুণান্বিত করল, সে নবী ﷺ-এর মর্যাদা কমিয়ে দিল। হাবীবুল্লাহ্র চেয়ে খলীলুল্লাহ্র মর্যাদা বেশী। প্রতিটি মু'মিনই আল্লাহর হাবীব। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা এর চেয়ে বেশী। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে খলীল বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এজন্যই আমরা বলি যে, মুহাম্মাদ ﷺ খলীলুল্লাহ্। কারণ, হাবীবুল্লাহ্র চেয়ে খলীলুল্লাহ্র ভিতরে বন্ধুত্বের অর্থ বেশী পরিমাণে বর্তমান রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ (৪৬) ব্যবসায়ী স্বার্থ হাসিলের জন্য নবী ﷺ-এর প্রশংসা করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের জন্য নবী ﷺ-এর প্রশংসা করা হারাম। এখানে জানা দরকার যে, নবী ﷺ-এর প্রশংসাকারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত।

১) বাড়াবাড়ি ব্যতীত নবী ﷺ-এর প্রশংসা করাতে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে যে সমস্ত সৎ গুণাবলী রয়েছে, তা বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই।

২) নবী ﷺ-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা। তিনি এটা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

অর্থ ঃ নাসারা সম্প্রদায় যেমনভাবে 'ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা সেভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না।

---

[১] - ইবনে মাজাহ- অধ্যায় ঃ মুকাদ্দামাহ

আমি একজন আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বল।[১]

অতএব যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর প্রশংসা এভাবে করবে যে, তিনি আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় দাতা, বিপদগ্রস্তের আহ্বানে সাড়া দানকারী, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, তিনি গায়েবের খবর জানেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসা করা হারাম। বরং কখনো ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুতরাং বেশী বাড়াবাড়ি করে নবী ﷺ-এর প্রশংসা করা ঠিক নয়।

রাসূল ﷺ-এর প্রশংসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে দুনিয়ার স্বার্থ অর্জন করা হারাম। রাসূল ﷺ যে সমস্ত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তা বর্ণনা করা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। যা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত তাকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়।

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হল সেসব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হয়েছে।

(সূরা হূদ ঃ ১৫-১৬)

আল্লাহই সঠিক পথের সন্ধান দাতা।

নবী ﷺ কি নূরের তৈরী?

প্রশ্ন ঃ (৪৭) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবী ﷺ প্রার্থনা করে এ বিশ্বাসে যে, তিনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, তার হুকুম কি? এ ধরনের লোকের পিছনে সলাত আদায় করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করবে যে, নবী ﷺ আল্লাহর নূর- (বা আল্লাহ জাতি নূর) মানুষ নন, তিনি গায়েবের খবর জানেন, সে আল্লাহ এবং

[১] - বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবু আহাদিসুল আম্বিয়া

www.pathagar.com

রাসূলের সাথে কুফরী করল। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন, বন্ধু নয়। কেননা তার কথা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে কাফির।

আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।

(সূরা কাহফ ঃ ১১০)

আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ﴾

অর্থ ঃ আকাশ-জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। (সূরা নামল ঃ ৬৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ অহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। (সূরা আন'আম ঃ ৫০)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনো হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদদাতা। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৮)

﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي﴾

অর্থ ঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে

www.pathagar.com

দিও।[১] যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এ বিশ্বাসে যে, নবী ﷺ ভাল-মন্দের মালিক, সে কাফির।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থ ঃ তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে অপমানিত অবস্থায়। (সূরা গাফির ঃ ৬০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

অর্থ ঃ বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (সূরা জিন ঃ ২১-২২)

নবী ﷺ তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে বলেছেন,

لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না।[২] নবী ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমা ও ফুফু সাফিয়াকে একই কথা বলেছেন।

যে ব্যক্তি তাকে নূরের তৈরী বলে বিশ্বাস করে তাকে ইমাম নিয়োগ করা এবং তার পিছনে সলাত আদায় করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ (৪৮) ইমাম মাহদীর আগমন সংক্রান্ত হাদীসগুলো কি সহীহ?

উত্তর ঃ মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো চারভাগে বিভক্ত।

১) মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস

২) যঈফ হাদীস

৩) হাসান হাদীস

৪) সহীহ হাদীসেও ইমাম মাহদীর আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে ইরাকের সিরদাব নামক স্থানে লুকায়িত রাফিজীদের কল্পিত মাহদীর সাথে

[১] - বুখারী- অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সালাহ।

[২] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ওসায়া

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত মাহদীর কোন সম্পর্ক নেই। এটি রাফিজীদের পক্ষ থেকে একটি বানোয়াট কাহিনী। সহীহ হাদীসে যে মাহদীর কথা বলা হয়েছে, তিনি অন্যান্য বানী আদমের মতই একজন লোক হবেন। তিনি যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন। এটিই ইমাম মাহদীর প্রকৃত ঘটনা। সুতরাং ইরাকের সিরদাব অঞ্চলে লুকায়িত মাহদীর আগমনে বিশ্বাস করা ভুল। নবী ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত ইমাম মাহদীর আগমন সত্য।

প্রশ্ন ঃ (৪৯) ইয়া'জূজ-মা'জূজ কারা?

উত্তর ঃ ইয়া'জূজ মা'জূজ বানী আদমের অন্তর্ভুক্ত দু'টি জাতি। তারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যুল-কারনাইনের ঘটনায় বলেন,

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾

অর্থ ঃ অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে যুল-কারনাইন, ইয়া'জূজ ও মা'জূজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাঁপরে ফুঁক দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস। আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়া'জূজ ও মা'জূজের দল তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। যুল-কারনাইন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার

www.pathagar.com

অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৯৩-৯৮)

নবী ﷺ বলেন,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন আদমকে ডাক দিবেন। আদম (আঃ) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির আছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার বংশধর থেকে জাহান্নামী দলকে পৃথক কর। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামের দল কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেক এক হাজারের মধ্যে থেকে নয়শত নিরানব্বই জন। তখন কোলের শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে। গর্ভবতী মহিলারা সন্তান প্রসব করে দেবে। মানুষদেরকে আপনি মাতাল অবস্থায় দেখবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন। সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে থেকে কে হবে সেই এক ব্যক্তি? নবী ﷺ বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের মধ্যে থেকে হবে সেই এক ব্যক্তি। আর বাকীরা হবে ইয়া'জূজ-মা'জূজের দল।[১]

ইয়া'জূজ-মা'জূজের দল বের হয়ে আসা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। নবী ﷺ-এর যুগেই ইয়া'জূজ-মা'জূজ বের হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা পেরেশান ও রক্তিম চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বলছিলেন,

﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا﴾

অর্থ ঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। আরবদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। অকল্যাণ নিকটবর্তী হয়ে গেছে। ইয়া'জূজ-মা'জূজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে দেয়া

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ আহাদীসুল আম্বিয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। এই বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি অঙ্গুলি দিয়ে গোলাকৃতি করে দেখালেন।[১]

প্রশ্ন ঃ (৫০) নবীগণ কেন তাঁদের উম্মাতকে দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে সাবধান করেছেন? অথচ দাজ্জাল তো শেষ যামানাতেই বের হবে।

উত্তর ঃ আদম সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীতে দাজ্জালের ফিত্‌না হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা। নবী ﷺ এ সংবাদ দিয়েছেন। এজন্য নূহ (আঃ) থেকে আরম্ভ করে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবীই তাঁদের সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। যাতে তারা সাবধান থাকতে পারে এবং দাজ্জালের বিষয়টি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলদের দায়িত্ব হল তাঁদের উম্মাতকে সকল প্রকার অনিষ্ট হতে সাবধান করা।

নবী ﷺ বলেছেন,

﴿إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ﴾

অর্থ ঃ আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকাবস্থায় দাজ্জাল যদি বের হয়, তাহলে আমি একাই তার সাথে যুদ্ধ করব এবং তাকে প্রতিহত করব। আমি চলে গেলে যদি তার আগমন ঘটে, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে তার ফিতনা থেকে রক্ষা করবে। আমার পরে আল্লাহ্‌ই প্রতিটি মুসলিম এর জন্য দায়িত্বশীল।[২]

যেহেতু দাজ্জালের ফিত্‌না পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় ফিতনা, তাই বিশেষভাবে সলাতের মধ্যে নবী ﷺ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি শেষ বৈঠকে এ দু'আটিও পাঠ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিত্‌না হতে।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ফিতান

[২] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ফিতান

www.pathagar.com

দাজ্জাল শব্দটি (دجـل) হতে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা ইত্যাদি। দাজ্জাল যেহেতু সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী, তাই তাকে দাজ্জাল বলে নাম রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ (৫১) যারা পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস করে, তাদের কিভাবে বুঝানো সম্ভব?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করবে এবং বলবে এটি মধ্যযুগের কল্পিত কাহিনীমাত্র, সে কাফির।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

অর্থ ঃ তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন, অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। (সূরা আন'আম ঃ ২৯-৩০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾

অর্থ ঃ সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপীরাই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, এটা পুরাতনকালের রূপকথা। কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো না তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (সূরা আত্-তাতফীফ ঃ ১০-১৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾

অর্থ ঃ বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে। যে কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। (সূরা ফুরক্বান ঃ ১১)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা 'আনকাবুত ঃ ২৩)

যারা পরকালকে অবিশ্বাস করে তাদের কাছে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করা হবে ঃ

প্রথমতঃ কিয়ামত এবং পরকালের বিষয়টি নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে আসমানী কিতাবসমূহে মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাদের উম্মাতগণ তা কবূল করে নিয়েছে। তোমরা কিভাবে নবী-রাসূলদের কথা অমান্য করে পরকালকে অস্বীকার কর? অথচ দার্শনিক কিংবা কোন বাতিল ফির্কার প্রবর্তকের কথা বিশ্বাস করে থাক।

দ্বিতীয়তঃ কিয়ামাত হওয়ার বিষয়টি বিবেক দ্বারাও স্বীকৃত এবং সমর্থিত। তা কয়েকভাবে হতে পারে ঃ

১) প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, সে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে। যে প্রথমবার অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾

অর্থ ঃ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য তুলনামূলকভাবে অতি সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

অর্থ ঃ যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৪)

২) আকাশ-যমীনের সৃষ্টির বড়ত্ব ও অভিনবত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যিনি এ দু'টিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে এবং পুনরায় তাদের প্রথমবারের মত সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আল্লাহ বলেন, ﴿لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় আকাশ-জমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড়।
(সূরা গাফির/মু'মিন ঃ ৫৭)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

অর্থ ঃ তারা কি জানে না যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আহক্বাফ ঃ ৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

অর্থ ঃ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলে দেন, হও তখনই তা হয়ে যায়।
(সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১-৮২)

৩) প্রত্যেক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যমীনকে মৃত অবস্থায় দেখে। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে তা উর্বর হয়ে উঠে এবং সেখানে নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যিনি মৃত যমীনকে জীবিত করতে পারেন, তিনি মৃত মানুষকেও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর অবস্থায় পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন শস্যশ্যামলও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। (সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৯)

৪) বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, তা পুনরুত্থান সম্ভব হওয়ার সত্যতা প্রমাণ বহন করে। সূরা বাকারাতে এ ধরনের পাঁচটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

অর্থ ঃ অথবা সে ব্যক্তির অনুরূপ যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যা দেওয়াল বিধ্বস্ত ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে (এর অধিবাসীদেরকে) জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়। বললেন, তা নয়, বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে। সেগুলো পঁচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সূরা বাক্বারা ঃ ২৫৯)

৫) প্রতিদান পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পুনরুত্থান আবশ্যক। তা না হলে মানুষ সৃষ্টির কোন মূল্য থাকে না এবং পার্থিব জীবনে মানুষ ও পশুর মাঝেও কোন পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

www.pathagar.com

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

অর্থ ঃ তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না। অতএব শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১৫-১১৬)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾

অর্থ ঃ কিয়ামাত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। (সূরা ত্বো-হা ঃ ১৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

অর্থ ঃ তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং কাফিরেরা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। তখনই তা হয়ে যায়। (সূরা নাহল ঃ ৩৮-৪০)

আল্লাহ বলেন,

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ﴾

অর্থ ঃ কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন ঃ ৭)

www.pathagar.com

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য উপরোক্ত প্রমাণগুলো পেশ করার পরও যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে যালিমরা অতিসত্বরই তাদের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হবে।

প্রশ্ন ঃ (৫২) কবরের আযাব কি সত্য?

উত্তর ঃ কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত, সুস্পষ্ট সুন্নাত এবং মুসলিমদের ঐকমত্যে কবরের আযাব সত্য। নবী ﷺ বলেছেন,

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ ঃ তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কথাটি নবী ﷺ তিনবার বলেছেন।[১] সকল মুসলমানই সলাতে বলে,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব এবং কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সাধারণ মানুষ এবং আলিম-উলামা সবাই এই দু'আটি পাঠ করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

অর্থ ঃ সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফিরা'আওন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও। (সূরা গাফির/মু'মিন ঃ ৪৬)

কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে আনন্দ-ফূর্তি করার জন্য জাহান্নামের আগুনের উপরে পেশ করা হবে না। বরং তার আযাব ভোগ করার জন্য।

আল্লাহ বলেন,

---

[১] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জান্নাত।

www.pathagar.com

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

অর্থ ঃ আপনি যদি যালিমদেরকে ঐ সময়ে দেখতে পেতেন, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আন। তোমাদের আমলের কারণে আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছিলে এবং তোমরা তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার করেছিলে। (সূরা আন'আম ঃ ৯৩)

এ আয়াতের মধ্যে "আজ" বলতে মৃত্যুর দিনকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলিমদের ঐকমত্যে কবরের আযাব সত্য।

স্বাভাবিক দাফন না হলেও কবরে আযাব হবে।

প্রশ্ন ঃ (৫৩) মৃত লাশকে যদি হিংস্র পশুরা খেয়ে ফেলে কিংবা আগুনে পুড়ায়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয় তবুও কি কবরের আযাব হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই হবে। কারণ, আযাব হবে রূহের উপর। কেননা শরীর মাটি হয়ে যাবে। তাছাড়া যেহেতু বিষয়টি গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ কথা বলা যাবে না যে, দেহের কোন আযাবই হবে না। যদিও তা নষ্ট হয়ে গেছে বা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিষয়টি পরকালের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াতে দৃশ্যমান কোন বস্তুর সাথে পরকালের গায়েবী বিষয়ের তুলনা চলে না।[১]

কবরের আযাব অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্ন ঃ (৫৪) এক শ্রেণীর লোক কবরের আযাব অস্বীকার করার পক্ষে দলীল পেশ করে যে, কবর খনন করলে দেখা যায় যে, লাশ রয়ে গেছে, কোন

---

[১] - এরপরও বলা হয় যে, দেহটি পুড়ে গেলে বা কোন জন্তুতে ভক্ষণ ফেললে মানুষের জ্ঞানের পরিসর থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে গেলেও আল্লাহর জ্ঞান পরিসরে বিদ্যমান থাকে। সুতরা আল্লাহর পক্ষে সেই মৃত ব্যক্তির উপর আযাব প্রয়োগ বা শাস্তি প্রদান অসম্ভব নয়। যেমন আমাদের কর্মের ভিতর থেকে একটি উদাহরণ, একটি বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ অন করে ফুল পাওয়ার দিলে দৃষ্টিগোচরে থাকতে থাকতে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়। অথচ আমি বিশ্বাস করি আছে, আর বাস্তবেও সুইচ অফ করেদিলে দেখতে পাই। আল্লাহর মহিমাতো আরো বাস্তবসম্মত হওয়ার কথা (সম্পাদক)

www.pathagar.com

পরিবর্তন হয়নি, কবর সংকীর্ণ অথবা প্রশস্তও হয়নি। আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?

উত্তর ঃ আমরা বলব কবরের আযাব কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

অর্থ ঃ সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে। সেদিন আদেশ করা হবে, ফিরআওন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও। (সূরা গাফির ঃ ৪৬)

নবী ﷺ বলেছেন,

فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ তোমরা যদি দাফন না করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, যা আমি নিজে শ্রবণ করে থাকি। অর্থাৎ তোমরা যেহেতু একে অপরকে দাফন করে থাক, তাই আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা বাদ দিলাম। কারণ, তোমরা কবরের আযাব শুনতে পেলে দাফন করা বাদ দিবে। অতঃপর নবী ﷺ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন,

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন,

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১] নবী ﷺ মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন,

يُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ

অর্থ ঃ তার কবরকে চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

এমনি আরো অনেক দলীল রয়েছে, যা শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করা মোটেই জায়েয নয়। বরং তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নেয়া আবশ্যক। তাছাড়া কবরের আযাব হবে রূহের উপরে। শরীরের উপরে নয়। যদি শরীরের উপরে হত এবং তা দেখা যেত, তাহলে বিষয়টি গায়েবের উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হত না। কিন্তু কবরের আযাবের বিষয়টি আলমে বরযখের তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার প্রকাশ্য বিষয়াদি দ্বারা এটাকে উপলব্ধি করা যাবে না।

কবরের আযাব, শান্তি, প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণতা এসব বিষয় কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে। অন্য কেউ নয়। কখনো কখনো মানুষ স্বপ্নে দেখে যে, সে কোথাও যাচ্ছে, আকাশে উড়ছে, কাউকে প্রহার করছে কিংবা তাকে কেউ প্রহার করছে। আরো দেখে যে, সে এক সংকীর্ণ স্থানে আছে অথবা প্রশস্ত কোন স্থানে আনন্দময় জীবন যাপন করছে। অথচ ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশের লোকেরা কিছুই অনুভব করতে পারে না। সুতরাং আমাদের উচিত এ সমস্ত বিষয় শ্রবণ করা, বিশ্বাস করা এবং আনুগত্য করা।

প্রশ্ন ঃ (৫৫) পাপী মু'মিনের কবরের আযাব কি হালকা করা হবে?

উত্তর ঃ কখনো কখনো কবরের আযাব হালকা করা হবে। কারণ, নবী ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, এ দু'জনকে কবরের মধ্যে আযাব দেয়া হচ্ছে, তবে বড় কোন অপরাধের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রসাব থেকে ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করত না আর দ্বিতীয়জন চোগলখোরী করত অর্থাৎ একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাতো। অতঃপর নবী ﷺ একটি তাজা খেজুরের শাখা নিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরের উপরে একটি পুঁতে দিয়ে বললেন, সম্ভবত খেজুরের শাখা দু'টি শুকানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব হালকা করা হবে। এ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, আযাব কখনো হালকা করা হয়। তবে প্রশ্ন রয়ে যায় যে, আযাব হালকা হওয়ার সাথে খেজুরের শাখার সম্পর্ক কি?

---

[১] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জান্নাহ

www.pathagar.com

উত্তরে বলা যায় যে, খেজুরের শাখা তাজা থাকাকালে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তাসবীহ মৃতের কবরের আযাব হালকা করে থাকে। এর উপর ভিত্তি করে আযাব হালকা হওয়ার আশায় কেউ যদি কবরের পাশে তাসবীহ পাঠ করে, তাহলে জায়েয হবে না। কোন কোন আলিম বলেছেন, তাজা খেজুরের শাখা তাসবীহ পাঠ করে বলে আযাব হালকা করা হয়, এ কারণটি দুর্বল। তাজা বা শুকনো সকল বস্তুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে।

আল্লাহ বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

অর্থ ঃ সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই (তাসবীহ পাঠ অর্থাৎ) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

রাসূল ﷺ পাথরের তাসবীহ শুনতে পেতেন। অথচ পাথর জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে আযাব হালকা করার মূল কারণ কি?

উত্তরে বলা যায় যে, তিনি খেজুরের শাখা দু'টি জীবিত থাকা পর্যন্ত কবরের আযাব হালকা করার জন্য দু'আ করেছিলেন। বুঝা গেল শাস্তি মূলতবী থাকার সময়সীমা বেশী দিন দীর্ঘ ছিল না। নবী ﷺ তাদের কর্ম হতে সাবধান করার জন্যই এ রকম করেছিলেন। কারণ, তাদের কাজ দু'টি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের একজন প্রসাব থেকে ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করত না। অন্যজন মানুষের মাঝে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশে একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাতো। এটা করা কবীরা গুনাহ। নবী ﷺ তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করার জন্য সাময়িক সুপারিশ করেছেন।

কতক আলিম বলেছেন, কবরের আযাব হালকা করার জন্য কবরের উপরে খেজুরের শাখা অথবা গাছ পুঁতে রাখা সুন্নাত। কিন্তু এ ধরনের দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। কারণ,

১) আমরা জানি না যে, এ কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে কি না।

২) আমরা যদি কবরের উপরে তা রাখি, তাহলে আমরা মৃতের উপরে খারাপ আচরণ ও মন্দ ধারণা পোষণ করলাম। আমরা জানি না, হতে পারে সে শান্তিতে আছে। হতে পারে এ মৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে

মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই সে আযাব থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

৩) সালাফে সালিহীনদের কেউ কোন কবরের উপরে খেজুরের শাখা রাখতেন না। অথচ তারা আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

৪) নবী ﷺ আমাদেরকে খেজুরের শাখা পুঁতে রাখার চেয়ে ভাল জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তির দাফন সমাধা করার পর তিনি বলতেন,

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য ঈমানের উপর অটল থাকার তাওফীক কামনা কর। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞেস করা হবে।[১]

প্রশ্ন ঃ (৫৬) শাফাআত কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ শাফাআত শব্দটির আভিধানিক অর্থ মিলিয়ে নেয়া, নিজের সাথে একত্রিত করে নেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় কল্যাণ লাভ অথবা অকল্যাণ প্রতিহত করার আশায় অপরের জন্য মধ্যস্থতা করাকে শাফাআত বলে। শাফাআত দু'প্রকার। যথা ঃ

১) শরীয়ত সম্মত শাফাআত। কুরআন ও সুন্নাহ্য় এ প্রকার শাফাআতের বর্ণনা এসেছে। তাওহীদপন্থীগণ এ ধরনের শাফাআতের হকদার হবে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন,

مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

অর্থ ঃ কিয়ামাতের দিন কোন ব্যক্তি আপনার শাফাআতের বেশী হকদার হবে? নবী ﷺ বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার হাদীস শেখার আগ্রহ দেখে আমার ধারণা যে, তোমার পূর্বে এ বিষয় সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ

[১] - আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জানায়েয।

www.pathagar.com

করবে, কিয়ামাতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফাআতের সবচেয়ে বেশী হকদার হবে।[১] এ প্রকার শাফাআতের জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে।

১-শাফাআতকারীর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

২-যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার উপরও আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

৩-শাফাআতকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে শাফাআত করার অনুমতি থাকা।

আল্লাহ তা'আলা এ শর্তগুলো কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

অর্থ ঃ আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছেন, যাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন এবং যাকে শাফাআত করার অনুমতি দেন তার কথা ভিন্ন। (সূরা নাজ্‌ম ঃ ২৬)

আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾

অর্থ ঃ কে এমন আছে যে, সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَئِذٍ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً﴾

অর্থ ঃ দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (সূরা ত্বো-হা ঃ ১

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَى﴾

অর্থ ঃ তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৮)

সুতরাং শাফাআত পাওয়ার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্ত থাকা আবশ্যক। অতঃপর শাফাআত দু'প্রকার।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল 'ইল্‌ম

www.pathagar.com

১) সাধারণ শাফাআত ঃ সাধারণ শাফাআতের অর্থ হল সৎ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা এবং যার জন্য ইচ্ছা আল্লাহ শাফাআত করার অনুমতি দিবেন। এ ধরনের শাফাআত আমাদের নবী ﷺ, অন্যান্য নবী-রাসূল, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ সুপারিশ করবেন। তাঁরা পাপী মু'মিনদেরেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে আনার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন।

২) বিশেষ ও নির্দিষ্ট সুপারিশ ঃ এ ধরনের শাফাআত নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট। এ শাফাআতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল হাশরের মাঠের শাফাআত। হাশরের মাঠে মানুষ যখন বিপদে পড়ে যাবে এবং অসহনীয় আযাবে গ্রেপ্তার হবে, তখন তাদের জন্য সুপারিশ করার জন্য একজন সুপারিশকারী খুঁজবে। যাতে তারা এ মহান সংকট থেকে রেহাই পেতে পারে। তারা আদম (আঃ)-এর কাছে গমন করবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাবে। তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। অবশেষে তারা নবী ﷺ-এর কাছে আসবে। তিনি মানুষকে এ বিপদজনক অবস্থা হতে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাঁর দু'আ এবং শাফাআত কবূল করবেন। এটিই হল সুমহান মর্যাদা, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾

অর্থ ঃ রাত্রির কিছু অংশ জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আপনার পালনকর্তা অচিরেই আপনাকে সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

নবী ﷺ যে সমস্ত সুপারিশ করবেন, তার মধ্যে জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের করানোর সুপারিশ অন্যতম। জান্নাতবাসীগণ যখন পুলসিরাত পার হবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সেতুর উপরে আটকানো হবে। সেখানে তাদের পারস্পরিক যুল্‌ম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। প্রতিশোধ নেয়া ও পারস্পরিক যুল্‌ম-নির্যাতন হতে পবিত্র করার পর জান্নাতে প্রবেশ অনুমতি দেয়া হবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুপারিশক্রমে জান্নাতের দরজা খোলা হবে।

২) শরীয়ত বিরোধী শাফাআত ঃ এ ধরনের শাফাআত কোন কাজে আসবে না। মুশরিকরা আল্লাহর নিকটে তাদের বাতি্বল মা'বূদদের কাছ থেকে এ

www.pathagar.com

ধরনের শাফাআতের আশা করে থাকে। অথচ এ শাফাআত তাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

অর্থ ঃ কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের উপকারে আসবে না।

(সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪৮)

কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের শির্কের উপরে সন্তুষ্ট নন। তাদের জন্য শাফাআতের অনুমতি দেয়াও সম্ভব নয়। আল্লাহ্ যার উপর সন্তুষ্ট হবেন, কেবল তার জন্যই সুপারিশ বৈধ। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য ফাসাদ ও কুফরী পছন্দ করেন না। মুশরিকরা তাদের মূর্তিদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের উপাসনায় লিপ্ত হত।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ﴾

অর্থ ঃ এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। (সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

সুতরাং মুশরিকরা তাদের বানোয়াট মূর্তিদের উপাসনা করার পিছনে যুক্তি ছিল যে, মূর্তিরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এটা তাদের মূর্খতার পরিচয়। কারণ, তারা এমন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, যা তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ (৫৭) মু'মিনদের শিশু বাচ্চাদের পরিণাম কি? মুশরিকদের যে সমস্ত শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে, তাদের অবস্থা কি হবে?

উত্তর ঃ মু'মিনদের শিশু সন্তানগণ তাদের পিতাদের অনুসরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

অর্থ ঃ যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে।

(সূরা তূর ঃ ২১)

অমুসলিমদের নাবালক শিশুদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হল, আমরা বলব আল্লাহ্ই ভাল জানেন তারা কি আমল করত। দুনিয়াতে তারা তাদের পিতা-

www.pathagar.com

মাতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আখিরাতে তাদের অবস্থা কি হবে আল্লাহই ভাল জানেন। নবী ﷺ থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।[১] পরকালে তাদের কি হবে সেটা জানার ভিতরে আমাদের কোন লাভ নেই। দুনিয়াতে তাদের বিধান হল, তারা প্রাপ্তবয়স্ক মুশরিকদের মতই হবে। মারা গেলে তাদেরকে গোসল দেয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না, তাদের উপর জানাযার সলাত আদায় হবে না এবং মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৫৮) জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল মহিলাদের জন্য কি আছে?

উত্তর ঃ জান্নাতীদের নিয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾

অর্থ ঃ সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবী কর। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৩১)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ ঃ এবং তথায় রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭১)

এটা জানা কথা যে, মন যা চায়, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল বিবাহ করার মনোবাসনা। তা জান্নাতীদের জন্য অর্জিত হবে। চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁকে তাঁর দুনিয়ার স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়ে দিবেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

অর্থ ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে প্রবেশ করাও চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা গাফির ঃ ৮)

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জানায়েয

প্রশ্ন ঃ (৫৯) মহিলারা বেশী সংখ্যায় জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ কি?

উত্তর ঃ মহিলারা বেশী সংখ্যায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে কথাটি ঠিক। কেননা নবী ﷺ একদা খুৎবা প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

﴿يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ﴾

অর্থ ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী করে সদাকা কর। কারণ, আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামে দেখেছি। কেন তারা অধিক হারে জাহান্নামে যাবে এ প্রশ্ন নবী ﷺ-কে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশী পরিমাণে মানুষের উপরে অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর সদাচারণ অস্বীকার কর।[১] নবী ﷺ এ হাদীসে নারীদের বেশী হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশী পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে, অভিশাপ করে এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

তাকদীরের মাসআলা এড়িয়ে চলার বিধান।

প্রশ্ন ঃ (৬০) পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যারা তাকদীরের মাসআলাসহ আকীদার বিভিন্ন বিষয় পাঠ করা পছন্দ করেন না, তাদের জন্য আপনার উপদেশ কি?

উত্তর ঃ তাকদীরের বিষয়টি আকীদার অন্যান্য মাসআলার মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। মানুষের উচিত এ মাসআলাটি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা অর্জন করা। কেননা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্দেহের উপর থাকা ঠিক নয়। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় না শিখলে অথবা বিলম্বে শিখলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, তা অবশ্যই শিখতে হবে। তাকদীরের মাসআলাটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যা ভালভাবে শিক্ষা করা প্রতিটি বান্দার উপর আবশ্যক। মূলতঃ তাকদীরের মাসআলায় কোন সমস্যা নেই। মানুষের কাছে আকীদার আলোচনা কঠিন হওয়ার অন্যতম কারণ হল, তারা আকীদা শিখতে গিয়ে 'কিভাবে' কথাটিকে 'কেন' কথার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ মানুষকে তার আমলের ব্যাপারে দু'টি প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। কেন করলে এবং কিভাবে করলে। আমলটি কেন করেছো এটি হল ইখলাস সম্পর্কে

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল হাঈজ

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করা। আর কিভাবে করেছো এটি হল রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ কিভাবে করেছো এটির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেন করতে হবে এ বিষয়টির প্রতি তেমন কোন গুরুত্বই দেয় না। রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চায়। আকীদার বিষয়টির উপরে কোন গুরুত্ব দেয় না। দুনিয়ার মাসআলায় মানুষ খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। অথচ আকীদাহ, ইখলাস ও তাওহীদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল। কিছু কিছু মানুষ বর্তমানে দুনিয়া পূজারী হয়ে গেছে। অথচ সে টেরও পাচ্ছে না। অনেক মানুষ আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত হয়েছে। অথচ সে অনুভবও করতে পারে না। আকীদার বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলিম সমাজ পর্যন্ত কেউ গুরুত্ব প্রদান করে না। এ বিষয়টি খুবই ভয়াবহ। অবশ্য বিনা আমলে শুধুমাত্র আকীদার উপরে গুরুত্ব দেয়াও ভুল। কারণ, আমল হল আকীদা সংরক্ষণের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। আমরা রেডিও-টিভি এবং পত্র-পত্রিকায় শুনতে পাই যে, পরিচ্ছন্ন আকীদাই হল দ্বীন। আমল না করে এভাবে শুধুমাত্র আকীদার উপরে গুরুত্ব দেয়াতে দ্বীনের কিছু কিছু হারাম বিষয়কে হালাল করে নেয়ার আশংকা রয়েছে। এ যুক্তিতে যে, আকীদা ঠিক আছে।

মোট কথা এই যে, মানুষের উপর আকীদার বিষয়গুলো শিক্ষা করা আবশ্যক। যাতে করে তারা আল্লাহর নাম, গুণাবলী এবং কর্মক্ষমতা ও তাঁর বিধানাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে পারে। নিজে বিভ্রান্ত না হয় এবং অপরকে বিভ্রান্ত না করে। তাওহীদের জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এজন্য বিদ্বানগণ 'ইল্‌মে তাওহীদকে 'ফিক্‌হে আকবার' বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্‌হ বলে নাম রেখেছেন।[১] নবী ﷺ বলেছেন,

﴿مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।[২] দ্বীনের জ্ঞানের মধ্যে তাওহীদের জ্ঞানের গুরুত্ব সর্বপ্রথম। সুতরাং মানুষের উপর

---

[১] -ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম "আল-ফিকহুল আক্‌বার"। গ্রন্থটিতে প্রচলিত ফিকহী মাসআলা সম্পর্কে কোনই আলোচনা নেই। বইটিতে কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্‌হ তথা তাওহীদের (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী) বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।
আফসোসের বিষয় এই যে, আমরা নিজেদেরকে হানাফী তথা ইমান আবূ হানীফার (রহ.) মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করি। অথচ আমরা তাঁর গৃহীত আকীদার সাথে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের আকীদার কোন সম্পর্ক নেই।

[২] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল 'ইল্‌ম

www.pathagar.com

আবশ্যক হল, এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করবে যে, কিভাবে সে তাওহীদের জ্ঞান অন্বেষণ করবে এবং কোন্ উৎস থেকে তা অর্জন করবে। প্রথমে সন্দেহ থেকে মুক্ত সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করবে। অতঃপর বিদ'আত ও সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জন করার পর সঠিক আকীদার আলোকে তার উত্তর দিবে। আকীদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের বক্তব্য, অতঃপর তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ীনে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য আলিমগণের লেখনী ও বক্তব্য থেকে গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে থেকে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানুষ কি নিজ কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন?

প্রশ্ন ঃ (৬১) সম্মানিত শায়খ! তাকদীরের মাসআলা বর্ণনা করুন। মানুষের মূল কাজ কি পূর্ব নির্ধারিত এবং কাজটি পালন করার নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ কি স্বাধীন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন মানুষের জন্য যদি নির্ধারিত থাকে যে, সে একটি মাসজিদ বানাবে। সে অবশ্যই মাসজিদ বানাবে। তবে কিভাবে বানাবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। এমনিভাবে পাপ কাজ নির্ধারিত থাকলে তা অবশ্যই করবে। কিভাবে করবে তা নির্ধারিত হয়নি। মোট কথা মানুষের তাকদীরের যে সমস্ত কর্ম নির্ধারিত আছে, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ তাকদীরের মাসআলা নিয়ে বহু দিন যাবৎ মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এজন্যই মানুষ তাকদীরের মাসআলাকে কেন্দ্র করে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে।

১) এক শ্রেণীর লোক আল্লাহর সাধারণ নির্ধারিত বিষয়কে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, মানুষ তার কর্মসমূহে সম্পূর্ণ বাধ্যগত। তার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। প্রচণ্ড বাতাসের কারণে ছাদের উপর থেকে কোন মানুষ নীচে পড়ে যাওয়া এবং স্বেচ্ছায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা তাদের দৃষ্টিতে একই রকম।

২) অন্য একদলের মতে মানুষ তার কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা আল্লাহর কুদরতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদের মতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনরূপে কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

www.pathagar.com

উভয় দলের মাঝখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাকদীরে বিশ্বাস করেন। সাথে সাথে তারা কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে বান্দার স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন। বান্দার কর্ম আল্লাহর নির্ধারণ এবং বান্দার নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। ছাদের উপর থেকে বাতাসের চাপে মাটিতে পড়ে যাওয়া এবং স্বেচ্ছায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার মাঝে মানুষ অবশ্যই পার্থক্য করতে জানে। প্রথমটিতে তার কোন ইচ্ছা ছিল না এবং দ্বিতীয়টি তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু উভয় কাজ আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। বান্দা আপন ইচ্ছায় যা নির্ধারণ করে থাকে, তা সম্পর্কেই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে তাকদীরের মাধ্যমে দলীল পেশ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা শরীয়ত বিরোধী কর্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সে আল্লাহর নির্ধারণ সম্পর্কে অবগত থাকে না। স্বেচ্ছায় পাপ কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়ার কারণেই দুনিয়া বা আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কাউকে পাপ কাজের উপর বাধ্য করা হলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। যেমন একজন অন্য জনকে জোরপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে মদপানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় সে পান করেনি। মানুষ ভাল করেই জানে যে, আগুন থেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা এবং বসবাসের জন্য সুন্দর ঘরবাড়ি নির্বাচন করা তাকদীর এবং তার আপন পছন্দ অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুন্দর ঘরবাড়ি নির্ধারণ এবং আগুন থেকে বাঁচার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ সে সুযোগ গ্রহণ করেনি, তাকে সুযোগ নষ্ট করার জন্য তিরস্কার করা হয়। সে নিজেও অনুতপ্ত হয়। তবে কি জন্যে সে পরকালের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার এবং জান্নাত আবশ্যককারী আমলগুলো ছেড়ে দেয়াকে নিজের অপরাধ মনে করবে না?

বর্ণিত প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি কারও তাকদীরে লিখে রাখেন যে, সে একটি মাসজিদ বানাবে, সে অবশ্যই মাসজিদটি বানাবে কিন্তু কিভাবে বানাবে সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এ উদাহরণটি ঠিক নয়। কেননা তাতে ধারণা করা হয় যে, নির্মাণের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বান্দার হাতে। এতে আল্লাহর কোন হাত নেই। সঠিক কথা এই যে, নির্মাণ করা এবং নির্মাণের পদ্ধতি সবই তাকদীরে নির্ধারিত। উভয়টি নির্বাচনে বান্দার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে তাকে বাধ্য করা হয়নি। যেমনভাবে তাকে আপন ঘরবাড়ি নির্মাণ বা মেরামত করতে বাধ্য করা হয়নি। তাকদীর সম্পূর্ণ গোপন বিষয়। অহীর মাধ্যমে যাকে আল্লাহ অবগত করান সেই কেবলমাত্র জানতে পারে। এমনিভাবে নির্মাণের পদ্ধতিও

www.pathagar.com

আল্লাহর নির্ধারণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সমস্ত জিনিসের বিবরণ বিস্তারিতভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাকদীরে লিখিত আছে।

আল্লাহ যে বিষয়ের ইচ্ছা করেন বা নির্ধারণ করেন, তা ব্যতীত বান্দার পক্ষে অন্য কিছু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। বরং বান্দা যখন কোন কিছু করে, তখন সে ভাল করেই জানে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সকল কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন আর বান্দা প্রকাশ্যভাবে তা সম্পাদন করে। বান্দা যখন কর্ম সম্পাদন করে, তখন সে অনুভবই করতে পারে না যে, কেউ তাকে কাজটি করতে বাধ্য করছে। বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে বান্দা যখন কাজটি করে ফেলে, তখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই তা সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্নে বর্ণিত মানুষের পাপ কাজের যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, তাতে আমরা তাই বলব, যা আমরা মাসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বলেছি। বান্দা কর্তৃক স্বেচ্ছায় কোন কাজ নির্বাচন করা আল্লাহর নির্ধারণের পরিপন্থী নয়। কেননা কাজ করার প্রতি বান্দা যখন অগ্রসর হয়, তখন সে স্বেচ্ছায় কাজটি নির্বাচন করেই অগ্রসর হয় এবং সে জানে না যে, কেউ তাকে কাজ করার জন্য বাধ্য করছে। কিন্তু যখন সে করে ফেলে, তখন সে জানতে পারে যে, আল্লাহ তার জন্যে কাজটি নির্ধারণ করেছেন। এমনিভাবে পাপকাজে লিপ্ত হওয়া এবং তার প্রতি অগ্রসর হওয়া বান্দার নির্বাচনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এটি তাকদীরের খেলাফ নয়। আল্লাহই সকল কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। সকল কর্ম বাস্তবায়নের উপকরণও তিনি সৃষ্টি করেছেন। বান্দার পক্ষ থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেসকল কাজ সংঘটিত হয়, তা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত।

আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ﴾

অর্থ ঃ তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা আকাশে ও জমিনে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭০)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

অর্থ ঃ এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছি মানুষ ও জিন শয়তানদের। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে

www.pathagar.com

চাকচিক্যপূর্ণ প্রবঞ্চনামূলক কথা-বার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালন কর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। (সূরা আন'আম ঃ ১১২)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

অর্থ ঃ এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাচারিতাকে পরিত্যাগ করুন। (সূরা আন'আম ঃ ১৩৭)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

অর্থ ঃ আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গাম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফির। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পরে লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

(সূরা বাকারা ঃ ২৫২)

কোন মানুষের উচিত নয়, নিজের ভিতরে বা অন্যের ভিতরে এমন কোন জিনিসের অনুসন্ধান করা, যা মনের ভিতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং তাকদীর ও শরীয়তের সাথে সংঘর্ষ থাকার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। সাহাবাদের আমল এ রকম ছিল না। অথচ তাঁরা সত্য জানতে এবং উদ্‌ঘাটন করতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। সহীহুল বুখারীতে আলী বিন আবূ তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ

www.pathagar.com

مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) الْآيَةَ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে লিখে দেয়া হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা কি ভাগ্যের লেখার উপর ভরসা করে বসে থাকব না এবং আমল বর্জন করব না? আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে সৌভাগ্যশীলদের আমল করবে। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে সে দুর্ভাগ্যশীলদের আমল করবে। নাবী ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তার জন্য সৌভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেয়া হবে আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন।

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

অর্থ ঃ অতএব যে দান করে, আল্লাহ্ ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে। আমি তাকে সুখের বিষয়ের (জান্নাতের) জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের (জাহান্নামের) জন্যে সহজ পথ দান করব।

(সূরা আল-লাইল ঃ ৫-১০)[১]

নবী ﷺ ভাগ্যের লিখনের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান, তা জানার কোন উপায় নেই। মানুষকে তার সাধ্যানুযায়ী আমল করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াত দিয়ে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎ আমল করবে, তার জন্য কল্যাণের সহজ পথকে আরো সহজ করে দিবেন। এটিই ফলদায়ক

---

[১] সহীহুল বুখারী মাওসূয়াতুল হাদীস, দারুস সালাম রিয়াদ, হাদীস নং ১৩৬২, সহীহ মুসলিম (ঐ) হাদীস নং ৬৭৩১

www.pathagar.com

ঔষধ। এর মাধ্যমেই বান্দা তার সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। ঈমান আনার সাথে সাথে সৎ আমল করার জন্যে সদা স্বচেষ্ট থাকবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন সৎ আমল করার তাওফীক দেন, ভাল পথ সহজ করে দেন, কঠিন পথ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখেন এবং দুনিয়া-আখিরাতে আমাদেরকে যেন ক্ষমা করেন।

প্রশ্ন ঃ (৬২) সৃষ্টির পূর্বে মানুষের ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, তা কি দু'আর মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব?

উত্তর ঃ সন্দেহ নেই যে, লিখিত তাকদীর পরিবর্তনে দু'আর প্রভাব রয়েছে। তবে জেনে রাখা দরকার, পরিবর্তনটাও পূর্বে লেখা আছে যে, দু'আর মাধ্যমে অমুকের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এ ধারণা যেন না হয় যে, আপনি ভাগ্যের কোন অলিখিত বস্তু পরিবর্তনের জন্যে দু'আ করছেন। সুতরাং দু'আ করবেন এটা লেখা আছে। আর দু'আর মাধ্যমে যা অর্জিত হবে, তাও লিখিত আছে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রোগীর উপর ঝাড়-ফুঁক করা হলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। নবী ﷺ একদল সৈনিক কোন একদিকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা কোন এক গোত্রের নিকটে মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলে গোত্রের লোকেরা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। রাতের বেলা সেই গোত্রের নেতাকে বিষাক্ত সাঁপে দংশন করল। তাকে ঝাড়ার জন্য কবিরাজ অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু কোন কবিরাজ পাওয়া গেল না। অবশেষে লোকেরা সাহাবাদের নিকট এসে কবিরাজ অন্বেষণ করল। একজন সাহাবী বললেন, আমি ঝাড়-ফুঁক করতে রাজি আছি, তবে আমাকে বিনিময় দিতে হবে। তারা একশতটি ছাগল দিতে রাজি হলে উক্ত সাহাবী রোগীর উপরে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। এতে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

প্রশ্ন ঃ (৬৩) রিযিক এবং বিবাহ কি লাওহে মাহফূজে লিখিত আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা যেদিন কলম সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত যত মাখলুকাত সৃষ্টি হবে, সবই লাওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে বললেন, লিখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি লিখব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেল। সে সময় কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে, কলম সব কিছুই লিখে ফেলল।[১] নবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত

---

[১] - মুসনাদে আহমাদ

www.pathagar.com

হয়েছে, শিশু মায়ের পেটে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা শিশুর ভিতরে রূহ ফুঁকে দেন, তার রিয্ক, বয়স এবং তার কাজ অর্থাৎ সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে। রিয্ক লিখা আছে এবং কিভাবে অর্জন করবে, তাও লিখা আছে। রিযক অন্বেষণের সাথে সাথে রিয্ক অন্বেষণের উপকরণও লিপিবদ্ধ আছে।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাতে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিয্ক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (সূরা মুল্ক ঃ ১৫)

রিযক পাওয়ার এবং তা বৃদ্ধি হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল, পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিয্ক বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং বয়স বাড়িয়ে দেয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। রিয্ক বৃদ্ধির আরো মাধ্যম হল তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিয্ক দান করবেন। (সূরা তালাক ঃ ২-৩)

এমন বলা যাবে না যে, রিয্ক যেহেতু নির্ধারিত আছে, সুতরাং আমি এর উপকরণ অনুসন্ধান করব না। এটা বোকামীর পরিচয়। বুদ্ধিমানের পরিচয় হল রিয্কের জন্য এবং দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। নবী ﷺ বলেছেন,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَـا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে নিজের হিসাব নিল এবং পরকালের জন্য আমল করল। অক্ষম ও নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকল।[১] রিয্‌ক যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, বিবাহ করাও নির্ধারিত রয়েছে। এ পৃথিবীতে কে কার স্বামী বা স্ত্রী হবে, তাও নির্দিষ্ট রয়েছে। আসমান-জমিনের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

প্রশ্ন ঃ (৬৪) মুসীবত নাযিল হলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ বালা-মুসীবত নাযিল হওয়ার সময় মানুষ চার স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা ঃ

প্রথম স্তর ঃ অসন্তোষ প্রকাশ করা। এটি আবার কয়েক প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ আল্লাহ যে বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তার কারণে অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা হারাম। কারণ, এ ধরনের অসন্তুষ্টি কখনো কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾

অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-সংকোচে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদাতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা হাজ্জ ঃ ১১)

দ্বিতীয় প্রকার ঃ কখনো অসন্তুষ্টিমূলক কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন হতাশা প্রকাশ করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দু'আ করা– এটাও হারাম।

তৃতীয় প্রকার ঃ কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন গাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছেঁড়া, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই হারাম এবং ধৈর্য ধারণের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় স্তর ঃ বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা। যেমন কোন কবি বলেছেন, বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এর শেষ পরিণাম খুবই ভাল। কেননা এ সবর করাটা তার নিকট খুবই কঠিন তবুও সে সবর করে। বিপদগ্রস্ত হওয়াটা যেমন অপছন্দ করে তেমনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ

---

[১] - তিরমিযী, অধ্যায় ঃ কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ

www.pathagar.com

করাটাও তার নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু তার ঈমান তাকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। মোট কথা সে বিপদে আপতিত হওয়া এবং না হওয়াকে এক মনে করে না। এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থ ঃ তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল ঃ ৪৬)

তৃতীয় স্তর ঃ বিপদ আসার পর সন্তুষ্ট থাকা এবং মুসীবত আসা ও না আসা উভয়কেই সমান মনে করা। তাই বিপদ আসলেও তার কাছে বিপদ সহ্য করা বেশী কঠিন মনে হয় না। গ্রহণযোগ্য মতে এটা (এ ধরনের সবর করা) মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। এটা এবং পূর্ববর্তী স্তরের মাঝে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। বিপদ হওয়া এবং না হওয়া সমান মনে হওয়া সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ প্রকারের এবং পূর্বের প্রকারের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের প্রকারে বিপদে আপতিত ব্যক্তি বিপদকে কঠিন মনে করে এবং ধৈর্যধারণ করে।

চতুর্থ স্তর ঃ শুকরিয়া আদায় করা– এটা সর্বোচ্চ স্তর। তা এই যে, বিপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা। কারণ, সে ভাল করেই জানে যে, এ সমস্ত বিপদাপদ গুনাহ মোচন এবং সাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। নবী ﷺ বলেন,

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

অর্থ ঃ কোন মুসলিম বিপদাপদে পতিত হলে বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ মোচন করেন। এমনকি শরীরে একটি কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।[১]

রোগ কি একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়? কোন কিছু দেখে বা শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করার বিধান।

প্রশ্ন ঃ (৬৫) সম্মানিত শায়খ! নবী ﷺ-এর বাণী, (لا عدوى ولاطيرة ولا هامــة ولا صــفر) "একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয় না।

[১] - বুখারী, কিতাবুল মারাজ্ব ওয়াত্ তিব্ব

www.pathagar.com

পাখী উড়িয়ে বা পাখীর ডাক শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণের নিয়ম ইসলামে নেই। সফর মাসেরও কোন অতিরিক্ত সম্মান নেই" এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাই? হাদীসে বর্ণিত জিনিসগুলোর প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলো কোন্ ধরনের অস্বীকার? নবী ﷺ-এর বাণী, "কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন কর যেভাবে তুমি বাঘ থেকে ভয়ে পলায়ন কর"। এ হাদীস ও প্রথমোক্ত হাদীসের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করব?

উত্তর ঃ একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হওয়াকে আদ্ওয়া বলা হয়। শারীরিক রোগে যেমন এটা হয়, তেমনি চারিত্রিক রোগের ক্ষেত্রেও এমন হয়ে থাকে। এজন্যই নবী ﷺ বলেছেন, অসৎ বন্ধু কামারের ন্যায়। সে হয়ত তোমার জামা পুড়িয়ে ফেলবে। তা না হলে কমপক্ষে তুমি তার কাছ থেকে খারাপ গন্ধ পাবে।

কোন জিনিস দেখে, কোন কথা শুনে বা জানার মাধ্যমে কুলক্ষণ মনে করাকে "ত্বিয়ারা" বলা হয়।

"হা'মাহ" এর ব্যাখ্যা দু'ধরণ হতে পারে। ক) এমন রোগ, যা একজনকে আক্রমণ করে অন্যজনের নিকট সংক্রমিত হয়। খ) "হা'মাহ" বলা হয়, আরবদের ধারণা মতে এমন এক শ্রেণীর পাখিকে, যে গভীর রাতে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পরিবারের লোকদেরকে ডাকাডাকি করে এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উৎসাহ দেয়। কেউ কেউ ধারণা করে যে, এটি নিহত ব্যক্তির রূহ পাখির আকৃতি ধরে উপস্থিত হয়েছে। এ পাখিটিকে আমাদের পরিভাষায় হুতুম পেঁচা বলা হয়। আরবরা এ পাখির ডাককে কুলক্ষণ মনে করত। কারো ঘরের পাশে এসে এ পাখি ডাকলে তারা বিশ্বাস করত যে, সে মৃত্যুবরণ করবে।

মূলক কথা হচ্ছে হা'মাম নামক রোগ বা পাখির কোন প্রভাব নেই।

"সফর" এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (১) সফর মাস। আরবরা এ মাসকে অকল্যাণের মাস মনে করত। (২) এটি উটের এক ধরনের রোগের নাম, যা এক উটের শরীর থেকে অন্য উটের শরীরে সংক্রমিত হয়। (৩) সফর মাসকে আরবরা কখনো হারাম মাসের সাথে গণনা করত। আবার কখনো হালাল মাস হিসেবে গণ্য করত।

গ্রহণযোগ্য কথা হল, জাহিলী সমাজের লোকেরা সফর মাসকে অমঙ্গলের মাস মনে করত। কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণে সময় বা মাসের কোন প্রভাব নেই। সফর মাস অন্যান্য মাসের মতই। তাতে কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করতে গিয়ে কোন কোন মানুষ যখন সফর মাসে কোন কাজ সমাধা করে, তখন সেই তারিখ লিখে রাখে এবং বলে, কল্যাণের মাস সফর মাসের অমুক তারিখে কাজটি সমাধা হল। এটি এক বিদ'আত দ্বারা অন্য বিদ'আতের এবং এক অজ্ঞতা দ্বারা অন্য অজ্ঞতার চিকিৎসা করার শামিল। এটি কল্যাণের মাসও নয় এবং অকল্যাণের মাসও নয়। এজন্যই কোন কোন সালফে সালিহীন পেঁচার ডাক শুনে (خيرا إن شاء الله) "আল্লাহ চাহেতো ভাল হবে" এ কথা বলার প্রতিবাদ করেছেন। ভাল বা খারাপ কোন কিছুই বলা যাবে না। সে অন্যান্য পাখির মতই ডাকে।

উপরের চারটি বিষয়ের প্রভাবকে হাদীসে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে মু'মিন দৃঢ়ভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং ঈমান মজবুত হবে। এ সমস্ত কুসংস্কারের সামনে মু'মিন ব্যক্তি কখনো দুর্বল হবে না।

কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন এ সমস্ত বিষয়ের প্রভাবকে বিশ্বাস করবে, তখন নিম্নলিখিত দু' অবস্থার এক অবস্থা হতে পারে ঃ

(১) সে হয়ত বিশ্বাস করে সামনের দিকে অগ্রসর হবে অথবা থেমে যাবে। এ অবস্থায় তার কর্মসমূহ এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করল, যার কোন প্রভাব নেই।

(২) কোন কিছু পরওয়া না করে কাজের প্রতি অগ্রসর হবে, কিন্তু মনের ভিতরে দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তা থেকেই যাবে। কিন্তু এটি প্রথমটির চেয়ে হালকা। কারণ, সে এ সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকে।

কিছু কিছু মানুষ শুভ-অশুভ নির্ধারণ করার জন্য কুরআন মাজীদ খুলে থাকে। খুলে জাহান্নামের আলোচনা দেখতে পেলে লক্ষণ ভাল নয় বলে মনে করে। আর জান্নাতের আলোচনা দেখতে পেলে খুশী হয়। এটি জাহিলী যামানার লোকদের কাজের মতই।

নবী ﷺ উক্ত জিনিসগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি। কারণ, এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এগুলোর প্রভাবকে নবী ﷺ মেনে নেননি। আল্লাহই সকল বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তারকারী। সুতরাং যদি জানা যায় যে, কোন বস্তু সংঘটিত হওয়াতে সঠিক কারণ রয়েছে, তাহলে তাকে কারণ হিসেবে বিশ্বাস করা বৈধ। কিন্তু নিছক ধারণা করে কোন ঘটনায় অন্য বস্তুর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কোন বস্তু নিজে নিজেই অন্য ঘটনার কারণ হতে পারে না। সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন, অসুস্থ উটের

www.pathagar.com

মালিক যেন সুস্থ উটের মালিকের উটের কাছে অসুস্থ উটগুলো নিয়ে না যায়।[১] সুস্থ উটগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নবী ﷺ এ রকম বলেছেন।

নবী ﷺ আরো বলেন,

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

অর্থ ঃ সিংহের ভয়ে তুমি যেমন পলায়ন কর, (কুষ্ঠ) রোগী দেখেও তুমি সেভাবে পলায়ন কর।[২]

"জুযাম এমন নিকৃষ্টতম দ্রুত সংক্রামক রোগ যা আক্রান্ত ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়" আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নবী ﷺ কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এখানে রোগের চলমান শক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে রোগ নিজস্ব ক্ষমতার বলে অন্যজনের কাছে চলে যায় তা বলা হয়নি। বরং নবী ﷺ সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

অর্থ ঃ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।

(সূরা বাক্বারা ঃ ১৯৫)

এটা বলা যাবে না যে, নবী ﷺ রোগের সংক্রমন হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কেননা বাস্তব অবস্থা ও অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে এ রকম ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে।

যদি বলা হয় যে, নবী ﷺ যখন বললেন, রোগ সংক্রামিত হয় না, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মরুভূমিতে সম্পূর্ণ সুস্থ উট বিচরণ করে। উটগুলোর কাছে যখন একটি খাঁজলীযুক্ত উট আসে, তখন সব উটই খাঁজলীযুক্ত হয়ে যায়। তিনি বললেন, প্রথম উটটিকে কে খাঁজলীযুক্ত করল?[৩]

উত্তর হল, নবী ﷺ-এর উক্তি "প্রথমটিকে কে খাঁজলীযুক্ত করল?" এর মাধ্যমেই জবাব দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতে রোগের জীবানু অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে সুস্থ ব্যক্তির নিকট গমন করে থাকে। তাই আমরা বলব যে, প্রথম উটের উপরে সংক্রামক ব্যতীত আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগ নাযিল হয়েছে। কোন

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তিব্ব

[২] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তিব্ব

[৩] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তিব্ব

www.pathagar.com

ঘটনার পিছনে কখনো প্রকাশ্য কারণ থাকে। আবার কখনো প্রকাশ্য কোন কারণ থাকে না। প্রথম উট খাঁজলীযুক্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় উট খাঁজলীযুক্ত হওয়ার কারণ যদিও জানা যাচ্ছে, তথাপি আল্লাহ চাইলে খাঁজলীযুক্ত হত না। তাই কখনো খাঁজলীতে আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে ভালও হয়ে যায়। আবার কখনো মারাও যায়। এমনিভাবে প্লেগ, কলেরা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও একই কথা। একই ঘরের কয়েকজন আক্রান্ত হয়। কেউ মারা যায় আবার কেউ রেহাই পেয়ে যায়। মানুষের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা। বর্ণিত আছে যে, একজন কুষ্ঠ রোগী লোক নবী ﷺ-এর কাছে আসল। তিনি তার হাত ধরে বললেন, আমার সাথে খাও।[১] আল্লাহর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা থাকার কারণেই তিনি তাকে খানায় শরীক করেছিলেন।

উপরের বিরোধপূর্ণ হাদীসগুলোর মাঝে সমঞ্জস্যতা বিধানে যা বলা হল, তাই সর্বোৎকৃষ্ট। কেউ কেউ প্রশ্নের শেষোক্ত হাদীসকে মানসূখ বা রহিত বলেছেন। রহিত হওয়ার দাবী ঠিক নয়। কেননা রহিত হওয়ার অন্যতম শর্ত হল বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে সমঞ্জস্যতা সৃষ্টি করা সম্ভব না হওয়া। উভয় হাদীসের মধ্যে মিল দেয়া সম্ভব হলে উভয় হাদীসের উপর আমল করতে হবে। আর রহিত হওয়ার দাবী করলে একপক্ষের হাদীসের উপর আমল বাতিল হয়ে যায়। একপক্ষের হাদীসগুলো বাতিল করার চেয়ে উভয়পক্ষের হাদীসগুলোর উপর আমল করাই উত্তম।

বদ নজরের প্রকৃতি এবং তার চিকিৎসা কি?

প্রশ্ন ঃ (৬৬) মানুষের উপর কি বদ নজর লাগে? লাগলে তার চিকিৎসা কি? এ থেকে বেঁচে থাকা কি আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী?

উত্তর ঃ বদ নজরের প্রভাব সত্য।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ﴾

অর্থ ঃ কাফিরেরা তাদের দৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে চায়। (সূরা আল-কলম ঃ ৫১)

[১] - আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ কিতাবুত তিব্ব

www.pathagar.com

নবী ﷺ বলেন,

الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا

অর্থ ঃ বদ নজরের প্রভাব সত্য। কোন জিনিস যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত, তাহলে বদ নজর তাকে অতিক্রম করত। তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করবে এবং গোসলে ব্যবহৃত পানি দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করবে।[১]

নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ্য় বর্ণিত আছে যে, একদা আমির ইবনে রাবীয়া সাহল ইবনে হুনাইফের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) তখন গোসল করতে ছিলেন। আমির ইবনে রাবীয়া সাহ্লকে দেখে বলল, আমি আজকের মত লুকায়িত সুন্দর চামড়া আর কখনো দেখিনি। এ কথা বলার কিছুক্ষণ পর সাহ্ল অসুস্থ হয়ে পড়ে গেল। তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বলা হল, সাহ্ল বদ নজরের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা কাকে সন্দেহ করছ? তারা বলল, আমির ইবনে রাবীয়াকে। তখন নবী ﷺ বললেন, কেন তোমাদের কেউ তার ভাইকে হত্যা করতে চায়। কেউ যদি কারো মধ্যে ভাল কিছু দেখে, তাহলে সে যেন তার জন্য ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে এবং দু'আ করে। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং আমিরকে অযূ করতে বললেন। অযূতে মুখমণ্ডল, কনুইসহ উভয় হাত এবং হাঁটু পর্যন্ত এমনকি লুঙ্গির নীচ পর্যন্ত ধৌত করে সাহ্লের শরীরে ঢালতে বললেন।[২] এটি বাস্তব ঘটনা, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

কেউ বদ নজরে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা হল ঃ (১) হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করে আক্রান্ত রোগীর উপর ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। নবী ﷺ বলেন,

لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ

অর্থ ঃ বদ নজর এবং বিচ্ছুর বিষ নামানোর ঝাড়-ফুঁক ব্যতীত কোন ঝাড়-ফুঁক নেই।[৩]

জিবরীল (আঃ) নবী ﷺ-কে এ দু'আর মাধ্যমে ঝাড়তেন,

---

১ - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সালাম
২ - ইবনে মাজাহ, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তিব্ব
৩ - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তিব্ব

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

অর্থ ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি প্রতিটি এমন জিনিস হতে, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক জীবের অমঙ্গল হতে ও হিংসুকের চোখের বদ নজর হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি।[১]

(২) যার বদ নজর লাগছে বলে সন্দেহ করা হয়, তাকে গোসল করিয়ে গোসলের পানি রোগীর শরীরে ঢালতে হবে। যেমনভাবে নবী ﷺ আমির বিন রাবীয়াকে গোসল করতে বলেছিলেন। সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তির প্রসাব-পায়খানা বা অন্য কোন কিছু দিয়ে চিকিৎসা করার কোন দলীল নেই।

বদ নজর লাগার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়াতে কোন দোষ নেই। এটা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থীও নয়। কারণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসার স্বরূপ হল বান্দা বৈধ উপকরণ অবলম্বন করে বদ নজর ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে এবং সে সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নবী ﷺ হাসান-হুসাইন (রাঃ)-কে এই বাক্যগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন,

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর কাছে তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান এবং বিষধর বস্তু ও কষ্টদায়ক নযর হতে তোমাদের দু'জনের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি। নবী ﷺ বলেন, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসহাক এবং ইসমাঈল (আঃ)-কে এ দু'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুক করতেন।[২]

প্রশ্ন ঃ (৬৭) আকীদার মাসআলায় কি মানুষের অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ আকীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা হবে কি না এ বিষয়টি অন্যান্য ফিক্‌হী মাসআলার ন্যায় মতবিরোধপূর্ণ। কখনো কখনো এ মতভেদ শাব্দিক হতে পারে। কিন্তু আসলে তাদের মাঝে কোন মতভেদ নেই।

---

[১] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সালাম

[২] - ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছের।

www.pathagar.com

যেমন কোন একটি ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত যে বিষয়টি তথা এই কথাটি কুফরী অথবা এই কাজটি কুফরী অথবা এ কাজটি ছেড়ে দেয়া কুফরী। কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরীতে লিপ্ত হল, নির্দিষ্টভাবে তার উপর কি কুফরীর বিধান প্রযোজ্য হবে? কেননা সেখানে কুফরীর শর্তসমূহ বিদ্যমান এবং কাফির না হওয়ার প্রতিবন্ধকতা নেই। না কি কাফির হওয়ার দাবী অবর্তমান থাকায় বা কাফির হওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকায় উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা প্রযোজ্য হবে না? এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কুফর প্রযোজ্যকারী বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা দু'প্রকার।

(১) এমন ব্যক্তি হতে কুফরী প্রকাশ পাওয়া, যে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারী অথবা সে কোন দ্বীনই বিশ্বাস করে না। সে এটা কোন সময় কল্পনাও করে না যে, সে যে বিষয়ের উপর রয়েছে, কোন দ্বীন তার বিরুধিতা করে। এ ব্যক্তির উপর দুনিয়াতে কাফিরের বিধান প্রয়োগ করা হবে। আখিরাতের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হল, আল্লাহ পরকালে তাকে পরীক্ষা করবেন। তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা ভাল করেই জানি যে, বিনা অপরাধে কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

অর্থ ঃ আপনার প্রতিপালক কাউকে যুল্‌ম করবেন না। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৪৯)

দুনিয়াতে তার উপর কুফরীর বিধান প্রয়োগ হওয়ার কারণ এই যে, সে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাই তার উপর ইসলামের বিধান প্রয়োগ হবে না। আখিরাতে তাকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) তাঁর রচিত "তরীকুল হিজ্‌রাতাইন" নামক বইয়ে মুশরিকদের শিশুদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন।

(২) এমন লোক থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়া, যার ধর্ম ইসলাম, কিন্তু সে এ কুফরী প্রযোজ্যকারী আকীদা নিয়ে বসবাস করছে অথচ সে জানে না যে, এ আকীদা ইসলাম বিরোধী। কেউ তাকে সতর্কও করেনি। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুনিয়াতে ইসলামের বিধান প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে। পরকালের বিষয়টি আল্লাহর হাতে। কুরআন, সুন্নাহ এবং আলিমদের বাণী হতে এ মর্মে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

অর্থ ঃ রাসূল না পাঠিয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেব না। (সূরা ইসরা ঃ ১৫)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾

অর্থ ঃ আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা যুল্‌ম করে। (সূরা কাসাস ঃ ৫৯)

আল্লাহ বলেন,

﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

অর্থ ঃ সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অজুহাত বা যুক্তি প্রদর্শন করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

অর্থ ঃ আমি সব রাসূলকেই তাদের জাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবায় এরশাদ করেন,

﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾

অর্থ ঃ আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সে সব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। (সূরা তাওবা ঃ ১১৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾

অর্থ ঃ এটি এমন একটি বরকতময় গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'টি সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিংবা এ কথা বলতে না পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা তাদের চাইতে অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অবশ্যই তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে। (সূরা আন'আম ঃ ১৫৫-৫৭)

এমনি আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, মানুষের কাছে দ্বীনের শিক্ষা দান ও তা বর্ণনা করার পূর্বে হুজ্জত কায়েম হবে না।

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন,

﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّــةِ يَهُــودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾

অর্থ ঃ ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এ উম্মাতের কোন ইয়াহূদী বা নাসারা আমার (শেষে নাবী আগমনের) কথা শুনে আমার আনিত বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন না করে মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।[১]

আলিমগণ বলেন, নতুন মুসলিম বা অমুসলিম দেশের নাগরিক বা মুসলিম থেকে দূরবর্তী স্থানের অধিবাসী হওয়ার কারণে কেউ যদি কুফরী কাজে লিপ্ত হয়, তাকে কাফির হওয়ার ফাতাওয়া দেয়া যাবে না।[২] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যারা আমাকে চেনে, তারা অবশ্যই জানে যে, নির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফির বা ফাসিক বলা থেকে আমি কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকি। তবে যে ব্যক্তি কাফির বা ফাসিক হওয়ার কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত আছে, তার কথা ভিন্ন। আমি আবারও বলছি যে, এ উম্মতের কেউ ভুলক্রমে অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। চাই আকীদার মাসআলায় ভুল করুক কিংবা অন্য কোন মাসআলায়। সালাফে

---

১ - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান

২ - মুগনী, ৮/১৩১

www.pathagar.com

সালিহীন অনেক মাসআলায় মতভেদ করেছেন। তারপরও কেউ কাউকে কাফির বলেননি। তাদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু কর্মের উপরে হুকুম লাগানো এবং ব্যক্তির উপরে হুকুম লাগানোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। শায়খুল ইসলাম আরো বলেন, কাউকে কাফির বলার ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে। কারণ, কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি এমন হতে পারে যে, সে নতুন মুসলিম অথবা সে আলিম-উলামা থেকে দূরের কোন জনপদে বসবাস করছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে দ্বীনের কোন বিষয় অস্বীকার করলেই তাকে কাফির বলা যাবে না। যতক্ষণ না তার কাছে হুজ্জত (কুরআন-সুন্নাহর দলীলসমূহ) পেশ করা হবে। হতে পারে যে, সে দলীল-প্রমাণ শুনেনি অথবা শুনেছে কিন্তু বিশুদ্ধ সূত্রে তার কাছে পৌছেনি। কখনো এও হতে পারে যে, সে একজন আলিম। তার কাছে দলীল রয়েছে বা দলীলের ব্যাখ্যা রয়েছে। যদিও তা সঠিক নয়।[১]

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বলেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে কাফির বলি, যে দ্বীনে মুহাম্মাদী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে গালি-গালাজ করল। শুধু তাই নয়, মানুষকে আল্লাহর দ্বীন হতে বিরত রাখল এবং ধার্মিক লোকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করল। আমি এ শ্রেণীর লোকদেরকে কাফির বলে থাকি।[২] তিনি আরো বলেন, যারা বলে আমরা ব্যাপকভাবে মানুষকে কাফির বলি এবং দ্বীন পালনে সক্ষম ব্যক্তিকেও আমাদের কাছে হিজরত করে চলে আসতে বলি, তারা অপবাদ দানকারী মিথ্যুক। তারা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে বাধা দিয়ে থাকে। আবদুল কাদের জ্বিলানী এবং সাইয়্যিদ আহ্মাদ বাদভীর কবরের উপরে যে মূর্তি রয়েছে, তার উপাসকদেরকে যদি অজ্ঞতার কারণে এবং তাদেরকে কেউ সতর্ক না করার কারণে কাফির না বলি, তাহলে কিভাবে আমরা এমন নির্দোষ লোকদেরকে আমাদের দিকে হিজরত না করার কারণে কাফির বলব, যারা কখনো আল্লাহর সাথে শরীক করেনি এবং আমাদেরকে কুফর প্রতিপন্ন করেনি ও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেনি?[৩]

---

[১] - মাজমূআয়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ৩/৩৩৯

[২] - আদ্ দুরারুস্ সানীয়া ঃ ১/৫৬

[৩] - আদ্ দুরারুস্ সানীয়া ঃ ১/৬৬

www.pathagar.com

আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং আলিমদের কথা অনুযায়ী দলীল-প্রমাণ পেশ করা ব্যতীত কাউকে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের দাবীও তাই। তিনি অজুহাত পেশ করার সুযোগ দূর না করে কাউকে শাস্তি দিবেন না। বিবেক দ্বারা মানুষের উপরে আল্লাহর হক সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। যদি তাই হত, তাহলে রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে হুজ্জত পেশ করা যথেষ্ট হত না।

সুতরাং যে মুসলিম, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম হিসেবেই পরিগণিত হবে, যতক্ষণ না শরীয়তের দলীলের মাধ্যমে তার ইসলাম ভঙ্গ হবে। কাজেই কাফির বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, তা না হলে দু'টি বড় ধরনের ভয়ের কারণ রয়েছে।

(১) আল্লাহর উপর মিথ্যাচারিতার অপবাদ দেয়া। সাথে সাথে যার উপর হুকুম লাগানো হল তাকেও এমন দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হল, যা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহর উপর মিথ্যাচারিতার অপবাদ এভাবে দেয়া হল যে, এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা হয়েছে, যাকে আল্লাহ কাফির বলেননি। এটি আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার শামিল। কেননা কাউকে কাফির বলা বা না বলা এটি কেবলমাত্র আল্লাহরই অধিকার। যেমনিভাবে কোন কিছু হারাম করা বা হালাল করার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে।

(২) দ্বিতীয় সমস্যাটি হল মুসলিম ব্যক্তি যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার বিপরীত অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। কেননা যখন কোন মুসলিমকে লক্ষ্য করে কাফির বলবে, তখন সে যদি কাফির না হয়, তাহলে ফাতাওয়াদানকারী নিজেই কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

অর্থ ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলবে, তখন তাদের দু'জনের একজন কাফিরে পরিণত হবে।[১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যাকে কাফির বলা হল, সে যদি কাফির হয়ে থাকে তাহলে কাফির হবে। অন্যথায় ফাতাওয়া দানকারী নিজেই কাফিরে পরিণত হবে।[২] সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান

[২] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফির বলবে অথবা আল্লাহর শত্রু বলবে, সে অনুরূপ না হয়ে থাকলে যে বলল সে নিজেই কাফির বা আল্লাহর শত্রু হিসেবে পরিণত হয়ে যাবে।[১] যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফির বলে, সে নিজের আমল নিয়ে অহংকার করে এবং অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তি দু'টি সমস্যার সম্মুখীন। নিজের আমলকে খুব বড় মনে করলে আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার মধ্যে অহংকার আসার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন,

﴿قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর। বড়ত্ব আমার পোষাক। যে ব্যক্তি আমার কোন একটি পোষাক নিয়ে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।[২] সুতরাং কাউকে কাফির বলার পূর্বে দু'টি বিষয় খেয়াল করতে হবে ঃ

(১) আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্তে কাজটিকে কুফরী বলা হয়েছে কিনা। যাতে করে আল্লাহর উপরে মিথ্যাচারিতায় লিপ্ত না হয়।

(২) যার ভিতরে কাফির হওয়ার কারণ ও শর্তসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, কেবলমাত্র তার উপরই কুফরীর বিধান প্রয়োগ করা। কাফির হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, জেনে-শুনে শরীয়ত বিরোধী এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যা কুফরীকে আবশ্যক করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

অর্থ ঃ আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনগণে বিপরীত পথের অনুগামী হয়, আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তন করাবো, যাতে সে প্রত্যাবর্তন করতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা নিসা ঃ ১১৫)

---

[১] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান

[২] - আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ কিতাবুল লিবাস

www.pathagar.com

জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার শর্ত হল হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা করা।

কাজটি করলে কাফির হয়ে যাবে, এটা জানা কি জরুরী? নাকি কাজটি শরীয়তে নিষেধ এতটুকু জানাই যথেষ্ট? যদিও কাজটির ফলাফল সম্পর্কে অবগত না থাকে।

উত্তর হল, কাজটি শরীয়তে নিষেধ এ কথা জেনে তাতে লিপ্ত হলেই হুকুম লাগানোর জন্য যথেষ্ট। কেননা নবী ﷺ রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে এক লোকের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছিলেন। কারণ, সে জানতো দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা জানতো না। বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচারকে হারাম জেনে তাতে লিপ্ত হলে তাকে রজম করতে হবে। যদিও সে বিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি যে রজম, তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

জোরপূর্বক কাউকে কুফরী কাজে বাধ্য করা হলে, তাকে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থ ঃ কেউ ঈমান আনার পরে কুফরীতে লিপ্ত হলে এবং কুফরীর জন্য অন্তরকে খুলে দিলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১০৬)

অধিক আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে বা চিন্তিত অবস্থায় অথবা রাগান্বিত হয়ে অথবা ভীত অবস্থায় কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফির হয়ে যাবে না।

আল্লাহর বাণী,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

অর্থ ঃ ভুলক্রমে কোন অপরাধ করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫)

সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي

www.pathagar.com

ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

অর্থ ঃ গুনাহ্ করার পর বান্দা যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে একটি বাহনের উপর আরোহণ করে মরুভূমির উপর দিয়ে পথ চলতে ছিল। এমন সময় বাহনটি তার খাদ্য-পানীয় সব নিয়ে পলায়ন করল। এতে লোকটি নিরাশ হয়ে একটি গাছের নিচে এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নিদ্রায় থাকার পর উঠে দেখে বাহনটি তার সমস্ত আসবাবপত্র সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে বলে উঠল, হে আল্লাহ্! আপনি আমার গোলাম, আমি আপনার প্রতিপালক। খুশীতে আত্মহারা হয়েই সে এ ধরনের ভুল করেছে।[১]

কাফির বলার পথে আরেকটি বাধা হল কাজটি কুফরী হওয়ার ব্যাপারে কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির কাছে তা'বীল বা ব্যাখ্যা থাকা। যাতে করে সে তাকে সত্য মনে করে। কাজেই সে তার ধারণা মতে পাপ বা শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়নি।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

অর্থ ঃ ভুলক্রমে কোন অপরাধ করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহ্যাব ঃ ৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৬)

ইমাম ইবনে কুদামা আলমাকদিসী বলেন, কোন প্রকার সন্দেহ বা ব্যাখ্যা ব্যতীত কেউ যদি নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হালাল ভেবে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি তা'বীল করে কাফির ভেবে হত্যা করে এবং সম্পদ হালাল জেনে আত্মসাৎ করে, তবে তাদেরকে কাফির বলা হবে না। এজন্যে খারিজীদেরকে অধিকাংশ

[১] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তাওবাহ

www.pathagar.com

আলিমগণ কাফির বলেননি। অথচ তারা মুসলিমদের জান-মাল হালাল মনে করত। তাদেরকে কাফির না বলার কারণ এই যে, তারা তা'বীল বা অপব্যাখ্যা করে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছিল। খারিজীরা অনেক সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করত। শুধু তাই নয় এ কাজকে তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম মনে করত। তা সত্ত্বেও আলিমগণ তাদেরকে কাফির বলেননি। কারণ, তাদের কাছে অপব্যাখ্যা ছিল।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, কুরআনের বিরোধিতা করা খারিজীদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং কুরআন বুঝতে গিয়ে ভুল করার কারণে তারা বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পাপী মু'মিনদেরকে কাফির মনে করেছে।[২] তিনি আরো বলেন, খারিজীরা কুরআনের বিরোধিতা করে মু'মিনদেরকে কাফির বলেছে। অথচ কুরআনের ভাষায় মু'মিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তারা বিনা 'ইল্মে, সুন্নাহ্র অনুসরণ না করে এবং কুরআনের জ্ঞানীদের কাছে না গিয়ে কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করেছে। ইমামগণ ঐক্যবদ্ধভাবে খারিজীদেরকে নিন্দা করেছেন এবং গোমরা বলেছেন। তবে তাদেরকে কাফির বলার ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। আলী (রাঃ) বা অন্য কোন সাহাবী তাদেরকে কাফির বলেননি। বরং তাদেরকে যালিম এবং সীমালঙ্ঘনকারী মুসলমান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও অন্যান্য ইমামগণ থেকেও এ ধরনের কথা বর্ণিত আছে। নবী ﷺ খারিজীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন। চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। সাহাবা ও পরবর্তী উত্তম যুগের ইমামগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তাদের কেউ খারিজীদেরকে কাফির বলেননি। বরং তাদেরকে মুসলমান মনে করেছেন। তারা যখন অন্যায়ভাবে মানুষের রক্তপাত শুরু করল এবং মুসলিমদের ধন-সম্পদের উপর আক্রমণ করল, তখন আলী (রাঃ) তাদের এই যুল্ম এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে কাফির মনে করে যুদ্ধ করেননি। তাই তিনি তাদের মহিলাদেরকে দাসী হিসেবে বন্দী করেননি এবং তাদের সম্পদকে গণীমত হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাদের গোমরাহী কুরআনের দলীল, মুসলিমদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। তথাপিও আলিমগণ তাদেরকে কাফির

---

[১] - খারিজীর বিশ্বাস এই যে, কোন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যায় এবং তার জান-মাল হালাল হয়ে যায়।

[২] - মাজমূআয়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১৩/৩০

www.pathagar.com

বলেননি। তাহলে কিভাবে এমন ফির্কার লোকদেরকে কাফির বলবেন, যাদের চেয়ে বড় আলিমগণ অনেক মাসআলায় ভুল করেছেন। সুতরাং এক দলের পক্ষে অপর দলকে কাফির বলা এবং জান-মাল হালাল মনে করা জায়েয নেই। যদিও তাদের ভিতরে বিদ'আত বর্তমান রয়েছে। মূল কথা তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে সে সম্পর্কে তারা সকলেই অজ্ঞ। কোন মুসলিম যদি তা'বীল করে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা কাউকে কাফির বলে, তবে উক্ত মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী থেকে যে হুকুম সাব্যস্ত হয়, দাওয়াত না পৌঁছিয়ে বান্দার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণের তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যই সঠিক।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

অর্থ ঃ রাসূল না পাঠিয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেব না। (সূরা ইসরা ঃ ১৫)

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

অর্থ ঃ সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি যুক্তি আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

বুখারী ও মুসলিমে আছে, আল্লাহর চেয়ে অধিক ওজর-অযুহাত গ্রহণকারী আর কেউ নেই। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে রাসূল প্রেরণ করেছেন।

মোট কথা অজ্ঞতার কারণে কেউ কুফরী করলে অথবা কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফির হবে না। এটাই আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং আলিমদের পথ।

প্রশ্ন ঃ (৬৮) যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের হুকুম কি?

উত্তর ঃ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বলছি যে, আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালানো তাওহীদুর রুবূবীয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতে আল্লাহর রুবূবীয়াত, পরিপূর্ণ রাজত্ব এবং পরিচালনা ক্ষমতার দাবী অনুযায়ী তাঁর হুকুম কার্যকর করার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলিম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বুদের ইবাদাত করবে, যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউ নয়। তিনি তাদের অংশী স্থাপন করা হতে পবিত্র। (সূরা তাওবা ঃ ৩১)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী-নাসারাদের ধর্মযাজকদেরকে রব হিসেবে নামকরণ করেছেন। কারণ, তারাও আল্লাহর বিধানের মত বিধান রচনা করত। তাদের রচিত বিধানের অনুসারীদেরকে গোলাম বা বান্দা হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে। কারণ, তারা আল্লাহর বিধানের বিরোধিতায় তাদের রবদের কাছে নতি স্বীকার করত। আদী বিন হাতিম (রাঃ) রাসূল ﷺ-কে বললেন, তারা তো তাদের ইবাদাত করে না। নবী ﷺ বললেন, তারা হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে। আর সাধারণ লোকেরা তাদের অনুসরণ করে থাকে। এটার নামই ইবাদাত।[১]

আপনি জেনে নিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না বরং অন্যের বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করতে চায়, তাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের আয়াতে তাদেরকে ঈমানহীন (মুনাফিক) দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতে কাফির, যালিম ও ফাসিক বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا

[১] - তিরমিযী, অধ্যায় ঃ তাফসীরুল কুরআন

www.pathagar.com

اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য শয়তানের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো, যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তখন কেমন হবে? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ফিরে আসবে যে, কল্যাণ ও সমঝোতা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি একমাত্র এ উদ্দেশেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের (রাসূলগণের) আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল করে নিবে।

(সূরা নিসা ঃ ৬০-৬৫)

আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদেরকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করেছেন ঃ

(১) মুনাফিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য গমন করে থাকে। প্রত্যেক ঐ বিষয় বা ব্যক্তির নামই তাগুত,

যে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে। সমস্ত বিচার-ফায়সালা এবং হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ ঃ জেনে রাখ তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪)

(২) তাদেরকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের দিকে এবং রাসূল ﷺ-এর দিকে আহবান করা হলে তারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৩) তারা কোন মুসিবতে পড়লে অথবা তাদের কৃতকর্ম মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলে শপথ করে বলে থাকে যে, সৎ উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বর্তমানে যারা ইসলামের বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালায়, তাদের কথাও একই রকম। তারা বলে, আমাদের উদ্দেশ্য হল যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধন করা।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত চরিত্রের অধিকারী মুনাফিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের খবর জানেন এবং তাদেরকে নসীহত করার জন্য এবং কঠোর ভাষায় কথা বলার জন্য নবী ﷺ-কে আদেশ দিয়েছেন। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হল, যাতে তাদের অনুসরণ করা হয়। অন্য মানুষের অনুসরণ নয়। তাদের চিন্তাধারা ও মতবাদ যতই শক্তিশালী হোক না কেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের রুবূবীয়াতের শপথ তাঁর রাসূলকে বলছেন যে, তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ব্যতীত কারও ঈমান সংশোধন হবে না।

সকল প্রকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে রাসূলের দিকে ফিরে আসা

১) রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য অন্তরকে প্রশস্ত করা

২) পরিপূর্ণভাবে রাসূলের ফায়সালাকে মেনে নেয়া এবং কোন প্রকার শিথিলতা ব্যতীত তা বাস্তবে রূপদান করা।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফির। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা জালেম। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৫)

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُوْنَ﴾

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা ফাসেক। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৭)

যারা আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না তাদেরকে আল্লাহ উপরের তিনটি আয়াতে পরপর কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলেছেন। তিনটি গুণই কি এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করল না, সে কাফির, ফাসিক এবং যালিমও বটে। কেননা আল্লাহ কাফিরদেরকে যালিম এবং ফাসিক হিসেবেও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾

অর্থ ঃ বস্তুতঃ কাফিরেরাই প্রকৃত যালিম। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৪)

আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

অর্থ ঃ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। (সূরা তাওবা ঃ ৮৪)

প্রত্যেক কাফিরই কি যালিম এবং ফাসিক? নাকি আল্লাহর আইন দিয়ে ফায়সালা না করার কারণ বিভিন্ন প্রকার মানুষের উপর অবস্থাভেদে এ সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় মতটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার না করলে মানুষ কখনো কাফির হয়, কখনো যালিম হয় আবার অবস্থাভেদে কখনো ফাসিক হয়।

সুতরাং আমরা বলব যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অবজ্ঞা করে এবং অন্য বিধানকে অধিক উপযোগী ও উপকারী মনে করে তার মাধ্যমে মানুষের বিচার-ফায়সালা করে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে। এদের অন্তর্ভুক্ত ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের জন্য পথ হিসেবে ইসলাম বিরোধী বিধান রচনা করে। তারা তাদের রচিত বিধানকে মানুষের জন্য অধিক উত্তম ও উপযোগী মনে করেই তৈরী করে থাকে। এ কথা স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মানুষ এক পথ ছেড়ে দিয়ে যখন অন্য পথে চলে, তখন এটা মনে করেই চলে যে, প্রথম পথের চেয়ে দ্বিতীয় পথটি উত্তম।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং বিচার-ফায়সালা করে কিন্তু সে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে না এবং অন্য বিধানকে অধিক উপকারী এবং উপযোগীও মনে করে না

www.pathagar.com

বরং সে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এরূপ করে থাকে, তাহলে কাফির হবে না বরং যালিম হিসেবে গণ্য হবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিচার-ফায়সালা করে কিন্তু সে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে না এবং অন্য বিধানকে অধিক উপকারী এবং উপযোগীও মনে করে না, বরং বিচার প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ঘুষ গ্রহণের জন্য কিংবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য এরূপ করে থাকে, তাহলে কাফির হবে না বরং ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদেরে আলিম ও আবিদদেরকে রব্ব (প্রভু) হিসেবে গ্রহণ করে, তারা দু'প্রকার। (১) তারা জানে যে, তাদের গুরুরা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারপরও তারা তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের হালাল করা বস্তুকে হালাল ও হারামকে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে তাদের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। তারা ভাল করেই জানে যে, তাদের নেতারা রাসূলদের আনিত দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। এটাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল শির্ক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। (২) তারা কেবলমাত্র হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে। তারা আল্লাহর নাফরমানীতে তাদের নেতাদের অনুসরণ করেছে। যেমনভাবে মুসলমানেরা হারাম জেনেও পাপকাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাদের হুকুম অন্যান্য পাপীদের মতই।

গাইরুল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করা বড় শির্ক।

প্রশ্ন ঃ (৬৯) গাইরুল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করার হুকুম কি? গাইরুল্লাহ্‌র নামে যবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ গাইরুল্লাহ্‌র নামে পশু যবাই করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যবাই করা একটি ইবাদাত। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

অর্থ ঃ আপনার প্রভুর জন্য সলাত পড়ুন এবং কুরবানী করুন।

(সূরা কাউসার ঃ ২)

www.pathagar.com

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

অর্থ ঃ আপনি বলুন! আমার সলাত, আমার সমস্ত ইবাদাত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্যে আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (সূরা আন'আম ঃ ১৬২-১৬৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে পশু যবাই করবে, চাই সে কোন ফেরেশতার উদ্দেশে করুক বা নবী-রাসূলের উদ্দেশে বা কোন অলী বা আলিমের উদ্দেশে করুক, সবই শির্কে পরিণত হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হবে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির উচিত এ ধরনের শির্কে লিপ্ত না হওয়া।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)

গাইরুল্লাহ এর জন্যে যবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

অর্থ ঃ তোমাদের জন্যে মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পতিত হয়ে মারা যাওয়া পশু, অন্য পশুর শিং এর আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে যা তোমরা যবাই দ্বারা পবিত্র করেছ, তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার দেবীর উপর বলি দেয়া হয়েছে, তাও তোমাদের জন্য হারাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

প্রশ্ন ঃ (৭০) আল্লাহ তা'আলা বা তাঁর রাসূল অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ এই কাজটি অর্থাৎ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল ﷺ অথবা কুরআন অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা কুফরী। যদিও তা মানুষকে হাসানোর নিয়তে

হয়ে থাকে। নবী ﷺ-এর যুগে এ রকম বিদ্রুপের ঘটনা ঘটেছিল। একদা মুনাফিকরা তাঁকে এবং সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা এ সমস্ত লোকদের চেয়ে অধিক বড় পেট বিশিষ্ট লোক, অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদের চেয়ে অধিক ভীতু আর কাউকে দেখিনি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾

অর্থ ঃ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা কেবল হাসি-তামাসা করছিলাম। (সূরা তাওবা ঃ ৬৫)

নবী ﷺ-এর কাছে যখন অভিযোগ আসল, তখন তারা বলল, পথ চলার সময় পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য যে সমস্ত কথা-বার্তা বলা হয়, আমরা শুধুমাত্র তেমন কিছু কথাই বলছিলাম। নবী ﷺ তাদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিলেন।

﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

অর্থ ঃ বলুন, তোমরা কি আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-তামাসা করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান প্রকাশের পর কুফরী করেছো। (সূরা তাওবা ঃ ৬৫-৬৬)

কাজেই আল্লাহ তা'আলা, রিসলাত, অহী এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত পবিত্র। এগুলোর কোন একটি নিয়ে ঠাট্টা করা বৈধ নয়। যে এরূপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, তার কাজটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব এবং শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রমাণ বহন করে। যারা এ ধরনের কাজ করবে, তাদের উচিত আল্লাহর দরবারে তাওবা করে এবং ক্ষমা চেয়ে নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে আল্লাহর প্রতি ভয় ও সম্মান দিয়ে অন্তরকে পরিপূর্ণ করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ (৭১) কবরবাসীর কাছে দু'আ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ দু'আ করা দু'প্রকার। (১) ইবাদাতের ভিতরে দু'আ। যেমন ঃ সলাত, সিয়াম এবং অন্যান্য ইবাদাত। মানুষ যখন সলাত আদায় করে কিংবা সওম পালন করে, তখন সে প্রভুর কাছে উক্ত ইবাদাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। আল্লাহর বাণী,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার করতঃ আমার ইবাদাত হতে বিমুখ হবে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।(সূরা মু'মিন ঃ ৬০)

আল্লাহ তা'আলা দু'আকে ইবাদাত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদাতের কোন প্রকার আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে পেশ করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হবে। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর অনুরূপ সম্মানিত ভেবে কোন বস্তুর সামনে রুকূ করে অথবা সিজদা করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হবে। এজন্যই নবী ﷺ শির্কের দরজা বন্ধ করার জন্য কারো সামনে মাথা নত করতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি কি তার ভাইয়ের সাক্ষাতে মাথা নত করবে? উত্তরে তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন। সালাম দেয়ার সময় অজ্ঞ লোকেরা যদি আপনার সামনে মাথা নত করে, তবে আপনার উপর আবশ্যক হল তার কাছে বিষয়টি বর্ণনা করে দেয়া এবং তাকে নিষেধ করে দেয়া।

(২) কোন কিছু চাইতে গিয়ে অন্যের কাছে দু'আ করা। এটি সকল ক্ষেত্রে শির্ক নয়।

প্রথমতঃ যার কাছে দু'আ করা হবে, সে যদি জীবিত হয়ে থাকে এবং প্রার্থিত বস্তু প্রদান করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে শির্ক হবে না। যেমন আপনি কাউকে বললেন, আমাকে পানি পান করান, আমাকে দশটি টাকা দিন, ইত্যাদি। এ ধরনের কথা শির্ক নয়। নবী ﷺ বলেন, তোমাদেরকে যখন কেউ আহবান করে, তবে তোমরা তার আহবানে সাড়া দাও।[১] আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾

অর্থ ঃ সম্পদ বন্টনের সময় আত্মীয়, ইয়াতীম এবং মিসকীন উপস্থিত হলে, তাদেরকে তা থেকে দান কর। (সূরা নিসা ঃ ৮)

সুতরাং ফকীর যদি হাত বাড়ায় এবং বলে আমাকে কিছু দান করুন, তাহলে তা জায়েয হবে।

আল্লাহ বলেন, "তোমরা তাদেরকে রিয্ক দাও।"

দ্বিতীয়তঃ যার কাছে দু'আ করা হল, সে যদি মৃত হয়, তাহলে শির্ক হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হবে।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুন্ নিকাহ

www.pathagar.com

বড়ই আফসোসের বিষয় যে, কিছু কিছু ইসলামী দেশে এমন অনেক মুসলমান রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কবরে দাফনকৃত মাটির সাথে মিশে যাওয়া মৃত লোকটি উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে অথবা সন্তানহীনকে সন্তান দিতে সক্ষম। এটি বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের শির্ককে সমর্থন করা, মদ্য পান করা, ব্যভিচার করা এবং অন্যান্য পাপের কাজ সমর্থন করার চেয়েও জঘন্য। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।

আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কি?

প্রশ্ন ঃ (৭২) কাউকে আল্লাহর ওলী ভেবে তার কাছে বিপদে উদ্ধার কামনা করার জন্য ফরিয়াদ করার বিধান কি? আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা ওলী হওয়ার গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

অর্থ ঃ মনে রেখো যে, আল্লাহর ওলীদের না কোন আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে। (সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৩)

ঈমান এবং তাকওয়া আল্লাহর ওলী হওয়ার প্রধান আলামত। সুতরাং যে মু'মিন হবে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে, সেই আল্লাহর বন্ধু। যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, তারা আল্লাহর বন্ধু নয়। বরং তারা আল্লাহর শত্রু। আলাহ বলেন,

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর ফেরেশতাগণের, জিবরীলের এবং মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু।

(সূরা বাকারা ঃ ৯৮)

সুতরাং যে কোন মুসলিম গাইরুলাহ্র কাছে দু'আ করবে অথবা গাইরুল্লাহ্র কাছে এমন বিষয়ে ফরিয়াদ করবে, যে বিষয়ে তার কোন ক্ষমতা নেই, সে কাফির-মুশরিকে পরিণত হবে। সে কখনই আল্লাহর ওলী হতে পারে না। যদিও সে তা দাবী করে থাকে। বরং তাওহীদ, ঈমান এবং তাকওয়াবিহীন তার এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার উপদেশ হল, তারা

www.pathagar.com

যেন ভণ্ড ওলীদের মাধ্যমে প্রতারিত না হয় এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব এবং সহীহ্ হাদীসের দ্বারস্থ হয়। তবেই তাদের আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই হবে এবং মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করবে। এতে ভণ্ডদের হাত থেকে তাদের ধন-সম্পদও হিফাযতে থাকবে। তেমনিভাবে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে রয়েছে তাদেরকে ধোঁকার পথ হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা। যারা কখনো নিজেদেরকে সাইয়্যিদ আবার কখনো ওলী হিসেবে দাবী করে, আপনি যদি তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, তারা আল্লাহর ওলী বা সাইয়্যিদ হওয়ার গুণাগুণ হতে সম্পূর্ণ দূরে। প্রকৃতপক্ষে যিনি আল্লাহর ওলী হবেন, তিনি নিজেকে ওলী হিসেবে প্রকাশ করা থেকে দূরে থাকবেন। আপনি তাকে পরহেজগার মু'মিন হিসেবে দেখতে পাবেন। তিনি প্রকাশ করবেন না। তিনি মানুষের মাঝে ওলী হিসেবে প্রকাশিত হওয়া বা মানুষ তার দিকে ধাবিত হোক, কোনটাই পছন্দ করবেন না। কোন মানুষ যদি এতটুকু কামনা করে যে, লোকেরা তাকে সম্মান করুক, তার কাছে এসে ভীড় করুক, তাহলে এটা হবে তাকওয়া এবং ওলী হওয়ার পরিপন্থী। যে ব্যক্তি মূর্খদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলিমদের সাথে বিতর্ক করা কিংবা লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য 'ইল্‌ম অর্জন করবে, তার জন্য নবী ﷺ থেকে কঠিন ধমকি এসেছে। যারা নিজেদেরকে ওলী হিসেবে দাবী করে এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, তারা প্রকৃত ওলীদের গুণাগুণ হতে অনেক দূরে।[১]

মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার নসীহত হল, তারা যেন এ সমস্ত ভণ্ডদের থেকে সাবধান থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্র দিকে ফিরে এসে আল্লাহ্‌কেই একমাত্র আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ (৭৩) যাদু কাকে বলে? যাদু শিক্ষার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আলিমগণ বলেন, যাদু বলা হয় প্রত্যেক এমন ক্রিয়াকলাপকে, যার কারণ অস্পষ্ট ও গোপন থাকে, কিন্তু বাইরে তার প্রভাব দেখা যায়। গণক

---

[১] -যারা নিজে এবং খালীফাহ উপাধীধারীদের মাধ্যমে মুরীদ সংগ্রহ করে তারা কস্মিনকালেও আল্লাহর ওলী নয় বরং তারা শয়তানের ওলী। তারা পীর মুরীদীর সম্পর্কটাকে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের সাথে তুলনা করে বৈধ প্রমাণের চেষ্টা করে। এটা একটা অযৌক্তিক তুলনা ও গোজামিল দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, ছাত্র-শিক্ষক ও পীর মুরীদীর মধ্যে আসমান যমীন পার্থক্য রয়েছে। একজন ছাত্র একাধিক (শতশত) শিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কোন পীর তাকে ছাড়া আরো পীরের মুরীদ হোক তা কস্মিনকালেও বরদাশত করবে না। কেননা পীর মুরীদী শুধুমাত্র ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

এবং জ্যোতিষের কার্যকলাপও যাদুর অন্তর্ভুক্ত। চাকচিক্যময় বক্তব্য ও ভাষার প্রভাবকেও যাদু বলা হয়। রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই কিছু কিছু বক্তৃতার মধ্যে যাদু রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি বস্তুর গোপন প্রভাবকে যাদু বলা হয়।

আর পরিভাষায় এমন কিছু গিরা এবং ঝাড়ফুঁকের নাম, যা মানুষের অন্তর, মস্তিষ্ক এবং শরীরের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করতঃ কখনো জ্ঞানশূন্য করে ফেলে, কখনো ভালবাসা বা ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। কখনো শরীর অসুস্থ করে দেয়। যাদু শিক্ষা করা হারাম। শুধু তাই নয়, বরং তা কখনো কুফরী এবং শির্কের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

অর্থ ঃ সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলায়মান (আঃ) অবিশ্বাসী হননি, কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করেছিল, তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিতো এবং উভয়ে কাউকে ওটা শিক্ষা দেয়ার পূর্বে তারা বলতো যে, আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করো না, অনন্তর যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তাই শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করত, যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয় এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। (সূরা বাকারা ঃ ১০২)

শয়তানের মাধ্যমে এ ধরনের যাদু শিক্ষা এবং ব্যবহার করা কুফরী এবং সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যেই যাদুকরের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। তার যাদুর সীমা যদি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে তাকে কাফির এবং মুরতাদ হিসেবে

www.pathagar.com

হত্যা করতে হবে। আর যদি কুফরী পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে মুসলিমদেরকে তার ক্ষতি হতে হিফাযত করার জন্য তাকে দণ্ড প্রয়োগ করে করে হত্যা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৭৪) যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মিশের ব্যবস্থা করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা তৈরী করা হারাম। **কখনো কখনো শির্কে পরিণত হয়।**

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾

অর্থ ঃ এবং উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না, এমনকি তারা বলতো যে, আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করো না, অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তাই শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করত, যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয় এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই।

(সূরা বাকারা ঃ ১০২)

প্রশ্ন ঃ (৭৫) গণক কাকে বলে? গণকের কাছে যাওয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ গণক এমন লোককে বলা হয়, যে অনুমানের উপর নির্ভর করে ভিত্তিহীন বিষয়ের অনুসন্ধান করে থাকে। জাহিলী যামানার কিছু লোকের সাথে শয়তানের যোগাযোগ ছিল। শয়তানেরা চুরি করে আকাশের সংবাদ শ্রবণ করত এবং তাদের কাছে বলে দিত। আকাশ থেকে যা শ্রবণ করত, তার সাথে আরো অনেক মিথ্যা কথা সংযোগ করে মানুষের মধ্যে তা প্রকাশ করত। তারা যা বলত, তার একটি কথা সত্য হলে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যেত এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য ও ভবিষ্যতে কি হবে, তা জানার জন্য গণকদের কাছে আসা শুরু করত। এজন্যই আমরা বলি যে, গণক তাকে বলা হয়, যে ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

যারা গণকের কাছে আসে, তারা তিনভাগে বিভক্ত। (১) গণকের কাছে এসে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা এবং তার কথায় বিশ্বাস না করা। এটা হারাম। এ ধরনের লোক সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত কবূল হবে না।[১]

(২) গণকের কাছে এসে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা এবং তার কথায় বিশ্বাস করা। এটা আল্লাহর সাথে কুফরী করার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সে 'ইল্‌মে গায়েবের দাবীতে গণককে বিশ্বাস করেছে। মানুষ 'ইল্‌মে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করলে আল্লাহর কথাকে অবিশ্বাস করা হবে।

আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ﴾

অর্থ ঃ বলুন, আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের সংবাদ অন্য কেউ জানে না। সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ বিষয় (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র)-এর সাথে কুফরী করল।[২]

(৩) গণককে পরীক্ষার জন্য এবং মানুষের কাছে তার ধোঁকাবাজির কথা তুলে ধরার জন্য গণকের কাছে গমন করাতে কোন অসুবিধা নেই। ইবনু সায়্যাদ নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলে তিনি মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে ইবনে সায়্যাদকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো আমি কি গোপন করেছি? ইবনে সায়্যাদ বলল, আদ্‌-দুখ্‌ অর্থাৎ আদ্‌-দুখান। নবী ﷺ বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। মোটকথা গণকের কাছে আগমণকারীর তিন অবস্থা হতে পারে ঃ

১) মানুষের কাছে গণকের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য নয়, এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্যও নয় বরং এমনিতেই গণকের কাছে গিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত কবূল হবে না।

---

[১] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্‌ সালাম

[২] - তিরমিযী, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্‌ তাহারাহ

www.pathagar.com

২) গণককে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে বিশ্বাস করলে কাফির হয়ে যাবে। তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করলে কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।

৩) গণককে পরীক্ষা করার জন্য এবং মানুষের কাছে গণকের ধোকাবাজির কথা ফাঁস করে দেয়ার নিয়তে গণকের কাছে গেলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (৭৬) রিয়া বা মানুষকে দেখানো ও শুনানোর নিয়তে ইবাদাত করার বিধান কি?

উত্তর ঃ যে ইবাদাত 'রিয়া' মিশ্রিত হয় তা তিন প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ ইবাদাত মূলতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশেই করা হয়। যেমন দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'সলাত' আদায় করা। এটা শির্ক এবং এ প্রকার ইবাদাত বাত্বিল।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ইবাদাত করার মধ্যবর্তী অবস্থায় 'রিয়ায়' পতিত হওয়া। অর্থাৎ যেমন ইবাদাত শুরুর সময় একনিষ্ঠভাবে আরম্ভ করে কিন্তু ইবাদাতের মধ্যবর্তী সময়ে 'রিয়া' সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ইবাদাতের প্রকারভেদ অনুযায়ী তার হুকুম নির্ধারিত হবে ঃ

১) যদি দ্বিতীয় ইবাদাতটি প্রথমটির উপর ভিত্তিশীল না হয় তবে প্রথমটি শুদ্ধ হবে আর দ্বিতীয়টি বাত্বিল হয়ে যাবে। এর উদাহরণ হল, যেমন কোন ব্যক্তি একশত বিয়াল দান করল ইখলাসের সাথে, আরও একশত রিয়াল দান করল লোক দেখানোর উদ্দেশে, এমতাবস্থায় প্রথম একশত বিয়ালের দানটি শুদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয় একশত রিয়ালের দানটি বাত্বিল হয়ে যাবে।

২) যদি ইবাদাতটির শেষাংশ প্রথমাংশের উপর ভিত্তিশীল হয় তবে এর দু'টি অবস্থা ঃ

(ক) ইবাদাতকারী ব্যক্তি 'রিয়াকে' প্রতিহত করবে এবং 'রিয়ার' উপর স্থির হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি 'সলাতে' দাঁড়াল একনিষ্ঠভাবে কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে স্বীয় অন্তরে 'রিয়া' অনুভব করল, অতঃপর 'সলাত' আদাকারী স্বীয় অন্তরে রিয়া অনুভব করতে থাকল এবং সাথে সাথে প্রতিহতও করতে থাকল, এমতাবস্থায় 'রিয়া' ইবাদাতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না, অথবা কোন ক্ষতি করবে না।

(খ) অপর অবস্থাটি হল ঃ ইবাদাতকারী 'রিয়ার' প্রতি তুষ্ট থাকবে এবং 'রিয়া'কে অন্তরে শেষাংশ প্রথমাংশের উপর ভিত্তিশীল। যেমন কোন ব্যক্তি 'সলাতে' দাঁড়াল ইখলাসের সাথে, অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে সে যখন লক্ষ্য করল মানুষ তার 'সলাতের' দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, তখন তার অন্তরে 'রিয়া'র উদয়

www.pathagar.com

হল এবং 'সলাত'রত উক্ত ব্যক্তি 'রিয়া'র প্রতি তুষ্ট থাকল (অন্তরে 'রিয়া'কে প্রতিহত করল না) এমতাবস্থায় পূর্ণ 'সলাত' বাত্বিল হয়ে যাবে। কেননা 'সলাতের' শেষাংশের সাথে প্রথমাংশ সম্পৃক্ত রয়েছে।

তৃতীয় প্রকার ঃ এটা হল ইবাদাত সমাপ্ত করার পর যদি ইবাদাতকারী অন্তরে 'রিয়া'র উদ্ভব ঘটে, তবে তা ইবাদাতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু যদি ইবাদাতের সাথে সংঘর্ষকারী কিছু করে তাবে ইবাদাতটি বাত্বিল হয়ে যাবে। যেমন দান খয়রাত করার পর দান গ্রহণকারীকে খোঁটা দেয়া, গঞ্জনা করা বা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেয়া।

দ্রষ্টব্য ঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো 'রিয়া'র অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইবাদাত দেখে কেউ প্রশংসা করলে এবং তাতে ইবাদাতকারী খুশী হলে তা রিয়ার অন্তর্গত হবে না। কারণ, এটি ইবাদাত সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছে। আনুগত্যের কাজ করার পর মানুষ খুশী হবে, এটাই স্বাভাবিক। বরং এটি তার ঈমানের প্রমাণ বহন করে।

নবী ﷺ বলেছেন, ﴿مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ﴾

অর্থ ঃ নেকীর কাজ করে যে খুশী হয় এবং পাপের কাজ করাকে যে খারাপ মনে করে, সেই প্রকৃত মু'মিন ।

রাসূল ﷺ বলেন, ﴿تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ﴾

অর্থঃ এটা মু'মিনদের আগাম শুভ সংবাদ।[১]

প্রশ্ন ঃ (৭৭) কুরআনের শপথ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তর একটু বিস্তারিতভাবে দেয়া প্রয়োজন। যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর নামে শপথ করে, তখন উক্ত বস্তুকে সম্মানিত মনে করেই করে থাকে। এজন্যই আল্লাহ বা তাঁর অন্য কোন নাম অথবা কোন সিফাত (গুণাবলী) ব্যতীত অন্য বস্তুর নামে শপথ করা জায়েয নেই। যেমন কেউ বলল, আল্লাহর শপথ! আমি এ কাজটি অবশ্যই করব অথবা বলল কাবা ঘরের প্রভুর শপথ! আল্লাহর বড়ত্বের শপথ! ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম (কথা)। আল্লাহর কথা তাঁর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। কথা বলা আল্লাহর সত্তাগত সিফাত। তিনি সদাসর্বদা এ গুণে গুণান্বিত। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি কথা বলেন। কথা বলার শক্তি থাকা বা বাকশক্তি থাকা একটি পরিপূর্ণ গুণ। আল্লাহ তা'আলা সকল দিক থেকে

---

[১] - ইবনে মাজাহ, অধ্যায় ঃ কিতাবুয্ যুহ্দ

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ। তাই কথা বলা আল্লাহর একটি সত্তাগত গুণ। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি কথা বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলা একটি কর্মগত গুণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

অর্থ ঃ তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন ওকে বলেন ঃ হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২)

এখানে কথা বলাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে দলীল রয়েছে যে, আল্লাহ যখন ইচ্ছা কথা বলেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক দলীল রয়েছে। যারা বলে আল্লাহ্ সদাসর্বদা কথা বলার গুণে গুণান্বিত, কিন্তু আল্লাহর কথা তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, বাইরে এর কোন প্রভাব নেই বা কেউ তাঁর কথা শ্রবণ করতে পারে না, তাদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাদের মাযহাব বাত্বিল হওয়ার ব্যাপারে ৯০টি যুক্তি বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু কুরআন মাজীদে আল্লাহর কালাম রয়েছে, আর আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত, তাই কুরআনের শপথ করা জায়েয আছে। হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ এটাকে বৈধ বলেছেন। শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হয় এমন শব্দ উচ্চারণ করে শপথ করা ঠিক নয়। সাধারণ লোকেরা যাতে বুঝতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা শপথ করা উচিত। কেননা মানুষ বুঝতে পারে এবং তাদের অন্তরে স্বস্তি অর্জিত হয়, এমন বক্তব্য মানুষের কাছে পেশ করাই উত্তম। শপথ যেহেতু আল্লাহ, তাঁর নাম এবং সিফাতের মাধ্যমেই করতে হবে, তাই গাইরুল্লাহ্র নামে, নবীর নামে, জিবরীল ফেরেশতার নামে, কা'বার নামে বা অন্য কোন মাখলুকের নামে শপথ করা জায়েয নয়। নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা যেন চুপ থাকে।[১] নবী ﷺ আরো বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ্র নামে শপথ করল, সে কুফরী বা শির্ক করল।[২]

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুশ্ শাহাদাত

[২] - তিরমিযী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর

www.pathagar.com

কেউ যদি কোন মানুষকে নবী ﷺ, তাঁর হায়াত কিংবা অন্য ব্যক্তির নামে শপথ করতে দেখে, তা হলে সে যেন তাকে নিষেধ করে এবং বলে দেয় যে, এটা হারাম। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আদেশ বা নিষেধ যাতে নম্র ভাষায় হয়। যাতে করে সে সহজেই নসীহত কবূল করতে পারে। কেননা অনেক মানুষ রয়েছে, যারা রাগান্বিত হয়ে মানুষকে আদেশ-নিষেধ করে থাকে। অনেক সময় তাদের চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। মনে হয় সে যেন নিজের প্রতিশোধ নিচ্ছে। এতে করে শয়তান এসে সুযোগ পেয়ে যায়। মানুষ যদি পরস্পর পরস্পরকে মর্যাদা প্রদান করতো, হিকমত এবং নম্রতার সাথে তাকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিতো, তা হলে তাদের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য হতো।

নবী ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার মাধ্যমে তা দান করেন না।[১]

অনেকের কাছেই নবী ﷺ-এর সাথে গ্রাম্য লোকটির আচরণের ঘটনা গোপন নয়। গ্রাম্য লোকটি মাসজিদে নববীতে এসে পেশাব করে দিল। লোকেরা তাকে ধমকাতে শুরু করল। নবী ﷺ তাদেরকে ধমকাতে নিষেধ করলেন। লোকটি যখন পেশাব শেষ করল, নবী ﷺ তাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, এ সমস্ত মাসজিদ পেশাব করা বা তাতে ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নয়। তা কেবলমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা, তাসবীহ পাঠ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্যই নির্দিষ্ট। অতঃপর তিনি সাহাবাদেরকে পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার আদেশ দিলেন। এতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এবং মাসজিদ পবিত্র হয়ে গেল। সাথে সাথে গ্রাম্য লোকটিকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যও সফল হয়ে গেল। আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকেও এরূপ হওয়া উচিত। আমরা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য পন্থায় সত্যকে তুলে ধরব। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন।

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার বিধান কি?

প্রশ্ন ঃ (৭৮) নবীর নামে, কা'বার নামে এবং মান-মর্যাদা ও জিম্মাদারীর নামে শপথ করার বিধান কি?

---

[১] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল বির্ ওয়াস্ সিলাহ

www.pathagar.com

উত্তর ঃ নবী ﷺ-এর নামে শপথ করা জায়েয নয়। বরং এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে কা'বার নামে শপথ করা শির্ক। নবী ﷺ এবং কা'বা উভয়টিই মাখলুক। আর কোন মাখলুকের নামে শপথ করাই শির্ক। এমনিভাবে সম্মান এবং জিম্মাদারীর শপথ করাও শির্ক। নবী ﷺ বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ্র নামে শপথ করল, সে কুফরী অথবা শির্ক করল।[১] ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلاَّ فَلْيَصْمُتْ

অর্থ ঃ তিনি তাঁর পিতা উমার (রাঃ)-কে পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন। নবী ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।[২] কিন্তু "আমার জিম্মায়" এটি শপথ নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল অঙ্গীকার।

প্রশ্ন ঃ (৭৯) যে ব্যক্তি কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করে, কবরবাসীর কাছে দু'আ করে এবং তাদের জন্য নযর-মানৎ পেশ সহ অন্যান্য ইবাদাত করে থাকে, তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটি একটি বিরাট প্রশ্ন। বিস্তারিতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া দরকার। তাই আমরা বলব যে, কবরবাসীগণ দু'প্রকার ঃ

(১) যারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে এবং মানুষেরা তাদের প্রশংসা করে থাকে, তাদের জন্য শুভ কামনা করতে হবে। এ সমস্ত কবরবাসী তাদের মুসলমান ভাইদের দু'আর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

---

[১] - তিরমিযী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর

[২] - বুখারী, কিতাবুল আদব

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রণী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা হাশর ঃ ১০)

মৃত ব্যক্তি নিজের অকল্যাণ দূর করতে বা কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম নয়। তাহলে কিভাবে সে অপরের কল্যাণ করতে পারবে অথবা অপরের পক্ষ হতে অকল্যাণ দূর করতে পারবে?

(২) যারা ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় শির্কের মত পাপ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে তারা দাবী করতো যে তারা আল্লাহর অলী, তারা গায়েবের খবর রাখে। এমনকি রুগীর আরোগ্য দান, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের দাবীও করে থাকে। এরা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। এদের জন্য দু'আ করা এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রহমত কামনা করা জায়েয নেই।

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

অর্থ ঃ নবী ও মু'মিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হোক- এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী। আর ইবরাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফিরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল।

(সূরা তাওবা ঃ ১১৩-১১৪)

কবরবাসীগণ কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করতে পারে না। তাই কবরবাসীদের কাছে এগুলো কামনা করা জায়েয নেই। যদিও কোন কোন কবর থেকে কারামাত প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন কবর থেকে আলো বের হওয়া, সুঘ্রাণ বের হওয়া ইত্যাদি। অথচ তারা শির্কের উপরে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের কবর থেকে যদি এরূপ কিছু বের হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটি ইবলীস শয়তানের ধোঁকা মাত্র।

মুসলিমদের উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর উপর সকল প্রকার আশা-ভরসা করা। কেননা তাঁর হাতেই আকাশ-যমীনের একমাত্র রাজত্ব। তাঁর দিকেই

www.pathagar.com

সকলে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনিই ফরিয়াদকারীর দু'আ কবূল করেন এবং মানুষের অকল্যাণ দূর করেন।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾

অর্থ ঃ তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৫৩)

মুসলিমদের জন্য আমার আরো নসীহত এই যে, তারা যেন কারো তাকলীদ[১] না করে এবং একমাত্র রাসূল ﷺ-এর নিঃশর্ত অনুসরণ করে।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর জীবনীতে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾

অর্থ ঃ বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আল-'ইমরান ঃ ৩১)

মুসলিমদের উপর আবশ্যক হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার দাবী করে, তারা যেন তার আমলগুলোকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখে। তার আমলগুলো যদি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত মুতাবেক হয়, তাহলে আশা করা যায় যে, সে আল্লাহ্‌র ওলী। আর যদি তার ভিতরে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমল পাওয়া যায়, তাহলে কোন ক্রমেই সে আল্লাহ্‌র ওলী হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে ওলী হওয়ার মানদণ্ড বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

---

[১] - বিনা দলীলে কারো কথাকে মেনে নেয়াকে তাকলীদ বলে।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ জেনে রেখো, যারা আল্লাহর ওলী, তাদের না আছে কোন ভয়-ভীতি, না তারা চিন্তিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করে চলে।

(সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৩)

সুতরাং যে মু'মিন-মুত্তাকী, সেই আল্লাহর ওলী। আর যে ব্যক্তির ভিতরে ঈমান এবং তাকওয়া নেই, সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না। যার ভিতরে যতটুকু ঈমান ও আমল রয়েছে, তার ভিতরে ততটুকু আল্লাহর বন্ধুত্ব রয়েছে। তবে আমরা নির্দিষ্ট করে কাউকে আল্লাহর ওলী হিসেবে সার্টিফিকেট দিতে পারি না। আমরা বলতে পারি, যিনি মু'মিন-মুত্তাকী হবেন তিনি আল্লাহর ওলী হবেন।

কবরের ভক্তরা কবরবাসীর কাছে দু'আ করলে অথবা তা থেকে মাটি নিলে যদিও কখনো কখনো উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তথাপিও এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, কবরবাসীই উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের কারণ। এটি কবরবাসীর কাছে দু'আকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ফিতনার কারণও হতে পারে। কারণ, আমরা জানি যে, কবরবাসী কারও দু'আ কবূল করার ক্ষমতা রাখেন না কিংবা কবরের মাটি কল্যাণ আনয়ন করতে বা ক্ষতি দমন করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামাত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।

(সূরা আহকাফ ঃ ৫-৬)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

অর্থ ঃ এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে তারা পুনরুত্থিত হবে, তাও জানে না। (সূরা নাহ্ল ঃ ২০-২১)

এই মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ছাড়া যাকেই ডাকা হোক না কেন, ডাকে সাড়া দিবে না এবং আহ্বানকারীর কোন উপকারও করতে পারবে না।

www.pathagar.com

নবী ﷺ-এর কবর মাসজিদের ভিতরে হওয়ার জবাব

প্রশ্ন ঃ (৮০) যে সমস্ত কবর পূজারী নবী ﷺ-এর কবর মাসজিদের ভিতরে হওয়াকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা কয়েকভাবে দিতে পারি ঃ

১) মাসজিদটি মূলতঃ কবরের উপর নির্মাণ করা হয়নি বরং এ মাসজিদ নির্মিত হয়েছে নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায়।

২) নবী ﷺ-কে মাসজিদে দাফন করা হয়নি। কাজেই এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, এটাও সৎ ব্যক্তিদেরকে মাসজিদে দাফন করার কুপ্রথার অন্ত র্ভুক্ত। বরং নবী ﷺ-কে তাঁর নিজ ঘরে দাফন করা হয়েছে।

৩) রাসূল ﷺ-এর ঘরগুলোকে মাসজিদে প্রবেশ করানো সাহাবীদের যৌথ সিদ্ধান্তে হয়নি বরং তাদের অধিকাংশের মৃত্যুর পর হয়েছে। তখন তাঁদের অল্প কয়েকজন মাত্র বেঁচে ছিলেন। তা ঘটেছিল ৯৪ হিঃ সনে মাসজিদ সম্প্রসারণকালে। এ কাজটি সাহাবীদের অনুমতি বা তাদের যৌথ সিদ্ধান্তে হয়নি। তাদের কেউ কেউ তাতে বিরোধিতাও করেছিলেন। তাবিয়ীদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

৪) কবরটি মূলতঃ মাসজিদের ভিতরে নয়। কারণ, তা মাসজিদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক রুপে রয়েছে। আর মাসজিদকে ওর উপর বানানো হয়নি। এজন্যই এ স্থানটিকে তিনটি প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত ও বেষ্টিত করা হয়েছে। আর উত্তর দিকের প্রাচীরটি ত্রিভুজের মত করে রাখা হয়েছে। এতে করে নবী ﷺ-এর কবরটি সরাসরি মুসল্লীর সামনে পড়ে না। আশা করি কবর পূজারীদের দলীল খণ্ডনে উপরোক্ত উত্তরগুলোই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন ঃ (৮১) কবরের উপরে গম্বুজ নির্মাণের বিধান কি?

উত্তর ঃ কবরের উপরে গম্বুজ নির্মাণ করা হারাম। নবী ﷺ কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এতে কবরবাসীকে অতিরিক্ত সম্মান করার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কবরবাসীদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করারও ভয় রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ কবরের অবস্থাই তাই। অধিকাংশ মানুষই কবরবাসীদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকে। আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার আশায় কবরবাসীর উসীলায় দু'আ করে থাকে। কবরবাসীদের কাছে দু'আ করা এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য তাদের কাছে ফরিয়াদ করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৮২) মাসজিদে দাফন করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নবী ﷺ মাসজিদে দাফন করতে এবং কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত সময়েও কবরকে মাসজিদে পরিণতকারীদের উপর লা'নত করেছেন এবং তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, কবরকে মাসজিদে পরিণত করা ইয়াহূদ-নাসারাদের কাজ। কারণ, মাসজিদে দাফন করা এবং কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা শির্কের মাধ্যম। মাসজিদে মৃত ব্যক্তিদেরকে দাফন করা হলে মানুষ বিশ্বাস করবে যে, দাফনকৃত ব্যক্তি কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে অথবা তার এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তার আনুগত্যকে আবশ্যক করে। মুসলিমদের উচিত এ ভয়াবহ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। তাদের মাসজিদগুলো যেন সকল প্রকার শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে সহীহ আকীদা এবং নির্ভেজাল তাওহীদুর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

অর্থ ঃ এবং এও ওহী করা হয়েছে যে, মাসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।

(সূরা জিন ঃ ১৮)

সুতরাং মাসজিদসমূহ সকল প্রকার শির্কের চিহ্ন থেকে মুক্ত হতে হবে। তাতে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা হবে। তাঁর কোন শরীক নেই। এটাই মুসলিমদের উপর ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ (৮৩) নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যে কোন কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েয নয়। নবী ﷺ বলেন,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

অর্থ ঃ তোমরা তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদের দিকে ভ্রমণ করো না। মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদ।[১]

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল হাজ্জ

www.pathagar.com

হাদীসের উদ্দেশ্য হল ইবাদাতের নিয়তে পৃথিবীর কোন স্থানের দিকে সফর করা যাবে না। কারণ, এ তিনটি মাসজিদের দিকেই ইবাদাতের নিয়তে সফর করা জায়েয। অন্য কোন মাসজিদের দিকে ভ্রমণ করা জায়েয নেই। নবী ﷺ-এর কবরের দিকে নয়, বরং তাঁর মাসজিদে ইবাদাতের নিয়তে সফর করতে হবে। মাসজিদে পৌঁছে গেলে নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। তা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করা জায়েয নেই।

কবরের মাধ্যমে বরকত কামনা এবং তার চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা হারাম

প্রশ্ন ঃ (৮৪) কবরের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা বা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কিংবা নৈকট্য হাসিলের জন্য কবরের চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কবর থেকে বরকত কামনা করা হারাম এবং তা শির্কের পর্যায়ে। কেননা এটা এক বিশ্বাস, যার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। সালাফে সালিহীন থেকে কবরের বরকত গ্রহণ করার কথা প্রমাণিত নয়। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, কবরবাসী অকল্যাণ প্রতিহত করা এবং কল্যাণ আনয়নের ক্ষমতা রাখে, তাহলে এটি বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনিভাবে রুকূ, সিজদাহ, নৈকট্য লাভ বা সম্মানের নিয়তে যদি কবরবাসীর জন্য কুরবানী করে তাও শির্কে পরিণত হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থ ঃ যে কেউ বিনা দলীলে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডাকে, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে। নিশ্চয় কাফিরেরা সফলকাম হবে না।

(সূরা মু'মিনূন ঃ ১১৭)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীরক না করে।

(সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১১০)

যে ব্যক্তি বড় শির্কে লিপ্ত হবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথকারী যার নামে শপথ করল, তাকে যদি আল্লাহর সমপর্যায়ের সম্মানিত মনে করে শপথ করে, তাহলে বড় শির্কে পরিণত হবে। আর যদি শপথকারী এ রকম বিশ্বাস পোষণ না করে কিন্তু তার অন্তরে শপথকৃত বস্তুর প্রতি সম্মান রয়েছে, কিন্তু এ সম্মান আল্লাহর সম্মানের পর্যায়ে মনে করে না, তাহলে ছোট শির্কে পরিণত হবে। নবী ﷺ বলেছেন,

﴿مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ এর নামে শপথ করল, সে কুফরী অথবা শির্ক করল।[১]

যারা কবর থেকে বরকত হাসিল করে, কবরবাসীর কাছে দু'আ করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করে, তাদের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব। তাদের যুক্তি, "আমরা পূর্ব পুরুষদেরকে এ অবস্থায় পেয়েছি"।

এ কথা আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। যে সমস্ত কাফির নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তাদেরও যুক্তি এটিই ছিল।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾

অর্থ ঃ এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক পথের পথিক পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। (সূরা যুখরুফ ঃ ২৩)

তাদের কাছে প্রেরিত রাসূল বললেন,

﴿أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

---

[১] - তিরমিজী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদাপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (সূরা যখরুফ ঃ ২৪)

আল্লাহ বলেন, ﴿فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

অর্থ ঃ অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি।

(সূরা যুখরুফ ঃ ২৫)

অতএব দেখুন, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হয়েছে। ভুলের উপর থেকে কারও পক্ষে বাপ-দাদাদের অথবা দেশাচরের দোহাই দেয়া ঠিক নয়। এসব দোহাই তাদের কোন উপকারে আসবে না। বরং তাদের উচিত আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং সত্যের অনুসরণ করা। দেশাচর এবং মানুষের তিরস্কারের ভয় যেন তাদেরকে সত্যের অনুসরণের পথে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। সত্যিকারের মু'মিন কোন প্রকার সমালোচনাকারীর সমালোচনার ভয় করে না এবং আল্লাহর দ্বীন হতে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ (৮৫) প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে সলাত আদায়ের বিধান কি?

উত্তর ঃ প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই।

নবী ﷺ বলেন, ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ﴾

অর্থ ঃ যে ঘরে ছবি রয়েছে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[১]

স্মৃতি স্বরূপ কারও ছবি যত্ন করে রেখে দেয়াও জায়েয নেই। কাজেই যার কাছে এ রকম ছবি রয়েছে, তার উচিত এগুলো নষ্ট করে দেয়া। চাই সেই ছবি দেয়ালে ঝুলন্ত থাকুক কিংবা এ্যালবামের ভিতরে সংরক্ষিত থাকুক অথবা অন্য কোন স্থানে থাকুক। কারণ, ঘরের মধ্যে ছবি থাকলে ঘরের মালিক রহমতের ফেরেশতাদের প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন ঃ (৮৬) ঘরের দেয়ালে ছবি ঝুলানোর বিধান কি?

উত্তর ঃ ঘরের দেয়ালে ছবি ঝুলিয়ে রাখা সম্পূর্ণ হারাম। যদিও শুধুমাত্র মাথা এবং শরীরের কিছু মাত্র দেখা যায়। সম্মান প্রদর্শনের জন্যই মানুষেরা এ

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল লিবাস

www.pathagar.com

রকম করে থাকে। এ ধরনের সম্মান থেকেই শির্কের সূচনা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নূহ (আঃ)-এর কাওমের লোকেরা প্রথমে কতিপয় সৎ লোকের ছবি উঠিয়ে রেখে ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দেখে তাদের ইবাদাতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ইবাদাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা স্বয়ং উক্ত সৎ ব্যক্তিদের ইবাদাত শুরু করে দেয়।

প্রশ্ন ঃ (৮৭) ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি উঠানোর বিধান কি?

উত্তর ঃ ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত এই যে, হাতে যেন কোন প্রকার কাজ করা না হয়। এভাবে ছবি উঠালে নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে প্রশ্ন এই যে, ছবি তোলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য যদি হয় ছবিকে সম্মান করা, তা হলে হারাম হবে। কারণ, নিষিদ্ধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করাও হারাম। তাই স্মৃতি স্বরূপ ছবির সম্মান করা এবং হিফাযত করা নিষেধ। নবী ﷺ বলেন,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ.

অর্থ ঃ যে ঘরে ছবি রয়েছে, সেই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[১]

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ঘরে ছবি রাখা অথবা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা জায়েয নয়।

ইসলামে বিদ'আতের কোন স্থান নেই।

প্রশ্ন ঃ (৮৮) (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোন সুন্নাত চালু করল, তার জন্য সাওয়াব রয়েছে, এ হাদীসকে যে সমস্ত বিদ'আতী তাদের বিদ'আতের পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?

উত্তর ঃ তাদের জবাবে আমরা বলব, নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল লিবাস

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোন সুন্নাত চালু করল, তার জন্য সাওয়াব রয়েছে, তিনি তো এও বলেছেন যে,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

অর্থ ঃ তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাহ্র অনুসরণ করবে এবং তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর তোমরা নতুন আবিষ্কৃত বিষয় হতে সাবধান থাকবে। কারণ, প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।[১]

প্রশ্নে বর্ণিত যে হাদীসটিকে বিদ'আতীরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, সেই হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা এই যে, মুযার গোত্রের কিছু অভাবী লোক নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলে তিনি সাদকা করার প্রতি উৎসাহ দিলেন। এক ব্যক্তি থলি ভর্তি রূপা নিয়ে এসে নবী ﷺ-এর সামনে হাজির হল। তখন তিনি বললেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে উত্তম কোন সুন্নাত চালু করল, তার জন্য সাওয়াব রয়েছে এবং তার পরে কিয়ামাত পর্যন্ত যারা সেই সুন্নাহ্র উপর আমল করবে, তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।[২]

হাদীসের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা জানতে পারলাম, যে, উত্তম সুন্নাত বলতে সুন্নাহ্র উপর নতুনভাবে আমল শুরু করাকে বুঝানো হয়েছে। নতুনভাবে সুন্নাত তৈরী করার কথা বলা হয়নি। কেননা আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কারো জন্য শরীয়তের কোন বিধান প্রবর্তন করা জায়েয নেই। কাজেই হাদীসের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি যদি সুন্নাহ্র উপর আমল করে, তার আমল দেখে অন্যরাও যদি সেই সুন্নাহ্র উপর আমল করা শুরু করে, তাহলে প্রথম আমলকারী ব্যক্তি নিজে আমল করার সাওয়াব পাওয়ার সাথে সাথে তাকে দেখে আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

---

[১] - আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ

[২] - ইবনে মাজাহ, অধ্যায় ঃ আল-মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা)

www.pathagar.com

অথবা হাদীসের উদ্দেশ্য হল, শরীয়ত সম্মত কোন ইবাদাত পালনের মাধ্যম বা উপকরণ যেমন ধর্মীয় কিতাব রচনা করা, 'ইল্ম প্রচার করা, মাদরাসা নির্মাণ করা ইত্যাদি। এমন নয় যে, নতুন ইবাদাত তৈরী করা। মানুষের ইচ্ছামত যদি শরীয়ত প্রবর্তন করা জায়েয হয়, তাহলে অর্থ এই হয় যে, নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইসলাম পরিপূর্ণ হয়নি। কোন বিদআত প্রবর্তন করে তাকে হাসানাহ বা উত্তম বলে ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা নাবী ﷺ বলেন, প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।

প্রশ্ন ঃ (৮৯) ঈদে মীলাদুন্ নবী পালনের হুকুম কি?

উত্তর ঃ নবী ﷺ-এর সঠিক জন্ম তারিখ অকাট্যভাবে জানা যায়নি। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে নবী ﷺ রবীউল আওয়াল মাসের ৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রাবীউল আওয়ালের ১২তারিখ নয়।

শরীয়তের দিক থেকে যদি মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা শরীয়ত সম্মত হত, তবে নবী ﷺ তা করতেন অথবা তাঁর উম্মাতকে করতে বলতেন। আর কুরআনে বা হাদীসে তা সংরক্ষিত থাকতো।

আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

অর্থ ঃ আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (সূরা হিজর ঃ ৯)

যেহেতু মীলাদের বিষয়টি সংরক্ষিত হয়নি, তাই বুঝা গেল যে, মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা দ্বীনের কোন অংশ নয়। আর যা দ্বীনের অংশ নয়, তা দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা বৈধ নয়। কিভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব, আল্লাহ তা বলে দিয়েছেন। তা হল নবী ﷺ কর্তৃক নিয়ে আসা দ্বীন। তাই আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে নতুন কিছু প্রবর্তন করা জায়েয নেই। এ রকম করা বিরাট অপরাধ। আল্লাহর কালামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার শামিল।

আল্লাহ বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থ ঃ আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

আমরা বলব যে, এই মীলাদ মাহফিল যদি পরিপূর্ণ দ্বীনের অংশ হতো, তাহলে অবশ্যই নবী ﷺ মৃত্যুর পূর্বেই তা বলে যেতেন। যারা বলে মীলাদ

www.pathagar.com

মাহফিল পরিপূর্ণ দ্বীনের অংশ, তবে বলতে হবে রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পরে তা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাহলে এটা হবে আল্লাহর কথাকে মিথ্যা বলার শামিল।

কোন সন্দেহ নেই যে, যারা মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করে, তারা রাসূল ﷺ-এর সম্মান এবং ভালবাসার জন্যই করে থাকে। রাসূলকে ভালবাসা, তাকে সম্মান করা সবই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, কোন মানুষের কাছে যদি নবী ﷺ তার সন্তান, পিতামাতা এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হতে প্রিয় না হয়, তা হলে সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। যেহেতু নবী ﷺ-এর ভালবাসা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত, তাই এর ভিতরে বিদ'আত তৈরী করা জায়েয নেই। তাছাড়া আমরা শুনতে পাই যে, এই মীলাদ মাহফিলে এমন বড় বড় অপছন্দনীয় কাজ হয়, যা শরীয়ত বা কোন সুস্থ বিবেকও সমর্থন করে না। তারা এমন এমন কবিতা পাঠ করে, যাতে রয়েছে নবী ﷺ-এর প্রশংসায় খুবই বাড়াবাড়ি। অনেক সময় তাঁকে আল্লাহর চেয়েও বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। মীলাদ অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপস্থিত সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করে যে, মীলাদ মাহফিলে নবী ﷺ উপস্থিত হন। তাই তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়াতে হবে। এটি একটি চরম মূর্খতা। নবী ﷺ জীবিত থাকাবস্থায় তাঁর সম্মানের জন্য দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণও দাঁড়াতেন না। অথচ তারা তাঁকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতেন এবং সম্মান করতেন। নবী ﷺ জীবিতাবস্থায় দাঁড়নো পছন্দ করতেন না। তাহলে কিভাবে কল্পনা করে তাঁর মৃত্যুর এ রকম করা যেতে পারে?

মীলাদ নামের বিদ'আতটি সম্মানিত তিন যুগ চলে যাওয়ার পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে রয়েছে এমন কিছু খারাপ আমল, যা দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে আঘাত হানে। তাতে রয়েছে নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেশাসহ অন্যান্য অপকর্ম।

প্রশ্ন ঃ (৯০) মাতৃ দিবসের ঈদ পালন করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়তে যে ঈদ রয়েছে, তা ব্যতীত সকল প্রকার ঈদ বিদ'আত, যা সালাফে সালিহীনের যুগে ছিল না। হতে পারে এটি অমুসলিমদের কাছ থেকে এসেছে। তাই এতে অমুসলিমদের সাথে সদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলিমদের ঈদ মাত্র দু'টি। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা। তাছাড়া সপ্তাহের ঈদ জুমু'আহ্‌বার। এ তিনটি ঈদ ব্যতীত মুসলিমদের অন্য কোন ঈদ নেই। এছাড়া যত ঈদ রয়েছে, ইসলামী শরীয়তে সবই বিদ'আত এবং ভ্রান্ত।

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيه فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরী করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমার অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[২]

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঈদ পালন করা বৈধ নয়। এতে ঈদের মত আনন্দ প্রকাশ এবং উপহার বিনিময় করাও বৈধ নয়। মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বীন নিয়ে গর্ববোধ করা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যে দ্বীন মনোনীত করেছেন, কোন প্রকার বাড়ানো বা কমানো ছাড়াই তার অনুসরণ করা। প্রত্যেক মতবাদ এবং আহ্বায়কের পিছনে ছুটে যাওয়া মুসলিমদের উচিত নয়। বরং তার উচিত আল্লাহর দ্বীন মোতাবেক জীবন গঠন ও পরিচালনা করা। অন্য ধর্মের কাউকে অনুসরণ না করা, বরং মানুষই তার অনুসরণ করবে এবং সে হবে তাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। কারণ, ইসলামী শরীয়তকে সকল দিক থেকে পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থ ঃ আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

বছরে মাত্র একবার মাতৃ দিবস পালন করাই যথেষ্ট নয়। বরং সন্তানের উপর মায়ের রয়েছে অনেক হক, যা আদায় করা একান্ত জরুরী। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে মায়ের আনুগত্য করতে হবে। এর জন্য কোন স্থান বা সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই।

---

[১] - বুখারী ও মুসলিম

[২] - সহীহ মুসলিম

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৯১) সন্তানদের জন্ম দিবস উপলক্ষে উৎসব পালন করা এবং বিবাহ উপলক্ষে উৎসব পালন করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং সপ্তাহের ঈদ জুমু'আহ্বার ব্যতীত ইসলামে কোন ঈদের অস্তিত্ব নেই। কোন মানুষের জন্ম দিবস পালন করা বা তার সন্তানের জন্ম দিবস পালন করা অথবা বিবাহ উপলক্ষে প্রতি বছর ঈদ বা উৎসব পালন করা শরীয়ত সম্মত নয়, বরং বিদ'আতের নিটবর্তী বরং এ সমস্ত কাজ বিধর্মী খৃষ্টানদের অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কোন ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গল মনে করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ (৯২) জনৈক লোক একটি ঘরে বসবাস শুরু করার পর থেকেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হয়েছে আরো বড় বড় কয়েকটি মুসীবতে, যার কারণে সে এ ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গলের কারণ হিসেবে মনে করছে। তার জন্য কি ঘর ছেড়ে দেয়া জায়েয আছে?

উত্তর ঃ কোন কোন ঘর, যানবাহন এবং স্ত্রী লোকের ভিতরে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোন উদ্দেশে অকল্যাণ নির্ধারণ করে থাকেন। হতে পারে ক্ষতির উদ্দেশে কিংবা কল্যাণ প্রতিহত করার উদ্দেশে বা অন্য কোন উদ্দেশে। তাই এ ঘর বিক্রি করে অন্য ঘরে চলে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। হতে পারে অন্য ঘরে চলে যাওয়াতেই তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ.

অর্থ ঃ তিনটি বস্তুর মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে। ঘোড়া, স্ত্রীলোক এবং ঘরে।[১]

প্রশ্নঃ (৯৩) উসীলার হুকুম কি?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিস্তারিতভাবে এর উত্তর দিব। উসীলার অর্থ হচ্ছে কোন উদ্দেশে পৌঁছার জন্যে মাধ্যম গ্রহণ করা। উসীলা দু'প্রকার।

(১) শরীয়ত সম্মত সঠিক উসীলা। তা হল শরীয়ত সম্মত সঠিক পন্থায় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পৌঁছার চেষ্টা করা।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জিহাদ

www.pathagar.com

(২) শরীয়ত বহির্ভূত উসীলা।

প্রথম প্রকারের উসীলা আবার কয়েক প্রকার।

(ক) আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা ঃ এটি দু'ভাবে হতে পারে। সাধারণভাবে আল্লাহর নামগুলো উল্লেখ করে দু'আ করা। (১) যেমন নবী ﷺ দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আয় বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِـــيَّ حُكْمُـــكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَـــدًا مِـــنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُـــرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর পুত্র। আপনার হাতে আমার কর্তৃত্ব, আমার প্রতি আপনার নির্দেশ প্রতিফলনযোগ্য। আমার প্রতি আপনার ফায়সালা ন্যায়নিষ্ঠ। আপনার সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির উসীলায় আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেগুলো আপনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন, অথবা তা আপনার কোন সৃষ্টিকে জানিয়েছেন, অথবা কুরআনে তা নাযিল করেছেন, অথবা আপনার অদৃশ্য জ্ঞানে তা সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আপনি আমার জন্য কুরআনকে হৃদয়ের উর্বরতা স্বরূপ করুন---------।[১] এখানে আল্লাহর প্রতিটি নামের উসীলায় আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়েছে।

(২) আল্লাহর নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর কাছে দু'আ করা। যেমন আবূ বাক্‌র (রাঃ) নবী ﷺ-এর কাছে সলাতের মধ্যে পঠিতব্য দু'আ শিক্ষা দেয়ার আবেদন জানালে তিনি নিম্নের দু'আটি শিক্ষা দিলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَـــاغْفِرْ لِـــي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

---

১ - আহমাদ, হাকিম, সনদ সহীহ

১ - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল আযান

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অবিচার করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[১]

এখানে আল্লাহর দু'টি নাম যথা ঃ গাফূর এবং রাহীম-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত কামনা করা হয়েছে।

(খ) আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা ঃ এটি দু'ভাবে হতে পারে। (১) এভাবে বলবে যে, হে আল্লাহ! আপনার সুন্দর নামগুলোর মাধ্যমে এবং উন্নত গুণাবলীর মাধ্যমে প্রার্থনা করছি। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন উল্লেখ করবে।

(২) নির্দিষ্ট কোন গুণাবলীর উসীলা দিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রার্থনা করা। যেমন হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেন

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার 'ইল্ম এবং মাখলুকের উপর আপনার ক্ষমতার উসীলা দিয়ে এ দু'আ করছি যে, আমার জীবিত থাকা যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি জানেন যে, আমার মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণর, তাহলে আমাকে মৃত্যু দান করুন।[২] এখানে 'ইল্ম ও কুদ্রাত- এই দু'টি গুণের মাধ্যমে উসীলা দেয়া হয়েছে। আর এটি প্রার্থনার সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।

(গ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে উসীলা দেয়া ঃ এভাবে বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতি এবং আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। এ ঈমানের উসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তা'আলা ঈমানের উসীলা দিয়ে দু'আ করার নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ

---

[২] - নাসায়ী, কিতাবুস্ সাহ্

النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে অপমানিত করলে, আর যালিমদের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমাদের সকল দোষ-ক্রটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (সূরা আল-'ইমরান ঃ ১৯০-১৯৩)

এখানে গুনাহ মাফের জন্য ঈমানের উসীলা দিয়ে দু'আ করা হয়েছে।

(ঘ) সৎ আমলের উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা ঃ এখানে তিন ব্যক্তির ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা একটি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে গুহা থেকে তাদের বের হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। তারা প্রত্যেকেই নিজের সৎ আমল তুলে ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিল। একজন পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার উসীলা দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উসীলা দিল এবং তৃতীয়জন তার চাকরের বেতন পূর্ণভাবে প্রদান করার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করল। তারা প্রত্যেকেই দু'আয় বলেছিল, আপনি যদি জানেন যে, এ আমলটুকু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তাহলে আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার পর পাথরটি সরে গেল এবং তারা গুহা থেকে বের হয়ে আসল।

(ঙ) নিজের অবস্থা আল্লাহর কাছে তুলে ধরে উসীলা দেয়া ঃ অর্থাৎ দু'আকারী যে অবস্থায় রয়েছে, তা আল্লাহর কাছে তুলে ধরবে।

যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। (সূরা কাসাস ঃ ২৪)

যাকারিয়া (আঃ) নিজের দুর্বলতাকে তুলে ধরে উসীলা দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

অর্থ ঃ তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে, বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে। হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি। (সূরা মারইয়াম ঃ ৪)

উসীলার যে সমস্ত প্রকার উপরে বর্ণিত হয়েছে, তার সবই বৈধ।

(চ) সৎ কর্মশীলদের দু'আর উসীলা দেয়া ঃ সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর কাছে দু'আ চাইতেন। বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, জুমু'আর দিনে নবী ﷺ খুৎবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে, পশুপাল পিপাসায় মারা যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নবী ﷺ উভয় হাত উঠালেন এবং তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন। অতঃপর নবী ﷺ মিম্বার থেকে নামার আগেই বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং তাঁর দাড়ি মুবারক বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝরতে থাকল। এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকল। পরবর্তী জুমু'আয় সেই ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি বলল, পানিতে সব কিছু ডুবে যাচ্ছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর কাছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করুন। নবী ﷺ দু'হাত উঠালেন এবং বললেন,

(اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَ)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশের উঁচু ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়– এই বলে নবী ﷺ আকাশের এক পাশের দিকে ঈঙ্গিত করার সাথে সাথে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষেরা সূর্যের আলোতে বের হয়ে আসল।

আরো অনেক ক্ষেত্রে সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর কাছে বিশেষভাবে দু'আ চেয়েছিলেন। নবী ﷺ একদা বললেন যে, তাঁর উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি এও বললেন যে, তারা ঐ সমস্ত লোক, যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, চিকিৎসার জন্য লোহা গরম করে দাগ দেয় না এবং পাখি উড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করে না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। এ কথা শুনে উকাশা ইবনে মিহসান

www.pathagar.com

বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটাও এক প্রকার উসীলা। কোন সৎ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার কাছে দু'আ চাওয়া এবং তার দু'আর উসীলা গ্রহণ করা জায়েয আছে। কোন মুসলমান যদি তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দু'আ করে, তবে ফেরেশতাগণ আমীন বলতে থাকেন।

(২) অবৈধ উসীলা ঃ

শরীয়ত সম্মত নয়, এমন জিনিসের মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা অবৈধ। কেননা এ সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে উসীলা দেয়া বিবেক এবং শরীয়ত সম্মত নয়। যেমন মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ চাওয়ার মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা। এ ধরনের উসীলা দেয়া জায়েয নেই। কারণ, মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ চাওয়া একটি জঘন্য মূর্খতাপূর্ণ কাজ। মানুষ যখন মারা যায়, তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষে কারও জন্য দু'আ করা সম্ভব নয়। নবী ﷺ-এর পক্ষেও মৃত্যুবরণ করার পর কারও জন্য দু'আ করা সম্ভব নয়। তাই সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে এসে দু'আ চাননি। উমার (রাঃ)-এর আমলে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনার নবী ﷺ জীবিত থাকাকালে তাঁর উসীলা দিয়ে আমরা আপনার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম। আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করতেন। এখন নবী ﷺ জীবিত নেই। তাই আমরা নবীর চাচার উসীলায় আপনার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করুন। তারপর আব্বাস (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং দু'আ করলেন। মৃতের কাছে দু'আ চাওয়া যদি বৈধ হতো, তাহলে কোন ক্রমেই তারা নবী ﷺ-কে বাদ দিয়ে আব্বাস (রা)-এর কাছে দু'আ চাওয়া বৈধ মনে করতেন না। কারণ, আব্বাস (রাঃ)-এর দু'আর চেয়ে নবী ﷺ-এর দু'আ কবূল হওয়া অধিক উপযোগী। মোট কথা মৃত ব্যক্তির উসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয নেই।

নবী ﷺ-এর সম্মানের উসীলা দেয়াও জায়েয নেই। কারণ, আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান থাকা দু'আকারীর জন্য কোন উপকারে আসবে না। দু'আকারীর জন্য এমন বিষয়ের উসীলা দেয়া উচিত, যা তার কাজে আসবে। সুতরাং এভাবে বলা উচিত যে, হে আল্লাহ! আপনার প্রতি এবং আপনার রাসূলের প্রতি আমার ঈমান আনয়নের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করুন। এ জাতীয় অন্যান্য শরীয়ত সম্মত বিষয়ের উসীলা দেয়া বৈধ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৯৪) কাউকে বন্ধু বা শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার মূলনীতি কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত ব্যক্তি বা বিষয় হতে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا﴾

অর্থ ঃ তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। (সূরা মুমতাহিনাহ ঃ ৪)

আর এটা হবে মুশরিকদের সাথে।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

অর্থ ঃ আর মহান হাজ্জের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। (সূরা তাওবা ঃ ৩)

সুতরাং প্রতিটি মু'মিনের উপর আবশ্যক হল কাফির-মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা। এমনিভাবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব। যদিও তা কুফরীর পর্যায়ে না যায়। যেমন পাপাচারিতায় লিপ্ত হওয়া।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

অর্থ ঃ কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

(সূরা হুজুরাত ঃ ৭)

www.pathagar.com

যদি কোন মু'মিনের কাছে ঈমানের সাথে সাথে পাপাচারিতা থাকে, তাহলে আমরা তাকে মু'মিন হওয়ার কারণে ভালবাসব এবং পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঘৃণা করব। এ ধরনের সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হল যেমন আমরা অরুচীকর ঔষধ গ্রহণ করি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা পান করি। কারণ, তাতে আরোগ্যের আশা করা যায়।

কোন কোন মানুষ পাপী মু'মিনকে কাফির-মুশরিকের চেয়েও ঘৃণা করে। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় এবং বাস্তবতার বিপরীত। কাফির ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সমস্ত মু'মিনের শত্রু। তাদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করে, এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায়। (সূরা মুমতাহিনাহ ঃ ১)

আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরে বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৫১)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

অর্থ ঃ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। (সূরা বাকারা ঃ ১২০)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾

অর্থ ঃ আহ্‌লে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসা বশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয়। (সূরা বাকারা ঃ ১০৯)

এমনিভাবে প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক। আমাদের জন্যে হারাম কাজের প্রতি ভালবাসা রাখা বৈধ নয়। আমরা পাপী মু'মিনের পাপকাজকে ঘৃণা করি এবং তা থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখি। কিন্তু আমরা তাকে ঈমানের কারণে ভালবাসি।

প্রশ্ন ঃ (৯৫) অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার হুকুম কি? পর্যটনের উদ্দেশে দেশ ভ্রমণের বিধান কি?

উত্তর ঃ তিনটি শর্ত সাপেক্ষ অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ ঃ

১) ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় 'ইল্‌ম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

২) তার কাছে এমন দ্বীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।

৩) মুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে। এতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন চিকিৎসার জন্য অথবা শিক্ষা অর্জনের জন্য, যা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না, তা হলে কোন অসুবিধা নেই।

পর্যটনের উদ্দেশে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোন দরকার নেই। আমাদের ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবানীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ (৯৬) যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে চাকুরী করে, তার জন্য আপনার উপদেশ কি?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ যে মুসলিম ভাই অমুসলিমদের সাথে চাকুরী করে, তার জন্য আমার উপদেশ হল, সে এমন একটি কর্মক্ষেত্র তালাশ করবে, যা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলদের শত্রু হতে মুক্ত। যদি পেয়ে যায়, তাহলে কতই না সুন্দর। আর যদি না পায়, তাহলে কাফিরদের সাথে একই কর্মক্ষেত্রে চাকুরী করাতে কোন অসুবিধা নেই। তারা তাদের কাজ করবে এবং সেও আপন কর্মে লিপ্ত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, তার অন্তরে যেন কাফিরদের প্রতি কোন ভালবাসা না থাকে। সালাম এবং তার উত্তর দেয়ার ব্যাপারে সে ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ করে চলবে। তাদের জানাযায় শরীক হবে না এবং তাদের অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করবে না। বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। সাধ্যানুসারে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন ঃ (৯৭) কাফিরদের কাছে যে সমস্ত প্রযুক্তি রয়েছে তা দ্বারা কিভাবে আমরা উপকৃত হব?

উত্তর ঃ আল্লাহর শত্রু কাফিরেরা যে সমস্ত কাজ-কর্ম করে, তা তিন প্রকারঃ

১) ইবাদাত, ২) অভ্যাস এবং ৩) কারিগরি ও শিল্পকলা।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই কাফিরদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করবে, তার জন্য বিরাট ভয়ের কারণ রয়েছে। এটা তাকে ইসলাম থেকে বেরও করে দিতে পারে। লেবাস-পোশাক, চাল-চলন ও রীতিনীতি কোন কিছুতেই কাফিরদের অনুসরণ করা বৈধ নয়।

নবী ﷺ বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে যাতে জনগণের উপকার রয়েছে, তা কাফিরদের কাছ থেকে শিক্ষা করাতে কোন দোষ নেই। কারণ, তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া ইবাদাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, তাতে দলীল থাকতে হবে। আর অভ্যাস বা পার্থিব বিষয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা সবই হালাল। একমাত্র শরীয়ত নির্দিষ্ট করে কিছু হারাম করা সেটা ভিন্ন কথা।[১]

১- এখানে শরীয়তের কর্তৃক একটি মৌলনীতির ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য না হওয়ার আশংকায় বাদ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৯৮) আরব উপদ্বীপে অমুসলিমদের প্রবেশ করানোর হুকুম কি?

উত্তর ঃ অমসুলিসমদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করানোতে নবী ﷺ-এর বাণীর বিরোধিতা করার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন,

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

অর্থ ঃ তোমরা মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।[১] সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেন,

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا.

অর্থ ঃ আমি অবশ্যই ইয়াহূদী-নাসারাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেব। তাতে মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মানুষকে থাকতে দেব না।[২]

তবে প্রয়োজনের স্বার্থে এবং কোন মুসলমান পাওয়া না গেলে তাদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করানোতে কোন দোষ নেই। তবে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদান করা যাবে না। যেখানে শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলা হয়েছে, সেখানেও যদি আকীদাহ কিংবা চরিত্রগত কোন ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করানো হারাম। কেননা জায়েয বস্তুতে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তখন তা হারামে পরিণত হয়ে যায়। কাফিরদেরকে এখানে আনা হলে যে সমস্ত ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলো তাদেরকে ভালবাসা, তাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট থাকা এবং দ্বীনের প্রতি দৃঢ়তা চলে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বে যথেষ্ট পেশাদার লোক রয়েছে। আমরা তাদেরকেই যথেষ্ট মনে করতে পারি।

দ্বীন-ধর্ম প্রত্যাখ্যানই কি উন্নতির চাবিকাঠি?

প্রশ্ন ঃ (৯৯) কিছু সংখ্যক মানুষ দাবী করে যে, দ্বীনের অনুসরণই মুসলিমদেরকে উন্নতি থেকে পিছিয়ে রেখেছে। তাদের দলীল হলো পাশ্চাত্য দেশসমূহ সকল প্রকার দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেই বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এও বলে যে, পাশ্চাত্য বিশ্বেই বেশী করে বৃষ্টি ও ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সায়ের

[২] - মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সায়ের

www.pathagar.com

উত্তর ঃ দুর্বল ঈমানদার, ঈমানহীন এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাই কেবল এ ধরনের কথা বলতে পারে। মুসলিম জাতি ইসলামের প্রথম যুগে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেই সম্মান-মর্যাদা এবং শক্তি অর্জন করে পৃথিবীর সকল প্রান্তে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসলিমদের স্বর্ণ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ করেই বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব এতো উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ তাদের সঠিক দ্বীনকে ছেড়ে দিয়ে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার কারণেই সমস্ত জাতির পিছনে পড়ে আছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মুসলমানেরা যদি আবার তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে যায়, তা হলে আমারই সম্মানিত হবো এবং সমস্ত জাতির উপরে আমরা রাজত্ব করতে সক্ষম হবো। আবূ সুফিয়ান যখন রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের সামনে নবী ﷺ-এর দ্বীনের পরিচয় তুলে ধরল, তখন রোমের বাদশা মন্তব্য করে বলল যে, তুমি যা বলছ, তা সত্য হলে অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার পা রাখার স্থান পর্যন্ত চলে আসবে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হয়েছে, আমাদের দ্বীন তা গ্রহণ করতে বাধা দেয় না। আফসোসের কথা হলো মুসলমানেরা দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিকেই হারিয়ে ফেলেছে। পার্থিব উন্নতি সাধন করতে ইসলাম কখনো বিরোধিতা করে না।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

অর্থ ঃ আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়ার মধ্য থেকে। তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে।

(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তাতে চলাফেরা কর এবং তাঁর দেয়া রিয্ক আহার কর। (সূরা মুল্ক ঃ ১৫)

তিনি আরো বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা বাকারা ঃ ২৯)

www.pathagar.com

এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা মানুষকে পৃথিবীর সকল বস্তু উপার্জন করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রতি উৎসাহ যোগায়। দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নয়। বরং তা দ্বারা পার্থিব জীবনে উপকৃত হওয়ার জন্য। অমুসলিম রাষ্ট্রের লোকেরা মৌলিক দিক থেকে কাফির। তারা যে দ্বীনের দাবী করে থাকে, তাও বাত্বিল ধর্ম।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আল-'ইমরান ঃ ৮৫)

আহলে কিতাবরা যদিও অন্যান্য কাফির-মুশরিকদের থেকে আলাদা, কিন্তু পরকালে কোন পার্থক্য হবে না। এজন্যই নবী ﷺ শপথ করে বলেছেন, এই উম্মাতের কোন ইয়াহূদী-নাসারা যদি তাঁর দাওয়াত শ্রবণ করার পরও তাঁর প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তারা নিজেদেরকে ইয়াহূদী বলে দাবী করুক বা নাসারা হিসেবে দাবী করুক, সবই সমান।

অমুসলিমরা বৃষ্টিসহ অন্যান্য যে ধরনের নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তার কারণ হল এটা তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তাদের ভাল কাজের বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করা হয়ে থাকে। উমার (রাঃ) নবী ﷺ-এর পিঠে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে দেখে বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! পারস্য এবং রোমের বাদশারা অসংখ্য নিয়ামতের ভিতরে রয়েছে। আর আপনি এ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, হে উমার! এদেরকে পার্থিব জীবনেই সমস্ত নিয়ামত দেয়া হয়েছে। তুমি কি এতে রাজী নও যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য হবে আখিরাত।

তাছাড়া তুমি কি দেখ না যে, তাদের মধ্যে হয়ে থাকে অনাবৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্পসহ নানা বিপদাপদ? যা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় এবং রেডিওতে শুনা যায়। উল্লেখিত প্রশ্নের মত যারা প্রশ্ন করে, তারা অন্ধ। আল্লাহ তাদের অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে তারা বাস্তব অবস্থা দেখতে পায় না। তাদের জন্য আমার নসীহত এই যে, তারা যেন মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের দিকে ফিরে আসলেই আমাদের জন্য সম্মান, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব অর্জিত হবে। উপরোক্ত সন্দেহ পোষণকারীর এটাও বিশ্বাস করা জরুরী যে, পাশ্চাত্য বিশ্বের কাফিররা বাতিলের উপর রয়েছে। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

www.pathagar.com

পরকালে পূর্ণভাবে শাস্তি প্রদানের নিমিত্তেই তাদেরকে দুনিয়ার নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে। যখন তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, তখন তাদের দুঃখ ও হতাশা বেড়ে যাবে। তাদেরকে নিয়ামত প্রদানের উদ্দেশ্য এটিই।

প্রশ্ন ঃ (১০০) কতক লোক বলে যে, অন্তর ঠিক থাকলে শব্দের উচ্চারণ ঠিক করার বেশী গুরুত্ব নেই। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ শব্দের উচ্চারণ বলতে যদি তার উদ্দেশ্য হয় আরবী ভাষা, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তার কারণ এই যে, আকীদা ঠিক থাকলে আরবী ভাষার সঠিক উচ্চারণ জরুরী নয়। অর্থ বোঝা গেলেই চলবে। আর যদি শব্দের উচ্চারণ বলতে এটা উদ্দেশ্য হয় যে, অন্তরের আকীদা যেহেতু ঠিক আছে, কাজেই মুখে যা ইচ্ছা তা উচ্চারণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। যদিও তা কুফরী বাক্য হয়ে থাকে। তবে এটি ঠিক নয়। আমরা বলব যে, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখের ভাষাও ঠিক করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (১০১) আল্লাহ আপনাকে চিরস্থায়ী করুন- এ কথাটি বলা কি ঠিক?

উত্তর ঃ প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যটি বলা ঠিক নয়। বরং এটি দু'আর মধ্যে সীমালঙ্ঘন করার শামিল। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয় একমাত্র জান্নাত ছাড়া।

আল্লাহ বলেন,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

অর্থ ঃ ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা (সত্তা) ব্যতীত। (সূরা আর-রাহমান ঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾

অর্থ ঃ আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪)

প্রশ্ন ঃ (১০২) আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে কোন কিছু চাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে মানুষ দুনিয়ার কোন জিনিস চাইবে, এ থেকে আল্লাহর চেহারা অনেক বড়। আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে কোন কিছু চাওয়া বৈধ নয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এটিই তোমাদের প্রথম বরকত নয়। কেননা কোন কোন মানুষের হাতে এমন বরকত প্রকাশিত হয়, যা অন্যের হাতে প্রকাশিত হয়নি।

মৃত ব্যক্তি বা মিথ্যুকদের কল্পিত অলী থেকে বরকত লাভের ধারণা করা সম্পূর্ণ বাত্বিল। এর কোন অস্তিত্ব নেই। কখনো বরকতের নামে শয়তানের সহযোগিতায় ভণ্ডরা মানুষকে গোমরাহ করার জন্য কিছু কিছু অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়ে থাকে। সঠিক বরকত এবং ভণ্ডামীর মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি হল, যার কাছ থেকে কারামাত প্রকাশিত হল, তার ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সে যদি আল্লাহর অলীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই সুন্নাহ্র অনুসারী হবে এবং বিদ'আত হতে মুক্ত হবে, আল্লাহ তাঁর হাতে এমন বরকত প্রকাশ করবেন, যা অন্যের হাতে প্রকাশ করবেন না। আর যদি কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধিতাকারী হয় অথবা বাতিলের দিকে আহবানকারী হওয়া সত্ত্বেও তার হাতে বাহ্যিকভাবে কোন ভাল জিনিস প্রকাশিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি শয়তানের পক্ষ হতে বাতিলের সহযোগিতা মাত্র।

প্রশ্ন ঃ (১০৯) মানুষ বলে থাকে "তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে"– এ ধরনের কথা বলার বিধান কি?

উত্তর ঃ তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে- এ ধরনের কথা বলা ঠিক নয়। কারণ, তাকদীর পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট। তাই অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলা হবে কিভাবে? বরং বলা হবে তাকদীর আগমন করেছে বা বিজয় লাভ করেছে। এমনিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলাও ঠিক হবে না। বরং বলা হবে আল্লাহর অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়েছে।

"চিন্তার স্বাধীনতা"– কথাটি কতটুকু সঠিক?

প্রশ্ন ঃ (১১০) "চিন্তার স্বাধীনতা" সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি এবং পত্রিকায় পড়ে থাকি। মূলতঃ এটি আকীদা গ্রহণের স্বাধীনতার দিকে আহ্বান মাত্র। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমাদের কথা হল, যে ব্যক্তি আকীদার স্বাধীনতার দাবী করে এবং যে কোন দ্বীনে বিশ্বাসের অধিকার রাখে বলে মনে করে, সে কাফির। কারণ, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন গ্রহণ করা বৈধ মনে করে, সে কাফিরে পরিণত হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

দ্বীনের বিষয় চিন্তা প্রসূত বিষয় নয়। এটা আল্লাহর অহী, যা আল্লাহ তাঁর নবীদের উপর নাযিল করেছেন যেন মানুষ তার অনুসরণ করতে পারে। ইসলাম একটি চিন্তাধারা, খৃষ্ট ধর্ম, একটি চিন্তাধারা এবং ইয়াহূদীবাদ একটি চিন্তাধারা– এভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ এই যে, আসমানী শরীয়তসমূহ নিছক মানবীয় চিন্তা প্রসূত বিষয়। আসমানী দ্বীনসমূহ আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী স্বরূপ আগমন করেছে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করবে। সুতরাং এর ব্যাপারে চিন্তাধারা কথাটি ব্যবহার করা জায়েয নেই।

মোট কথা, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করবে যে, সে নিজের খেয়াল-খুশী মত যে কোন দ্বীনে বিশ্বাস করতে পারে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আলি-ইমরানঃ ৮৫)

আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

অর্থ ঃ ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

(সূরা আ-লি 'ইমরান ঃ ১৯)

সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি তা করবে আলিমগণ তাকে সুস্পষ্ট কাফির হিসেবে ফাতাওয়া দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ (১১১) মুফতীর নিকট "এ বিষয়ে ইসলামের হুকুম কি বা ইসলামের দৃষ্টিতে কি"- এ ধরনের বাক্য দিয়ে প্রশ্ন করার বিধান কি?

উত্তর ঃ এভাবে বলা উচিত নয়। হতে পারে সে ফাতাওয়া দিতে ভুল করবে। কাজেই তার ভুল ফাতাওয়া ইসলামের বিধান হতে পারে না। তবে মাসআলাতে যদি সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি? উত্তর হবে, এ বিষয়ে ইসলামের বিধান হল হারাম।

প্রশ্ন ঃ (১১২) "পরিস্থিতির ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে" "তাকদীরের ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে"– এ ধরনের কথা বলার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কথাগুলো অপছন্দনীয় এবং শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ, পরিস্থিতির কোন ইচ্ছা নেই। এমনিভাবে তাকদীরেরও নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। যদি বলে তাকদীরের লিখন এ রকম ছিল, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১১৩) কাউকে শহীদ বলার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কাউকে শহীদ বলা দু'ভাবে হতে পারে। (১) এভাবে সাক্ষ্য দেয়া যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হল সে শহীদ, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে শহীদ, প্লেগ রোগে মারা গেলে শহীদ---। এভাবে বলা জায়েয আছে। কেননা এখানে আপনি নবী ﷺ-এর হাদীস অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করছেন। ২) নবী ﷺ নির্দিষ্ট করে যাকে শহীদ বলেছেন এবং সমস্ত মুসলমান যাকে শহীদ বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে শহীদ বলা জায়েয নেই। ইমাম বুখারী এভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যে, " এ কথা বলা যাবে না যে অমুক শহীদ"। ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন, অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে অবগত হওয়া ব্যতীত অকাট্যভাবে কারও জন্য শাহাদাতের ফায়সালা দেয়া যাবে না। তিনি সম্ভবত উমার (রাঃ)-এর একটি ভাষণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলে থাক অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। খবরদার! তোমরা এভাবে বলো না। কারণ, তার অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। তোমরা নবী ﷺ-এর মত করে বল যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল অথবা জীবন দিল সে শহীদ"।[১]

কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হলে সে বিষয়ে 'ইল্ম থাকতে হবে। শহীদ হওয়ার শর্ত হলো আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা। আর এটি অন্তরের গোপন অবস্থা। তা জানার কোন উপায় নেই। এজন্য নবী ﷺ বলেন,

﴿مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ﴾

অর্থ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো, আর আল্লাহই ভাল জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।[২]

নবী ﷺ আরো বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.

[১] - মুসনাদে আহমাদ

[২] - বুখারী, কিতাবুল জিহাদ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শরীরে জখম হবে, আর আল্লাহই ভাল জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয়, সে কিয়ামাতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার আহতের স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকবে, রং হবে রক্তের, কিন্তু তার গন্ধ হবে মিসকের সুঘ্রাণের ন্যায়।[১]

যারা জিহাদ করে মারা যায়, তাদের বাহ্যিক অবস্থা ভাল। তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু তাদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করি না। তার প্রতি খারাপ ধারণাও করি না। তবে দুনিয়াতে তার উপর শহীদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকে তার পরিহিত কাপড়েই রক্ত সহকারে দাফন করা হবে। আর যদি অন্যভাবে শহীদ হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল দেয়া হবে, কাফন পড়ানো হবে এবং জানাযার সলাত আদায় হবে।

কাউকে শহীদ হওয়ার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ জান্নাতের সাক্ষ্য দেয়া। এটি আহলে সুন্নাহ্‌র মাযহাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলে সুন্নাতের লোকেরা নবী ﷺ যাকে শহীদ বলেছেন, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শহীদ বলেন না। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে যাকে শহীদ বলা হয়েছে, তাকে শহীদ বলা যাবে।

প্রশ্ন ঃ (১১৪) 'হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল', 'হঠাৎ এসে গেলাম'– এ জাতীয় কথা বলা জায়েয কি না?

উত্তর ঃ আমরা এতে নাজায়েযের কিছু মনে করি না। মনে হয় এ ধরনের কিছু হাদীস পাওয়া যায় যে, রাসূল ﷺ-এর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। রাসূল ﷺ আমাদেরকে হঠাৎ দেখে ফেললেন। তবে এ মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোন হাদীস আমার মনে আসছে না। মানুষ কোন কাজকে হঠাৎ মনে করতে পারে। কারণ, সে গায়েবের খবর জানে না। আল্লাহর ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে না। তিনি সকল বিষয়ে অবগত আছেন। প্রতিটি বিষয় আল্লাহর কাছে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। তাই হঠাৎ করে তাঁর কোন কাজ হতেই পারে না।

প্রশ্ন ঃ (১১৫) সম্মানিত শায়খ! ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী চিন্তাবিদ- এ ধরনের কথা বলা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ ইসলামী চিন্তাধারা বা অনুরূপ শব্দ বলা যাবে না। ইসলামকে যদি চিন্তাধারা বলি, তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে, এটি চিন্তাপ্রসূত বিষয় যা গ্রহণ বা

---

[১] - বুখারী, কিতাবুল জিহাদ

www.pathagar.com

বর্জন করার সম্ভাবনা রাখে। এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাক্য, যা ইসলামের শত্রুরা আমাদের ভিতরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। অথচ আমরা জানি না।

কাউকে ইসলামী চিন্তাবিদ বলাতে কোন অসুবিধা নেই। একজন মুসলিম চিন্তাবিদ হবে এতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (১১৬) দ্বীনকে খোসা এবং মূল এভাবে ভাগ করা কি ঠিক?

উত্তর ঃ দ্বীনকে খোসা এবং মূল হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করা বৈধ নয়। দ্বীনের সবই মূল এবং মানব জাতির জন্য উপকারী। তা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। পোশাক এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষার ক্ষেত্রেও যদি মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্র অনুসরণের নিয়ত করে, তাহলে তাতেও সাওয়াব রয়েছে। খোসা এমন জিনিসকে বলা হয়, যা উপকারী নয় বলে নিক্ষেপ করা হয়। ইসলামের ভিতরে বর্জনীয় কোন কিছু নেই। সবই মানুষের জন্য কল্যাণকর। যারা এ ধরনের কথার প্রচলন ঘটায়, তাদের ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার। যাতে করে তারা সত্যের সন্ধান পেতে পারে এবং তার অনুসরণ করতে পারে। তাদের উচিত ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া বর্জন করা। এ কথা ঠিক যে, ইসলামের মধ্যে কিছু জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ইসলামের রুকনসমূহ।

নবী ﷺ বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ.

অর্থ ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর। আর তা হল ঃ ১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, ২) সলাত প্রতিষ্ঠা করা, ৩) যাকাত প্রদান করা, ৪) রমাযোনের সিয়াম পালন করা এবং ৫) কা'বা ঘরের হাজ্জ পালন করা।[১]

দ্বীনের মধ্যে এমন জিনিসও রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাতে মানুষের জন্য উপকারহীন কিছু নেই।

দাড়ি লম্বা করার ব্যাপারে কথা হল নিঃসন্দেহে তা একটি ইবাদাত। নবী ﷺ তা লম্বা করার ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি আদেশ পালন করাই ইবাদাত, যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

---

[১] - বুখারী , অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান

www.pathagar.com

দাড়ি রাখা আমাদের নবী ﷺসহ পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা হারূন (আঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

﴿يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي﴾

অর্থ ঃ হে আমার ভাই! আমার দাড়িতে ও মাথায় ধরে টান দিবেন না। (সূরা ত্বাহা ঃ ৯৪)

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, দাড়ি লম্বা করা স্বভাবগত বিষয়ের অন্তর্গত। সুতরাং দাড়ি লম্বা করা একটি ইবাদাত, অভ্যাস নয় এবং তা খোসাও নয়। যেমনটি ধারণা করে থাকে কতিপয় লোক।

প্রশ্ন ঃ (১১৭) "তাকে সর্বশেষ বিছানায় দাফন করা হল" মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলার হুকুম কি?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলা সম্পূর্ণ হারাম। যদি তুমি বল সে তার শেষ গন্তব্যে চলে গেছে, তার অর্থ হল কবরের পরে আর কিছু নেই। এ ধরনের কথা পুনরুত্থান অস্বীকার করার শামিল। ইসলামী আকীদার অন্যতম দিক হল কবরই শেষ নয়। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই কেবল বলে থাকে কবরই শেষ। তারপর আর কিছু নেই।

আল্লাহ বলেন, ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾

অর্থ ঃ প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (সূরা তাকাসুর ঃ ১-২)

জনৈক গ্রাম্য লোক আয়াতটি শুনার পর বলল, আল্লাহর শপথ! ভ্রমণকারী কখনো স্থায়ী বসবাসকারী হতে পারে না। মোট কথা কবরকে শেষ নিবাস বলা যাবে না। কিয়ামাতের দিনে জান্নাত বা জাহান্নামই হবে শেষ নিবাস।

প্রশ্ন ঃ (১১৮) নাসারাদেরকে মাসীহী বলা কি ঠিক?

উত্তর ঃ নবী ﷺ-এর আগমনের পর, নাসারাদেরকে মাসীহী বলা ঠিক নয়। তারা যদি সত্যিকার অর্থে মাসীহী হত, তাহলে অবশ্যই নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করত। কেননা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরে ঈমান আনয়ন এবং 'ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন একই কথা।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মারইয়াম-তনয় 'ঈসা (আঃ) বললেন ঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি এমন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম হবে আহমাদ। অতঃপর যখন তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেন, তখন তারা বলল, এ তো প্রকাশ্য এক যাদু। (সূরা আস্-সাফ ঃ ৬)

'ঈসা (আঃ) মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ এজন্য দিয়েছেন, যাতে তারা তাঁর আনিত দ্বীন গ্রহণ করে। কেননা কোন বিষয়ের সুসংবাদ দেয়ার অর্থই হল তা গ্রহণ করা। 'ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে যার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি যখন দলীল-প্রমাণসহ আগমন করলেন, তখন তারা তাঁর সাথে কুফরী করল এবং যাদুকর বলে উড়িয়ে দিল। আর মুহাম্মাদ ﷺএর সাথে কুফরী করার মাধ্যমে তারা 'ঈসার সাথেও কুফরী করল। কারণ, একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকে অস্বীকার করা। তাই খৃষ্টানদের জন্য কখনো 'ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবী করা বৈধ নয়। তারা যদি সত্যিকার অর্থে ঈসা নবীর অনুসারী হত, তাহলে অবশ্যই তারা তাঁর প্রদত্ত সুসংবাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করত। 'ঈসাসহ সকল নবীর নিকট থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যখন তোমাদেরকে কিতাব এবং জ্ঞান দান করব, অতঃপর যদি তোমাদের কাছে এমন একজন রাসূল আগমন করেন, যিনি তোমাদের কিতাবকে সত্যায়ন করেন, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করলে এবং এ শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিলে? তখন তাঁরা বললেন, আমরা অঙ্গীকার করলাম। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম। (সূরা আ-লি 'ইমরান ঃ ৮১)

অত্র আয়াতে রাসূল বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

মোট কথা খৃষ্টানদের জন্য 'ঈসা (আঃ)-এর উম্মাত হওয়ার দাবী করা ঠিক নয়। কারণ, তারা 'ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে। আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বীকার করার অর্থ 'ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করা।

প্রশ্ন ঃ (১১৯) আল্লাহ্ না করেন– এ কথাটি বলার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আমি এ কথাটি বলা অপছন্দ করি। কথাটিতে আল্লাহর উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। আল্লাহর উপর কোন কিছুর বাধ্যবাধকতা নেই। নবী ﷺ বলেন,

﴿لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْـــزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ﴾

অর্থ ঃ তোমাদের কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন। বরং দৃঢ়তার সাথে যেন দু'আ করে এবং কবূলের আশা নিয়ে দু'আ করে। আল্লাহ্কে বাধ্যকারী কেউ নেই।[১]

আল্লাহ না করুন এর স্থলে আল্লাহ নির্ধারণ না করুন বলা অনেকটা সন্দেহ মুক্ত।

প্রশ্ন ঃ (১২০) মানুষ মারা গেলে (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَــى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) **অর্থাৎ হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার প্রভুর দিকে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে- এ কথাটি বলা কি ঠিক?**

উত্তর ঃ এ ধরনের কথা বলা জায়েয নেই। কে তাকে সংবাদ দিল যে, সন্তুষ্টচিত্তে সে আল্লাহর দিকে ফেরত যাচ্ছে? কাউকে এভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা কারও পক্ষে বৈধ নয়।

---

[১] - বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ দাওয়াত

www.pathagar.com

فتاوى

الصلاة

সলাত বিষয়ক ফাতাওয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

كتاب الطهارة

অধ্যায় ঃ পবিত্রতা

প্রশ্ন ঃ (১২১) অপবিত্রতা ও বাহ্যিক নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার প্রকৃত উপায় কি?

উত্তর ঃ যে কোন নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে পানি। পানি ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। চাই উক্ত পানি পরিচ্ছন্ন হোক বা পবিত্র কোন বস্তু তাতে পড়ার কারণে তাতে কোন পরিবর্তন দেখা যাক। কেননা বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, পবিত্র কোন বস্তুর কারণে যদি পানির মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়, তবে তাকে পানিই বলা হবে। এর পবিত্র করণের ক্ষমতা বিনষ্ট হবে না। এই পানি নিজে পবিত্র অন্যকেও পবিত্র করতে পারে।

পানি যদি না পাওয়া যায় বা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশংকা দেখা যায়, তবে তায়াম্মুমের দিকে অগ্রসর হবে। দু'হাত মাটিতে মেরে তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করবে এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে।

আর বাহ্যিক ও প্রকাশ্য নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি হচ্ছে, যে কোন প্রকারে উক্ত নাপাক বস্তু অপসারিত করা। চাই তা পানি দ্বারা হোক বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা। কেননা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় এমন নাপাক বস্তুর পবিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা তা অপসারিত করা। অতএব পানি বা পেট্রোল বা কোন তরল পদার্থ বা শুষ্ক বস্তু দ্বারা যদি পরিপূর্ণরূপে উক্ত নাপাকী অপসারিত করা সম্ভব হয়, তবেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু কুকুরের নাপাকী (মুখ দেয়া উচ্ছিষ্টের পাত্র) পবিত্র করার জন্য অবশ্যই সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে এবং একবার মাটি দ্বারা মাজতে হবে।

এভাবেই আমরা জানতে পারব প্রত্যক্ষ নাপাক বস্তু থেকে কিভাবে পবিত্র হতে হয় এবং আভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ (১২২) বাহ্যিক অপবিত্র বস্তু পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পবিত্র করা যাবে কি? ভাপের বা ধোয়ার (Dry clean) মাধ্যমে কি কোট ইত্যাদি পবিত্র করা যায়?

উত্তর ঃ বাহ্যিক নাপাক বস্তু অপসারিত করা উদ্দেশ্য ইবাদাত নয়। অর্থাৎ এটা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত নাপাক বস্তু থেকে মুক্ত হওয়া। অতএব যে কোন বস্তু দ্বারা যদি তা অপসারিত করা

www.pathagar.com

সম্ভব হয় এবং তার চিহ্ন বিদূরিত করা যায়, তবে উক্ত বস্তু তাকে পবিত্রকারী হবে। চাই তা পানি হোক বা পেট্রোল অথবা যে কোন বস্তু হোক। এমনকি বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সূর্যের তাপ বা বাতাসের মাধ্যমেও যদি উক্ত বস্তু অপসারিত হয়, তবে সে স্থান পবিত্র হয়ে যাবে। এ কথাটি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর পছন্দ। কেননা অপবিত্র বস্তুটি প্রত্যক্ষ থাকলেই উক্ত স্থানটি নাপাক থাকবে, যখনই তা অপসারিত হয়ে যাবে তখনই উক্ত স্থান পবিত্র হবে। অবশ্য নাপাক বস্তুটির রং যদি উঠানো সম্ভব না হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। এ ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি ড্রাই ক্লিনের মাধ্যমে যদি কোট ইত্যাদি সাফ করা হয় এবং তা থেকে বাহ্যিক নাপাকী দূরিভূত হয়ে যায়, তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ (১২৩) দীর্ঘকাল কোন স্থানে পানি জমা থাকার কারণে তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ পানির বিধান কি?

উত্তর ঃ যদিও এ পানি পরিবর্তন হয়ে থাকে তবুও তা পবিত্র। কেননা বাইরের কোন বস্তু দ্বারা তার পরিবর্তন সৃষ্টি হয়নি। বরং দীর্ঘ সময় থাকার কারণে এ পরিবর্তন এসেছে। এ দ্বারা ওযূ বা গোসল করলে তা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি নিশ্চিত হয় যে, কোন অপবিত্র বস্তু পড়ার কারণে তাতে পরিবর্তন এসেছে তবে তা নাপাক বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ (১২৪) পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার হিকমত কি?

উত্তর ঃ হে প্রশ্নকারী! আপনি জেনে রাখুন এবং যারাই এ প্রশ্নের উত্তর পাঠ করবে তাদেরও জেনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের হিকমত হচ্ছে আল্লাহর নিম্নলিখিত এ বাণীটি ঃ

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

অর্থ ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত কোন বিষয় ওয়াজিব বা হারাম সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন উঠালেই আমরা তাকে বলব ঃ এটা আপনার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ কিংবা আপনার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশ। বিষয়টি মেনে নেয়ার জন্য এতটুকু কথাই একজন মু'মিনের জন্য যথেষ্ট। এ কারণে আয়িশা (রাঃ)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হল, 'কি ব্যাপার ঋতুবতী নারী রোযা

www.pathagar.com

কাযা আদায় করবে, অথচ সলাত কাযা আদায় করবে না?' তিনি জবাবে বললেন,

﴿كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ﴾

অর্থ ঃ "আমরা ঋতুবতী হতাম, আমাদেরকে সওম কাযা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হত, কিন্তু সলাত কাযা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হত না।"[১]

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উক্তি পাওয়া গেলে অন্য কোন হিকমত অনুসন্ধান করা উচিত নয়। বিনা দ্বিধায় মু'মিন সেটা মেনে নিবে এবং আমল করবে। কোন প্রশ্ন করবে না। অবশ্য উক্ত নির্দেশের হেতু ও হিকমত অনুসন্ধান করা নিষেধ নয়। কেননা তাতে ১) আন্তরিক প্রশান্তি বৃদ্ধি হয়, ২) বিষয়টির কারণ ও হিকমত জানা থাকলে ইসলামী শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রস্ফুটিত হয়। ৩) তাছাড়া বিষয়টির কারণ জানা থাকলে একই কারণ বিশিষ্ট অন্য কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন উক্তি না পাওয়া গেলে সেখানে কিয়াস করা সম্ভব হবে। শরীয়তের বিষয়ে হিকমত জানা থাকলে উল্লেখিত তিনটি উপকার পাওয়া যায়।

উল্লেখিত ভূমিকার পর উপরে বর্ণিত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব ঃ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম নারীর জন্য হারাম নয়।[২]

এর কারণ হচ্ছে, মানুষের সৌন্দর্যের জন্য স্বর্ণ হচ্ছে সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু। বস্তুটি সৌন্দর্য ও গয়না হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। আর পুরুষের এটা দরকার নেই। অর্থাৎ পুরুষ এমন মানুষ নয় যে, তাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে পরিপূর্ণ হতে হবে। বরং তার পৌরুষত্বের কারণে সে নিজেই পরিপূর্ণ মানুষ। তাছাড়া নিজের দিকে অন্য মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য পুরুষের সৌন্দর্য অবলম্বন করারও দরকার নেই। কিন্তু নারী এর বিপরীত। নারী অপূর্ণ, তার সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করা দরকার। এ কারণে সর্বোচ্চ মূল্যে গয়না দিয়ে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার প্রয়োজন দেখা যায়। যাতে করে তার ঐ সৌন্দর্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি করে, স্বামীর কাছে স্ত্রী হয়ে উঠে আবেগময়ী ও আকর্ষণীয়।

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী সলাত কাযা আদায় করবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদ ঃ সওম কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

২. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রেশমের বিবরণ। নাসায়ী, অধ্যায় ঃ সৌন্দর্য, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।

www.pathagar.com

আর এ কারণেই নারীর জন্য স্বর্ণ দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা বৈধ করা হয়েছে, পুরুষের জন্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা নারী প্রকৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে এরশাদ করেন ঃ

﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾

অর্থ ঃ যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? (তাকে কি তোমরা আল্লাহর সন্তান হিসেবে সাব্যস্ত করবে?) (সূরা যুখরুফ ঃ ১৮)

আর এভাবেই শরীয়তে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার হিকমত সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

যে সমস্ত পুরুষ স্বর্ণ ব্যবহারে অভ্যস্ত এ উপলক্ষে আমি তাদেরকে নসীহত করে বলতে চাই ঃ তারা এ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের নাফারমানী করেছে। নিজেদেরকে নারীদের কাতারে শামিল করেছে এবং নিজেদের হাতে বা গলায় জাহান্নামের আগুনের অঙ্গার পরিধান করেছে। যেমনটি নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তওবা করা। তবে শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে পুরুষের জন্য রৌপ্য ব্যবহার বৈধ রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য পদার্থও ব্যবহার করা যাবে। যেমন আংটি বা ঘড়ি ইত্যাদি। তবে কোন ক্রমেই যেন তা অপচয়ের পর্যায়ে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (১২৫) স্বর্ণের দাঁত লাগানোর বিধান কি?

উত্তর ঃ একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে পুরুষের জন্য স্বর্ণের দাঁত লাগানো জায়েয নয়। কেননা পুরুষের জন্য স্বর্ণ পরিধাণ করা ও তা গয়না হিসেবে ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে যদি সচরাচর স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধানো প্রচলিত থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই, স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করতে পারে। কেননা নবী ﷺ বলেন,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

"আমার উম্মাতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার বৈধ করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।"[১]

---

[১]. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রেশমের বিবরণ। নাসায়ী, অধ্যায় ঃ সৌন্দর্য, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১২৮) কুরআন মাজীদে সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিদ্বানগণ বলেন, কুরআন মাজীদে সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা জায়েয নয়। কেননা এ কথা সর্বজনবিদিত যে, পবিত্র কুরআন এমন সম্মান ও মর্যাদাবান কিতাব যা সাথে নিয়ে টয়লেটের মত স্থানে প্রবেশ করা সমিচীন নয়।

প্রশ্ন ঃ (১২৯) আল্লাহর নাম সম্বলিত কাগজ সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর নাম সম্বলিত কাগজ যদি বাইরে প্রকাশিত না থাকে বরং তা পকেটের মধ্যে থাকে বা গোপনে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে, তবে তা সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা জায়েয। সাধারণত অনেক নাম তো এমন রয়েছে যা আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন আবদুল্লাহ বা আবদুল আযীয প্রভৃতি।

প্রশ্নঃ (১৩০) টয়লেটের মধ্যে ওযূ করার দরকার হলে সে সময় কিভাবে 'বিসমিল্লাহ্' বলবে?

উত্তর ঃ টয়লেটের মধ্যে ওযূ করলে মনে মনে বিসমিল্লাহ্ বলবে, মুখে উচ্চারণ করে বলবে না। কেননা ওযূ ও গোসলে 'বিসমিল্লাহ্' ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালী নয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'ওযূতে বিসমিল্লাহ্ বলার ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধ কোন হাদীস নেই।' এজন্যে মুগনী গ্রন্থের লিখক মুওয়াফ্ফাক বিন কুদামা মত প্রকাশ করেছেন যে, ওযূর সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ঃ (১৩১) প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলা সামনে বা পিছনে রাখার বিধান কি?

উত্তর ঃ এ মাসআলায় বিদ্বানদের থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায় ঃ

একদল বিদ্বান বলেন, বদ্ধ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কিবলা সামনে বা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা হারাম। তারা আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-এর হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

www.pathagar.com

"তোমরা পেশাব-পায়খানায় গেলে পায়খানার সময় বা প্রস্রাব করার সময় কিবলাকে সামনে রাখবে না এবং পিছনেও রাখবে না। বরং পূর্ব ও পশ্চিম দিক ফিরে বসবে।"[১]

আবূ আইয়ূব বলেন, আমরা শাম দেশে গিয়ে দেখি সেখানকার টয়লেট কা'বার দিকে তৈরী করা আছে। আমরা তা ব্যবহার করার সময় বাঁকা হয়ে বসতাম, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম।

এ বিষয়টি ছিল খোলা মাঠে। কিন্তু বন্ধ ঘরের মধ্যে যদি হয়, তবে কিবলা সামনে বা পিছনে রাখাতে কোন দোষ নেই। ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন,

ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.

"আমি একদা হাফসার বাড়ীর ছাদে উঠলাম। দেখলাম নবী ﷺ শামের দিকে মুখ করে কা'বার দিকে পিছন ফিরে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করছেন।"[২]

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, ঘেরা স্থানে হোক বা খোলা স্থানে কোন সময়ই কিবলা সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখা যাবে না। তাদের দলীল হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত আবূ আইয়ূব আনসারীর হাদীস। আর ইবনু উমারের হাদীস সম্পর্কে তাদের জবাব হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার পূর্বের।

দ্বিতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞাই প্রাধান্য পাবে। কেননা নিষেধাজ্ঞা আসল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর আসল হচ্ছে জায়েয। তাই জায়েয থেকে স্থানান্তর হয়ে নাজায়েযের বিধানই গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয়তঃ আবূ আইয়ূব বর্ণিত হাদীস নবীজীর বাণী। আর ইবনু উমারের হাদীস তাঁর কর্ম। মৌখিক নির্দেশের হাদীস কর্মের হাদীসের সাথে সংঘর্ষশীল হতে পারে না। কেননা কর্মে বিশেষত্ব ও ভুলের সম্ভাবনা থাকে বা অন্য কোন ওযরেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এ মাসআলায় আমার মতে, **প্রাধান্যযোগ্য কথা হচ্ছে,**

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ওযূ, অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব ও পায়খানায় কিবলা সামনে রাখবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ হাজত পূরা করে পবিত্রতা অর্জন করা।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ওযূ, অনুচ্ছেদ ঃ দু'টি ইটের উপর পায়খানা করা।

www.pathagar.com

খোলা ময়দানে ক্বিবলা সামনে বা পিছনে রেখে শৌচকার্য করা হারাম। চার দেয়ালে ঘেরা স্থানে কিবলাকে পিছনে রাখা জায়েয হবে সামনে রাখা জায়েয নয়। কেননা কিবলার সম্মুখবর্তী হওয়ার হাদীস সংরক্ষিত। এখানে বিশেষত্বের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পশ্চাতে রাখার নিষেধাজ্ঞাকে নবীজীর কর্ম দ্বারা বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সম্মুখে রাখার চাইতে পশ্চাতে রাখার বিষয়টি সহজ এ কারণে- আল্লাহ ভাল জানেন- মানুষ ঘেরার মধ্যে থাকলে বিষয়টিকে হালকা করা হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে কিবলাকে সম্মুখে বা পশ্চাতে না রাখা।

প্রশ্ন ঃ (১৩২) বায়ু নিঃস্বরণ হলে কি ইসতিনজা করা আবশ্যক?

উত্তর ঃ পশ্চাদদেশ থেকে বায়ু নিঃস্বরিত হলে ওযূ বিনষ্ট হবে।

কেননা নবী ﷺ বলেন,

لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"সলাত থেকে বের হবে না যে পর্যন্ত বায়ু বের হওয়ার আওয়াজ না শুনবে বা দুর্গন্ধ না পাবে।"[১]

কিন্তু এতে ইস্তিন্জা করা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ- লজ্জাস্থান ধৌত করা আবশ্যক নয়। কেননা এমন কিছু তো বের হয়নি যা ধৌত করার দরকার হবে।

তাই বায়ু নির্গত হলে ওযূ নষ্ট হবে। এতে ওযূ করে পবিত্র হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ-কুলি, নাক ঝাড়াসহ মুখমণ্ডল ধৌত করবে, কনুইসহ দু'হাত ধৌত করবে, কানসহ মাথা মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত দু'পা ধৌত করবে।

এখানে একটি মাসআলার ব্যাপারে আমি মানুষকে সতর্ক করতে চাই ঃ কিছু লোক সলাতের সময় হওয়ার পূর্বে প্রস্রাব-পায়খানা করলে ইস্তিন্জা করে। অতঃপর সলাতের সময় উপস্থিত হলে ওযূ করার পূর্বে ধারণা করে যে, পুনরায় তাদেরকে ইস্তিন্জা করতে হবে পুনরায় লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা কোন কিছু বের হওয়ার পর উক্ত স্থান ধৌত করে নিলেই তো তা পবিত্র হয়ে গেল। আর পবিত্র হয়ে গেলে পুনরায় তা ধৌত করার কোন অর্থ নেই। কেননা ইস্তিন্জা ও শর্ত মোতাবেক কুলুখের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্রাব-পায়খানা বের হওয়ার স্থানকে পবিত্র করা। একবার পবিত্র হয়ে গেলে নতুন করে কোন কিছু বের না হলে আর তা নাপাক হবে না।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ওযূ, অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহের ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হলে ওযূ করবে না, হাঃ ১৩৭। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতায় নিশ্চিত থাকার পর ওযূ ভঙ্গের ব্যাপারে সন্দেহ হলে ঐ পবিত্রতা নিয়েই সলাত চালিয়ে যাবে এ কথার দলীল, হাঃ ৩৬১।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১৩৩) কখন মিসওয়াক ব্যবহার করার গুরুত্ব বেশী? খুতবা চলাবস্থায় সলাতের অপেক্ষাকারীর মিসওয়াক করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নিম্নলিখিত সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ ঃ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে, গৃহে প্রবেশ করে, ওযূতে কুলি করার সময়, সলাতে দণ্ডায়মান হওয়ার সময়।

সলাতের অপেক্ষাকারীর মিসওয়াক করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু খুতবা চলাবস্থায় মিসওয়াক করবে না। কেননা এটা তাকে খুতবা শোনা থেকে ব্যস্ত করবে। কিন্তু তন্দ্রা কাটানোর প্রয়োজনে মিসওয়াক ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন ঃ (১৩৪) ওযূর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলা কি ওয়াজিব?

উত্তর ঃ ওযূর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব নয়; বরং তা সুন্নাত। কেননা এক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ বলার ক্ষেত্রে অনেকের আপত্তি রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, 'এক্ষেত্রে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি।' বলার অপেক্ষা রাখে না এবং কারো অজানা নয় যে, ইমাম আহমাদ হাদীস শাস্ত্রের ইমাম এবং হাফিয। তিনি যদি কোন ক্ষেত্রে বলেন, এ বিষয়ে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি, তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্ন থেকে যায়। অতএব যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় তা মানুষের উপর আবশ্যক করা উচিত নয়। এজন্যে আমি মনে করি ওযূতে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। কিন্তু কারো নিকট যদি এক্ষেত্রে হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়, তবে 'বিসমিল্লাহ' ওয়াজিব বলা তার জন্য আবশ্যক। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لاَ وَضُوْءَ অর্থাৎ- ওযূ বিশুদ্ধ হবে না। ওযূ পূর্ণ হবে না এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ (১৩৫) পুরুষ ও নারীর খাত্না করার বিধান কি?

উত্তর ঃ খাত্নার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। নিকটবর্তী মত হচ্ছে, পুরুষের খাত্না করা ওয়াজিব আর নারীর জন্য সুন্নাত। এ পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, পুরুষের খাত্নার মাঝে একটি ইবাদাত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে সলাতের পবিত্রতা। যদি খাত্না না করা হয়, তবে প্রস্রাব বের হলে তার কিছু অংশ লিঙ্গের ঢাকনা চামড়ার ভিতরে জমা হয়ে থাকে, যা জ্বলনের কারণ হয় বা সেখানে ইন্‌ফেকশন (Infection) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সর্বনিম্ন অসুবিধা হচ্ছে, যখনই সে নড়াচড়া করবে, তখনই প্রস্রাবের বিন্দু বের হবে এবং তার শরীর ও কাপড় নাপাক করে দিবে।

www.pathagar.com

আর নারীর খাত্না করার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা হচ্ছে, তার যৌন উত্তেজনা হ্রাস করা। আর এটা হচ্ছে তার একটি পূর্ণতা। এখানে খারাপ অতিরিক্ত কোন বিষয়কে বিদূরিত করা হচ্ছে না। যেমন পুরুষের বেলায় হয়ে থাকে।

বিদ্বানগণ খাত্নার ক্ষেত্রে শর্ত করেছেন, খাত্না করলে যদি অসুস্থতা বা প্রাণনাশের আশংকা থাকে, তবে সে অবস্থায় খাত্না করা ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব বিষয়সমূহ অপারগতা, ধ্বংসের আশংকা ও ক্ষতির কারণে রহিত হয়ে যায়।

পুরুষের খাতনা ওয়াজিব হওয়ার দলীল ঃ

প্রথমতঃ এ মর্মে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে নবী ﷺ খাত্না করার আদেশ করেছেন।[১] আর নবীজীর নির্দেশ মানেই তা পালন করা ওয়াজিব।

দ্বিতয়তঃ খাত্না হচ্ছে মুসলিম ও খৃষ্টানের মাঝে পার্থক্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এমনকি মুসলমানগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে খাত্নার মাধ্যমে নিজেদের নিহত ব্যক্তিদের খুঁজতেন। আর যা বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য তা হচ্ছে ওয়াজিব। কেননা মুসলমান ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য থাকা ওয়াজিব। এ কারণেই নবী ﷺ কাফিরদের সাথে সাদৃশাবলম্বন নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি কোন জাতির সদৃশ অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

তৃতীয়তঃ খাত্না হচ্ছে শরীর থেকে একটি জিনিস কর্তন করা। বিনা কারণে শরীরের কোন অংশ কর্তন করা হারাম। আর ওয়াজিব কারণ ছাড়া হারামকে হালাল করা বৈধ নয়। অতএব খাত্না করা ওয়াজিব।

চতুর্থতঃ খাত্না করলে অভিভাবকের পক্ষ থেকে ইয়াতীমের উপর ও তার সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কেননা এতে খাত্নাকারীকে পারিশ্রমিক দেয়া আবশ্যক। বিষয়টি ওয়াজিব না হলে তার শরীরে ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা জায়েয হত না।

---

১ . মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ৩/৪১৫।

২ . আবূ দাউদ, পোষাক অধ্যায়, হাঃ ৩৫১২। মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৪৮৬৯, ৫৪০৯।

www.pathagar.com

হাদীসের উক্তি ও যুক্তি দ্বারা আমরা প্রমাণ করলাম যে, পুরুষের খাত্না করা ওয়াজিব।

কিন্তু নারীর খাত্না ওয়াজিব বলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সঠিক মত হচ্ছে, পুরুষের খাত্না করা ওয়াজিব নারীর নয়। একটি যঈফ হাদীস রয়েছে যাতে বলা হয়েছে,

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِيْ حَقِ الرِّجَالِ ومَكْرُمَةٌ فِيْ حَقِ النِّسَاءِ.

"খাত্না পুরুষের জন্য সুন্নাত ও নারীর জন্য সম্মান।"[১] হাদীসটি বিশুদ্ধ হলে সকল মতভেদের সমাধান হয়ে যেত।

প্রশ্ন ঃ (১৩৬) কোন মানুষের যদি কৃত্রিম দাঁত থাকে, তবে কুলি করার সময় কি তা খুলে রাখা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ কারো মুখে যদি দাঁত বাঁধানো থাকে, তবে ওযূর সময় তা খুলে রাখা আবশ্যক নয়। তা হাতের আংটি বা ঘড়ি ব্যবহার করার মত। ওযূর সময় আংটি খোলা আবশ্যক নয়। বরং উত্তম হচ্ছে তা নাড়িয়ে দেয়া, কিন্তু এ নাড়ানোও ওয়াজিব নয়। কেননা নবী ﷺ আংটি পরিধান করতেন কিন্তু এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি ওযূর সময় তা খুলে রাখতেন। অথচ মুখের মধ্যে বাঁধানো দাঁতের তুলনায় আংটিই পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে বাঁধার কারণ হতে পারে। তাছাড়া কোন কোন মানুষের দাঁত অনেক কষ্টে বাঁধাই করতে হয়- যা যখন তখন খোলা ও লাগানো সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন ঃ (১৩৭) কান মাসেহ্ করার জন্য কি নতুন করে পানি নিতে হবে?

উত্তর ঃ কান মাসেহ করার জন্য হাতে নতুন পানি নেয়া আবশ্যক নয়। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুস্তাহাবও নয়। কেননা নবী ﷺ ওযূর পদ্ধতি বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে কেউ এমন কথা উল্লেখ করেননি যে, তিনি কান মাসেহ্ করার জন্য নতুন করে পানি নিতেন। অতএব মাথা মাসেহ্ করার পর হাতের অবশিষ্ট ভিজা দিয়েই কান মাসেহ্ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (১৩৮) ওযূতে ধারাবাহিকতার অর্থ কি? ওযূতে মুওয়ালাত বা পরস্পর অর্থ কি? এ দু'টি কথার বিধান কি?

---

১. মুসনাদের আহমাদ, হাঃ ৫/৭৫

www.pathagar.com

উত্তর ঃ ওযূর মধ্যে ধারাবাহিকতার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ যে ধারাবাহিকতার সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন সেভাবে ওযূ করা। আল্লাহ প্রথমে মুখমণ্ডল ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তারপর দু'হাত, তারপর মাথা মাসেহ করা এবং শেষে পা ধৌত করা। কোন মানুষ যদি উল্টাপাল্টা করে যেমন প্রথমে হাত তারপর পা তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করে তারপর মাথা মাসেহ করে, তবে তার ওযূ হবে না। এ কারণে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব নয় সুন্নাত। অতএব আল্লাহ যে সিরিয়ালে ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন তাকেই ধারাবাহিকতা বলে যা বজায় রাখা ওযূর অন্যতম ওয়াজিব। নবী ﷺ হাজ্জে গিয়ে সাঈ করতে গিয়ে প্রথমে ছাফা পর্বতে আরোহণ করে পাঠ করেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।"

(সূরা বাক্বারা ঃ ১৫৮)

আরও তিনি বলেন, ,,أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِـــهِ 'আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন সেভাবে শুরু করছি।"[১] এখানে তিনি বর্ণনা করে দিলেন কেন তিনি মারওয়াতে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ যার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন সেখান থেকেই প্রথমে শুরু করা।

আর মুওয়ালাত বা ওযূর কাজ ক্রমানুক্রমে করার অর্থ হচ্ছে, ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বিরতি গ্রহণের মাধ্যমে পৃথক না করা। এর উদাহরণ হচ্ছে, মুখমণ্ডল ধৌত করার পর পরই হাত না ধুয়ে দেরী করা। এ অবস্থায় তার পরস্পর করা নষ্ট হয়ে গেল তাই তাকে নতুন করে ওযূ আরম্ভ করতে হবে। কেননা নবী ﷺ দেখলেন জনৈক ব্যক্তি ওযূ করেছে কিন্তু পায়ে তার নখ বরাবর একটি স্থান রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُـــوءَكَ। "তুমি ফিরে গিয়ে সুন্দরভাবে ওযূ করে আস।"[২]

আবূ দাউদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি তাকে পুনরায় নতুন করে ওযূ করার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, ওযূতে পরস্পরা রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা ওযূ একটি ইবাদাত। আর একটি ইবাদাতের বিভিন্ন অংশের মাঝে বিচ্ছিন্ন করলে পরস্পরের উপর ভিত্তি করা চলে না।

---

[১] . মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছে দঃ নবী ﷺ-এর হাজ্জের বর্ণনা।

[২] . মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতার অঙ্গের সমস্ত অংশ শামিল করে ওযূ করা।

www.pathagar.com

অতএব বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরতা রক্ষা করা ওযূর দু'টি ফরয।

প্রশ্ন ঃ (১৩৯) ওযূর সময় কেউ যদি কোন একটি অঙ্গ ধৌত করতে ভুলে যায়, তবে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ ওযূ করার সময় কেউ যদি একটি অঙ্গ ভুলে যায়, তবে যদি অচিরেই তা মনে পড়ে তাহলে তা ধৌত করবে এবং তার পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করবে। যেমন কেউ ওযূ করল। কিন্তু বাম হাত ধৌত করতে ভুলে গেল এবং শুধু ডান হাত ধৌত করে মাথা ও কান মাসেহ্ করে ফেলল। দু'পা ধৌত করার পর খেয়াল হল তার বাম হাত ধৌত করা হয়নি। তাকে আমরা বলব, আপনি বাম হাত ধৌত করুন, মাথা ও কান মাসেহ্ করুন এবং দু'পা ধৌত করুন। এ অঙ্গগুলো পুনরায় ধৌত করা এজন্যই ওয়াজিব যে, ওযূতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। কেননা ওযূর অঙ্গগুলো যেরূপ ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, সেভাবেই ধারবাহিকতা বজায় রেখে তা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"তোমরা মুখমণ্ডল ধৌত কর, দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ্ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় পর স্মরণ হয়, তবে পুনরায় ওযূ করবে। যেমন কেউ ওযূ করার সময় বাম হাত ধৌত করতে ভুলে গেল এবং এভাবেই ওযূ শেষ করে ফেলল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্মরণ হল সে তো বাম হাত ধৌত করেনি। তখন তার উপর আবশ্যক হচ্ছে পুনরায় প্রথম থেকে ওযূ করা। কেননা ওযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা আবশ্যক। বরং ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত।

জেনে রাখা উচিত, যদি সে সন্দেহে থাকে অর্থাৎ ওযূ শেষ হওয়ার পর সন্দেহ হল, সে কি ডান হাত বা বাম হাত ধৌত করেছে কি না? কুলি করেছে কি না? নাক ঝেড়েছে কি না? তখন এ সন্দেহের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না। বরং সামনে অগ্রসর হবে এবং সলাত আদায় করবে। কেননা ইবাদাত শেষ হওয়ার পর কোন সন্দেহ দেখা দিলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, তার কোন মূল্য নেই। এ ধরনের সন্দেহের প্রতি গুরুত্বারোপ করলে মানুষের সামনে ওয়াস্ওয়াসার দরজা উন্মুক্ত করা হয়। তখন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ইবাদাতে সন্দেহ করা শুরু করবে। অতএব আল্লাহ্র রহমতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ইবাদাত

www.pathagar.com

সম্পন্ন করার পর কোন সন্দেহ দেখা দিলে মানুষ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, তার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না। অবশ্য সন্দেহ যদি দৃঢ়তায় পরিণত হয়, তবে তার ব্যবস্থা নেয়া ওয়াজিব।

ওযূ অবস্থায় পানি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার পানি পাওয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ (১৪০) ওযূ চলছে এমন সময় পানি বন্ধ হয়ে গেল। পানি যখন ফিরে এল তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে গেছে। এখন ওযূ কি নতুন করে করতে হবে নাকি বাকী অঙ্গসমূহ ধৌত করলেই চলবে?

উত্তর ঃ মাসআলাটির ভিত্তি হচ্ছে, ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত কিনা? এতে বিদ্বানদের মধ্যে দু'টি মত পাওয়া যায়।

একটি মত হচ্ছে ঃ মুওয়ালাত বা ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ক্রমানুক্রমে ধৌত করা অর্থাৎ একটি না শুকাতে অপর অঙ্গ ধৌত করা ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। একটি অঙ্গ ধৌত করার পর অপর অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে যদি বিচ্ছিন্নতা হয়ে যায়, তবে ওযূ বিশুদ্ধ হবে না। এটাই সঠিক মত। কেননা ওযূ পূর্ণাঙ্গ একটি ইবাদাত। এর একটি অংশের সাথে অপর অংশের সম্পর্ক থাকা জরূরী। অঙ্গসমূহ পরস্পর ধৌত করার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, এক অঙ্গ ধোয়ার পর সাধারণভাবে এতটা সময় বিরতি গ্রহণ না করা যাতে পরের অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে তা শুকিয়ে যায়। কিন্তু এ বিরতি গ্রহণ যদি পবিত্রতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে কোন অসুবিধা নেই। যেমন ওযূ শুরু করেছে এমন সময় লক্ষ্য করে কোন এক অঙ্গে পেইন্ট বা এ জাতীয় কোন বস্তু লেগে আছে, তখন তা অপসারণ করতে গিয়ে যদি দীর্ঘ সময়ের দরকার পড়ে এবং আগের অঙ্গ শুষ্ক হয়ে যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই ওযূ চালিয়ে যাবে, নতুন করে আবার শুরু করতে হবে না। কেননা এ দীর্ঘতা তো পবিত্রতার কাজের সাথেই সম্পর্কিত। তাছাড়া এখানে তো ওযূর কাজে বিরতি গ্রহণ করা হয়নি।

কিন্তু পানির জন্য যদি বিরতি হয়, যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, এ অবস্থায় পরস্পর ধৌত করার শর্ত ক্ষুণ্ন হল। অতএব তাকে পুনরায় নতুন করে ওযূ শুরু করতে হবে। আবার কেউ বলেন, নতুন করে ওযূ শুরু করার দরকার নেই। কেননা এখানে তো তার কোন এখতিয়ার নেই। সে তো ওযূ পূর্ণ করার অপেক্ষা করছে। তাই পানি আসলে ওযূর বাকী কাজ পূর্ণ করবে- যদিও ধৌতকৃত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

যে সমস্ত বিদ্বান পরস্পর ধৌত করা ওয়াজিব বলেন, তাদের কথা হচ্ছেঃ অঙ্গ শুষ্ক হওয়া না হওয়ার সাথে পরস্পর ধৌত করার সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক

হচ্ছে সামাজিক পরিচিতির সাথে। সামাজিকভাবে যদি বলা হয়, এখানে ওযূর মাঝে বিচ্ছিন্ন হল বা বিরতি নেয়া হল, তবে তাতে পরম্পরতা নষ্ট হবে। যেমন পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যারা পানির অপেক্ষা করে তারা তো পানি নিয়ে আসার কাজে ব্যস্ত, সাধারণভাবে মানুষ এটাকে ওযূর প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মাঝে বিচ্ছিন্নতা বলে না। অতএব তারা পানি পাওয়ার পর ওযূর বাকী কাজ পূর্ণ করবে। আর এটাই উত্তম কথা। তবে যদি উক্ত বিরতি খুব বেশী দীর্ঘ হয়ে যায়, তবে নতুন করে শুরু করে নেয়াটাই ভাল। কেননা কাজটা খুবই সহজ।

প্রশ্ন ঃ (১৪১) নখ পালিশ ব্যবহার করে ওযূ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নখ পালিশ হচ্ছে এক প্রকার রং যা নারীরা তাদের নখে ব্যবহার করে থাকে। তা গাঢ় হয়ে থাকে। নারী যদি সলাত আদায়কারী হয় তবে তার জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কেননা এটা নখে থাকলে ওযূর পানি নখে পৌঁছবে না। আর কোন বস্তুর কারণে যদি পানি পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি হয়, তবে তা ওযূ ও গোসলকারীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "তোমরা মুখমণ্ডল ও হাতদ্বয় ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

অতএব নারীর নখে যদি নখ পালিশ থাকে তবে তা তো পানি পৌঁছতে বাধা দিবে। সুতরাং তা থাকা অবস্থায় ওযূ বা গোসল করলে তো তার একটি অঙ্গ শুষ্কই রয়ে গেল এবং ওযূ বা গোসলের একটি ফরয কাজ পরিত্যাগ করল।

কিন্তু নারী সলাত আদায়কারী না হলে যেমন ঋতুবতী বা নিফাস বিশিষ্ট হলে, সে এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। তবে এ কাজ কাফির নারীদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। তাই তা ব্যবহার না করাতেই কল্যাণ। কেননা এতে তাদের সাথে সদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি শুনেছি, কোন কোন মানুষ নাকি ফাতাওয়া দিয়েছে যে, এটা হাত মোজা পরিধান করার ন্যায়। সুতরাং গৃহে অবস্থান করলে নারী তা একদিন একরাত, আর সফরে থাকলে তিনদিন তিন রাত ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এটি ভুল ফাতাওয়া ও অজ্ঞতা। মানুষের শরীর আচ্ছাদিত করে এমন প্রত্যেক বস্তুকেই মোজার সাথে তুলনা করা উচিত নয়। ইসলামী শরীয়তে যে মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র পায়ের মোজার সাথে বিশিষ্ট। আর তা প্রয়োজনের সময়। কেননা ঠাণ্ডার কারণে বা ময়লা-আবর্জনা থেকে সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য পায়ে মোজা পরিধান করার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য শরীয়ত মানুষের প্রতি সহজ করে এর উপর মাসেহ করা বৈধ করেছে।

www.pathagar.com

অনেক সময় ওরা নখ পালিশ ব্যবহারকে পাগড়ীর উপর মাসেহ করার সাথে তুলনা করে। কিন্তু এটা আরেক অজ্ঞতা। কেননা পাগড়ীর স্থান হচ্ছে মাথা। আর মাথার ক্ষেত্রে আগে থেকেই সহজ করা রয়েছে। তা ধৌত করতে হবে না। সেখানে মাসেহ করতে হবে। কিন্তু হাত এর বিপরীত। হাতের ফরয হচ্ছে তা ধৌত করা। এ কারণে নবী ﷺ নারীদের হাত মোজাতে মাসেহ করা বৈধ করেননি। অথচ তা হাত ঢেকে রাখে। অতএব পানি পৌঁছতে বাধাদানকারী যে কোন পর্দা হলেই তাকে পাগড়ী বা মোজার সাথে তুলনা করা জায়েয নয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রাণাপণ চেষ্টা করা। এমন কোন ফাতাওয়া দিবে না যার জন্য আল্লাহ্‌র সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা এটা আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত এখানে অনুমান ও ধারণা করে কোন কিছু বলার অবকাশ নেই। (আল্লাহ তাওফীক দাতা ও সঠিক পথ প্রদর্শক।)

প্রশ্ন ঃ (১৪২) শরীয়ত সম্মত ওযূর পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ শরীয়ত সম্মত ওযূর পদ্ধতি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ হচ্ছে ঃ ওয়াজিব পদ্ধতি। যা না করলে ওযূই হবে না। আর তা হচ্ছে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত বিষয়সমূহ। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সলাতের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এর বর্ণনা হচ্ছে, মুখমণ্ডল একবার ধৌত করতে হবে। কুলি করা ও নাক ঝাড়া মুখমণ্ডল ধৌত করার অন্তর্গত। হাত ধৌত করার সীমানা হচ্ছে আঙ্গুলের প্রান্তসীমা থেকে কনুই পর্যন্ত একবার ধৌত করা। হাত ধৌত করার সময় কব্জি ধৌত করা হল কিনা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক লোক অসতর্কতাবশতঃ শুধু হাতের উপর অংশ ধৌত করে এবং কব্জি ছেড়ে দেয়। এটা বিরাট ভুল। তারপর একবার মাথা মাসেহ করা। কান মাসেহ করা মাথা মাসেহের অন্তর্গত। শেষে দু'পা টাখনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা। এটা হচ্ছে ওযূর সর্বনিম্ন ওয়াজিব পদ্ধতি।

দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে ঃ মুস্তাহাব পদ্ধতি। প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে ওযূ শুরু করবে। দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। তারপর তিন চুল্লু পানি দ্বারা

www.pathagar.com

তিনবার কুলি করবে ও নাক ঝাড়বে। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে। এরপর দু'হাত কনুইসহ তিনবার করে ধৌত করবে। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত। একবার মাথা মসেহ করবে। দু'হাত পানিতে ভিজিয়ে ভিজা হাত মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, অতঃপর আবার তা সামনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এরপর কান মাসেহ করবে। দু'তর্জনী দু'কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের অংশ মাসেহ করবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ্ করবে। সব শেষে দু'পা টাখনুসহ তিনবার করে ধৌত করবে। প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা।

ওযূ শেষ হলে এই দু'আটি পাঠ করবে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ্ 'আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ্ 'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।"

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল কর।"

যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এভাবেই নবী ﷺ থেকে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[১]

একটি পত্র

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি

সম্মানিত শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহঃ) বলেন,

অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে ও সলাত আদায় করবে সে ব্যাপারে এটি একটি সংক্ষিপ্ত পত্র। অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থার বিচার করে তার জন্য ইসলামী শরীয়তে কিছু বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নবী

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ওযূর পর মুস্তাহাব দু'আ। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৫০।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ ﷺ-কে ক্ষমাশীল সর্বোত্তম সঠিক ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেন, যা হচ্ছে সহজ ও সরল। আল্লাহ্ এরশাদ করেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য ধর্মে কোন অসুবিধা রাখেন নি।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)

তিনি আরো বলেন,

﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমরা অসুবিধায় পড় তিনি তা চান না।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾

"তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কথা শোন ও আনুগত্য কর।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

নবী ﷺ বলেন, إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ "নিশ্চয় এই ধর্ম অতি সহজ।"[১]

তিনি আরো বলেন,

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করি, তখন সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন কর।"[২]

উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ওযর বিশিষ্ট লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইবাদাতকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন। যাতে করে তারা কোন অসুবিধা ও কষ্ট ছাড়াই তাঁর ইবাদাত সম্পাদন করতে পারে। (আল-হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন)

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি ঃ

১। অসুস্থ ব্যক্তির অবশ্যক হল ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি দ্বারা ওযূ করা এবং বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য পানি দ্বারা গোসল করা।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ধর্ম সহজ, হাঃ ৩৯।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ই'তিসাম। অনুচ্ছেদ ঃ রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ, হাঃ ৭২৮৮। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ফযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-কে সম্মান করা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন প্রশ্ন তাকে না করা।

www.pathagar.com

২। পানি দ্বারা যদি পবিত্রতা অর্জন করতে না পারে- অপরাগতার কারণে বা রোগ বেড়ে যাবে এ আশঙ্কার কারণে বা ভয় সুস্থ হতে দেরী হবে যাবে- তবে এহেন পরিস্থিতিতে সে তায়াম্মুম করবে।

৩। তায়াম্মুমের পদ্ধিত হল- হাত দু'টিকে পবিত্র মাটিতে একবার মারবে তারপর তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। অতঃপর উভয় হাতকে কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। আগে ডান হাত পরে বাম হাত।

৪। রুগী নিজে যদি পবিত্রতা অর্জন করতে অক্ষম হয়, তবে অন্য ব্যক্তি তাকে ওযূ বা তায়াম্মুম করিয়ে দিবে।

৫। ওযূ বা গোসলের কোন অঙ্গে যদি যখম থাকে আর পানি দিয়ে ধৌত করলে তাতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে পানি দিয়ে হাতকে ভিজিয়ে সে স্থানকে মুখে দিবে। এভাবে মুছে দেয়াতে যদি ক্ষতির আশঙ্কা হয়, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করে নিবে।

৬। ভাঙ্গা-মচকা ইত্যাদি কারণে যদি শরীরের কোন অঙ্গে পট্টি বা ব্যান্ডেজ থাকে তবে সে স্থান ধৌত করার পরিবর্তে পানির মাধ্যমে তার উপর মাসেহ করে নিবে। এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করবে না। কেননা মাসেহ ধোয়ার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।

৭। কোন বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করবে? দেয়াল বা অন্য কোন বস্তু যেখানে ধূলা গেলে আছে তা দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। দেয়াল যদি মাটি জাতীয় বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা লেপন করা থাকে যেমন রং বা পেইন্ট, তবে সেখানে তায়াম্মুম জায়েয হবে না। কিন্তু যদি উক্ত দেয়ালে ধূলা লেগে থাকে তবে তাতে তায়াম্মুম করতে অসুবিধা নেই।

৮। জমিনের উপর হাত রেখে বা দেয়াল থেকে বা যে বস্তুতে ধূলা আছে তা থেকে তায়াম্মুম করা সম্ভব না হয় তবে কোন পাত্র বা রুমালের মধ্যে কিছু মাটি রেখে দিতে পারে এবং তা দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

৯। এক ওয়াক্তের সলাত আদায়ের উদ্দেশে তায়াম্মুম করার পর যদি তায়াম্মুম অবশিষ্ট থাকে তবে তা দিয়ে আরেক ওয়াক্তের সলাত আদায় করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী সলাতের জন্য আবার তায়াম্মুম করা দরকার নেই। কেননা সে তো পবিত্রই আছে। আর পবিত্রতা ভঙ্গকারী কোন কারণও ঘটেনি। এমনিভাবে বড় নাপাকী থেকে যদি তায়াম্মুম করে তবে পরবর্তী বড় নাপাকীতে লিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আর তায়াম্মুম করতে হবে না। কিন্তু এর মাঝে ছোট নাপাকীতে লিপ্ত হলে তার জন্য তায়াম্মুম করতে হবে।

www.pathagar.com

১০। অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল সকল প্রকার নাপাকী থেকে স্বীয় শরীরকে পাক-পবিত্র করা। যদি পাক-পবিত্র হতে সক্ষম না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট নাপাকী নিয়েই সলাত আদায় করবে। তার উক্ত সলাত বিশুদ্ধ হবে এবং পুনরায় উক্ত সলাত দোহরাতে হবে না।

১১। পবিত্র কাপড় নিয়ে সলাত আদায় করাও অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। কাপড় নাপাক হয়ে গেলে তা ধৌত করা অথবা তা বদলিয়ে অন্য কাপড় পরিধান করা ওয়াজিব। কিন্তু এরূপ করা যদি সাধ্যাতীত হয় তবে সংশ্লিষ্ট নাপাকী নিয়েই সলাত আদায় করবে। উক্ত সলাত বিশুদ্ধ হবে এবং তা আর ফিরিয়ে পড়তে হবে না।

১২। পবিত্র স্থান ও পবিত্র বস্তুর উপর সলাত আদায় করাও রুগীর উপর ওয়াজিব। যদি সলাতের স্থান নাপাক হয়ে যায় তবে তা ধৌত করা বা কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করা বা সেখানে কোন পবিত্র বস্তু বিছিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি এর কোনটাই সম্ভব না হয় তবুও ঐ অবস্থায় সলাত আদায় করবে এবং তার সলাত শুদ্ধ হবে। অন্য সময় তা ফিরিয়ে পড়ারও দরকার হবে না।

১৩। পবিত্রতা হাসিল করতে অপারগতার কারণে কোন রুগীর জন্য সলাত পরিত্যাগ করা বা কাযা করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। সাধ্যানুযায়ী সে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর সময়ের মধ্যেই সলাত আদায় করে নিবে-যদিও তখন তার শরীরে বা কাপড়ে বা সলাতের স্থানে নাপাকী লেগেই থাকে যা দূরীভূত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فاتقوا الله ما استطعتم অর্থ ঃ তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

১৪। কোন মানুষ যদি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত থাকে, তবে সে সলাতের ওয়াক্ত আসবে তখন তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে, তারপর উক্ত স্থানে পবিত্র কোন বস্তু বেঁধে দিবে যাতে প্রস্রাব কাপড় বা শরীরে ছড়িয়ে না যায়। তারপর ওযূ করে সলাত আদায় করবে। এরূপ সে প্রত্যেক ফরয ছলাতের সময় করবে। এরূপ করা যদি তার উপর অধিক কষ্টকর হয় তবে দু'সলাতের একত্রে পড়া তার জন্য জায়েয আছে। যোহর এবং আসর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করে দিবে। আর ফরয সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতের জন্য আদালা ওযূর দরকার নেই। তবে অন্য কোন নফল সলাত আদায় করতে চাইলে তাকে ফরযের নিয়মে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১৪৩) পবিত্রতায় সতর্কতার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকবার ওযূ করার সময় সুতার মোজা খোলার বিধান কি?

উত্তর ঃ এটা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। এতে ভ্রান্ত মতবাদেও ধারক শিয়া রাফিযীদের সাথে সদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা তারা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয মনে করে না। অথচ মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) যখন নবী ﷺ-এর মোজা খুলতে চাইলেন, তিনি তাকে বললেন,

دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

"খুলতে হবে না। কেননা পবিত্র অবস্থায় আমি এ দু'টি পরিধান করেছি।" তারপর তার উপর মাসেহ করলেন।[১]

প্রশ্ন ঃ (১৪৪) সুতার মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা গণনা কখন থেকে শুরু করতে হবে?

উত্তর ঃ এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা। এর সঠিক বিবরণ মানুষের জানা দরকার। তাই বিস্তারিতভাবে আমি প্রশ্নটির জবাব দিব, ইন্‌শাআল্লাহ্।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলীলের ভিত্তিতে মোজার উপর মাসেহ করার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সলাতের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে أَرْجُلَكُمْ শব্দটিতে لام অক্ষরটিতে যবর এবং যের দিয়ে উভয়ভাবে পড়া যায়। যবর দিয়ে পাঠ করলে তা وُجُوهَكُمْ শব্দের উপর ভিত্তি করবে। তখন মুখমণ্ডল ধৌত করার মত পাও ধৌত করতে হবে। আর যের দিয়ে পাঠ করলে তখন তার ভিত্তি হবে بِرُءُوسِكُمْ শব্দের উপর। তখন পা মাথা মাসেহের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব পূর্বোল্লিখিত দু'ক্বিরাত অনুযায়ী পদযুগল ধৌতও করা যায় এবং মাসেহও করা যায়। সুন্নাতে নববীতে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, কখন ধৌত করতে হবে এবং কখন মাসেহ করতে হবে?

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ওযূ, অনুচ্ছেদ ঃ পা দু'টি পবিত্র করার পর যখন মোজা পরিধান করবে, হাঃ ২০৬। মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ করা, হাঃ ৭৯, ২৭৪।

www.pathagar.com

সুতরাং পা যখন অনাবৃত থাকবে তখন তা ধৌত করতে হবে। আর মোজা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত করা থাকলে তা মাসেহ্ করবে।

হাদীসে নবী ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সনদে মোজার উপর মাসেহ করা প্রমাণিত হয়েছে। যেমনটি জনৈক কবি বলেছেন ঃ

মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসসমূহ হচ্ছে ঃ ১) নবীজীর উপর মিথ্যারোপ করা ২) আল্লাহর জন্য (মাসজিদ) ঘর তৈরী করা। ৩) কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্‌র দিদার লাভ। ৪) শাফাআতের বর্ণনা। ৫) হাওয কাওসার ৬) মোজার উপর মাসেহ করা।

মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা নবী ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত। তাই পবিত্র (ওযূ) অবস্থায় কোন মানুষ মোজা পরিধান করে থাকলে- ওযূ করার সময় মোজা খুলে পা ধৌত করার চাইতে উক্ত মোজার উপর মাসেহ করা উত্তম। এ কারণে মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) যখন নবী ﷺ-এর ওযূর সময় তাঁর পরিহিত মোজা খুলতে চাইলেন, তিনি বললেন, "খুলতে হবে না। কেননা পবিত্র অবস্থায় আমি তা পরিধান করেছি।" তারপর তার উপর মাসেহ করলেন।[১]

মোজার উপর মাসেহ করার কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ

প্রথম শর্ত ঃ ছোট বড় সব ধরনের নাপাকী থেকে পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করার পর মোজা পরিধান করবে। যদি পবিত্রতা অর্জন না করে মোজা পরিধান করে, তবে তাতে মাসেহ করা বিশুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ মাসেহ করার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মাসেহ করতে হবে। এর বর্ণনা অচিরেই আসবে, ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় শর্ত ঃ ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা তথা ওযূর ক্ষেত্রে মাসেহ হতে হবে। কিন্তু গোসল ফরয হলে মোজা অবশ্যই খুলতে হবে এবং সমস্ত শরীর ধৌত করতে হবে। এজন্য জানাবতের ক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ করা যাবে না। যেমনটি সাফওয়ান বিন আস্‌সাল (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ তিনি বলেন, আমরা সফরে থাকলে নবী ﷺ আমাদেরকে আদেশ করতেন, নাপাক না হলে আমরা যেন তিন দিন তিন রাত মোজা না খুলি।[২]

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ওযূ, অনুচ্ছেদ ঃ পা'দুটি পবিত্র করার পর যখন মোজা পরিধান করবে, হাঃ ২০৬। মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ করা, হাঃ ৭৯, ২৭৪।

[২]. নাসায়ী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির ও মুক্বীমের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা।

www.pathagar.com

মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা ঃ মুক্বীম তথা গৃহে অবস্থানকারীর জন্য একদিন একরাত তথা ২৪ ঘণ্টা। আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত তথা ৭২ ঘণ্টা। সলাত কয় ওয়াক্ত হল সেটা বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ সময় গণনা কখন থেকে শুরু হবে? এ হিসাব শুরু হবে প্রথমবার মাসেহ করার সময় থেকে। মোজা পরিধান বা ওযূ ভঙ্গের সময় থেকে হিসাব শুরু হবে না। কেননা হাদীসে 'মাসেহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যখন এ কাজটি হবে তখনই শব্দটির ব্যবহার হবে। "মুক্বীম একদিন একরাত্র মাসেহ করবে এবং মুসাফির তিনদিন তিনরাত মাসেহ করবে।" প্রথমবার মাসেহ করার সময় থেকে হিসাব শুরু হবে। তখন থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হলেই মুক্বীমের নির্দিষ্ট সময় শেষ। আর ৭২ ঘণ্টা পূর্ণ হলে মুসাফিরের নির্দিষ্ট সময় শেষ।

বিষয়টিকে অধিক সুস্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে ঃ

জনৈক ব্যক্তি ফজরের সময় পবিত্রতা অর্জন করে মোজা পরিধান করেছে। এরপর যোহর পর্যন্ত পবিত্র অবস্থায় থেকেছে। এমনকি আসর পর্যন্ত তার ওযূ নষ্ট হয়নি। তাই সে ঐ ওযূতে যোহর ও আসর সলাত সময়মত আদায় করেছে। তারপর মাগরিবের পূর্বে বিকাল ৫টার সময় ওযূ করেছে এবং মোজার উপর মাসেহ করেছে। এই ৫টা থেকে তার সময়ের হিসাব শুরু হবে। সে পরবর্তী দিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। যদি পরবর্তী দিন ৫টা বাজার পনের মিনিট আগে মোজাতে মাসেহ করে এবং এশা পর্যন্ত তার ওযূ ভঙ্গ না হয়, তবে ঐ মাসেহকৃত ওযূ দ্বারা মাগরিব সলাত আদায় করতে পারবে কোন অসুবিধা নেই। অতএব এ লোক প্রথমবার ওযূ করার পর প্রথম দিন যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং দ্বিতীয় দিন ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা মোট নয়টি সলাত আদায় করতে পারছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে, মাসেহের মাধ্যমে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা যায়। কিন্তু এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

শরীয়তে মাসেহ করার যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা শুরু হবে প্রথমবার মাসেহ করার সময় থেকে। এই উদাহরণে আপনি দেখলেন কতগুলো সলাত আদায় করা সম্ভব। উল্লেখিত উদাহরণে যে সময় দেখানো হয়েছে তা যদি শেষ হয়ে যায় এবং তারপর মাসেহ করে, তবে তা বাত্বিল বলে গণ্য হবে এবং তার ওযূ হবে না। কিন্তু মাসেহের নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে মাসেহ করে যদি আর ওযূ ভঙ্গ না হয়, তবে যতক্ষণ ওযূ ভঙ্গ না হবে সলাত

www.pathagar.com

পড়তে পারবে- যদিও নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা সলাত আদায় করার সময় সে তো পবিত্র অবস্থাতেই রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেই মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে এমন কথা দলীলবিহীন। কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আর মাসেহ করা যাবে না। এমন অর্থ নয় যে, সে আর পবিত্র থাকবে না। যে সময়সীমা দেয়া হয়েছে তা মাসেহের জন্য প্রযোজ্য পবিত্রতার জন্য নয়। তাই সময় অতিবাহিত হলেই ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে, এর কোন দলীল নেই। অতএব আমরা বলব, যখন কিনা এ ব্যক্তি বিশুদ্ধ শরঈ দলীলের ভিত্তিতে ওযূ করেছে পবিত্র হয়েছে, তখন তার ওযূ নষ্ট হয়েছে এ কথার পক্ষে বিশুদ্ধ শরঈ দলীল দরকার। আর সময় অতিবাহিত হলেই ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে এ রকম কোন দলীল নেই। তাই ওযূ ভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত সে পবিত্র হিসেবেই অবশিষ্ট থাকবে।

মুসাফিরের সময়সীমা তিনদিন তিনরাত। অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা। এ হিসাব শুরু হবে প্রথমবার মাসেহের সময় থেকে। এজন্য হাম্বলী মাযহাবের ফিক্বাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন, কোন লোক যদি মুক্বীম অবস্থায় মোজা পরিধান করে, অতঃপর নিজ শহরে থাকাবস্থাতেই তার ওযূ ভঙ্গ হয়, এরপর সফর করে এবং সফরের স্থানে গিয়ে ওযূ করে মাসেহ করে, তবে তাঁরা বলেন, সে মুসাফিরের সময়সীমা পূর্ণ করবে। এ দ্বারা বুঝা যায় যারা বলেন, মোজা পরিধান করার পর প্রথমবার ওযূ ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে সময় গণনা শুরু হবে, তাদের এ কথা দুর্বল।

কখন মোজার উপর মাসেহ বাত্বিল হবে? সময় অতিবাহিত হলে এবং মোজা খুলে ফেললে। অর্থাৎ- মোজা খুলে ফেললে আর মাসেহ করা যাবে না কিন্তু সে পবিত্র অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ তার ওযূ ভঙ্গ না হয়। এ কথার দলীল হচ্ছে সাফ্ওয়ান বিন আস্সালের পূর্ববর্তী হাদীস। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মোজা না খোলার।' এ থেকে বুঝা যায়, মোজা খুলে ফেললে মাসেহ করা বাত্বিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ- একবার মাসেহ করার পর যদি মোজা খুলে ফেলে, তবে পুনরায় তা পরিধান করে তাতে মাসেহ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সে নতুন করে পূর্ণ ওযূ করে পা ধৌত করে মোজা পরিধান করবে।

কিন্তু মোজা খুলে ফেললে পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকবে। কেননা মাসেহ করার মাধ্যমে যখন কোন ব্যক্তি ওযূ করবে তখন শরঈ দলীলের ভিত্তিতেই সে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে, সুতরাং তার এই পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে এ কথা বলার জন্য শরঈ দীলল দরকার। আর মাসেহ করে ওযূ করার পর মোজা খুলে

www.pathagar.com

ফেললে ওযূ বিনষ্ট হয়ে যাবে এ কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। কিন্তু এ কথার দলীল আছে যে একবার মাসেহ করার পর মোজা খুলে ফেললে পুনরায় পরিধান করে আবার তাতে মাসেহ করা যাবে না। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (আল্লাহ তাওফীক্ব দাতা)

প্রশ্ন ঃ (১৪৫) পাতলা বা ছেঁড়া মোজাতে মাসেহ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, ছেঁড়া মোজা এবং বাইরে থেকে চামড়া দেখা যায় এমন পাতলা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। কেননা মাসেহ করার উদ্দেশ্য এটা নয় অঙ্গটি পরিপূর্ণ ঢেকে রাখতে হবে। কেননা পা সতর নয়। মাসেহ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওযূকারী ব্যক্তির উপর সহজতা ও হালকা করা। অর্থাৎ- আমরা প্রত্যেক ওযূর সময় তাকে মোজা খুলে পা ধৌত করতে বাধ্য করব না। বরং বলব, এর উপর মাসেহ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর এ সহজতার উদ্দেশেই মোজার উপর মাসেহ করা শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে। অতএব কোন পার্থক্য নেই চাই মোজা ছেঁড়া হোক বা ভাল হোক, পাতলা হোক বা মোটা হোক।

প্রশ্ন ঃ (১৪৬) পট্টির উপর মাসেহ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ আমাদের জানা উচিত যে, পট্টি কি?

পট্টি বা ব্যান্ডেজ হচ্ছে এমন বস্তু যা ভাঙ্গা-মচকা জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ফিক্বাহবিদদের ভাষায় ঃ "বিশেষ প্রয়োজনে পবিত্রতা অর্জনের অঙ্গে কোন কিছু লাগিয়ে রাখা।" ভেঙ্গে যাওয়া স্থানে বা ফোঁড়ার স্থানে বা পিঠের ব্যথায় বা অন্য কোন কারণে যে পট্টি বা ব্যান্ডেজ লাগানো হয় এখানে সেটাই উদ্দেশ্য। ধৌত করার পরিবর্তে সেখানে মাসেহ করলেই যথেষ্ট হবে।

যেমন কোন লোকের হাতে ফোঁড়ার কারণে যদি পট্টি বাঁধা থাকে, তখন ওযূ করার সময় অন্যান্য স্থান ধৌত করে পট্টির উপর শুধু মাসেহ করবে। তাহলেই তার পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি তার ওযূ ভঙ্গ না হয়ে থাকে, তবে পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে ফেলার কারণে তার পবিত্রতা নষ্ট হবে না। কেননা শরঈ দীললে ভিত্তিতে সে পবিত্রতা অর্জন করেছে, সুতরাং পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে এ কথা বলার জন্য শরঈ দলীল দরকার। আর পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে ফেললে ওযূ বা পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে এ কথার পক্ষে কোন দীলল নেই।

পট্টির উপর মাসেহ করার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সবগুলোই ভেজালপূর্ণ। সবগুলোই যঈফ বা দুর্বল। একদল বিদ্বান বলেন, তবে সবগুলো হাদীসের সমন্বয়ে তা দলীল হিসেবে যোগ্য হতে পারে।

www.pathagar.com

আরেক দল বিদ্বান বলেন, হাদীসগুলো যঈফ হওয়ার কারণে তার উপর ভিত্তি করা চলবে না। এদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, যেহেতু মাসেহ করার দলীল নেই তাই পট্টি বা ব্যান্ডেজ বাঁধা স্থানের পবিত্রতা রহিত হয়ে যাবে। সেখানে কিছুই করতে হবে না। কেননা সে অপারগ। আবার কেউ বলেন, উক্ত স্থানে মাসেহ করবে না বরং তায়াম্মুম করবে।

কিন্তু হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে শরঈ মূলনীতির ভিত্তিতে দেখা যায় নিকটতম মত হচ্ছে মাসেহ করা। মাসেহ করলে তায়াম্মুমের কোন দরকার নেই। এ অবস্থায় আমরা বলব ঃ ওযূ গোসলের কোন অঙ্গে যদি যখম বা ফোঁড়া বা এ রকম কিছু থাকে, তবে তা কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ঃ

প্রথম স্তর ঃ যখম বা ফোঁড়ার স্থানটি উন্মুক্ত। ধৌত করলে কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং তা ধৌত করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় স্তর ঃ স্থানটি উন্মুক্ত কিন্তু ধৌত করলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তখন সেখানে মাসেহ করা ওয়াজিব।

তৃতীয় স্তর ঃ স্থানটি উন্মুক্ত কিন্তু ধৌত বা মাসেহ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তখন সেখানে তায়াম্মুম করা ওয়াজিব।

চতুর্থ স্তর ঃ স্থানটি পট্টি বা ব্যান্ডেজ জাতীয় বস্তু দ্বারা ঢাকা আছে। তখন সেই বস্তুর উপর মাসেহ করবে। ধৌত বা তায়াম্মুম করার দরকার হবে না।

প্রশ্ন ঃ (১৪৭) পট্টি বা ব্যান্ডেজের উপর কি একই সাথে মাসেহ ও তায়াম্মুম করতে হবে?

উত্তর ঃ না, একই সাথে মাসেহ ও তায়াম্মুম করতে হবে না। কেননা একটি অঙ্গে পবিত্রতার দু'টি পদ্ধতি ব্যবহার করা শরঈ মূলনীতির পরিপন্থী। তাই আমরা বলব ঃ পট্টি সম্বলিত অঙ্গটির পবিত্রতা হয় মাসেহের মাধ্যমে অথবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে অর্জন করবে। কিন্তু দু'রকম পদ্ধতি ব্যবহার করার আবশ্যকতা শরীয়ত বহির্ভূত কাজ। আর একটি ক্ষেত্রে বান্দাকে দু'টি ইবাদাতের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ (১৪৮) ওযূ শেষে প্রথমে ডান পা ধৌত করে মোজা পরিধান করা তারপর বাম পা ধৌত করে মোজা পরিধান করার বিধান কি? এভাবে মোজা পরলে কি তার উপর মাসেহ করা যাবে?

উত্তর ঃ মাসআলাটি বিদ্বানদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। একদল বিদ্বান বলেন, পবিত্রতা পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার পর মোজা পরিধান করবে। অন্যদল বলেন, যদি প্রথমে ডান পা ধৌত করে তাতে মোজা পরিধান করে তারপর বাম

www.pathagar.com

পা ধৌত করে তাতে মোজা পরিধান করে, তবে তা জায়েয। কেননা ডান পা পবিত্র করার পরই তো তা মোজাতে প্রবেশ করিয়েছে। অনুরূপভাবে বাম পা। অতএব সে তো পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করেই মোজা দু'টি পরিধান করেছে। কিন্তু একটি হাদীস পাওয়া যায়, দারাকুতনী ও হাকিম তা বর্ণনা করেন। হাকিম তা সহীহ বলেন। নবী ﷺ বলেছেন, "যখন কেউ ওযূ সম্পাদন করে এবং মোজা পরিধান করে।" এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ــــو لاة এরও বিপরীত যে লোক বাম পা ধৌত করেনি সে তো ওযূ সম্পাদন করেনি। তাই প্রথম মতটিই অধিক উত্তম ও বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ (১৪৯) মুক্বীম অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করে সফর আরম্ভ করলে কি সফরের সময়সীমা অনুযায়ী আমল করতে হবে?

উত্তর ঃ মুক্বীম অবস্থায় কোন লোক যদি মোজার উপর মাসেহ করে এরপর সফর করে, তবে সে সফরের সময়সীমা অনুযায়ী আমল করবে, এটাই বিশুদ্ধ মত। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ উল্লেখ করেছেন মুক্বীম অবস্থায় মাসেহ করে সফর করলে মুক্বীমের সময় সীমা অনুসরণ করবে। কিন্তু প্রথম কথাটিই বিশুদ্ধ। কেননা সফর করার পূর্বে এ লোকের মাসেহ করার সময়সীমা তো অবশিষ্ট রয়েছে, তারপর সে সফর করেছে। অতএব সে মুসাফিরের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তিনিদিন তিনরাত মাসেহ করবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) দ্বিতীয় মত পোষণ করে পরবর্তীতে প্রথম মত পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ (১৫০) প্রথমবার কখন মাসেহ করেছে– এ ব্যাপারে কোন মানুষ যদি সন্দেহে পড়ে, তবে সে কি করবে?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করবে। যদি সন্দেহ করে যে, যোহরের সময় মাসেহ করেছে না আসরের সময়। তখন সে আসরের সময়টাকে প্রথম মাসেহ গণ্য করবে। কেননা মূল হচ্ছে মাসেহ না করা। এ মূলনীতির দলীল হচ্ছে, কোন বস্তু যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতে থাকাটাই তার দাবী। তার বিপরীত না হওয়াটাই মূল। যখন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল, সলাত অবস্থায় তার যেন কিছু বের হয়ে যাচ্ছে। সে কি করবে? তিনি বললেন, "সলাত ছাড়বে না যে পর্যন্ত আওয়াজ না শুনবে বা দুর্গন্ধ না পাবে।"[১]

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ওযূ, অনুচ্ছেদ ঃ নিশ্চিত না হলে সন্দেহের কারণে ওযূ করবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা অর্জন করার পর যদি সন্দেহ হয় তবে উক্ত পবিত্রতা দ্বারা সলাত আদায় করার দলীল, হাঃ ৩৬১।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১৫১) কোন মানুষ যদি পায়ের লম্বা জুতায় (যা পায়ের টাখনু ঢেকে পরা হয়) মাসেহ করার পর তা খুলে ফেলে এবং মোজার উপর মাসেহ করে, তবে তার মাসেহ বিশুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ বিদ্বানদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, কেউ যদি পরিহিত দু'টি মোজার কোন একটিতে মাসেহ করে তবে সেটারই মাসেহ হবে দ্বিতীয়টির মাসেহ হবে না। কেউ কেউ বলেন, যদি নীচের মোজায় মাসেহ করা হয়, তবে সময়সীমা বাকী থাকলে দ্বিতীয়টিতে মাসেহ করা জায়েয হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। অর্থাৎ- কেউ ওযূ করে মোজার উপর মাসেহ করল, এরপর দ্বিতীয় আরেকটি মোজা বা জুতা পরিধান করল, অতঃপর উপরেরটির উপর মাসেহ করল, তবে প্রাধান্যযোগ্য মতানুযায়ী সময়সীমা বাকী থাকলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রথমটির উপর মাসেহ করার পর থেকে সময়সীমা হিসাব করতে হবে, দ্বিতীয়টির উপর মাসেহের সময় থেকে নয়।

প্রশ্ন ঃ (১৫২) কোন মানুষ যদি মোজা খুলে ফেলে তারপর ওযূ বিনষ্ট হওয়ার আগেই তা আবার পরিধান করে নেয়, তবে তার উপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর ঃ মোজা খোলার পর ওযূ থাকাবস্থায় আবার তা পরিধান করার দু'টি অবস্থা ঃ

প্রথম অবস্থা ঃ হয়তো এটা তার প্রথম ওযূ হবে। অর্থাৎ- প্রথমবার ওযূ করার পর মোজা পরিধান করেছে কিন্তু সেই ওযূ ভঙ্গ হয়নি, তাহলে তো কোন অসুবিধা নেই। মোজা খুলে আবার পরিধান করলে তাতে প্রয়োজনের সময় মাসেহ করতে পারবে।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ মোজার উপর একবার মাসেহ করার পর তা খুলে ফেলেছে, তবে তা পুনরায় পরিধান করলে তাতে আবার মাসেহ করা জায়েয হবে না। কেননা মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত হচ্ছে পানি দ্বারা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করার পর তা পরিধান করা। কিন্তু এ লোক তো মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেছে। বিদ্বানদের কথা থেকে এটাই জানা যায়।

কিন্তু কেউ যদি বলে যে, পবিত্র থাকাবস্থায় যদি পুনরায় মোজা পরিধান করে- যদিও মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে- তবে তো সময়সীমা থাকলে মাসেহ করতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। এটা শক্তিশালী কথা। কিন্তু আমি জানি না, কেউ এ রকম মত প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের কথা কে বলেছেন, এ রকম কারো নাম না জানার কারণে আমি এ মত পোষণ করতে চাই না। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ যদি বলে থাকেন, তবে আমার মতে সেটাই বিশুদ্ধ। কেননা মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন তো পরিপূর্ণ। এখানে কোন

www.pathagar.com

ত্রুটি নেই। সুতরাং ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে যদি মাসেহ করা যায়, তবে মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেও তো তাতে মাসেহ জায়েয হওয়া উচিত। কিন্তু এ রকম মত প্রকাশের পক্ষে আমি কোন আলিমে দ্বীনকে পাইনি। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

মাসেহের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর তাতে মাসেহ্ করা

প্রশ্ন ঃ (১৫৩) মাসেহ্ বৈধ হওয়ার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ যদি তাতে মাসেহ্ করে সলাত আদায় করে, তবে তার সলাতের বিধান কি?

উত্তর ঃ মাসেহ বৈধ হওয়ার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর যদি ওযূ ভঙ্গ হয় এবং তাতে মাসেহ করে সলাত আদায় করে, তবে পুনরায় পা ধৌতসহ ওযূ করতে হবে এবং পুনরায় উক্ত সলাত আদায় করতে হবে। কেননা সে পা ধৌত করেনি, ফলে অপূর্ণ ওযূ দ্বারা সলাত আদায় করেছে। কিন্তু যদি মাসেহ করার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর সে পবিত্র অবস্থাতেই থাকে ওযূ ভঙ্গ না হয় এবং সলাত আদায় করে, তবে তার সলাত বিশুদ্ধ। কেননা মাসেহ করার সময়সীমা শেষ হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। যদিও কতিপয় বিদ্বান বলেন, সময়সীমা শেষ হলেই ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা বিনা দীললের কথা।

অতএব মাসেহের নির্দিষ্ট সীমা শেষ হওয়ার পর কেউ যদি পবিত্র অবস্থাতেই থাকে- যদিও পূর্ণ একদিন, তবে সে সলাত পড়ে যাবে। কেননা শরঈ দীলেলের ভিত্তিতে তার পবিত্রতা বা ওযূ প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তার ওযূ ভঙ্গ হয়েছে দীলল ছাড়া এ কথা বলা যাবে না। আর মাসেহের সময়সীমা শেষ হলেই ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে এমন কথা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (১৫৪) ওযূ বিনষ্টের কারণগুলো কী কী?

উত্তর ঃ ওযূ বিনষ্টের কারণগুলো কী কী সে সম্পর্কে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ওযূ বিনষ্টের কারণ হিসেবে দলীলের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত হবে আমরা সেটাই এখানে আলোচনা করব ঃ

ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হওয়া। চাই তা পেশাব, পায়খানা, বীর্য, বায়ু বা মযী[১] বা অন্য কিছু হোক বের হলেই তা ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু

---

[১]. উত্তেজনার কারণে লিঙ্গের আগায় আঠালো জাতীয় যে তরল পদার্থ বের হয়, তাকে আরবীতে মযী বলে।

www.pathagar.com

বীর্য যদি উত্তেজনার সাথে বের হয়, তবে সকলের জানা যে, তখন গোসল ওয়াজিব হবে। কিন্তু মযী বের হলে অণ্ডকোষসহ পুরুষাঙ্গ ধৌত করে শুধু ওযূ করলেই চলবে।

দ্বিতীয়তঃ নিদ্রা যদি এমন অধিক পরিমাণে হয়, যাতে ওযূ ভঙ্গ হয়েছে কিনা অনুভূতি থাকে না, তবে তা ওযূ ভঙ্গের কারণ। কিন্তু নিদ্রা অল্প পরিমাণে হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কেননা এ অবস্থায় ওযূ ভঙ্গ হলে সাধারণতঃ অনুভব করা যায়। চাই চিৎ হয়ে শুয়ে নিদ্রা যাক বা হেলান ছাড়া বসে বা হেলান দিয়ে বসে নিদ্রা যাক। মোট কথা অন্তরের অনুভূতি উপস্থিত থাকা। কিন্তু যদি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাতে কোন কিছু বুঝতে পারে না, তবে ওযূ করা ওয়াজিব। কারণ হচ্ছে, নিদ্রা মূলতঃ ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়; বরং এ সময় ওযূ ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। অতএব অনুভূতি থাকাবস্থায় যেহেতু ওযূ ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই নিদ্রা এলেই ওযূ ভঙ্গ হবে না। নিদ্রা যে মূলতঃ ওযূ ভঙ্গের কারণ নয় তার দলীল হচ্ছে, অল্প নিদ্রাতে ওযূ ভঙ্গ হয় না। নিদ্রা গেলেই যদি ওযূ ভঙ্গ হত, তবে নিদ্রা অল্প হোক বেশী হোক ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কথা। যেমনটি প্রস্রাব অল্প হোক বেশী হোক ওযূ ভঙ্গ হবে।

তৃতীয়তঃ উটের গোশত ভক্ষণ করা। উটের গোশত রান্না করে হোক, কাঁচা হোক খেলেই ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি ছাগলের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন, যদি চাও তো করতে পার। বলা হল, আমরা উটের গোশত খেয়ে কি ওযূ করব? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"।[১] নবী ﷺ যখন কিনা ছগালের গোশত খেয়ে ওযূ করার বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন রেখেছেন, তখন বুঝা যায় উটের গোশত খেয়ে ওযূর ব্যাপারে মানুষের কোন ইচ্ছা স্বাধীনতা নেই। অবশ্যই ওযূ করতে হবে। অতএব উটের গোশত কাঁচা হোক বা পাকানো হোক কোন পার্থক্য নেই, গোশত লাল বর্ণ হোক বা অন্য বর্ণ খেলেই ওযূ ভঙ্গ হবে। উটের নাড়ী-ভুঁড়ি, কলিজা, হৃদপিণ্ড, চর্বি– মোটকথা উটের যে কোন অংশ ভক্ষণ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে। কেননা রাসূল ﷺ এ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি জানতেন মানুষ উটের সব অংশ থেকেই খেয়ে থাকে। উটের কোন অংশ থেকে অপর অংশের বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে নবী ﷺ তা অবশ্যই বর্ণনা করে দিতেন। যাতে

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ উটের গোশত খেয়ে ওযূ করা।

www.pathagar.com

করে মানুষ ধর্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। তাছাড়া ইসলামী শরীয়তে আমরা এমন কোন প্রাণীর বিধান সম্পর্কে অবগত নই যে, তার মধ্যে বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা আলাদ কোন বিধান আছে। কেননা প্রাণীকুল কোনটা হয় হালাল আবার কোনটা হয় হারাম। কোন্‌টা খেলে ওযূ আবশ্যক হবে কোন্‌টা খেলে ওযূ আবশ্যক হবে না। কিন্তু একটি প্রাণীর মধ্যে এক অংশের এ বিধান আর অন্য অংশের এ বিধান– এ রকম পার্থক্য ইসলামী শরীয়তে নেই। যদিও ইয়াহূদীদের শরীয়তে এ রকম পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾

"ইয়াহূদীদের জন্য প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে, (তা বৈধ ছিল)।" (সূরা আন'আম ঃ ১৪৬)

এজন্য বিদ্বানগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, শুকরের মাংস যেমন হারাম তেমনি শুকরের চর্বিও হারাম। অথচ আল্লাহ তা'আলা শুকরের ব্যাপারে তার মাংস হারাম হওয়ার কথাই শুধু উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং গাইরুল্লাহর জন্যে যবেহকৃত প্রাণী।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

আমি জানি না শুকরের চর্বি হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোন মতভেদ আছে। তাই উটের গোশত খেলে ওযূ ভঙ্গ হবে সেই সাথে উটের চর্বি, নাড়ী-ভুঁড়ি প্রভৃতি খেলেও ওযূ ভঙ্গ হবে।

প্রশ্ন ঃ (১৫৫) স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কখনোই ওযূ ভঙ্গ হবে না। এ কথার দলীল হচ্ছে, নবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তিনি স্ত্রীকে চুম্বন করে সলাত পড়তে বের হয়েছেন কিন্তু ওযূ করেননি। কেননা আসল হচ্ছে দলীল না থাকলে ওযূ ভঙ্গ না হওয়া। কেননা শরঈ দলীলের ভিত্তিতে তার ওযূ প্রমাণিত হয়েছে। আর যা শরঈ দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা শরঈ দলীল ছাড়া নষ্ট হবে না।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তো বলেছেন, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ "অথবা যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ কর।"

উত্তরে বলা হবে ঃ আয়াতে স্ত্রীদের স্পর্শ করার অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আয়াতের মধ্যে তাহারাত বা পবিত্রতাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ প্রকৃতরূপ ও বদলীরূপ এবং পবিত্রতাকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ ছোট পবিত্রতা ও বড় পবিত্রতা। অনুরূপভাবে ছোট পবিত্রতার কারণ ও বড় পবিত্রতার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সলাতের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এখানে পানি দ্বারা প্রকৃত ছোট পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" এখানে পানি দ্বারা প্রকৃত বড় পবিত্রতা অর্জনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ আবার বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

"তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে অথবা তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ কর, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা তায়াম্মুম কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এখানে (তায়াম্মুম কর) কথাটি পানি দ্বারা প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন করার বদলীরূপ (পরিবর্তিত পদ্ধতি) আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 'তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে' এ কথা দ্বারা অপবিত্রতার ছোট একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা অপবিত্রতার বড় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এখন যদি 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা সাধারণভাবে হাত দ্বারা স্পর্শ করার অর্থ করা হয়, তবে তো আল্লাহ এ আয়াতে অপবিত্রতার দু'টিই ছোট কারণ উল্লেখ করলেন এবং বড় কারণ উল্লেখ করা ছেড়ে দিলেন। অথচ তিনি এর আগে বলেছেন, "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা

www.pathagar.com

অর্জন কর।" এটা কুরআনের বালাগাতের বা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের পরিপন্থী। তাই আয়াতে 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা। তাহলেই তো আয়াতে দু'টি তাহারাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। বড় কারণ এবং ছোট কারণ। ছোট পবিত্রতা হচ্ছে, শরীরের চারটি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। আর বড় পবিত্রতা সমস্ত শরীরের সাথে সম্পর্কিত। আর বদলী পবিত্রতা তায়াম্মুম শুধুমাত্র দু'টি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত চাই তা বড় পবিত্রতার ক্ষেত্রে হোক বা ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে।

এই ভিত্তিতে আমরা বলব, স্ত্রীকে স্পর্শ করা কখনই ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। চাই স্পর্শ উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনার সাথে না হোক। তবে স্পর্শ করার কারণে যদি কোন কিছু নির্গত হয় তবে তার বিধান ভিন্ন। যদি বীর্য বের হয়, তবে গোসল করা ফরয আর মযী নির্গত হলে অণ্ডকোষসহ লিঙ্গ ধৌত করে ওযূ করা আবশ্যক।[১]

পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা

প্রশ্ন ঃ (১৫৬) জনৈক শিক্ষক ছাত্রদের কুরআনের দারস্ প্রদান করেন। মাদ্রাসায় বা তার আশেপাশে পানি নেই। এখন তিনি কি করবেন? কেননা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া তো কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না?

উত্তর ঃ মাদ্রাসায় বা তার আশেপাশে যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে শিক্ষক ছাত্রদের সতর্ক করবেন, তারা যেন পবিত্র না হয়ে কুরআন বহন বা স্পর্শ না করে। কেননা 'আম্র বিন হায্ম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ তাকে লিখেছেন, أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُـرْآنَ إِلاَّ طَـاهِرٌ "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।"[২] এখানে পবিত্রতা বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ওযূ বা গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে অর্জিত পবিত্রতা। যেমনটি আল্লাহ ওযূর আয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ

﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

---

[১]. বিষয়টির সমাধান নবী ﷺ-এর কর্ম থেকে সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় ঃ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর সলাত পড়তেন কিন্তু ওযূ করতেন না।" (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্, আহমাদ)

[২]. দারিমী, অধ্যায় ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, হাঃ ২১৬৬। মুওয়াত্বা মালিক অধ্যায় ঃ সলাতের জন্য আহবান হাঃ ৪১৯।

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে কোন অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তাঁর নি'য়ামতসমূহ পূর্ণরূপে দান করতে চান, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এখানে 'তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান' কথা দ্বারা বুঝা যায়, পবিত্রতা অর্জন না করলে পবিত্র হওয়া যাবে না। তাই ওযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন না করে কারো জন্য কুরআন স্পর্শ করা সমিচীন নয়। তবে কোন কোন বিদ্বান ছোটদের জন্য বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা কুরআন হাতে নেয়া তাদের জন্য খুবই দরকার। অথচ তারা ওযূর গুরুত্ব বোঝে না। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, ছাত্রদেরকে ওযূর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যাতে তারা পবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে।

প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন, 'পবিত্র ছাড়া তো কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না' সম্ভতঃ এ কথা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, কুরআন স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। কিন্তু এক্ষেত্রে বর্ণিত আয়াতে এ দলীল পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "পবিত্রগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না।" (সূরা ওয়াক্বি'আ ঃ ৭৯)

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিতাবুল মাকনূন বা লুকায়িত গ্রন্থ অর্থাৎ লওহে মাহফূয। আর 'পবিত্রগণ' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেরেশতাগণ। এখানে ওযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য হলে এরূপ বলা হত, 'পবিত্রতা অর্জনকারীগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না'। এখানে এ কথাও বলা হয়নি যে, পবিত্রতা অর্জন না করলে তা স্পর্শ করা জায়েয নয়। কিন্তু পূর্বে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তাই ওযূর নির্দেশ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন ঃ (১৫৭) কি কি কারণে গোসল ফরয হয়?

উত্তর ঃ গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। কিন্তু নিদ্রা অবস্থায় উত্তেজনার অনুভব না হলেও গোসল করা ফরয। কেননা নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে মানুষ অনেক সময় তা বুঝতে পারে না।

২) স্ত্রী সহবাস। সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের সর্বনিম্ন আগাটুকু প্রবেশ করালেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। কেননা প্রথমটির ব্যাপারে নবী ﷺ বলেন, "পানি নির্গত হলেই পানি ঢালতে হবে।"[1] অর্থাৎ বীর্যের পানি নির্গত হলেই গোসল করতে হবে।

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ পানি নির্গত হলেই পানি ঢালা, হাঃ ৩৪৩।

www.pathagar.com

আর দ্বিতীয় কারণের ব্যাপারে নবী ﷺ বলেন,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.

"স্ত্রীর চার শাখার (দু'হাত দু'পায়ের) মাঝে বসে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেই গোসল ফরয হবে।"[১]

যদিও বীর্যপাত না হয়। এ বিষয়টি অনেক মানুষের জানা নেই। অনেক লোক স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না করলে অজ্ঞতাবশতঃ সপ্তাহ মাস কাটিয়ে দেয় গোসল করে না। এটি মারাত্মক ধরনের ভুল। এজন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়তের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয।

অতএব উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে স্ত্রী সহবাস করে বীর্যপাত না হলেও গোসল করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর ফরয।

৩) নারীদের ঋতু বা নিফাস (সন্তান প্রসোবত্তোর স্রাব) হওয়া। ঋতুবতী নারীর স্রাব বন্ধ হলে, গোসলের মাধ্যমে তাকে পবিত্র হতে হবে। এ গোসলও ফরয গোসলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿يسألونَكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَآءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

অর্থাৎ "তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (মাসিক স্রাব) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে। যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

তাছাড়া নবী ﷺ ইস্তিহাযা বিশিষ্ট নারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, ঋতুর নির্দিষ্ট দিনসমূহ সে বিরত থাকবে তারপর গোসল করবে। নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান। তার উপরও গোসল করা ফরয।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ গোসল, অনুচ্ছেদ ঃ উভয় লিঙ্গ মিলিত হলে করণীয়, হাঃ ২৯১। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ পানি ঢালার সম্পর্ক পানি নির্গত হওয়ার সাথে, হাঃ ৩৪৮।

www.pathagar.com

হায়েয ও নিফাস থেকে গোসল করার পদ্ধতি নাপাকী থেকে গোসল করার পদ্ধতির অনুরূপ। তবে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ ঋতুবতীর গোসলের সময় বরই পাতা ব্যবহার করা মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা এতে অধিক পরিষ্কার ও পবিত্র হওয়া যায়। বরই পাতার বদলে সাবান ব্যবহার করলেও উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ফরয বলে উল্লেখ করেছেন। দলীল হচ্ছে, নবী ﷺ-এর কন্যা যয়নবকে যারা গোসল দিচ্ছিলেন, তিনি তাদেরকে বললেন,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ.

"যায়নাবকে তিনবার গোসল করাও, অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার অথবা এর চাইতে অধিকবার- যদি তোমরা তা মনে কর।"[১] তাছাড়া বিদায় হাজ্জে আরাফা দিবসে জনৈক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বাহণ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে নবী ﷺ বলেন,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ.

"তোমরা তাকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং পরিহিত দু'টি কাপড়েই কাফন পরাও।"[২]

বিদ্বানগণ বলেন, মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরয। কিন্তু এটা জীবিতের সাথে সম্পর্কিত। কেননা মৃত্যুবরণ করার কারণে উক্ত ব্যক্তির উপর শরীয়তের বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে গেছে। তাই জীবিতদের উপর ফরয হচ্ছে তাকে গোসল করিয়ে দাফন করা। কেননা নবী ﷺ সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ (১৫৮) স্ত্রীকে স্পর্শ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করলে কি গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ সাধারণ স্পর্শ, শৃঙ্গার, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আনন্দ বিনোদন করলে তাদের উপর গোসল ফরয হবে না। তবে যদি উভয়ের থেকে বীর্যস্খলিত হয়, তবে উভয়ের উপর গোসল করা ফরয হবে।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দেয়া ও ওযূ করানো। হাঃ ১২৫৩। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে গোসল দেয়া, হাঃ ৯৩৯।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামকারী মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন পরাতে হয়, হাঃ ১২৬৭। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামকারী মৃত্যুবরণ করলে কি করতে হবে। হাঃ ১২০৬।

www.pathagar.com

একজনের থেকে বীর্যস্খলিত হলে শুধু তার উপর গোসল ফরয হবে। এবিধান হচ্ছে সাধারণ শৃঙ্গার, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি তারা সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে নারী-পুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে- যদিও তাদের কারোই বীর্যস্খলিত না হয়। কেননা আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"স্ত্রীর চার শাখার (দু'হাত, দা'পা) মাঝে বসে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেই গোসল ফরয হবে।"[১]

মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "যদিও বীর্যপাত না হয়।" এ বিষয়টি অনেক লোকের অজানা। তাদের ধারণা নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে বীর্যপাত না হলে তাদের উপর গোসল ফরয নয়। কিন্তু এটা বিরাট ধরনের অজ্ঞতা। অতএব সহবাস হলেই সর্বাবস্থায় গোসল ফরয হবে। কিন্তু সহবাস না করে যে কোন প্রকারে আনন্দ-ফুর্তি করলে গোসল ফরয হবে না।

প্রশ্ন ঃ (১৫৯) নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে কি করবে?

উত্তর ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা পেলে তিনটি অবস্থা হতে পারে ঃ

প্রথম অবস্থা ঃ নিশ্চিত হবে যে, এই ভিজা বীর্যপাতের কারণে হয়েছে। তখন স্বপ্ন স্মরণ থাক বা ভুলে যাক গোসল করা ফরয।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ নিশ্চিত হবে এটা বীর্য নয়। তখন গোসল করা ফরয নয়। কিন্তু ঐ ভিজা স্থান ধৌত করা ওয়াজিব। কেননা তখন তা প্রস্রাবের বিধানের মধ্যে শামিল হবে।

তৃতীয় অবস্থা ঃ ভিজাটা কি বীর্যের কারণে না অন্য কারণে বিষয়টি অজানা। তখন ব্যাখার দাবী রাখে ঃ

প্রথমতঃ যদি স্মরণ থাকে যে, স্বপ্নে কিছু দেখেছে, তাহলে উক্ত ভিজা বীর্য ধরে নিয়ে গোসল করবে। কেননা উম্মু সালামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, পুরুষ যা স্বপ্নে দেখে থাকে নারী যদি তা দেখে, তবে তাকেও কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ যদি সে পানি

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ গোসল, অনুচ্ছেদ ঃ উভয় লিঙ্গ মিলিত হলে করণীয়, হাঃ ২৯১। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ পানি প্রবাহিত করার সম্পর্ক পানি নির্গত হওয়ার সাথে, হাঃ ৩৪৮।

www.pathagar.com

দেখে।"[১] এ থেকে বুঝা যায়, স্বপ্নে কিছু দেখে যদি পানির ভিজা পাওয়া যায়, তবে গোসল করা ফরয।

দ্বিতীয়তঃ স্বপ্নে কিছুই দেখেনি। যদি নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সহবাসের চিন্তা মনে এসে থাকে, তবে উক্ত ভিজাকে মযীর ভিজা মনে করবে।

কিন্তু ঘুমানোর পূর্বে সহবাসের কোন চিন্তা মাথায় না আসলে কি করতে হবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে ঃ

কেউ বলেছেন, সতর্কতাবশতঃ গোসল করা ওয়াজিব।

কেউ বলেছেন, ওয়াজিব নয়। এটাই বিশুদ্ধ কথা। কেননা আসল হচ্ছে যিম্মামুক্ত থাকা।

প্রশ্ন ঃ (১৬০) নাপাক অবস্থায় কি কি বিধান প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ নাপাক অবস্থায় প্রযোজ্য বিধানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ঃ নাপাক ব্যক্তির জন্য সলাত আদায় করা হারাম। ফরয, নফল, জানাযা সব ধরনের সলাত। কেননা আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও। তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

দ্বিতীয় ঃ নাপাক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা হারাম। কেননা কা'বা ঘরের তাওয়াফ করলে মাসজিদে অবস্থান করতে হয়। আর তাওয়াফকে সলাত বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সলাতের নিকটে যেয়ো না, যে পর্যন্ত তোমরা কি বলছ তা বুঝতে না পার এবং নাপাক অবস্থাতেও না, যতক্ষণ তোমরা গোসল না কর। তবে মাসজিদে (অবস্থান না করে তার) ভিতর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে চাইলে ভিন্ন কথা।" (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

তাছাড়া বিদায় হাজ্জে আয়েশা (রাঃ) ঋতুবতী হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাকে বলেছিলেন,

افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা, হাঃ ৩১১।

www.pathagar.com

"হাজ্জ পালনকারীগণ যা করে তুমিও তাই করে যাও, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করো না।"[১]

তৃতীয় ঃ কুরআন স্পর্শ করা হারাম। কেননা নবী ﷺ বলেন, أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।"[২]

চতুর্থ ঃ গোসল না করে মাসজিদে অবস্থান করা হারাম। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সলাতের নিকটে যেয়ো না, যে পর্যন্ত তোমরা কি বলছ তা বুঝতে না পার। এবং নাপাক অবস্থাতেও না, যতক্ষণ তোমরা গোসল না কর। তবে মাসজিদে (অবস্থান না করে তার) ভিতর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে চাইলে ভিন্ন কথা।" (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

পঞ্চম ঃ গোসল না করে কুরআন পাঠ করা হারাম। কেননা আলী (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

নবী ﷺ জুনবী (গোসল ফরযকারী) অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায় আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন।[৩]

নাপাক ব্যক্তির জন্য এই পাঁচটি বিধান প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ (১৬১) গোসল করার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ গোসল করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে ঃ

প্রথম পদ্ধতি ঃ ওয়াজিব পদ্ধতি। আর তা হচ্ছে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। অবশ্য কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া এর অন্তর্গত। অতএব যে কোন প্রকারে সমস্ত শরীরে পানি ঢালতে পারলে বড় নাপাকী দূর হয়ে যাবে এবং পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও। তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী তওয়াফ ছাড়া হাজ্জের যাবতীয় কাজ করবে।

২. দারেমী, অধ্যায় ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ নং৩ হাঃ ২১৬৬। মুওয়াত্বা মালিক অধ্যায় ঃ সলাতের জন্য আহবান হাঃ ৪১৯।

৩. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্র না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন পাঠ করা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ পরিপূর্ণ পদ্ধতি। নবী ﷺ যেভাবে গোসল করেছেন ঠিক সেভাবে গোসল করা। নাপাকী থেকে গোসল করতে চাইলে প্রথমে হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে, তারপর নাপাকী সংশ্লিষ্ট স্থান এবং লজ্জাস্থান ধৌত করে নিবে। এরপর পরিপূর্ণরূপে সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী ওযূ করে নিবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢেলে তা ভালভাবে ভিজিয়ে নিবে। সবশেষে সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে। এটাই গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি।

প্রশ্ন ঃ (১৬২) গোসলের সময় কুলি না করলে বা নাক না ঝাড়লে গোসল বিশুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ কুলি না করলে এবং নাকে পানি দিয়ে নাক না ঝাড়লে গোসল বিশুদ্ধ হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا। "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর"- (সূরা মায়িদা ঃ ৬) অর্থাৎ সমস্ত শরীর। আর মুখের ভিতর ও নাকের ভিতরের অংশ শরীরের অন্তর্গত যা পবিত্র করা ওয়াজিব। এ কারণে নবী ﷺ ওযূতে কুলি করতে ও নাক ঝাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তা আল্লাহর এ নির্দেশের অন্তর্গত ঃ "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর"- (সূরা মায়িদা ঃ ৬)। অতএব যখন কিনা ঐ দু'টি স্থান মুখমণ্ডলের মধ্যে শামিল আর মুখমণ্ডল ধৌত করা ওয়াজিব বড় পবিত্রতায়, তখন নাপাকীর গোসলে কুলি করা ও নাক ঝাড়াও ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ (১৬৩) পানি ব্যবহার করতে অপারগ হলে, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে?

উত্তর ঃ পানি না থাকার কারণে বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকার কারণে পানি ব্যবহার করতে অপারগ হলে, তায়াম্মুম করবে। এর পদ্ধতি হচ্ছে, পবিত্র মাটিতে দু'হাত মারবে, অতঃপর তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করবে এবং উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এ নিয়ম ছোট-বড় অপ্রকাশ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত।

কিন্তু নাপাকী যদি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ হয়, তবে সেখানে তায়াম্মুম নেই। চাই তা শরীরে হোক বা কাপড়ে বা মাটিতে। কেননা প্রকাশ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত মূল বস্তুটির অপসারণ করা। এখানে ইবাদাতের শর্ত নেই। এ কারণে মানুষের অনিচ্ছায় যদি মূল নাপাক বস্তুটি যে কোন প্রকারে বিদূরিত হয়ে যায়, তবে স্থানটি পবিত্র হয়ে গেল। যেমন কোন নাপাক স্থানে বা কাপড়ে যদি বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টির পানির সাথে উক্ত নাপাকী চলে যায়, তবে স্থানটি পবিত্র হয়ে গেল যদিও এ সম্পর্কে মানুষের জানা না থাকে। কিন্তু অপ্রকাশ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি এর বিপরীত।

www.pathagar.com

কেননা তা একটি ইবাদাত। তাই অবশ্যই এখানে মানুষকে নিয়ত বা দৃঢ় সংকল্প করে তা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (১৬৪) ঠান্ডার সময় কেউ যদি নাপাক হয়, তবে কি সে তায়াম্মুম করবে?

উত্তর ঃ কোন মানুষ নাপাক হলেই গোসল করা তার জন্য ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর"– (সূরা মায়িদা ঃ ৬)। কিন্তু রাতে যদি শীত প্রচণ্ড হয় এবং ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতে সক্ষম না হয়, তবে সম্ভব হলে পানি গরম করে নিবে। কিন্তু পানি গরম করার ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম করবে এবং সলাত আদায় করবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে অথবা স্ত্রীদের স্পর্শ করে, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। স্বীয় হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তাঁর নি'য়ামতসমূহ পূর্ণরূপে দান করতে চান, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করতে পার।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

নাপাকী থেকে তায়াম্মুম করার পর পানি না পাওয়া পর্যন্ত সে পবিত্রই থাকবে। পানি পেয়ে গেলে গোসল করা ওয়াজিব। কেননা সহীহুল বুখারীতে ইমরান বিন হুসাইন কর্তৃক দীর্ঘ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে। নবী ﷺ একদা জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন মানুষের সাথে সলাত আদায় না করে আলাদা বসে আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কেন সলাত পড়লে না?" সে বলল, আমি নাপাক হয়ে গেছি কিন্তু পানি নেই। তখন নবী ﷺ বললেন, "তুমি মাটি ব্যবহার কর, তাই তোমার জন্য যথেষ্ট।" এরপর পানি এল তখন নবী ﷺ তাকে পানি দিয়ে বললেন, তা তোমার শরীরে বইয়ে দাও।[১] এ থেকে বুঝা যায়, পানি

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ ঃ পানির বদলে পবিত্র মাটিই মুসলিম ব্যক্তির ওযূ, হাঃ ৩৪৪।

www.pathagar.com

পেলেই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা তায়াম্মুমকারীর জন্য ওয়াজিব। চাই ছোট নাপাকীর ক্ষেত্রে হোক বা বড় নাপাকীর ক্ষেত্রে।

তায়াম্মুমকারী বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করলে পুনরায় নাপাক না হওয়া পর্যন্ত বা পানি না পাওয়া পর্যন্ত পবিত্র অবস্থাতেই থাকতে পারবে। তাই প্রত্যেক সলাতের জন্য বারবার তায়াম্মুম করবে না। অবশ্য ছোট নাপাকী হলে তা থেকে পবিত্রতার জন্য তায়াম্মুম করবে।

প্রশ্ন ঃ (১৬৫) যে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা হয় তাতে কি ধূলা থাকা শর্ত? আল্লাহর বাণী "তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় তা দ্বারা মুছে ফেল।" এখানে "তা দ্বারা" বলতে কি বুঝা যায় তায়াম্মুম করার সময় অবশ্যই ধূলা থাকতে হবে?

উত্তর ঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে ধূলা লেগে থাকা শর্ত নয়। বরং মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলেই যথেষ্ট হবে, চাই তাতে ধূলা থাক বা না থাক। অতএব মাটির উপর যদি বৃষ্টি নাযিল হয়, আর ঐ মাটিতে মানুষ হাত মেরে মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে তবে যথেষ্ট হবে। যদিও মাটিতে কোন ধূলা না থাকে। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

"তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। স্বীয় হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল মাটি দ্বারা মুছে ফেল।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

তাছাড়া নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ কখনো এমন স্থানে সফর করতেন যেখানে বালু ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যেত না। কখনো বৃষ্টিপাত হত। তারপরও তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তায়াম্মুম করতেন। অতএব বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, যে কোন মাটি দ্বারা কেউ যদি তায়াম্মুম করে, তবে তা বিশুদ্ধ হবে। চাই সেখানে ধূলা থাক বা না থাক।

আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় তা দ্বারা মুছে ফেল।" এখানে منه শব্দে مِنْ অব্যয়টি দ্বারা 'কিছু সংখ্যক' বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং কোন কাজের শুরু বুঝানো হয়েছে। এজন্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ তায়াম্মুমের পদ্ধতি দেখাতে গিয়ে মাটিতে হাত মেরে তাতে ফুঁ দিয়েছেন।[১]

প্রশ্ন ঃ (১৬৬) মাটি না পেয়ে দেয়ালে বা বিছানায় তায়াম্মুম করলে বিশুদ্ধ হবে কি?

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমকারী কি দু'হাতে ফুঁক দিবে, হাঃ ৩৩৮।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ দেয়াল হচ্ছে পবিত্র মাটির অন্তর্ভুক্ত। দেয়াল যদি পাথর বা মাটির তৈরী ইট দ্বারা নির্মিত হয়, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। কিন্তু কাঠ বা পেইন্ট প্রভৃতি দ্বারা যদি দেয়ালকে ঢেকে দেয়া হয় আর এর উপর ধূলা জমে থাকে, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম করতে কোন অসুবিধা নেই। আর তা মাটিতে তায়াম্মুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা ধূলা মাটিরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উক্ত দেয়ালে যদি কোন ধূলা বা মাটি না থাকে, তবে সেখানে তায়াম্মুম করা যাবে না। কেননা সেখানে তো কোন মাটি নেই।

আর বিছানার ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, যদি তাতে ধূলা থাকে, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম চলবে অন্যথায় নয়। কেননা বিছানা মাটির অন্তর্গত নয়।

প্রশ্ন ঃ (১৬৭) ছোট্ট শিশুর প্রস্রাব যদি কাপড়ে লাগে, তবে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ এ মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, শিশু যদি পুরুষ হয় এবং শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ তার খাদ্য হয়, তবে তার প্রস্রাব হালকা নাপাক। এটাকে পবিত্র করার জন্য পানির ছিটা দেয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ হাতে পানি নিয়ে কাপড়ের উপর এমনভাবে ছিটিয়ে দিবে যাতে সম্পূর্ণ স্থানকে শামিল করে, ঘষতে হবে না এবং তাতে এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালতে হবে না যে, তা চিপে পানি বের করতে হয়। এর কারণ হচ্ছে নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। একদা একটি শিশু পুত্র নিয়ে এসে তাঁর কোলে রেখে দেয়া হল। সে প্রস্রাব করে দিলে, তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন, অতঃপর তার উপর ছিটা দিলেন কিন্তু তা ধৌত করলেন না।[১]

আর শিশু যদি কন্যা হয়, তবে তার প্রস্রাব অবশ্যই ধৌত করতে হবে। কেননা প্রস্রাব মূলতঃ অপবিত্র। তা ধৌত করা ওয়াজিব। কিন্তু শিশু পুত্রের প্রস্রাব এর ব্যতিক্রম। কেননা সুন্নাতে নববীতে এর প্রমাণ বিদ্যমান।[২]

পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম হওয়ার পর নারীর ঋতু স্রাবের বিধান

প্রশ্ন ঃ (১৬৮) জনৈক নারী পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করেছে। কিন্তু পরিচিত নিয়মেই তার স্রাব প্রবাহিত হচ্ছে। আরেক পঞ্চাশোর্ধ নারীর স্রাব

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ ওযূ, অনুচ্ছেদ ঃ শিশু পুত্রের পেশাব। হাঃ ২২৩। মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের বিধান ও তা ধোয়ার পদ্ধতি, হাঃ ২৮৬।

২. আবুস্ সামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ "শিশু মেয়ের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং শিশু ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।" (নাসায়ী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্)

www.pathagar.com

পরিচিত নিয়মে হয় না; বরং হলদে রং বা মেটে রঙ্গের পানি নির্গত হয়। এদের বিধান কি?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট ও প্রচলিত নিয়মে যে নারীর স্রাব নির্গত হচ্ছে, তার উক্ত স্রাব বিশুদ্ধ মতে হায়েয বা ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ঋতুবতী হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ কোন বয়স নেই। অতএব ঋতুর জন্য নির্দিষ্ট বিধানসমূহ এ নারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সলাত, সওম ও স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকা। স্রাব বন্ধ হলে ফরয গোসল করা এবং ছুটে যাওয়া সিয়ামের কাযা আদায় করা।

আর যে নারীর হলদে রং বা মেটে রঙ্গের পানি নির্গত হচ্ছে, যদি এটা ঋতুর নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে থাকে, তবে তা হায়েয বা ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। আর ঋতুর সময়ে না হলে তা হায়েয নয়। কিন্তু তার স্রাব যদি পরিচিত ঋতুস্রাবের মত হয় কিন্তু কখনো আগে হয় কখনো পরে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। যখন স্রাব আসবে তখন সলাত, সওম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে আর যখন স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে তখন গোসল করে পবিত্র হবে। এ সমস্ত কথা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ঋতুর জন্য বয়সের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই।

কিন্তু হাম্বলী মাযহাব মতে পঞ্চাশ বছর বয়সের উর্ধ্বে হলে আর ঋতু নেই। যদিও কৃষ্ণ বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। তখন সে সলাত, সওম (রক্ত বন্ধ হলে) গোসল প্রভৃতি যথানিয়মে চালিয়ে যাবে। কিন্তু এ মতটি বিশুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ঃ (১৬৯) গর্ভবতীর রক্তস্রাব দেখা গেলে তা কি ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর ঃ গর্ভবতীর হায়েয হয় না। যেমনটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেছেন। কেননা নারীর গর্ভ তো হায়েয বন্ধ হওয়ার মাধ্যমেই জানা যায়। বিদ্বানগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হিকমতে হায়েযের রক্তকে মাতৃগর্ভে ভ্রুণের খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকেন। গর্ভে সন্তান এসে গেলে ঐ হায়েয বাইরে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন নারীর গর্ভধারণের পরও সঠিক নিয়মে হায়েয হতে থাকে। যেমনটি গর্ভধারণের পূর্বে হচ্ছিল। তাদের এ স্রাব ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। কেননা গর্ভধারণ তার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলেনি। ফলে ঋতু আপন গতিতে চলমান রয়েছে। অতএব তার এ স্রাব ঋতুর সব ধরনের বিধানকে শামিল করবে। মোটকথা গর্ভবতী থেকে যে স্রাব নির্গত হয়, তা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম প্রকার ঃ গর্ভধারণের পূর্বে যে নিয়মে ঋতু চলছিল গর্ভের পরেও যদি সে নিয়মে স্রাব চলতে থাকে, তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। কেননা

www.pathagar.com

এখানে গর্ভধারণ তার স্বাভাবিক স্রাবের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে তা হায়েয বা ঋতু হিসেবেই গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ আকস্মিক কোন কারণবশতঃ স্রাব নির্গত হওয়া। কোন দুর্ঘটনাবশতঃ, ভারী কোন বস্তু বহন করা বা কোন স্থান থেকে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে রক্ত প্রবাহিত হওয়া। তখন এটা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এটা শিরা থেকে নির্গত। তাই সে সলাত, সওম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে না; পবিত্র অবস্থায় যা করতো তা সবই স্বাভাবিক নিয়মে করতে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ (১৭০) ঋতুর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট দিন বলে কি কিছু আছে?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ মতে ঋতুর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দিন নির্দিষ্ট বলে কিছু নেই। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿يَسأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَآءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ﴾

অর্থাৎ "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

এখানে স্ত্রী সহবাসের নিষিদ্ধতা নির্দিষ্ট দিনের সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। এর সম্পর্ক হচ্ছে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে।

এ থেকে বুঝা যায়, বিধানটির কারণ হচ্ছে ঋতু থাকা বা না থাকা। যখনই ঋতু পাওয়া যাবে বিধান প্রযোজ্য হবে। যখনই পবিত্র হয়ে যাবে তার বিধানসমূহও রহিত হবে।

তাছাড়া নির্দিষ্ট দিন বেঁধে দেয়ার কোন দলীলও নেই। অথচ বিষয়টি বর্ণনা করে দেয়ার দরকার ছিল। বয়স বা দিনের নির্দিষ্টতা যদি শরীয়ত সম্মত হত তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতে বর্ণিত হত।

অতএব এ ভিত্তিতে নারীদের কাছে পরিচিত স্রাব যখনই দেখা যাবে, নারী তখনই নিজেকে ঋতুবতী গণ্য করবে। এখানে কোন দিন নির্দিষ্ট করবে না। কিন্তু নারীর স্রাব যদি চলতেই থাকে বন্ধ না হয় অথবা সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ হয় যেমন মাসে একদিন বা দু'দিন তবে তা ইস্তিহাযার স্রাব (বা অসুস্থতা) বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (১৭১) ঔষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে ঋতুস্রাব চালু করে সলাত পরিত্যাগ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নিজের ইচ্ছায় ঋতুস্রাব চালু করার কারণে যদি স্রাব চালু হয়ে যায় এবং নারী সলাত পরিত্যাগ করে তবে উক্ত সলাতের কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা ঋতুস্রাব যখনই দেখা যাবে, তখনই তার বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে নারী যদি ঋতুস্রাব বন্ধ করার জন্য কোন ঔষধ গ্রহণ করে এবং তার ফলে স্রাব না আসে, তবে সলাত ও সওম আদায় করবে এবং সিয়ামের কাযা করবে না। কেননা সে তো ঋতুবতী নয়। অতএব কারণ পাওয়া গেলেই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন ঃ "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র"– (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)। অতএব যখনই এ অপবিত্রতা পাওয়া যাবে তার বিধান পাওয়া যাবে। যখন অপবিত্রতা থাকবে না কোন বিধি-বিধানও থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ (১৭২) ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ প্রয়োজন দেখা দিলে ঋতুবতী নারীর কুরআন পাঠ করা জায়েয। যেমন সে যদি শিক্ষিকা হয় তবে পাঠ দানের জন্য কুরআন পড়তে পারবে। অথবা ছাত্রী কুরআন শিক্ষা লাভ করার জন্য পাঠ করতে পারবে। অথবা নারী তার শিশু সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠ করবে, শিখানোর জন্য তাদের আগে আগে কুরআন পাঠ করবে। মোটকথা যখনই ঋতুবতী নারী কুরআন পাঠ করার প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই তার জন্য তা পাঠ করা জায়েয কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কুরআন পাঠ না করার কারণে যদি ভুলে যাওয়ার আশংকা করে, তবে স্মরণ করার জন্য তেলাওয়াত করবে কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বিনা প্রয়োজনেও তথা সাধারণ তেলাওয়াতের উদ্দেশে ঋতুবতী নারীর জন্য কুরআন পাঠ করা জায়েয। অবশ্য কোন কোন বিদ্বান বলেন, প্রয়োজন থাকলেও ঋতুবতী নারীর কুরআন পাঠ করা হারাম। এখানে তিনটি মত পাওয়া গেল।

কিন্তু আমার মতে যে কথা বলা উচিত তা হচ্ছে, ঋতুবতী নারী যদি কুরআন পাঠ দান বা শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে বা ভুলে যাওয়ার আশংকা করে, তবে কুরআন পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই।

হায়েযের রক্ত না ইস্তিহাযার রক্ত সন্দেহ হলে কি করবে?

প্রশ্ন ঃ (১৭৩) নির্গত স্রাবের ব্যাপারে নারী যদি সন্দিহান হয় যে, এটা কি হায়েযের রক্ত না কি ইস্তিহাযার রক্ত নাকি অন্য কিছুর রক্ত? এবং সে পার্থক্যও করতে পারে না। তবে সে তা কি গণ্য করবে?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আসল কথা হচ্ছে, নারীর গর্ভ থেকে নির্গত রক্ত হায়েযেরই হয়ে থাকে। কিন্তু যখন প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, এটা ইস্তিহাযার স্রাব তখন ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য করবে। অন্যথায় ইস্তিহাযা কিনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্গত রক্ত হায়েয বা ঋতু হিসেবেই গণ্য করবে।

প্রশ্ন ঃ (১৭৪) সলাতের সময় আরম্ভ হওয়ার পর ঋতু শুরু হলে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাতের সময় প্রবেশ করার পর যদি নারীর ঋতুস্রাব শুরু হয়, যেমন উদাহরণ স্বরূপ যোহরের সলাত শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টা পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হল, তবে পবিত্র হওয়ার পর এ ওয়াক্তের সলাত কাযা আদায় করবে। কেননা সে পবিত্র থাকাবস্থায় তার উপর সলাত আবশ্যক হয়েছিল।

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

"নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

আর ঋতু চলমান অবস্থায় যে সমস্ত সলাত পরিত্যাগ করবে তার কাযা আদায় করবে না। কেননা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে তিনি বলেন,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

"নারী কি এমন নয় যে, সে ঋতুবতী হলে সলাত পড়ে না সওম রাখে না?"[১] সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ কথার উপর ঐকমত্য যে, ঋতু চলাবস্থায় ছুটে যাওয়া সলাতের কাযা আদায় করতে হবে না।

নারী যদি এমন সময় পবিত্র হয় যখন সলাতের এক রাক'আত বা ততোধিক রাক'আত আদায় করা সম্ভব, তখন সে সেই সলাত আদায় করে নিবে। কেননা নবী ﷺ বলেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত সলাত আদায় করতে পারবে সে আসর সলাত পেয়ে গেল।"[২]

---

[১]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতীর সওম পরিত্যাগ করা, হাঃ ৩০৪।

[২]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, হাঃ ৫৪৫। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ এক রাক'আত সলাত পেলে ঐ সলাত পেয়ে গেল।

www.pathagar.com

যদি আসরের শেষ সময় পবিত্র হয় এবং সূর্যাস্তের জন্য এতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে যখন এক রাক'আত সলাত আদায় করা সম্ভব, অথবা সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয় যখন কমপক্ষে ফজরের এক রাক'আত সলাত আদায় করা সম্ভব, তবে উভয় অবস্থায় তাকে গোসল করার পর আসর বা ফজরের সলাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (১৭৫) জনৈক নারীর ঋতুর নির্দিষ্ট দিন ছিল ছয় দিন। অতঃপর এ দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গেছে। সে এখন কি করবে?

উত্তর ঃ এ নারীর ঋতুর দিন ছিল ছয় দিন। কিন্তু তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে নয় দিন বা দশ দিন বা এগার দিন হয়ে গেছে, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সলাত-সওম থেকে বিরত থাকবে। কেননা নবী ﷺ ঋতুর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র।" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

অতএব যতদিন পর্যন্ত এ স্রাব অবশিষ্ট থাকবে, নারীও নিজ অবস্থায় থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সলাত সওম আদায় করবে। পরবর্তী মাসে যদি তার স্রাবের দিন কম হয়ে যায়, তবে স্রাব বন্ধ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও আগের মাসের সমান দিন পূর্ণ না হয়।

মোটকথা নারী যতদিন ঋতু বিশিষ্ট থাকবে ততদিন সে সলাত-সওম থেকে বিরত থাকবে। চাই ঋতুর দিন পূর্ববর্তী মাসের বরাবর হোক বা কম হোক বা বেশী হোক। স্রাব বন্ধ হয়ে পবিত্র হলেই গোসল করবে।

হায়েযের দিনসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে হলে কি করবে?

প্রশ্ন ঃ (১৭৬) জনৈক নারী মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সলাত শুরু করেছে। এভাবে নয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার স্রাব দেখা গেছে। তিনদিন স্রাব প্রবাহমান ছিল। তখন সলাত পড়েনি। তারপর পবিত্র হলে গোসল করে এগার দিন সলাত আদায় করেছে। তারপর আবার তার স্বাভাবিক মাসিক শুরু হয়েছে। সে কি ঐ তিন দিনের সলাত কাযা আদায় করবে? নাকি তা হায়েযের দিন হিসেবে গণ্য করবে?

উত্তর ঃ নারীর গর্ভ থেকে যখনই রক্ত প্রবাহিত হবে তখনই তা ঋতু বা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। চাই সেই ঋতুর সময় পূর্বের ঋতুর সময়ের চাইতে দীর্ঘ হোক বা কম হোক। ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পাঁচ দিন বা ছয় দিন বা

দশ দিন পর পুনরায় স্রাব দেখা গেছে, তবে সে পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে এবং সলাত পড়বে না। কেননা এটা ঋতু। সর্বাবস্থায় এরূপই করবে। পবিত্র হওয়ার পর আবার যদি ঋতু দেখা যায়, তবে অবশ্যই সলাত-সওম থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু স্রাব যদি চলমান থাকে- সামান্য সময় ব্যতীত কখনই বন্ধ না হয়, তবে তা ইস্তিহাযা বা অসুস্থতা বলে গণ্য হবে। তখন তার নির্দিষ্ট দিন সমূহ শুধু সলাত-সওম থেকে বিরত থাকবে।

প্রশ্ন ঃ (১৭৭) ঋতু শুরু হওয়ার দু'দিন পূর্বে নারীর গর্ভ থেকে যে হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ নির্গত হয় তার বিধান কি?

উত্তর ঃ হলুদ রংয়ের এ তরল পদার্থ যদি ঋতুর সময় হওয়ার পূর্বে নির্গত হয়, তবে তা কিছু নয়। কেননা উম্মু 'আত্বিয়্যা (রাঃ) বলেন,

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

"আমরা হলুদ রং ও হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে তা কোন কিছুই গণ্য করতাম না।"[১]

আবূ দাউদের বর্ণনায় এসেছে, উম্মে আত্বীয়্যা (রাঃ) বলেন,

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

"পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে আমরা তাকে কোন কিছুই গণ্য করতাম না।"[২]

ঋতুর পূর্বের এ হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ যদি ঋতু বের হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তা কোন কিছু নয়। কিন্তু নারী যদি তা ঋতুর সূচনা স্বরূপ মনে করে, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করবে এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

প্রশ্ন ঃ (১৭৮) পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হওয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ ঋতুর ক্ষেত্রে নারীদের সমস্যা সাগরতুল্য যার কোন কূল কিনারা নেই। এর অনেক কারণের মধ্যে গর্ভ বা মাসিক নিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা। পূর্বে মানুষ এত ধরনের সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিল না। সন্দেহ নেই সৃষ্টিলগ্ন

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের দিন ছাড়া অন্য সময় পীত রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হওয়া। হাঃ ৩২৬।

[২]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র হওয়ার পর নারী যদি পীত রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হতে দেখে।

www.pathagar.com

থেকে নারীর নানান সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এর আধিক্য এত বেশী যে, মানুষ তার সমাধানের ক্ষেত্রে হয়রান হয়ে যায়; যা দুঃখজনক বিষয়।

তবে মূলনীতি হচ্ছে, নারী যদি নিশ্চিতভাবে ঋতু থেকে পবিত্রতা দেখতে পায়, যেমন নারীদের কাছে পরিচিত সাদা পানি বের হওয়া বা হলুদ বা মেটে বের হওয়া বা ভিজা পাওয়া এগুলো সবই হায়েয বা ঋতু নয়। এগুলো সলাত বা সওম থেকে বাধা দিবে না। স্বামী সহবাসে বাধা থাকবে না। কেননা এটা হায়েয নয়। উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) বলেন, "পবিত্র হওয়ার পর হলদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে আমরা তা কোন কিছুই গণ্য করতাম না।"[১] এর সনদ সহীহ।

এ ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে পবিত্র হওয়ার পর এ ধরনের যা কিছুই ঘটুক তাতে নারীর কোন অসুবিধা নেই। সলাত-সওম ও স্বামী সহবাসে কোন বাধা নেই। কিন্তু পবিত্রতা না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করবে না। কেননা কোন কোন নারী রক্ত বের হওয়াতে কিছুটা শুষ্কতা দেখলেই পবিত্রতার চিহ্ন না দেখেই তাড়াহুড়া করে গোসল করে নেয়। এজন্য মহিলা সাহাবীগণ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে দেখানোর জন্য তুলা নিয়ে আসতেন যাতে হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ লেগে থাকতো। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, "সাদা পানি নির্গত না দেখা পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করবে না।"[২]

প্রশ্ন ঃ (১৭৯) ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ (ট্যাবলেট) ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ (ট্যাবলেট) ব্যবহার করলে সাস্থ্যগত দিক থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে তাতে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে। কিন্তু এ যাবৎ আমি যা জেনেছি, তাতে এ সমস্ত ঔষধ নারীর জন্য ক্ষতিকারক। এ কথা সবার জানা যে, মাসিকের রক্ত প্রবাহিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর সময় মত স্বাভাবিক বিষয়ের গতিতে বাধা দিলে সেখানে অবশ্যই ক্ষতির আশংকা থাকে। নারীর শরীরে তার ক্ষতিকর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া এটা ব্যবহার করলে অনেক সময় নারীর স্বাভাবিক মাসিক বাধাগ্রস্ত হয় এবং সে পেরেশানী ও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়। সলাত-সওম ও স্বামীর সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

---

[১]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র হওয়ার পর নারী যদি পীত রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হতে দেখে।

[২]. বুখারী মুআল্লাকভাবে বর্ণনা করেন। অধ্যায় ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদ ঃ মাসিক আগমন ও নির্গমন।

www.pathagar.com

এজন্য আমি বলি না যে, এটা হারাম। কিন্তু নারীর ক্ষতির দিক চিন্তা করে বলি, এটা ব্যবহার করা উচিত নয়। আমার মতে এ পদক্ষেপ পছন্দনীয় নয়।

আরো বলি, আল্লাহ্ নারীর জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিদায় হাজ্জে নবী ﷺ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি কাঁদছেন। তখন আয়েশা (রাঃ) উমরা করার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন।

فَقَالَ مَا يُبْكِيك قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذٰلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

তিনি তাঁকে বললেন, "কি হয়েছে তোমার, কাঁদছো কেন? আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! এ বছর আমি হাজ্জ না করলেই ভাল হত। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তুমি ঋতুবতী হয়ে গেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, এটা এমন এক বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের মেয়েদের জন্য লিখে দিয়েছেন। (সুতরাং দুঃখ করার কিছু নেই।)[১] অতএব নারীর উচিত হচ্ছে এ সময় ধৈর্য ধারণ করা। ঋতুর কারণে সলাত-সওম করতে না পারলে তো আল্লাহর যিক্‌রের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। তাসবীহ্-তাহ্লীল করবে, দান-সদাকা করবে, মানুষের সাথে সদাচরণ করবে, কথা-কাজে মানুষের উপকার করার চেষ্টা করবে ইত্যাদি কাজ তো সুন্দর ও অত্যাধিক ফযীলতপূর্ণ আমল।

প্রশ্ন ঃ (১৮০) চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও নিফাসের স্রাব চলতে থাকলে কি করবে?

উত্তর ঃ কোন পরিবর্তন ছাড়াই যদি নিফাস বিশিষ্ট নারীর স্রাব চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও চলতে থাকে যদি চল্লিশ দিনের পরের স্রাব ঋতুস্রাবের সময়ে হয়ে থাকে, তবে তা হায়েয বা ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু পূর্ববর্তী স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের সময়ে না হয় তবে সে সম্পর্কে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল বিদ্বান বলেন, চল্লিশ দিন পূর্ণ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে সলাত-সওম আদায় করবে। আর প্রবাহিত রক্ত ইস্তিহাযা বা অসুস্থতা গণ্য করবে।

---

[১] . সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের ঋতু হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রামের পদ্ধতি বর্ণনা করা।

www.pathagar.com

আরেকদল বিদ্বান বলেন, সে অপেক্ষা করবে এবং ষাট দিন পূর্ণ করবে। কেননা ষাট দিন পর্যন্ত নিফাস হয়েছে এমন অনেক নারী পাওয়া গেছে। এটা বাস্তব বিষয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে কোন কোন নারীর ষাট দিন পর্যন্তই নিফাস হয়েছে। অতএব এই ভিত্তিতে ষাট দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের দিকে ফিরে যাবে আর সেই মাসিকের সময় অপেক্ষা করে পবিত্র হলে গোসল করে সলাত-সওম আদায় করবে। এরপরও যদি স্রাব চলতেই থাকে তখন তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য করবে।[১]

প্রশ্ন ঃ (১৮১) নিফাসের চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার আগেই পবিত্র হয়ে গেলে বা চল্লিশ দিনের পর পুনরায় স্রাব দেখা গেলে কি করবে?

উত্তর ঃ নিফাস বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য জায়েয নয়। যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে সে পবিত্র হয়ে যায়, তবে গোসল করে সলাত আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব এবং সলাতও বিশুদ্ধ। এ অবস্থায় স্বামী সহবাসও তার জন্য জায়েয। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)

যতক্ষণ অপবিত্রতা তথা রক্ত বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ স্বামীর সাথে সহবাস জায়েয হবে না। পবিত্র হয়ে গেলেই সহবাস জায়েয হবে। যেমনটি সলাত আদায় করাও তার জন্য ওয়াজিব। চল্লিশ দিনের পূর্বে পবিত্র হলে নিফাস অবস্থার যাবতীয় নিষিদ্ধতা শেষ হয়ে যাবে। তবে সহবাসের ক্ষেত্রে কিছুটা ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা সহবাসের ফলে পুনরায় রক্ত চালু হয়ে যেতে পারে।

---

[১]. কিন্তু উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে নিফাস বিশিষ্ট নারীগণ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ) অধিকাংশ বিদ্বান (সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ) এমতই পোষণ করেন যে, চল্লিশ দিনের পর স্রাব নির্গত হতে থাকলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। বরং গোসল করে সলাত ইত্যাদি শুরু করবে। আর হাসান বাসরী বলেন, ৫০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর ৬০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা আত্বা ও শা'বী থেকে বর্ণিত আছে। (তিরমিযী হাঃ ১১৯)- অনুবাদক।

www.pathagar.com

চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর এবং পবিত্র হওয়ার পর যদি আবার রক্ত দেখা যায়, তবে তা মাসিকের রক্ত হিসেবে গণ্য করবে। নিফাসের রক্ত নয়। মাসিকের রক্ত নারীদের কাছে পরিচিত। যখনই তা অনুভব করবে মনে করবে তা ঋতুস্রাব। এই রক্ত যদি প্রবাহমান থাকে এবং সামান্য সময় ব্যতীত কখনই বন্ধ হয় না, তবে তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে। তখন ঋতুর নির্দিষ্ট দিনসমূহ অপেক্ষা করবে এবং অবশিষ্ট দিনসমূহ পবিত্র হিসেবে গণ্য করবে এবং গোসল করে সলাত আদায় করবে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত)

অকাল গর্ভপাত হলে কি করবে?

প্রশ্ন ঃ (১৮২) জনৈক নারীর তৃতীয় মাসেই গর্ভপাত হয়ে গেছে। সে কি সলাত আদায় করবে না সলাত পরিত্যাগ করবে?

উত্তর ঃ বিদ্বানদের নিকট পরিচিত কথা হচ্ছে, নারীর গর্ভ যদি তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পড়ে যায়, তবে সে সলাত পড়বে না। কেননা নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণে মানুষের আকৃতি সৃষ্টি হয়ে গেছে। তখন তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সে সলাত থেকে বিরত থাকবে।

বিদ্বানগণ বলেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বয়স ৮১ (একাশি) দিন অতিবাহিত হলে মানুষের আকৃতি ধারণ করে। এ সময়টি তো তিন মাসের অনেক কম। যদি নিশ্চিত হয় যে, তিন মাস বয়সের ভ্রূণ পতিত হয়ে গেছে, তবে নির্গত রক্ত নিফাসের রক্ত বলেই গণ্য হবে। কিন্তু এই গর্ভপাত যদি আশি দিনের কমে হয়, তবে নির্গত রক্ত নষ্ট রক্ত বলে গণ্য হবে। আর সে কারণে সলাত প্রভৃতি পরিত্যাগ করবে না।

প্রশ্নকারী এই নারীর উপর আবশ্যক হচ্ছে, স্মরণ করার চেষ্টা করবে ৮০ দিনের কম বয়সে যদি গর্ভপাত হয়ে থাকে এবং সেজন্য সলাত পরিত্যাগ করে থাকে, তবে পরিত্যক্ত সলাতের কাযা আদায় করবে। সলাত কত ওয়াক্ত ছুটেছে তা নিশ্চিতভাবে স্মরণ করতে না পারলে অনুমানের ভিত্তিতে কাযা আদায় করবে।

ইস্তিহাযা হলে নারী কি করবে?

প্রশ্ন ঃ (১৮৩) অসুস্থতার কারণে যদি কোন নারীর রক্তস্রাব নির্গত হতেই থাকে, তবে কিভাবে সে সলাত ও সওম আদায় করবে?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ এ নারীর অসুখ শুরু হওয়ার পূর্বে তথা গত মাসে তার ঋতুর যে দিন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল, সেই নির্দিষ্ট দিনসমূহে সে নিজেকে ঋতুবতী হিসেবে গণ্য করে সলাত-সওম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বিগত মাসগুলোর প্রথম দিকে তার ছয়দিন ঋতু ছিল, তারপর এক সময় তার অসুখ শুরু হয়েছে, এক্ষেত্রে সে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিকে ছয় দিন অপেক্ষা করবে এবং সলাত সওম থেকে বিরত থাকবে। এ দিনসমূহ শেষ হলেই গোসল করে সলাত-সওম আদায় করবে।

এ নারী বা তার মত নারীদের সলাতের পদ্ধতি হচ্ছে,

ক) ফরয সলাতের সময় হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গরূপে লজ্জাস্থান ধৌত করবে।

খ) তারপর সেখানে প্যাড বা পট্টি জাতীয় কোন কিছু বেঁধে দিবে,

গ) এরপর ওযূ করবে এবং সলাত আদায় করবে।

সলাতের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এরূপ ওযূ ইত্যাদি কাজ করবে না। ফরয সলাতের সময় ব্যতীত অন্য সময় নফল সলাত পড়তে চাইলেও এভাবে ওযূ ইত্যাদি করবে।

এ অবস্থায় যেহেতু বারবার এত কাজ করা তার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাই দু'সলাতকে একত্রিত করা জায়েয। যোহরের সাথে আসরের সলাত আদায় করে নিবে বা আসরের সাথে যোহরের সলাত আদায় করবে এবং মাগরিবের সাথে এশার সলাত আদায় করবে অথবা এশার সময় মাগরিব ও এশার সলাত আদায় করবে। যাতে করে তার একবারের পরিশ্রম দু'সলাত যোহর ও আসরের জন্য যথেষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়বারের পরিশ্রম মাগরিব ও এশার জন্য যথেষ্ট হয়। আর একবার ফজর সলাতের জন্য। অর্থাৎ- পাঁচবার পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য লজ্জাস্থান ধৌত করা, পট্টি বাঁধা, ওযূ করা প্রভৃতি কষ্টকর বিষয়। তাই এর পরিবর্তে তিনবারেই এ কাজ আদায় হয়ে যাবে। কষ্টও অনেক লাঘব হবে। (আল্লাহ্ই তাওফীক দাতা ও তিনিই অধিক জ্ঞাত আছেন)

❁ ❁ ❁

প্রশ্ন ঃ (১৮৪) ইসলামে সলাতের বিধান কি? কার উপর সলাত ফরয?

উত্তর ঃ সলাত ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। বরং এটা কালেমায়ে শাহাদাতের পর দ্বিতীয় রুকন। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এটা ইসলামের মূল খুঁটি। যেমনটি নবী ﷺ বলেন,

www.pathagar.com

وَعَمُودُهُ الصَّـــلاَةُ "ইসলামের মূল খুঁটি হচ্ছে, সলাত ।"[১] আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর সলাত ফরয করেন এমন উঁচু স্থানে যেখানে মানুষের পক্ষে পৌঁছা অসম্ভব। কোন মাধ্যম ছাড়াই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি রাত মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সপ্তাকাশের উপর আরশে নিয়ে এ সলাত ফরয করেন। প্রথমে রাত-দিনে এ সলাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি দয়া করে এর সংখ্যা কমিয়ে নির্ধারণ করেন পাঁচ ওয়াক্ত। আর প্রতিদান ঘোষণা করেন, পঞ্চাশ ওয়াক্তের বরাবর। এ থেকে প্রমাণিত হয় সলাত কত গুরুত্বপূর্ণ। সলাতকে আল্লাহ কত ভালাবসেন! সুতরাং মানুষের জীবনের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সময় এই ক্ষেত্রে ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরী। সলাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে দলীল হচ্ছে ঃ কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলিমদের ইজমা বা ঐকমত্য।

কুরআন থেকে দলীল ঃ

আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

অর্থ ঃ "যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সলাত প্রতিষ্ঠা কর; নিশ্চয় সলাত মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয করা হয়েছে।

(সূরা নিসা ঃ ১০৩)

নবী ﷺ যখন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

"তুমি তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিদিন (দিনে-রাতে) তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন।"[২]

সলাত ফরয হওয়ার উপর সমস্ত মুসলমান ঐকমত্য হয়েছে। এজন্য উলামাগণ (রহঃ) বলেন, কোন মানুষ যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সলাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির মুরতাদ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। তার রক্ত ও সম্পদ হালাল। কিন্তু যদি সে তওবা করে তার কথা ভিন্ন। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি যদি নতুন মুসলমান হয়- ইসলামের বিধি-বিধান

---

[১]. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতের সম্মান, ইবনু মাজাহ, অধ্যায় ঃ ফিতনা, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার সময় যবান বন্ধ রাখা। তিরমিযী বলেন হাদীসটি সহীহ হাসান।

[২]. বুখারী, কিতাবু যাকাত, হাঃ ১৩৯৫। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

www.pathagar.com

সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং অনুরূপ কথা বলে তবে তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে। তাকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে। তারপরও যদি সে সলাত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে অমান্য করে তবে সেও কাফির বলে গণ্য হবে।

নিম্নলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সলাত ফরয ঃ মুসলিম, বালেগ, আকেল, নারী বা পুরুষ।

মুসলিমের বিপরীত হচ্ছে কাফির। কাফিরের উপর সলাত ফরয নয়। অর্থাৎ- কাফির অবস্থায় তার জন্য সলাত আদায় করা আবশ্যক নয়। ইসলাম গ্রহণ করলেও আগের সলাত ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু এ কারণে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ.﴾

"কিন্তু ডানদিকরা, তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করেছে? তারা বলবে, আমরা সলাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। আর আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩৯-৪৬)

'আমরা সলাত পড়তাম না' কথা থেকে বুঝা যায়, তারা কাফির ও কিয়ামাত দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও সলাত পরিত্যাগ করার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

প্রাপ্ত বয়স্ক ঃ যার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কোন একটি চিহ্ন প্রকাশ পাবে তাকেই বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক বলা হবে। উক্ত চিহ্ন পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি আর নারীর ক্ষেত্রে চারটি।

ক) পনর বছর পূর্ণ হওয়া।

খ) উত্তেজনার সাথে নিদ্রা বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া।

গ) নাভীমূল গজানো। অর্থাৎ- লজ্জাস্থানের আশে-পাশে শক্ত লোম দেখা যাওয়া। এ তিনটি চিহ্ন নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রে। নারীর ক্ষেত্রে চতুর্থ চিহ্নটি হচ্ছে হায়েয বা ঋতুস্রাব হওয়া। কেননা তা বালেগ হওয়ার আলামত।

আকেল বা বুদ্ধিমান হচ্ছে বিবেকহীন পাগলের বিপরীত শব্দ। কোন নারী বা পুরুষ যদি অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে

www.pathagar.com

তবে সেও এ শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এ অবস্থায় বিবেকহীন হওয়ার কারণে তার উপর সলাত ফরয হবে না।

ঋতুস্রাব বা নিফাস হলে সলাত ওয়াজিব নয়। কেননা নবী ﷺ বলেন, أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ "নারী কি এমন নয় যে, সে ঋতুবতী হলে সলাত পড়বে না সওম রাখবে না?"[১]

❁❁❁

প্রশ্ন ঃ (১৮৫) বেহুঁশ এবং স্মৃতিশক্তিহীন ব্যক্তির জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা কি আবশ্যক?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর আবশ্যক করেছেন যাবতীয় ইবাদাত বাস্তবায়ন করা- যদি তার মধ্যে সে যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকে। যেমন সে বিবেক সম্পন্ন হবে। সবকিছু বুঝতে পারবে। কিন্তু যে লোক বিবেকশূন্য সে শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য নয়। এ কারণে পাগল, শিশু বরং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের উপর কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত। অনুরূপ হচ্ছে আধা পাগল- যার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে কিন্তু পুরোপুরি পাগল হয়নি এবং অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির উপর সলাত-সওম আবশ্যক নয়। কেননা সে তো স্মৃতিশক্তিহীন মানুষ। সে ঐ শিশুর মত যার মধ্যে ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং সমস্ত বিধি-বিধান তার উপর থেকে রহিত কোন কিছুই তার উপর আবশ্যক নয়।

তবে সম্পদের যাকাত সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা তার উপর বজায় থাকবে। কেননা যাকাতের সম্পর্ক সম্পদের সাথে। তখন ঐ ব্যক্তির অভিভাবক তার পক্ষ থেকে যাকাতের অংশ বের করে দিবে। কেননা যাকাত ওয়াজিব হয় সম্পদের উপর। এজন্য আল্লাহ্ বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। তা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদ থেকে যাকাত নিতে বলেছেন, ব্যক্তি থেকে যাকাত নিতে বলেননি। নবী ﷺ যখন মু'আযকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তাকে বলেন,

---

[১]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতীর সওম পরিত্যাগ করা, হাঃ ৩০৪।

www.pathagar.com

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের সম্পদে সদাকা বা যাকাত ফরয করেছেন। তা ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের ভিত্তিতে সম্পদের আবশ্যকতা স্মৃতিহীন লোকের উপর থেকে রহিত হবে না। কিন্তু শারীরিক ইবাদাত যেমন সলাত , সিয়াম, পবিত্রতা প্রভৃতি রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে বিবেকহীন।

কিন্তু অসুস্থতা প্রভৃতির করণে বেহুঁশ হলে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে তার উপর সলাত আবশ্যক হবে না। এ রকম অসুস্থ ব্যক্তি যদি একদিন বা দ'দিন বেহুঁশ থাকে তবে তাকে সলাত কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা বিবেকশূন্য বেহুঁশ মানুষকে ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা চলবে না। যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"যে ব্যক্তি সলাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা সলাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে যখনই স্মরণ হবে তখনই সে তা আদায় করে নিবে।"[১]

কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি হুঁশ সম্পন্ন এ অর্থে যে, তাকে জাগানো হলে জাগ্রত হবে। কিন্তু বেহুঁশকে জাগানো হলেও তার হুঁশ ফিরবে না। এ বিধান হচ্ছে ঐ অবস্থায় যখন বেহুঁশী কোন কারণ ছাড়াই ঘটবে। কিন্তু কোন কারণবশতঃ হলে যেমন সংজ্ঞা লোপ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করেছে, তবে উক্ত বেহুঁশ অবস্থার সলাতসমূহ তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

❀❀❀

যে ব্যক্তি দু'মাস যাবত সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে সলাত-সওম কিছুই আদায় করতে পারেনি তার বিধান।

প্রশ্ন ঃ (১৮৬) জনৈক ব্যক্তি দু'মাস যাবৎ কোন কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে না সলাত আদায় করেছে না রামাযানের সওম পালন করেছে। এখন তার করণীয় কি?

---

[১]. সহীহুল বুখারী অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাত ভুলে যায় স্মরণ হলেই যেন আদায় করে নেয়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুচ্ছেদ ঃ কাযা সলাত আদায় করা।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ সংজ্ঞাহীন হওয়ার কারণে তার উপর কোন কিছুই আবশ্যক নয়। আল্লাহ যদি তার জ্ঞান ফিরিয়ে দেন, তবে সে রামাযানের সওম ক্বাযা আদায় করবে। কিন্তু আল্লাহ যদি তার মৃত্যুর ফায়সালা করেন তবে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। তবে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর যদি সার্বক্ষণিক ওযর বিশিষ্ট হয়, যেমন অতি বয়স্ক প্রভৃতি তবে ফরয হচ্ছে ঃ তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে।

তবে সলাত কাযা আদায় করার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে দু'রকম মত পাওয়া যায়।

১) অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা ইবনু উমার (রাঃ) একদিন একরাত্রি বেহুঁশ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছুটে যাওয়া সলাত কাযা আদায় করেননি। (মালিক, হাঃ ২৩)

২) তাকে কাযা আদায় করতে হবে। এ মত পোষণ করেছেন পরবর্তী যুগের হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণ। ইনসাফ গ্রন্থের লেখক বলেন, এটা মাযহাবের বিচ্ছিন্ন মতামতসমূহের অন্তর্গত। এ মতটি আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তিনদিন বেহুঁশ ছিলেন। তারপর ছুটে যাওয়া সলাত কাযা আদায় করেছেন। (মালিক, হাঃ ২৩)

❀❀❀

সলাতের শর্ত পূর্ণ করতে গিয়ে সময় পার হয়ে গেলে কি করবে?

প্রশ্ন ঃ (১৮৭) সলাতের কোন একটি শর্ত (যেমন পানি সংগ্রহ) পূর্ণ করতে গিয়ে যদি সলাতের সময় পার হয়ে যায় তবে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, কোনভাবেই সলাতের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করা বৈধ নয়। কোন লোক যদি সময় পার হয়ে যাওয়ার ভয় করে তবে যে অবস্থাতেই থাকুক সলাত আদায় করে নিবে। যদিও একটু পর উক্ত শর্ত পূর্ণ করা সম্ভব হয়। কেননা আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا "নিশ্চয় নিদিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

অনুরূপভাবে নবী ﷺ প্রতিটি সলাতের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং ঐ সময়ে আদায় করাটাই ওয়াজিব। কেননা শর্ত পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করা যদি বৈধ হত, তবে তায়াম্মুমের কোন প্রয়োজন ছিল না। সময় পার হওয়ার পর পানি সংগ্রহ করা সম্ভব। সুতরাং দীর্ঘ সময়ের জন্য সলাতকে

www.pathagar.com

দেরী করা বা অল্প সময়ের জন্য দেরী করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থায় সলাতের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তাই যে অবস্থাতেই থাক না কেন সময়ের মধ্যেই (তায়াম্মুম করে হলেও) সলাত আদায় করে নিবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া এ মত পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ (১৮৮) রাত জাগার কারণে সূর্য উঠার পর সলাত আদায় করলে কবূল হবে কি? অন্যান্য সলাত সে সময়মতই আদায় করে। সেগুলোর বিধান কি?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে সময় পার করে সূর্য উঠার পর ফজর সলাত আদায় করলে তা কবূল হবে না। কেননা রাত না জেগে আগেভাগে নিদ্রা গেলে সময়মত উক্ত সলাত আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। সুতরাং বিনা ওযরে সময় অতিবাহিত করে সলাত আদায় করলে উক্ত সলাত কবূল হবে না।

কেননা নবী ﷺ বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার পক্ষে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"[১]

আর যে ব্যক্তি বিনা ওযরে সময় অতিবাহিত করে সলাত আদায় করে সে তো এমন আমল করল, যার অনুমতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দেননি। সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত।

কিন্তু সে বলতে পারে আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। আর রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"যে ব্যক্তি সলাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা সলাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তার কাফ্ফারা হচ্ছে যখনই স্মরণ হবে তখনই সে তা আদায় করে নিবে।"[২]

আমরা তাকে বলব, যখন কিনা তার জন্য সম্ভব ছিল যে, সময় মত জাগার জন্য আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়বে বা এলার্ম ঘড়ি প্রস্তুত করবে বা কাউকে অনুরোধ করবে তাকে জাগিয়ে দেয়ার জন্য। এগুলো না করে সময় অতিবাহিত করে ঘুমের ওজুহাত খাড়া করা ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত পরিত্যাগ করারই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সুতরাং পরবর্তীতে আদায় করলে তা কবূল হবে না।

আর অন্যান্য সলাত সময়মত আদায় করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

---

[১]. মুসলিম, কিতাবুল আকযিয়া।
[২]. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাওয়াক্বীত; মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ।

www.pathagar.com

এ উপলক্ষে আমি একটি নসীহত করতে চাই ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে, এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা যেভাবে করলে তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। এ দুনিয়ায় তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। কেউ জানে না কখন তার মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে উঠবে। তাকে পাড়ি জমাতে হবে পরপারের জগতে। যেখানে সে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে। তখন আমলই হবে তার একমাত্র সহযোগী। মৃত্যুর পর আমল করার আর কোন অবকাশ থাকবে না। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তিনিটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। সদাকায়ে জারিয়া, উপকারী বিদ্যা, সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।"[১]

বিলম্ব করে ফজরের সলাত আদায় করার বিধান কি?

প্রশ্ন ঃ (১৮৯) যে ব্যক্তি ফজরের সলাত বিলম্ব করে আদায় করে এমনকি তার সময় পার হয়ে যায়। তার বিধান কি?

উত্তর ঃ যারা ফজর সলাত বিলম্ব করে আদায় করে এমনকি তার সময় পার হয়ে যায়- যদি বিশ্বাস করে যে এরূপ করা বৈধ, তবে তা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী। কেননা বিনা ওযরে সলাতের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করা হালাল বা জায়েয যে ব্যক্তি এ কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে সে কাফির। এ কারণে যে, সে কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলিমদের ইজমার বিরোধিতা করেছে।

কিন্তু যদি তা হালাল না ভেবে বিশ্বাস করে যে, দেরী করে সলাত আদায় করলে গোনাহ্‌গার হতে হবে। তারপরও প্রবৃত্তির তাড়নায় বা ঘুমের কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সময় পার করে দেয়। তবে সে সাধারণ পাপী বলে গণ্য হবে। তাকে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করতে হবে। অন্যায় থেকে বিরত হতে হবে। বড় বড় কাফিরের জন্যও তাওবার দরজা উন্মুক্ত।

---

[১]. মুসলিম, কিতাবুল ওসীয়্যাহ্।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

এদের ব্যাপারে যারা জানবে তারা তাদেরকে নসীহত করবে, তাদেরকে কল্যাণের নির্দেশ দিবে। যদি তারা তওবা না করে, তবে তাদের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে হবে। যাতে করে তারা যিম্মামুক্ত হতে পারে আর কর্তৃপক্ষও তাদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকে সংশোধন করতে পারে।

সলাত ত্যাগী যুবকের সাথে মেয়ের বিবাহ্ দেয়া কি বৈধ?

প্রশ্ন ঃ (১৯০) জনৈক যুবক এক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, সে সলাত আদায় করে না। কিন্তু বলা হচ্ছে, 'ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত করবেন।' এই যুবকের সাথে মেয়ে বিবাহ্ দেয়া কি বৈধ?

উত্তর ঃ বিবাহের প্রস্তাবকারী যদি জামাআতের সাথে সলাত আদায় না করে, তবে সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফারমান- গোনাহ্গার। মুসলিমদের ইজমার বিরোধিতাকারী। কেননা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সলাত আদায় করা সর্বোত্তম ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে মুসলমানগণ ঐকমত্য হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) (মাজমু' ফাতাওয়া ২৩/২২২ গ্রন্থে) বলেন, 'আলিমগণ এ কথার উপর ঐকমত্য হয়েছেন যে, জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, শ্রেষ্ঠ আনুগত্য ও ইসলামের অন্যতম বড় নিদর্শন।'

কিন্তু তার এই ফাসিকী তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না। এর সাথে মুসলিম মেয়ের বিবাহ দেয়া জায়েয। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত সচ্চরিত্রবান যুবকের সাথে বিবাহ দেয়াই উত্তম। যদিও সে অর্থ-সম্পদ ও বংশ-মর্যাদায় উন্নত না হয়। কেননা হাদীসে এসেছে ঃ "তোমাদের কাছে যদি এমন ব্যক্তি (বিবাহের প্রস্তাব দেয়) যার ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থা সন্তোষজনক তবে তার সাথে বিবাহ দাও। যদি এরূপ না কর তবে পৃথিবীতে

www.pathagar.com

ফিতনা হবে এবং বিরাট ফাসাদ হবে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি এরূপ লোক না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তি আসে (বিবাহের প্রস্তাব দেয়) যার ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থা সন্তোষজনক তবে তার সাথে বিবাহ দাও।" কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।[১] সহীহুল বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"চারটি গুণাগুণ দেখে কোন নারীকে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্ম। ধর্মভীরু নারীকে বিবাহ করে তুমি বিজয়ী হও। তোমার দু'হাত ধূলোলুণ্ঠিত হোক।"[২]

এ দু'টি হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে বিষয়টির গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক তা হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে- ধর্মভীরুতা ও সচ্চরিত্র। আর আল্লাহ্‌ভীরু ও দায়িত্ব সচেতন অভিভাবকের জন্য আবশ্যক হচ্ছে নবী ﷺ-এর নির্দেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। কেননা কিয়ামাত দিবসে এ বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾

"আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণের আহবানে কি সাড়া দিয়েছিলে?" (সূরা কাসাস ঃ ৬৫)

তিনি আরো বলেন,

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾

"অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। তাদের উপর সব কিছুর বিজ্ঞচিতভাবে বর্ণনা প্রদান করব আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৬-৭)

---

[১]. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ বিবাহ, হাঃ ১০৮৫। ইবনু মাজাহ্‌, কিতাবুন্নিকাহ্‌ হাঃ ১৯৬৭।
[২]. সহীহুল বুখারী, কিতাবুন্নিকাহ্‌ হাঃ ৪৭০০। সহীহ মুসলিম, কিতাবুর রযা' হাঃ ২৬৬১।

www.pathagar.com

আর যদি বিবাহের প্রস্তাবক এমন ব্যক্তি হয়, যে না জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করে না একাকী করে। অর্থাৎ- মোটেও সলাত আদায় করে না। তবে সে কাফির ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। তার তওবা করা জরুরী। যদি খালেসভাবে তওবা নাসূহা করে সলাত আদায় শুরু করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তওবা না করলে তাকে কাফির ও মুরতাদ অবস্থায় হত্যা করতে হবে। গোসল না দিয়ে কাফন না পরিয়ে জানাযা না পড়িয়ে দাফন করতে হবে। মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

কুরআনের দলীল ঃ আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾

"তারপর এদের পর এলো অপদার্থ লোকেরা। তারা সলাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯-৬০

এখানে 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে।' এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, সলাত বিনষ্ট ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার সময় তারা ঈমানদার ছিল না।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

"যদি তারা তাওবা করে ও সলাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" (সূরা তাওবা ঃ ১১)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, সলাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান না করলে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যাকাত পরিত্যাগকারী যদি তার আবশ্যকতা স্বীকার করে কিন্তু কৃপণতার কারণে তা আদায় না করে, তবে সে কাফির হবে না। অতএব সলাত প্রতিষ্ঠা করা ঈমানী ভ্রাতৃত্বের শর্ত হিসেবে অবশিষ্ট রইল। তাই এর দাবী হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা কুফরী। এ কারণে সলাত ত্যাগকারী সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। সলাত ত্যাগকারী ফাসিক নয় বা ছোট কাফির নয়। কেননা ফাসিক্বী এবং ছোট কুফরী ঈমানী ভ্রাতৃত্ব থেকে বের করে দেয় না। যেমনটি মু'মিনদের পরস্পর দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের সংশোধনের উদ্দেশে আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মাঝে সংশোধন কর।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত দু'টি দল ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়নি। অথচ মু'মিনের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি সহীহুল বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

নবী ﷺ বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"কোন মুসলিমকে গালিগালাজ করা ফাসিক্বী আর তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরী।"[১]

হাদীসের দলীল ঃ সলাত পরিত্যাগকারী কাফির হওয়ার ব্যাপারে সুন্নাহ থেকে দলীলসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী ﷺ বলেন, (بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَـرْكُ الصَّـلَاةِ) "মুসলিম বান্দা এবং কাফির ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা।"[২] বুরায়দা বিন হুসাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী ﷺ বলেন,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের, যে ব্যক্তি সলাত পরিত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে।"[৩]

উবাদাহ্ বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে বাইআত করেছেন এই মর্মে যে, "তারা শাসকের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হবে না। যতক্ষণ না তারা তাদের থেকে অবলোকন করে সুস্পষ্ট কুফরী, যে ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে।"[৪]

অর্থাৎ- শাসকদেরকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন লোকেরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সুপ্রমাণিত কোন কুফরী

---

[১]. সহীহুল বুখারী, কিতবুল ঈমান হাঃ ৪৬। মুসলিম কিতাবুল ঈমান হাঃ ৯৭।

[২]. সহীহ মুসলিম, কিতবুল ঈমান হাঃ ১১৬।

[৩]. আহমাদ, তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান হাঃ ২৫৪৫। নাসায়ী, কিতাবুছ সলাত হাঃ ৪৫৯। ইবনু মাজাহ্, কিতাবুস সলাত ওয়াস সুন্নাহ্ ফীহা হাঃ ১০৬৯।

. বুখারী, কিতাবুল ফিতান। মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্।

www.pathagar.com

আবলোকন করে। আপনি যখন এটা বুঝলেন তখন এ হাদীসটি দেখুন ঃ উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত।

নবী ﷺ বলেন,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا.

"অচিরেই তোমাদের মাঝে এমন কিছু আমীর বা শাসকের আগমন ঘটবে যাদের মধ্যে ভাল বিষয় লক্ষ্য করবে খারাপ বিষয়ও লক্ষ্য করবে। যে ব্যক্তি মন্দ বিষয়গুলো চিনলো (অন্য বর্ণনায়, অপসছন্দ করল) সে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সেগুলোর প্রতিবাদ করল সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে সন্তুষ্ট হয় ও তাদের অনুসরণ করে। তাঁরা বললেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন, না যতক্ষণ তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে।"[১]

এ হাদীস থেকে জানা গেল, তারা যদি সলাত আদায় না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। পূর্বে উবাদার হাদীসটিতে বলা হয়েছে কোন ক্রমেই শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপ্রমাণিত কোন কুফরী ছাড়া তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না। সুতরাং এ দু'টি হাদীস দ্বারা জানা গেল, সলাত পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপ্রমাণিত সুস্পষ্ট কুফরী।

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ থেকে দলীল প্রমাণ। সলাত পরিত্যাগকারী কাফির। মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। যেমনটি অন্যান্য সুস্পষ্ট বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইবনু আবী হাতিম সুন্নান গ্রন্থে 'উবাদা বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নসীহত করেছেন ঃ

لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عامداً متعمداً خرج من الملة.

"তোমরা কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত পরিত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সলাত পরিত্যাগ করবে সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।"[২]

---

[১]. সহীহ মুসলিম। কিতাবুল ইমারাহ্ হাঃ ৩৪৪৫, ৩৪৪৬।
[২]. হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/২১৬। হাকিমও অনুরূপ বর্ণনা করেন, মুস্তাদরাক, ৪/৪৪।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (لا إسلام لمن ترك الصلاة) "যে ব্যক্তি সলাত পরিত্যাগ করে, ইসলামে তার কোন অংশ নেই।"[১]

আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ.

"নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ সলাত ব্যতীত কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে কাউকে কাফির মনে করতেন না।"[২]

উল্লেখিত শ্রুতিগত উক্ত দলীলসমূহ ছাড়া সাধারণ যুক্তিও প্রমাণ করে যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফির। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'সলাতে অলসতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই তাকে অবজ্ঞাকারী। সুতরাং সে ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন এবং অবজ্ঞাকারী। সলাতে যাদের যতটুকু অংশ রয়েছে ইসলামে তাদের অংশ ততটুকু রয়েছে। সলাতের প্রতি যার যতটুকু আগ্রহ রয়েছে ইসালামের প্রতি তার আগ্রহ ততটুকু।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) (কিতাবুস সলাত ৪০০ পৃষ্ঠায়) বলেন, হাদীসের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় ঃ "যে লোক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা সলাতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা ফরয করেছেন, সে কখনই সলাত পরিত্যাগ করবে না। সে কখনই ধারাবাহিকভাবে সমস্ত সলাত থেকে বিরত থাকবে না। কারণ, সাধারণ বিবেক ও যুক্তিতে এ কথা কখনই সম্ভব নয় যে, একজন লোক অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন, এর পরিত্যাগকারীকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন; অথচ তারপরও সে তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং সার্বক্ষণিক এ সলাতকে পরিত্যাগ করে চলবে। এটা নিঃসন্দেহে অবাস্তব কথা। সুতরাং সলাতের ফরযকে সত্যায়নকারী কখনই তা পরিত্যাগ করে সন্তুষ্টচিত্তে বসে থাকতে পারে না। ঈমানের দাবী হচ্ছে সলাত আদায় করা। তার হৃদয় যদি তাকে সলাতের নির্দেশ না দেয় তবে তার অন্তরে যে ঈমানের লেশ মাত্র নেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তর সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও তার আমল সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই তাদের কথায় কান দিবেন না।" ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম

---

১. ইবনু আবী শায়বা, কিতাবুল ঈমান ৩৪।

২. তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান। হাকিম।

www.pathagar.com

সত্য বলেছেন। যে সলাতে রয়েছে অশেষ, অফুরন্ত ও বিরাট সওয়াব। যে সলাত আদায় করাও অতি সহজ সাধ্য। যে সলাত পরিত্যাগ করাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি- যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান রয়েছে সে কখনও উক্ত সলাত পরিত্যাগ করতে পারে না। এটা অসম্ভব ব্যাপার।

যখন কিনা কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফির ইসলাম থেকে বহিস্কৃত মুরতাদ- তখন তার সাথে কোন মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পাদন করা বৈধ নয়।

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

"আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্যই মুসলিম ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও তাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২১)

আর আল্লাহ মুহাজির নারীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

এই দু'টি আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম নারীর সাথে কাফিরের বিবাহ বৈধ নয়। অতএব কোন অভিভাবক যদি নিজ মেয়ে বা অধিনস্থ কোন মেয়ের বিবাহ সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করে তবে সে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। এই বিবাহের মাধ্যমে উক্ত নারী তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা এটা এমন সম্পর্ক যাতে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ নেই। নবী ﷺ থেকে আয়েশা (রাঃ)-এর বরাতে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

অতএব স্বামী যদি সলাত পরিত্যাগ করার পর তাওবা করে সলাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামে ফিরে না আসে তবে তার বিবাহ্ ফসখ বা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই সলাত ত্যাগকারী বিবাহের প্রস্তাবদানকারীর সাথে বিবাহের আক্বদ করার কোন প্রশ্নই আসে না।

সারকথা, বিবাহের প্রস্তাবকারী এ ব্যক্তি যদি জামা'আতের সাথে সলাত আদায় না করে তবে সে ফাসিক্ব কাফির নয়। এর সাথে বিবাহ্ দেয়া যায়। তবে তাকে ব্যতীত সলাতে পাবন্দ চরিত্রবান যুবকের সাথে বিবাহ্ দেয়া বেশী উত্তম।

কিন্তু যদি সে মোটেও সলাত আদায় না করে- না জামা'আতের সাথে না একাকী- তবে কাফির, ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ। কোনভাবেই তার সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয নয়। তবে যদি সে সত্যিকারভাবে তাওবা করে সলাত আদায় করে ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কোন বাধা নেই।

আর প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছে যে, প্রস্তাবকারীর ব্যাপারে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বলেছে 'ঠিক হয়ে যাবে- আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত করবেন।' এটা তো ভবিষ্যতের কথা। সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। অজানা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে কোন কিছু ভিত্তি করা যায় না। কেননা আমরা শুধু বর্তমান অবস্থার উপর জিজ্ঞাসিত হব। ভবিষ্যতের উপর নয়। আর এ ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা হচ্ছে কুফরী। সুতরাং এ কুফরী অবস্থায় কি করে তার সাথে মুসলিম রমণীর বিবাহ্ সম্পন্ন করা যায়? আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তার হিদায়াত এবং ইসলামে ফিরে আসার জন্য দু'আ করি। যাতে করে তার সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ্ সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়। আল্লাহ্ই হিদায়াতের মালিক।

পরিবারের সলাত ত্যাগকারী লোকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার বিধান কি?

প্রশ্ন ঃ (১৯১) জনৈক ব্যক্তি পরিবারের লোকদেরকে সলাতের আদেশ করছে। কিন্তু কেউ তার কথা শুনে না। এ অবস্থায় সে কি করবে? সে কি তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করবে নাকি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ পরিবারের এ লোকেরা যদি একেবারেই সলাত আদায় না করে তবে তারা কাফির ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ। তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করা জায়েয নয়। কিন্তু তার উপর আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে দা'ওয়াত দিবে। বারবার অনুরোধ করবে, হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত

www.pathagar.com

করবেন। কেননা সলাত পরিত্যাগকারী কাফির- নাঊযুবিল্লাহ্। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এর দলীল।

যারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলার পক্ষপাতী নয় তাদের দলীলগুলো চারটি অবস্থার বাইরে নয়।

ক) মূলতঃ উক্ত দলীলসমূহে তাদের মতের পক্ষে দলীল নেই।

খ) সেগুলো এমন গুণসম্পন্ন যে তা বিদ্যমান থাকাবস্থায় সলাত পরিত্যাগ অসম্ভব।

গ) অথবা এমন কিছু ওযর ও অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে যে অবস্থায় সলাত পরিত্যাগ করা মার্জনীয়।

ঘ) অথবা উক্ত দলীলসমূহ আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। সলাত পরিত্যাগকারী কাফির হওয়ার হাদীসগুলো দ্বারা তা খাছ বা বিশিষ্ট করা হয়েছে।

সলাত ত্যাগকারী মু'মিন বা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বা সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে কুরআন-সুন্নাহ্র উক্তি সমূহে এ রকম কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং 'সলাত পরিত্যাগ করা কুফরী' এ ব্যাপারে যে দলীলসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে তা নিয়া'মতের কুফরী বা ছোট কুফরী এ রকম ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই।

যখন কিনা সুস্পষ্ট হলো, সলাত পরিত্যাগকারী কাফির মুরতাদ, তখন তার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে ঃ

প্রথমতঃ মুসলিম নারীর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করা বৈধ হবে না। বিবাহের আক্বদ হয়ে গেলেও তা বাত্বিল বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না। কেননা আল্লাহ মুহাজির নারীদের উদ্দেশে বলেছেন ঃ

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

দ্বিতীয়তঃ বিবাহের বন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর যদি সলাত পরিত্যাগ শুরু করে তবে উক্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে- স্ত্রী ব্যবহার তার জন্য হালাল হবে না। পূর্বোল্লিখিত আয়াত এর দলীল।

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ সলাত ত্যাগকারী যবেহ্ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয হবে না। কেননা তা হারাম। ইয়াহূদী বা খৃষ্টানের যবেহ্ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ। কেননা আল্লাহ তা আমাদের জন্য হালাল করেছেন। (দেখুন সূরা মায়িদা ৫ নং আয়াত) অতএব সলাত ত্যাগকারী যবেহ করা গোশত ইয়াহূদী খৃষ্টানের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট।

চতুর্থতঃ সলাত ত্যাগকারী জন্য বৈধ নয় মক্কা বা তার হারাম সীমানায় প্রবেশ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকগণ তো নাপাক। সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর আর মাসজিদে হারামে প্রবেশ না করে।" (সূরা তাওবা ঃ ২৮)

পঞ্চমতঃ সলাত ত্যাগকারীর কোন নিকটাত্মীয় মারা গেলে সে তাদের মীরাস লাভ করবে না। যেমন কোন সলাত আদায়কারী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, রেখে গেল একজন ছেলে এবং এক চাচাতো ভাই। কিন্তু ছেলে সলাত ত্যাগকারী আর চাচাতো ভাই সলাত আদায়কারী। এ অবস্থায় দূরের সেই চাচাতো ভাই মীরাস পাবে ছেলে পাবে না। কেননা উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন,

لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ.

"কোন মুসলিম কাফিরের মীরাস লাভ করতে পারবে না। কোন কাফিরও কোন মুসলিমের মীরাস লাভ করতে পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"ফারায়েয তথা মীরাসসমূহ তার অধিকারীদের মাঝে বণ্টন করে দাও। কিছু অবশিষ্ট থাকলে মৃত ব্যক্তির নিকটতম পুরুষের জন্য নির্ধারিত হবে"- (বুখারী ও মুসলিম)। এ উদাহরণ প্রযোজ্য হবে সমস্ত ওয়ারীশদের ক্ষেত্রে।

ষষ্ঠতঃ সলাত ত্যাগকারী মৃত্যুবরণ করলে- তাকে গোসল দেয়া যাবে না, কাফন পরানো যাবে না, জানাযা সলাত আদায় করা যাবে না, মুসলিমদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তাকে কি করতে হবে? মাঠে-ময়দানে গর্ত খনন করে পরিহিত কাপড়েই পুঁতে ফেলতে হবে। কেননা তার কোনই মর্যাদা নেই।

www.pathagar.com

এ ভিত্তিতে কোন লোক যদি মৃত্যুবরণ করে, আর তার সম্পর্কে জানা যায় যে সে সলাত ত্যাগকারী, তবে জানাযা পড়ার জন্য লাশকে মুসলিমদের সামনে উপস্থিত করা বৈধ হবে না।

সপ্তমতঃ কিয়ামাত দিবসে সলাত ত্যাগকারী হাশর-নশর হবে ফির'আওন, হামান, ক্বারূন ও উবাই বিন খাল্‌ফের সাথে– এরা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাই সলাত ত্যাগকারী পরিবারের পক্ষ থেকে তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করাও জায়েয নয়। কেননা কাফির কোন দু'আ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

"নবী ও ঈমানদারের জন্য সমিচীন নয় যে তারা কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয় না কেন। যখন কিনা প্রমাণিত হয় যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" (সূরা তাওবা ঃ ১১৩)

সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ানক। কিন্তু আফসোস মানুষ বর্তমানে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। নিজেদের গৃহে এমন লোকদের স্থান দিচ্ছে যারা সলাত আদায় করে না। অথচ এটা মোটেও ঠিক নয়। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

সলাত ত্যাগকারী স্বামীর সাথে সলাত আদায়কারী স্ত্রীর বসবাস করার বিধান?

প্রশ্ন ঃ (১৯২) সলাত ত্যাগকারী স্বামীর সাথে সলাত আদায়কারী মুসলিম স্ত্রীর বসবাস করার বিধান কি? তাদের কয়েকজন সন্তানও আছে। সলাত ত্যাগকারী সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ কোন নারী যদি এমন লোককে বিবাহ করে, যে সলাত আদায় করে না, জামা'আতের সাথেও না বাড়ীতেও একাকি না। তার বিবাহ বিশুদ্ধ নয়। কেননা সলাত পরিত্যাগকারী কাফির। যেমনটি আল্লাহর সম্মানিত কিতাব, পবিত্র সুন্নাত ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তিসমূহ এ কথাটি প্রমাণ করে। আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ.

www.pathagar.com

"নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ সলাত ব্যতীত কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে কাউকে কাফির মনে করতেন না।"[১] কাফিরের জন্য কোন মুসলিম নারী বৈধ নয়।

আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

বিবাহের আক্বদ সম্পন্ন হওয়ার পর যদি স্বামী সলাত পরিত্যাগ করা শুরু করে তবে তাওবা করে ইসলামে ফিরে না আসলে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কতক বিদ্বান বলেছেন, বিবাহ্ ভঙ্গের বিষয়টি ঈদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত। যদি ঈদ্দত পার হয়ে যায় তারপর সে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে তবে নতুন আক্বদ করে আবার উক্ত স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। উক্ত মহিলার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সলাত ত্যাগকারী স্বামী থেকে আলাদা থাকবে। তাকে মেলামেশা করতে দিবে না- যতক্ষণ না সে তাওবা করে সলাত আদায় করে। যদিও তাদের সন্তান থাকে। কেননা এ অবস্থায় পিতার কোন অধিকার নেই সন্তানদের প্রতিপালনের।

এ উপলক্ষে আমি মুসলিম ভাইদেরকে সতর্ক করছি ও নসীহত করছি- তারা যেন কোন সলাত ত্যাগকারীর সাথে মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন না করে। কেননা বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ানক। এক্ষেত্রে তারা যেন নিকটাত্মীয় বা বন্ধুর সাথে কোন আপোষ না করে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত আছেন) ৯/১০/১৪১৪ হিঃ।

প্রশ্ন ঃ (১৯৩) তাওবা করার পর কি ছেড়ে দেয়া সলাতের কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃত সলাত পরিত্যাগ করার পর তাওবা করলে, আল্লাহ্র পথে ফিরে আসলে ছেড়ে দেয়া সলাতসমূহ কাযা আদায় করতে হবে কিনা এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। এ ক্ষেত্রে দু'টি মত পাওয়া যায়।

আমার কাছে প্রাধান্যযোগ মতটি হচ্ছে যেটি পছন্দ করেছেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত পরিত্যাগ করে এমনকি সময় পার করে দেয়, তার কাযা আদায় করাতে কোন ফায়দা নেই।

---

[১]. তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান। হাকিম।

www.pathagar.com

কেননা নির্দিষ্ট সময়ের ইবাদাত অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত সময়েই আদায় করতে হবে। সময়ের আগে আদায় করলে যেমন হবে না, অনুরূপ সময় পার হওয়ার পর আদায় করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহ্‌র সীমারেখাসমূহ হিফাযত করা অত্যন্ত যরূরী। শরীয়ত প্রণেতা আমাদের উপর সলাত ফরয করে তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন– এ সময় থেকে এ সময়ের মধ্যে সলাত আদায় করতে হবে। অতএব যে স্থানকে সলাতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি সেখানে যেমন সলাত বিশুদ্ধ হবে না। তেমনি যে সময়কে সলাতের সময় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি, সে সময়ে সলাত আদায় করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না।

অবশ্য যে ব্যক্তি সলাত পরিত্যাগ করেছে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে বেশী বেশী তাওবা ইস্তিগফার করা এবং বেশী বেশী নফল ইবাদাত ও নেক কাজে লিপ্ত হওয়া। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন ও পরিত্যক্ত সলাতসমূহকে ক্ষমা করবেন। (আল্লাহ্‌ই তাওফীক্ব দাতা)

প্রশ্ন ঃ (১৯৪) সলাত ত্যাগকারী সন্তানদের ব্যাপারে পরিবারের কর্তার কর্তব্য কি?

উত্তর ঃ পরিবারের কোন সন্তান যদি সলাত ত্যাগকারী হয়, তবে কর্তার উপর আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে সলাতের ব্যাপারে বাধ্য করা। তিনি তাদেরকে সলাতের নির্দেশ দিবেন, বুঝাবেন, প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করবেন। কেননা নবী ﷺ বলেন, وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ "দশ বছর বয়সে সলাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে।" [১]

এতে যদি কাজ না হয়, তবে (ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিযুক্ত) দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে তাকে সোপর্দ করবেন। যাতে করে তাকে সলাত আদায় করতে বাধ্য করা হয়। এক্ষেত্রে চুপ থাকা জায়েয হবে না। কেননা এতে অন্যায় কাজে সমর্থন হয়ে যায়। সলাত পরিত্যাগ করা কুফরী। সলাত আদায় না করলে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সলাত ত্যাগকারী কাফির চিরকাল জাহান্নামী। তাই সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, জানাযা পড়া বা মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। (আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা কামনা করি)

প্রশ্ন ঃ (১৯৫) সফর অবস্থায় আযান দেয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। সঠিক কথা হচ্ছে সফর অবস্থায় আযান দেয়া ওয়াজিব। দলীল ঃ নবী ﷺ মালিক বিন হুওয়াইরিস ও তার সফর

---

[১]. আহমাদ ২/১৮৭। আবূ দাউদ, কিতাবুস্‌ সলাত (৪৯৫, ৪৯৬) সহীহুল জামে (হাঃ ৫৮৬৮)।

www.pathagar.com

সঙ্গীদের বলেছিলেন ঃ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ "সলাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের মধ্যে যেন একজন আযান দেয়।"[১] এরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর নিকট ইসলামের তা'লীম নিতে এসেছিলেন। ফেরত যাওয়ার সময় নবীজী তাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া নবী ﷺ সফর বা গৃহে যেখানেই থাকতেন কখনই আযান বা ইক্বামাত পরিত্যাগ করেননি। সফরে থাকাবস্থায় তিনি বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

প্রশ্ন ঃ (১৯৬) একক ব্যক্তির জন্য আযান ও ইক্বামাতের বিধান কি?

উত্তর ঃ একক ব্যক্তির জন্য আযান ও ইক্বামাত সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। কেননা তার আশে-পাশে এমন লোক নেই যাদেরকে আযান দিয়ে ডাকা দরকার। কিন্তু যখন কিনা আযানে রয়েছে আল্লাহ্‌র যিক্‌র, তাঁর সম্মান। রয়েছে নিজেকে সলাত ও মুক্তির দিকে আহ্বান– অনুরূপভাবে ইক্বামাতেও। তাই আযান ও ইক্বামত উভয়টি সুন্নাত। আযান মুস্তাহাব বা সুন্নাত হওয়ার দলীল হচ্ছে, উকবা বিন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

"তোমার পালনকর্তা আশ্চর্যান্বিত হন এমন ছাগলের রাখালের কাজে। পাহাড়ের চূড়ায় থেকে সলাতের জন্য সে আযান দেয়। আল্লাহ বলেন, আমার এ বান্দাকে দেখ! সলাতের জন্য সে আযান ও ইক্বামাত দিচ্ছে। সে আমাকে ভয় করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম ও জান্নাতে প্রবেশ করালাম।"[২]

প্রশ্ন ঃ (১৯৭) কোন ব্যক্তি যদি যোহর ও আসর সলাত একত্রিত আদায় করে, তবে কি প্রত্যেক সলাতের জন্য আলাদাভাবে ইক্বামাত দিবে? নফল সলাতের জন্য ইক্বামাত আছে কি?

উত্তর ঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য আলাদাভাবে ইক্বামাত দিতে হবে। জাবির (রাঃ) নবী ﷺ-এর বিদায় হাজ্জের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি

---

[১]. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ।

[২]. আহমাদ হাঃ ১৬৬৭৪, ১৬৮০১। আবূ দাউদ কিতাবুস্ সলাত হাঃ ১০১৭। নাসায়ী, কিতাবুল আযান হাঃ ৬৬০।

www.pathagar.com

মুযদালিফায় (মাগরিব এশা) দু'সলাতকে একত্রিত করেছেন। ইক্বামাত দিয়ে প্রথমে মাগরিব সলাত আদায় করেন। তারপর ইক্বামাত দিয়ে এশা সলাত আদায় করেন। উভয় সলাতের মাঝে কোন সুন্নাত আদায় করেননি।[1]

নফল সলাতের জন্য কোন ইক্বামাত নেই।

প্রশ্ন ঃ (১৯৮) (الصلاة خير مــن النــوم) "আস্‌সলাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম" কথাটি কি ফজরের প্রথম আযানে বলতে হবে না দ্বিতীয় আযানে?

উত্তর ঃ (الصلاة خير مــن النــوم) "আস্‌সলাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম" কথাটি ফজরের প্রথম আযানে বলতে হবে। যেমনটি হাদীসে এসেছে ঃ "সকালের প্রথম আযান প্রদান করলে বলবে, (الصلاة خير من النوم) "আস্‌সলাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম" ঘুম থেকে সলাত উত্তম। এটা প্রথম আযানে দ্বিতীয় আযানে নয়।

কিন্তু জানা দরকার এ হাদীসে প্রথম আযান বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এটা হচ্ছে সেই আযান যা সময় হওয়ার পর প্রদান করা হয়। আর দ্বিতীয় আযান হচ্ছে ঃ ইক্বামাত। কেননা ইক্বামাতকেও 'আযান' বলা হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সলাত রয়েছে।"[2] এখানে দু'আযান বলতে بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ 'আযান ও ইক্বামত' উদ্দেশ্য।

সহীহুল বুখারীতে বলা হয়েছে ঃ আমীরুল মু'মিনীন 'উসমান বিন 'আফ্‌ফান (রাঃ) জুমু'আর জন্য তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন।

অতএব, বিলালকে প্রথম আযানে যে "আস্‌সলাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম" বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফজর সলাতের আযান।

ফজর উদিত হওয়ার আগে যে আযানের কথা পাওয়া যায় তা ফজরের আযান নয়। লোকেরা শেষ রাতের ঐ আযানকে ফজর সলাতের প্রথম আযানরূপে আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ফজর সলাতের জন্য নয়। কেননা নবী ﷺ বলেন,

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ.

---

[1]. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ। মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ।

[2]. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আযান।

www.pathagar.com

"বিলাল রাতে আযান দিয়ে থাকে। যাতে করে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হয় এবং নফল সলাত আদায়কারী ফিরে যায়।"[১] অর্থাৎ- ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে সাহুর খাবে আর ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ সলাত আদায়কারী সলাত শেষ করে সাহুর খাবে।

তাছাড়া নবী ﷺ মালিক বিন হুওয়াইরিছকে বলেছিলেনঃ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ "সলাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের মধ্যে একজন যেন আযান দেয়।" [২] আর আমরা জানি যে, ফজর উদিত না হলে সলাতের সময় উপস্থিত হবে না। অতএব ফজর হওয়ার আগের আযান ফজর সলাতের জন্য নয়।

অতএব সাধারণভাবে মানুষ ফজরের আযানে যে "আস্‌সলাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম" বলে থাকে সেটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ।

কিন্তু যারা ধারণা করে থাকে যে, প্রথম আযান বলতে ফজরের পূর্বের আযান উদ্দেশ্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। তারা দলীল পেশ করে থাকে যে, প্রথম আযান বলতে সেই আযানই উদ্দেশ্য যা শেষ রাতে নফল বা তাহাজ্জুদ সলাতের জন্য দেয়া হয় এবং সেজন্য বলা হয় ঃ "আস্‌সলাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম" অর্থাৎ- ঘুম থেকে সলাত উত্তম। এখানে 'উত্তম' শব্দটি দ্বারা বুঝা যায়, এ আহবানটি নফল সলাতের জন্যই।

আমরা জবাবে বলব ঃ 'উত্তম' শব্দটি শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব কাজের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের

---

[১] . সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান। সহীহ মুসিলম, কিতাবুস সিয়াম।
[২] . সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান। সহীহ মুসিলম, কিতাবুল মাসজিদ।

www.pathagar.com

ধন-সম্পদ ও জীবন পন করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।" (সূরা সাফ্ফ ঃ ১০-১১)

আল্লাহ জুমু'আর সলাত সম্পর্কে বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমু'আর দিনে সলাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হও, বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য উত্তম।" (সূরা জুমু'আ ঃ ৯)

অতএব 'উত্তম' শব্দটি যেমন ফরয বিষয়ে ব্যবহার হয় তেমনি মুস্তাহাব ও নফলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়।

প্রশ্ন ঃ (১৯৯) টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে আযান দিলে আযান হবে কি?

উত্তমঃ টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে আযান দিলে বিশুদ্ধ হবে না। কেননা আযান একটি ইবাদাত। আর ইবাদাত করার আগে নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (২০০) মাসজিদে প্রবেশ করার সময় দেখলাম, আযান হচ্ছে– এ সময় কোন কাজটি উত্তম?

উত্তর ঃ উত্তম হচ্ছে, আগে আযানের জবাব দিবে আযানের দু'আ পাঠ করবে। তারপর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা সুন্নাত সলাত শুরু করবে। তবে বিদ্বানদের মধ্যে অনেকে জুমু'আর দিনের বিষয়টিকে ব্যতিক্রম বলেছেন। অর্থাৎ- মাসজিদে প্রবেশ করার সময় যদি দেখে যে, খুতবার জন্য দ্বিতীয় আযান শুরু হয়ে গেছে, তখন আযানের জবাব না দিয়ে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত শুরু করে দিবে। যাতে করে খুতবা শোনতে পারে। কারণ হচ্ছে, খুতবা শোনা ওয়াজিব, আযানের জাবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। সুতরাং যা ওয়াজিব নয় তার চাইতে ওয়াজিবের গুরুত্ব দেয়া উত্তম।

প্রশ্ন ঃ (২০১) আযানের জবাবে 'রাযিতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলা-মি দী-না, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা।' দু'আটি কখন বলতে হবে?

উত্তর ঃ হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, মুআয্‌যিন যখন "আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্।" তখন তার জবাব দিয়ে বলবে, 'রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলা-মি দী-না, ওয়াবি মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা।' কেননা হাদীসে এসেছে ঃ

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا وَبِالإِسْلامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে ঃ "আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্ রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা।"

অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ "যে বলবে, 'আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি'।" এ কথাটি প্রমাণ করে যে, উক্ত দু'আটি মুআয্যিনের 'আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্' বলার পর পরই বলবে।

প্রশ্ন ঃ (২০২) আযানের দু'আর শেষে "ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মী'আ-দ" বাক্যটি বৃদ্ধি করে পড়া কি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর ঃ হাদীসে শাস্ত্রের পণ্ডিতদের মধ্যে এ বাক্যটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা সহীহ্ নয়। এটা শায[১]। কেননা আযানের দু'আর ব্যাপারে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের অধিকাংশই এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। বিশুদ্ধ হলে তো তা বাদ দেয়া বৈধ নয়। দু'আ ও প্রশংসার বাক্যে বা অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন শব্দ ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা এটা দ্বারা ইবাদাত সম্পন্ন করা হয়।

বিদ্বানদের মধ্যে অন্যরা বলেছেন ঃ এর সনদ সহীহ্। এটা বলা যায় এতে কোন বাধাও নেই। শায়খ আবদুল আযীয বিন বায বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্। বায়হাক্বী সহীহ্ সনদে এটা বর্ণনা করেছেন।[২]

প্রশ্ন ঃ (২০৩) ইক্বামাতের শব্দগুলো কি মুক্তাদীদেরকেও বলতে হবে?

উত্তর ঃ ইক্বামাত বলার সময় তার পিছে পিছে শব্দগুলো উচ্চারণ করার ব্যাপারে একটি হাদীস আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে।[৩] কিন্তু তা যঈফ। যা গ্রহণের অযোগ্য। অতএব তা না বলাই ভাল।

প্রশ্ন ঃ (২০৪) ইক্বামাতে 'ক্বাদক্বামাতিস্ সলাত' বলার সময় 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুআয্যিন যখন ইক্বামাতে 'ক্বাদক্বামাতিস্ সলাত' বলত, তখন তিনি বলতেন,

---

[১]. নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারী যদি এমন হাদীস বর্ণনা করেন, যা তার চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসের বিপরীত, তবে সেই হাদীসকে শায বলা হয়। শায হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্গত।

[২]. বায়হাকী সুনান গ্রন্থে ১/৪১০। দ্রষ্টব্যঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৮৮। ফাতাওয়া বিন বায ঃ ১০/ ৩৬৪, ৩৬৫।

[৩].আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত । ইবনু হাজার 'তালখীস' গ্রন্থে (১/২১২)বলেন, হাদীসটি যঈফ।

www.pathagar.com

'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'।[১] কিন্তু হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ঃ (২০৫) সলাত আদায় করার জন্য উত্তম সময় কি? প্রথম সময়ই কি সর্বোত্তম?

উত্তর ঃ শরীয়ত নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করাই সলাতের পূর্ণাঙ্গরূপ। এজন্য 'আল্লাহ্‌র কাছে কোন্ আমলটি উত্তম?' এ প্রশ্নের জবাবে নবী ﷺ বলেন, "সময়মত সলাত আদায় করা।"[২] হাদীসে এ কথা বলা হয়নি 'সলাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা।' কেননা কিছু সলাত তো এমন আছে যা সময়ের আগেই আদায় করা সুন্নাত।[৩] আর কিছু সলাত এমন আছে যা সময় হওয়ার পরও দেরী করে আদায় করা সুন্নাত। যেমন এশা সলাত রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা সুন্নাত। অতএব কোন নারী যদি প্রশ্ন করে, গৃহে অবস্থানের সময় যদি আমি এশা সলাতের আযান শুনি, তবে আমার জন্য কোনটি উত্তম- আযানের পর পর এশা সলাত আদায় করে নেয়া নাকি রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা?

জবাবে বলব, তার জন্য উত্তম হচ্ছে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে এশা সলাত আদায় করা। কেননা নবী ﷺ একদা রাতে বের হতে দেরী করলেন। এমনকি লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নারী ও শিশুরা তো ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর তিনি বের হয়ে সলাত আদায় করলেন এবং বললেন, إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي "এটাই এ সলাতের সময়। আমার উম্মাতের উপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম (তবে এশা সলাতের জন্য এ সময়টাকে নির্ধারণ করে দিতাম।)[৪] অতএব নারী নিজ গৃহে অবস্থানের সময় তার জন্য উত্তম হচ্ছে দেরী করে এশা সলাত আদায় করা।

অনুরূপভাবে একদল লোক যদি [সফরে] থাকে (যেখানে আশেপাশে কোন মাসজিদ নেই।) তারা যদি প্রশ্ন করে এশা সলাত কি আমরা দ্রুত পড়ে নিব নাকি দেরী করব? জবাবে বলব ঃ তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে, দেরী করা।

---

[১]. আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত। হাফেয ইবনু হাজার 'তালখীস' (১/২১১) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি যঈফ। শায়খ আলবানীও 'ইরউয়া' গ্রন্থে হাদীসটিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন ১/২৫৮।

[২]. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাওয়াক্বীত। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[৩]. যেমন সফর অবস্থায় কখনো কখনো আছরের সলাতকে যোহরের সাথে অগ্রিম আদায় করা এবং এশা সলাতকে অগ্রিম মাগরিবের সলাতের সাথে আদায় করা জায়েয।

[৪]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসজিদ।

www.pathagar.com

অবশ্য দেরী করলে যদি কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে আগেভাগে পড়ে নেয়াই উত্তম।

অন্যান্য সলাতগুলোর ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, আগেভাগে প্রথম ওয়াক্তেই সলাত আদায় করা। ফজর, যোহর, আসর ও মাগরিব সলাতসমূহ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করবে। কিন্তু যদি দেরী করার কোন কারণ থাকে, তবে দেরী করাই উত্তম হবে।

দেরী করার কারণ যেমন, গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড তাপদাহ শুরু হয়, তখন যোহর সলাত দেরী করে ঠাণ্ডা সময়ে আদায় করা উত্তম। অর্থাৎ- আসর সলাতের কিছুক্ষণ আগে। কেননা আসরের ওয়াক্ত নিকটবর্তী হলে তাপমাত্রা কমে আসে। এ কথার দলীল ঃ নবী ﷺ বলেন,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

"তাপমাত্রা প্রচণ্ড হলে, যোহর সলাত কে দেরী করে ঠাণ্ডার সময়ে আদায় করবে। কেননা প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের কঠিন প্রখরতা থেকে আসে।"[১]

নবী ﷺ সফরে থাকাবস্থায় সলাতের সময় হলে বিলাল আযান দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেন। তখন তিনি তাকে বলতেন "ঠাণ্ডা কর"। কিছুক্ষণ পর আবার আযানের জন্য উঠতেন। তিনি বলতেন, "ঠাণ্ডা কর।" (অর্থাৎ- রোদের তাপ কম হওয়ার অপেক্ষা কর।) কিছুক্ষণ পর বিলাল আযান দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন। তখন তিনি তাকে আযান দেয়ার অনুমতি দিতেন।[২]

দেরী করে সলাত আদায় করা উত্তম হওয়ার আরো কারণ এমন হতে পারেঃ যেমন, প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করলে জামা'আত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় দেরী করে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করাই উত্তম। যেমন একজন লোক মাঠে-ময়দানে কর্মরত অবস্থায়। সলাতের সময় হয়ে গেছে। সে জানে, লোকালয়ে গেলে শেষ সময়ে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করতে পারবে। এর জন্য কোনটি উত্তম- সময় হওয়ার সাথে সাথে একাকি সলাত আদায় করে নেয়া, নাকি দেরী করে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা?

---

[১] .বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ কঠিন গরমের সময় যোহর সলাতকে ঠাণ্ডা করে আদায় করা। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ যোহর সলাতকে ঠাণ্ডার সময়ে আদায় করা।

[২] .বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ কঠিন গরমের সময় যোহর সলাতকে ঠাণ্ডা করে আদায় করা। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ যোহর সলাত কে ঠাণ্ডার সময়ে আদায় করা।

www.pathagar.com

জবাবে বলব, এর জন্য উত্তম হচ্ছে ঃ দেরী করে জাম'আতের সাথে সলাত আদায় করা। বরং আমি বলি, জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করার জন্য দেরী করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ (২০৬) অজ্ঞতাবশতঃ সময় হওয়ার আগেই সলাত আদায় করে নেয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ সময় হওয়ার আগে সলাত আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না।

কেননা আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক সলাতের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ "যোহরের সময় শুরু হবে- সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে...।"[১] এভাবে প্রত্যেক সলাতের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি সময় হওয়ার আগেই সলাত আদায় করে নিবে তা ফরয হিসেবে আদায় হবে না। তবে তা নফল হয়ে যাবে। তাকে নফলের সাওয়াব দেয়া হবে। অতএব সময় হওয়ার পর ঐ সলাত তাকে পুনরায় পড়তে হবে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

ক্বাযা সলাতের তারতীব বা ধারাবাহিকতা।

প্রশ্ন ঃ (২০৭) ভুল এবং অজ্ঞতার কারণে ক্বাযা সলাত সমূহের তারতীব বা ধারাবাহিকতা কি রহিত হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকড়াও করিও না।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৬)

নবী ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ এশার পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ।

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন আমার উম্মাতের ভুলে যাওয়া ও ভুলক্রমে করে ফেলা বিষয়ের পাপ এবং যে বিষয়ে তাকে জোর-জবরদস্তি করা হয়।"[১]

প্রশ্ন ঃ (২০৮) এশা সলাতের জন্য মাসজিদে প্রবেশ করে মনে পড়ল, মাগরিব সলাত বাকী আছে, এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ মাসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে যে, এশার সলাত দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর মনে পড়ল যে, মাগরিব সলাত আদায় করেনি। তখন মাগরিব সলাতের নিয়ত করে এশার জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে। ইমাম তৃতীয় রাক'আত শেষে চতুর্থ রাক'আতের জন্য দণ্ডায়মান হলে- বসে পড়বে এবং পূর্ণ তাশাহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে ইমামের অপেক্ষা করবে। তারপর ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। অবশ্য একাকী সালাম ফিরিয়ে ইমামের অবশিষ্ট সলাতে এশার নিয়তে শামিল হলেও কোন অসুবিধা নেই।

ইমামের সাথে নিয়তের ভিন্নতা হলে কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও এটিই বিশুদ্ধ মত।

আর যদি একাকী মাগরিব সলাত আদায় করার পর এশার জামা'আতে শামিল হয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

একাধিক সলাত ছুটে গেলে কাযা আদায় করার নিয়ম কি?

প্রশ্ন ঃ (২০৯) নিদ্রা বা ভুলে যাওয়ার কারণে যদি আমার এক বা ততোধিক ফরয সলাত ছুটে যায়, তবে তা কাযা আদায় করার নিয়ম কি? প্রথমে কি বর্তমান সময়ের সলাত আদায় করব তারপর কাযা সলাত আদায় করব? নাকি আগে কাযা সলাতসমূহ তারপর বর্তমান সলাত আদায় করব?

উত্তর ঃ ছুটে যাওয়া কাযা সলাতসমূহ প্রথমে আদায় করবে। তারপর বর্তমান সময়ের সলাত আদায় করবে। দেরী করা ঠিক হবে না। মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, কারো যদি একাধিক ফরয সলাত ছুটে গিয়ে থাকে, তবে ঐ সলাতের সময় উপস্থিত হলে তার কাযা আদায় করবে। যেমন, আজ কারো ফজর সলাত ছুটে গেছে। সে উক্ত সলাত পরবর্তী দিন ফজরের সময়ে কাযা আদায় করবে। এটা মারাত্মক ভুল এবং নবী ﷺ-এর বাণী ও কর্মের বিরোধী।

---

[১]. ইবনু মাজাহ্, আধ্যায় ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে ও বাধ্যগত ব্যক্তির তালাক।

www.pathagar.com

নবী ﷺ-এর বাণী ঃ

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"যে ব্যক্তি সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, সে যেন এটা আদায় করে যখনই স্মরণ হবে।"[১]

এখানে এরূপ বলা হয়নি, দ্বিতীয় দিন তা আদায় করে নিবে।

নবী ﷺ-এর কর্ম ঃ খন্দক যুদ্ধের সময় তাঁর কয়েকটি সলাত ছুটে যায়। তখন তিনি বর্তমান সময়ের সলাতের আগেই উক্ত সলাতগুলোর কাযা আদায় করেন।

অতএব ছুটে যাওয়া সলাতের ক্বাযা প্রথমে আদায় করবে তারপর বর্তমান সময়ের সলাত আদায় করবে। কিন্তু যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ ক্বাযা সলাতের আগে বর্তমান সময়ের সলাত আদায় করে ফেলে তবে তা বিশুদ্ধ হবে। কেননা এটা তার ওযর।

উল্লেখ্য যে, ক্বাযা সলাতসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম প্রকার ঃ দেরী করার ওযর দূর হয়ে গেলেই ক্বাযা আদায় করে নিবে। তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে বিতর ও সুন্নাত সলাতসমূহ।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যার পরিবর্তে অন্য সলাত ক্বাযা হিসেবে আদায় করবে। তা হচ্ছে, জুমু'আর সলাত। এ সলাত ছুটে গেলে তার পরিবর্তে যোহর সলাত আদায় করবে। কেউ যদি জুমু'আর দিন ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর সলাতে শামিল হয়, তবে সে যোহর সলাত আদায় করবে। ঐ অবস্থায় যোহরের নিয়ত করে ইমামের সাথে সলাতে শামিল হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইমামের সালামের পর আসে তবে সেও যোহর পড়বে।

তবে কেউ যদি দ্বিতীয় রাক'আতে ইমামের সাথে রুকূ পায়, তবে সে জুমু'আর সলাতই আদায় করবে। অর্থাৎ- ইমাম সালাম ফিরলে এক রাক'আত আদায় করবে। অনেক লোক ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর জুমু'আর সলাতে শামিল হয়। অতঃপর সালাম শেষে জুমু'আর সলাত হিসেবে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে, এটা ভুল। বরং তার জন্য উচিত হচ্ছে ইমামের সালাম ফেরানোর পর যোহর হিসেবে চার রাক'আত সলাত আদায় করা। কেননা নবী ﷺ বলেছেন,

---

[১]. সহীহুল বুখারী অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাত ভুলে যায় স্মরণ হলেই যেন আদায় করে নেয়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ ঃ কাযা সলাত আদায় করা।

www.pathagar.com

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.

"যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সলাত পেয়ে গেল।"[১]

এ দ্বারা বুঝা যায়, কেউ যদি এর কম পায় সে সলাত পেল না। তখন জুমু'আর কাযা আদায় করবে যোহর সলাত আদায় করার মাধ্যমে। এ কারণে নারীরা বাড়িতে, মাসজিদে আসতে অপারগ অসুস্থ ব্যক্তিরা যোহর সলাত আদায় করবে। তারা জুমু'আ আদায় করবে না। তারা যদি জুমু'আ আদায়ও করে, তাদের সলাত প্রত্যাখ্যাত হবে- বাত্বিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় প্রকার ঃ এমন সলাত যা ছুটে যাওয়া সময়েই ক্বাযা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে ঈদের সলাত। ঈদের দিন সম্পর্কে জানা গেল না। কিন্তু সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর জানা গেল যে, আজকে ঈদের দিন ছিল। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ বলেন, পরবর্তী দিন সকাল বেলা উক্ত ঈদের সলাতের কাযা আদায় করতে হবে। কেননা ঈদের সলাত আদায় করার সময় হচ্ছে সকাল বেলা।

অধিক পাতলা পোশাকে সলাত আদায় করার বিধান কি?

প্রশ্ন ঃ (২১০) কোন কোন লোক এমন পাতলা পোশাকে সলাত আদায় করে যে, বাইরে থেকে তার শরীরের রং বুঝা যায়। নীচে রানের আধাআধি পর্যন্ত ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়া পরিধান করে। পাতলা কাপড়ের কারণে রানের বাকী অর্ধেক অংশ স্পষ্টই দেখা যায়। এদের সলাতের বিধান কি?

উত্তর ঃ এদের সলাতের বিধান ঐ লোকদের সলাতের মত যারা বিনা কাপড়ে শুধু খাটো পায়জামা বা জাঙ্গিয়া পরিধান করে সলাত পড়ে। কেননা এমন পাতলা পোশাক যা দ্বারা শরীরের সুস্পষ্ট বিবরণ বুঝা যায়, সতরের স্থানসমূহ ঢেকে রাখে না তা পরিধান করা না করা উভয়ই সমান। তাই তাদের সলাতও বিশুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে উলামাদের দু'টি মত পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক মতটি হচ্ছে, তাদের সলাতও বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মাযহাবেও এ মতটি ব্যাপক প্রসিদ্ধ। কেননা সলাতে পুরুষের জন্য সর্বনিম্ন

---

[১]. সহীহুল বুখারী অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পায়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সলাত পেয়ে গেল ।

www.pathagar.com

সতর হচ্ছে- নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণীর বাস্তবায়ন হয়।

আল্লাহ বলেন, ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সৌন্দর্য গ্রহণ কর।"

অর্থাৎ- পোশাক পরিধান কর। সুতরাং আবশ্যক হচ্ছে, তারা এমন পোশাক পরিধান করবে যা দ্বারা নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যায়। অথবা ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়ার উপরে এমন ধরনের মোটা কাপড় পরিধান করবে, যাতে বাইরে থেকে শরীরের রং বুঝা না যায়।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি বিরাট ভুল ও ভয়ানক। এদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করা। সলাতে এমন পোশাক পরিধান করার চেষ্টা করা- যা আবশ্যক সতর ঢেকে রাখে। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে ও মুসলমান ভাইদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাঁর পছন্দনীয় ও রেজামন্দীর পথে চলার তাওফীক দিন। নিশ্চয় তিনি দানশীল ও সম্মানিত।

সামনে, পিছনে ও উভয় পার্শে খোলা থাকে এমন পোশাক পরে নারীর সলাত হবে কি?

প্রশ্ন ঃ (২১১) অনেক মহিলা পোশাক পরিধান করে। যার সামনে, পিছনে ও উভয় পার্শে খোলা থাকে। ফলে পায়ের অনেকাংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এদের কথা হচ্ছে, আমরা তো শুধু নারীদের সামনেই এরূপ পোশাক পরিধান করি? এদের এ পোশাকের বিধান কি?

উত্তর ঃ আমি যা সঠিক মনে করি তা হচ্ছে নারী এমন পোশাক পরিধান করবে, যা তার শরীরের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, নবী ﷺ-এর যুগে নারীরা এমন ধরনের কামিস পরিধান করতেন যা পায়ের টাখনুদ্বয় এবং হাতের কব্জিদ্বয় পর্যন্ত প্রলম্বিত হত। অতএব নারীর উপর আবশ্যক হচ্ছে নিজ সম্ভ্রমের প্রতি যত্নবান হওয়া। এমন পোশাক পরিধান করা যা তার শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিবে। যাতে করে সে নিম্নলিখিত এই হাদীসের আওতাভুক্ত না হয়। নবী ﷺ বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

www.pathagar.com

"দু'ধরনের জাহান্নামী লোক। এদেরকে আমি এখনো দেখিনি। একদল, যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি থাকবে। লোকদেরকে তারা প্রহার করবে। দ্বিতীয় দল, এমন নারী যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকে। তারা লোকদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে, অহংকারের সাথে হেলে-দুলে চলে। তাদের মাথাগুলো যেন হেলে যাওয়া উটের চুঁড়ার মত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার সুঘ্রাণও পাবে না। নিশ্চয় জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়।"[১]

প্রশ্ন ঃ (২১২) নিক্বাব ও হাত মোজা পরিধান করে কি নারীর সলাত আদায় করা বৈধ?

উত্তর ঃ নারী যদি নিজ গৃহে অথবা এমন স্থানে সলাত আদায় করে, যেখানে পরপুরুষ আগমন করবে না। তবে তার জন্য শরীয়ত সম্মত হচ্ছে, মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় খোলা রাখা। যাতে করে সাজদার সময় কপাল ও নাক এবং উভয় হাত মাটিতে রাখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু সে যদি এমন স্থানে সলাত পড়ে যেখানে বেগানা পুরুষের আনাগোনা রয়েছে, তবে অবশ্যই মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে। কেননা গাইর মাহরাম (যার সাথে বিবাহ সিদ্ধ এমন পর পুরুষের) সামনে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তাদের সামনে মুখ খোলা জায়েয নয়। এ কথার দলীল হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি। যা থেকে কোন মু'মিন তো দূরে থাক সাধারণ বিবেকবানও ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না।

হাত মোজা পরিধান করা শরীয়ত সম্মত। মহিলা সাহাবীরা এরূপই করতেন। কেননা নবী ﷺ নারীদের ইহরাম বাঁধার নিয়মের মধ্যে উল্লেখ করেছেন ঃ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "ইহরামকারী নারী নিক্বাব পরবে না হাত মোজাও পরিধান করবে না।"[২]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, তাদের সাধারণ অভ্যাস ছিল হাত মোজা পরিধান করা। অতএব পরপুরুষের উপস্থিতিতে হাত মোজা পরিধান করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে দাঁড়ানো, বসা- সর্বাবস্থায়।

---

১. সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ পোশাক পরা উলঙ্গ নারী।

২. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করার জরিমানা। অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামকারী নারী পুরুষের সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

তবে সাজদার সময় মুখমণ্ডলের কাপড় সরিয়ে কপাল ও নাকের উপর সাজদা করবে।

প্রশ্ন ঃ (২১৩) অজানা অবস্থায় কাপড়ে নাপাকি নিয়ে সলাত আদায় করলে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাত সম্পন্ন করার পর জানা গেল যে, কাপড়ে নাপাকি ছিল। অথবা কাপড়ে নাপাকি থাকার কথা আগে থেকেই জানতো কিন্তু ভুলে গিয়েছে, সলাত শেষ হওয়ার পর সে কথা স্মরণ হল। এ অবস্থায় তাদের সলাত বিশুদ্ধ হবে। পুনরায় সলাত ফিরিয়ে পড়ার দরকার নেই। কেননা সে তো এই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে না জেনে অথবা ভুলক্রমে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৬)

"আল্লাহ বলেন, আমি তাই করলাম।"[১] অর্থাৎ- পাকড়াও করলাম না।

একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুতা নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। কিন্তু তাতে ছিল নাপাকি। তিনি তা জানতেন না। জিবরীল (আঃ) সে ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলে সলাত চলাবস্থায় তিনি তা খুলে ফেললেন।[২] এক্ষেত্রে তিনি নতুন করে সলাত আদায় করেননি। এথেকে প্রমাণিত হয়, সলাত অবস্থায় যদি নাপাকির ব্যাপারে জানতে পারে, তবে সলাত অবস্থাতেই তা বিদূরিত করার চেষ্টা করবে- যদি তা বিদূরিত করতে গিয়ে সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়। অনুরূপভাবে যদি ভুলে যায় আর সলাতরত অবস্থায় তা স্মরণ হয়, তবে সতরের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হলে সলাত না ভেঙ্গেই উক্ত কাপড় খুলে ফেলবে।

কিন্তু যদি সলাত শেষ হওয়ার পর স্মরণ হয় বা নাপাকি সম্পর্কে জানতে পারে। তবে সলাত বিশুদ্ধ হবে ফিরিয়ে পড়ার দরকার হবে না।

তবে কেউ যদি ভুলক্রমে ওযূ না করে সলাত আদায় করে। তারপর সলাত শেষে স্মরণ হলো যে, সে বিনা ওযূতে সলাত আদায় করেছে। তবে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ওযূ সম্পাদন করে সলাত ফিরিয়ে পড়া। অনুরূপভাবে

---

[১]. সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ সাধ্যের বাইরে আল্লাহ কোন কিছু চাপিয়ে দেননি।
[২]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরে সলাত আদায় করা।

www.pathagar.com

কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলক্রমে শরীরে নাপাকি নিয়ে সলাত আদায় করে, অতঃপর কাপড়ে বীর্য দেখে জানতে পারে বা নাপাকির কথা স্মরণ হয় তবে যতগুলো সলাত সে অপবিত্রাবস্থায় আদায় করেছিল সবগুলোই ফিরিয়ে পড়বে।

উভয় মাসআলায় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথম মাসআলাটি- অর্থাৎ কাপড়ে নাপাকী নিয়ে সলাত আদায় করা হচ্ছে, নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করা। আর দ্বিতীয়টি- অর্থাৎ- বিনা ওযূতে বা শরীর নাপাক অবস্থায় সলাত আদায় করা- হচ্ছে, নির্দেশিত বিষয় যা ওযূ-গোসলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হবে। আর নির্দেশিত বিষয় অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। বিষয়টির উপস্থিতি ব্যতিরেকে ইবাদাত বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু কাপড়ে নাপাকির বিষয়টি হচ্ছে না থাকা। অর্থাৎ- ওটার অনুপস্থিতি ব্যতীত সলাত বিশুদ্ধ হবে না। অতএব অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলক্রমে যদি তা উপস্থিত থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, সলাতের আবশ্যক কোন কিছু এখানে ছুটে যায়নি।

টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করার শাস্তি কি?

প্রশ্ন ঃ (২১৪) টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা যদি অহংকারবশতঃ হয় তবে তার শাস্তি কি? কিন্তু যদি অহংকারবশতঃ না হয় তবে তার শাস্তি কি? আবূ বাক্‌রের হাদীস দ্বারা যারা দলীল পেশ করে তাদের দাবীর কি জবাব?

উত্তর ঃ লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি কাপড় যদি পায়ের টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করা হয় এবং তার উদ্দেশ্য হয় অহংকার করা, তবে তার শাস্তি হল- কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তার দিকে দৃষ্টি দিবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আর যদি অহংকারের সাথে নয় বরং সাধারণভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তবে তার শাস্তি হল- তার টাখনুদ্বয়কে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে।

কেনন নবী ﷺ বলেন

﴿ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ﴾

অর্থ: "কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। সেই তিন ব্যক্তি হল- ১) পায়ের টাখনুর নীচে কাপড়

www.pathagar.com

ঝুলিয়ে পরিধানকারী। ২) দান করে খোটাদানকারী। ৩) মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী।"[১]

তিনি ﷺ আরো বলেন:

﴿مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ﴾

অর্থ: "যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"[২] এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে।

আর যে ব্যক্তি অহংকারের উদ্দেশ্য ছাড়া কাপড় ঝুলিয়ে পরবে তার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেন:

﴿ مَا أَسْفَلَ الكعبين مِــنَ الإزَارِ فَفِيْ النَّــارِ﴾

অর্থ: "যে টাখনুদ্বয়ের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হল তা আগুনের মধ্যে জলবে।"[৩] এ হাদীসে দোজখের আগুনে টাখনু জ্বলার ব্যাপারে অহংকারের কথা উল্লেখ নেই।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন:

﴿إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلى نِصْفِ السَّاقِ وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَــا بَيْنَــهُ وَبَــيْنَ الْكَعْبَيْنِ ومَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُــرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

অর্থ: "মুমিন ব্যক্তির কাপড় নেসফে সাক তথা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত, এতে কোন অসুবিধা নেই"। (হাঁটু থেকে পায়ের তলার মধ্যভাগকে নেসফে সাক বলা হয়)। অন্য বর্ণনায় তিনি ﷺ এরূপ বলেন: "পায়ের টাখনু এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী

---

[১]. সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করা কঠিনতম হারাম হওয়ার বর্ণনা।

[২]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার বশতঃ যে ব্যক্তি কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে। সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা হারাম।

[৩]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে তা জাহান্নামে।

www.pathagar.com

স্থানে কাপড় পরিধান করাতে কোন অসুবিধা নেই। যে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হবে তা জাহান্নামে যাবে। এবং যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"[১]

অনেকে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে এবং যুক্তি দেখায় যে আমি তো অহংকার বশতঃ কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরি নাই, সুতরাং এতে তেমন অসুবিধা নেই। উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ ব্যক্তির যুক্তি সম্পূর্ণ অসার।

অতএব অহংকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিই সাধারণভাবে কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরলেই জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আর তার সাথে যদি অহংকারযুক্ত হয় তবে তার শাস্তি আরো কঠিন, তা হল– আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আবূ বাক্র (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যারা দলীল পেশ করতে চায় দু'দিক থেকে তাদের যুক্তি অসাড় ঃ

প্রথম কথা ঃ আবূ বাক্র (রাঃ) বলেছেন, আমার কাপড়ের এক পার্শ্ব (অনিচ্ছাকৃত) ঝুলে পড়ে কিন্তু আমি তা বারবার উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।"[২] অতএব তিনি তো ইচ্ছাকৃত এ কাজ করতেন না। বরং তাঁর শরীর অধিক ক্ষীণ হওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলে যেত। তাছাড়া তিনি তা উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যারা কাপড় ঝুলিয়ে পরে এবং ধারণা করে যে, তারা অহংকার করে না, তারা তো ইচ্ছাকৃত এ কাজ করে। অতএব তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলব, অহংকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলিয়ে পরলে তার টাখনু জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। যেমনটি আবূ হুরায়রার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি অহংকারবশতঃ হয় তবে তার শাস্তি হচ্ছে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

---

[১]. আহমাদ। আবূ দাউদ অধ্যায় ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ লুঙ্গীর সীমানা নির্ধারণ। (হাঃ ৪০৯৩) ইবনু মাজাহ অধ্যায় ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ লুঙ্গী কোন্ পর্যন্ত থাকবে? (হাঃ ৩৫৭৩) নাসায়ী, অধ্যায় ঃ সৌন্দর্য, অনুচ্ছেদ ঃ লুঙ্গীর সীমানা। মালিক ২/২১৭।

[২]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কথা ঃ নবী ﷺ নিজেই আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন, যারা অহংকারবশতঃ এ কাজ করে থাকে। অতএব বর্তমানে এরা কি নবীজীর এ পরিশুদ্ধি ও সাক্ষ্য লাভ করেছে? কিন্তু শয়তান প্রবৃত্তির অনুসারী লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তিসমূহকে খেয়াল-খুশির উপর ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন তারা বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন।

ফরয গোসল না করেই সলাত পড়ে ফেললে করণীয় কি?

প্রশ্ন ঃ (২১৫) এক ব্যক্তি সলাত সম্পন্ন করার পর জানল যে, সে জুনুব (গোসলাবশ্যকাবস্থায়) ছিল, অর্থাৎ তার উপর গোসল ফরয ছিল। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ যে কোন মানুষ সলাত আদায় করার পর যদি জানতে পারে যে, সে ছোট নাপাকী বা বড় নাপাকীতে লিপ্ত ছিল। তথা ওযূ বা গোসল ফরয ছিল। তবে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন করে উক্ত সলাত পুনরায় আদায় করা।

কেননা নবী ﷺ বলেছেন, لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.
"পবিত্রতা ব্যতীত কোন সলাত কবূল করা হবে না।"[১]

প্রশ্ন ঃ (২১৬) সলাত রত অবস্থায় নাক থেকে রক্ত বের হলে কি করবে?

উত্তর ঃ নাক থেকে রক্ত বের হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। রক্ত কম বের হোক বা বেশী। অনুরূপভাবে দু'রাস্তা (পেশাব-পায়খানার রাস্তা) ছাড়া শরীরের অন্য যে কোন স্থান থেকে কোন কিছু বের হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। যেমন বমী, পুঁজ প্রভৃতি। চাই তা কম হোক বা বেশী হোক ওযূ ভঙ্গ হবে না। কেননা এগুলোর ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয়নি।

আসল হচ্ছে পবিত্রতা। এ পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে শরঈ দলীলের ভিত্তিতে। আর যা শরঈ দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তা খণ্ডন করার জন্য শরঈ দলীল প্রয়োজন। কিন্তু দু'টি রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য স্থান থেকে কোন কিছু বের হলে ওযূ ভঙ্গের কোন শরঈ দলীল নেই। অতএব নাক থেকে রক্ত

---

[১]. সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতের জন্য পবিত্রতা আবশ্যক।

www.pathagar.com

বের হলে বা বমী হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কম হোক বা বেশী হোক। কিন্তু যেহেতু এ অবস্থায় বিনয়ের সাথে সলাত আদায় করা দুস্কর হয়ে পড়ে এজন্য সলাত থেকে বের হতে কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে সলাত যদি মাসজিদের মধ্যে হয় আর নাকের রক্ত বা বমি পড়ে মাসজিদের পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; তবে মাসজিদ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। কিন্তু অল্প রক্ত কাপড়ে পড়লে কাপড় নাপাক হবে না।

প্রশ্ন ঃ (২১৭) কোন মাসজিদে কবর থাকলে সেখানে সলাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর ঃ কবর সংশ্লিষ্ট মাসজিদে সলাত আদায় করা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম প্রকার ঃ প্রথমে কবর ছিল। পরবর্তীতে তাকে কেন্দ্র করে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে এ মাসজিদ পরিত্যাগ করা; বরং মাসজিদ ভেঙ্গে ফেলা। যদি না করা হয় তবে মুসলিম শাসকের উপর আবশ্যক হচ্ছে উক্ত মাসজিদ ধ্বংস করে ফেলা।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ প্রথমে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। পরে সেখানে কোন মৃতকে দাফন করা হয়েছে। তখন ওয়াজিব হচ্ছে, কবর খনন করে মৃত ব্যক্তি বা তার হাড়-হাড্ডি সেখান থেকে উত্তোলন করে, মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করবে। কিন্তু এ মাসজিদে শর্ত সাপেক্ষে সলাত আদায় করা জায়েয। আর তা হচ্ছে, কবর যেন মাসজিদের সম্মুখভাগে না হয়। কেননা নবী ﷺ কবরের দিকে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

নবী ﷺ-এর কবর যা মাসজিদে নববীর মধ্যে শামিল। এর জবাব হচ্ছে, নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেই মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এ কথা সবার জানা যে, তাঁকে মাসজিদের মধ্যে দাফন করা হয়নি। বরং তাঁকে মাসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন নিজ গৃহে দাফন করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ৮৮ হিঃ সনে খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তার অধিনস্থ মদীনার আমীর ওমর বিন আবদুল আযীযকে পত্র মারফত নির্দেশ প্রদান করে, মাসজিদে নববী ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করার সময় যেন উম্মুল মু'মিনীন তথা নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের গৃহগুলোকে মাসজিদের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। তখন ওমর বিন আবদুল আযীয মদীনার নেতৃস্থানীয় লোক এবং ফিক্বাহবিদদেরকে একত্রিত করে তাঁদের সামনে খলীফার পত্র পড়ে শোনান। বিষয়টি তাদের কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। তারা বললেন, কবর ও গৃহগুলোকে বর্তমান অবস্থাতেই রেখে

www.pathagar.com

দেয়া উচিত। উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এটাই সর্বাধিক সঠিক উপায়। বর্ণিত আছে যে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহ তথা নবী ﷺ-এর কবর শরীফকে মাসজিদের মধ্যে শামিল করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে বাধা প্রদান করেন। কেননা তিনি আশংকা করছিলেন যে, এ কবরকে মাসজিদে রূপান্তরিত করা হতে পারে। যা হাদীসের ভাষায় নিষিদ্ধ। বিষয়টি ওমর লিখে পাঠালেন খলীফা ওয়ালিদের কাছে। কিন্তু ওয়ালিদ তার নির্দেশই বাস্তবায়ন করার আদেশে অটল রইলেন। ফলে বাধ্য হয়ে ওমর খলীফার নির্দেশ মোতাবেক কবরকে মাসজিদের মধ্যে শামিল করে ফেললেন।

অতএব আপনি দেখলেন, নবী ﷺ-এর কবর মূলতঃ মাসজিদের মধ্যে দেয়া হয়নি। আর কবরের উপর মাসজিদও বানানো হয়নি। সুতরাং যারা মাসজিদে দাফন করা বা কবরের উপর মাসজিদ তৈরীর বৈধতার পক্ষে কথা বলে তাদের কোন দলীল নেই। নবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে তিনি বলেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিসম্পাত), তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মাসজিদে রূপান্তরিত করেছে।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুমূর্ষু অবস্থায় ইয়াহূদী খৃষ্টানদের কার্যকলাপ থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করার উদ্দেশে উপরোক্ত বাণী পেশ করেন। উম্মে সালামা (রাঃ) হাবশায় হিজরত করে খৃষ্টানদের গীর্জা বা উপাসনালয়ে স্থাপিত বহু মূর্তি দেখেছিলেন। বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন,

أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

"ওরা এমন জাতি, তাদের মধ্যে কোন নেক বান্দা বা সৎলোক মৃত্যুবরণ করলে তার কবরের উপর তারা মাসজিদ তৈরী করত এবং ঐ মূর্তিগুলো স্থাপন করত। ওরা আল্লাহ্‌র কাছে সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট।"[২]

---

[১]. সহীহুল বুখারী অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ উপাসনালয়ে সলাত আদায় করা। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর মাসজিদ বানানো নিষেধ।

[২]. সহীহুল বুখারী অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, "সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হচ্ছে তারা, যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে। আর যারা কবরসমূহকে মাসজিদে রূপান্তরিত করেছে।"[১] ইমাম আহমাদ উত্তম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

অতএব মু'মিন কখনই ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্তুষ্ট হবে না এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হবে না।

টয়লেটের ছাদের উপর সলাত আদায় করার বিধান কি?

প্রশ্ন ঃ (২১৮) টয়লেটের ছাদের উপর সলাত আদায় করার বিধান কি? নাপাক উচ্ছিষ্ট একত্রিত করা হয় এমন ঘরের ছাদে সলাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর ঃ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত টয়লেটসমূহের ছাদের উপর সলাত আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আমাদের টয়লেটসমূহ বিশেষভাবে আলাদা করে বানানো হয় না। এর ছাদ অন্যান্য ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট করেই বানানো হয়। অনুরূপভাবে নাপাক উচ্ছিষ্ট একত্রিত করা হয় এ রকম ঘরের ছাদে সলাত আদায় করতেও কোন অসুবিধা নেই।

কেননা নবী ﷺ বলেন, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

"জমিনের সকল স্থান আমার জন্য মাসজিদ তথা সলাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করে দেয়া হয়েছে।"[২]

প্রশ্ন ঃ (২১৯) মাসজিদুল হারামের জমিনে (Floor) জুতা নিয়ে হাঁটার বিধান কি?

উত্তর ঃ মাসজিদুল হারামের জমিনে (Floor) জুতা নিয়ে হাঁটা-হাঁটি করা উচিত নয়। কেননা যারা মাসজিদের সম্মান বুঝে না এতে তারা সুযোগ পাবে। ফলে জুতায় পানি বা ময়লা নিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং মাসজিদের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে ফেলবে। বিদ্বানদের নিকট মূলনীতি হচ্ছে ঃ "কল্যাণ ও ক্ষতির সংঘর্ষ যদি বরাবর হয় অথবা ক্ষতির আশংকা বেশী হয়; তখন কল্যাণের দিকে যাওয়ার চাইতে ক্ষতিকর বিষয়কে প্রতিহত করা অধিক উত্তম।"

---

[১]. আহমাদ, ১/ ৪০৫, ৪৩৫।

[২]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী আমার জন্য যমীনকে মাসজিদ করা হয়েছে...।

www.pathagar.com

নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের পর কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা কুফরী ছেড়ে ইসলামে নতুন প্রবেশ করার কারণে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তাই তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন,

لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَـــابَيْنِ بَـــابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ.

"তোমার স্বজাতির লোকেরা যদি কুফরী ছেড়ে ইসলামে নতুন প্রবেশকারী না হতো, তবে আমি এই কা'বা ঘর ভেঙ্গে (ইবরাহীমের ভিত্তির উপর) পুনঃনির্মাণ করতাম। ঘরের দু'টি দরজা রাখতাম একটিতে লোকেরা প্রবেশ করতো অন্যটি দ্বারা বের হতো।"[১]

প্রশ্ন ঃ (২২০) ক্বিবলা থেকে সামান্য সরে গিয়ে সলাত আদায় করলে কি সলাত ফিরিয়ে পড়তে হবে?

উত্তর ঃ ক্বিবলার দিক থেকে সামান্য সরে গেলে সলাতে কোন ক্ষতি হবে না। এ বিধান ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে মাসজিদে হারামের বাইরে থাকে। কেননা মাসজিদে হারামে সলাত আদায়কারীর ক্বিবলা হচ্ছে মূল কা'বা। এজন্যই উলামাগণ বলেছেন ঃ কা'বা শরীফ অবলোকন করা যার জন্য সম্ভব হবে, তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মূল কা'বার সম্মুখবর্তী হওয়া। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তি যদি মূল কা'বার সম্মুখবর্তী না হয়ে শুধু ক্বিবলার দিকে মুখ ফেরায় তবে তার সলাত বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

"আপনার মুখমণ্ডল মাসজিদে হারামের দিকে ফেরান। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন সেদিকেই তোমাদের মুখমণ্ডল ফেরাবে।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৪৪)

কিন্তু মানুষ দূরে থাকার কারণে যদি কা'বা দেখতে না পায়- যদিও সে মক্কায় থাকে- তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে ক্বিবলার দিকে মুখ ফেরানো। এক্ষেত্রে মূল ক্বিবলা থেকে সামান্য সরে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। এ কারণে নবী ﷺ মদীনাবাসীদের বলেন, مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ "পূর্ব ও

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও তার বাড়ী ঘরের ফযীলত। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ও তার দেয়াল ভাঙ্গা।

www.pathagar.com

পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে ক্বিবলা।"[১] কেননা মদীনার অধিবাসীগণ দক্ষিণ দিকে মুখ করে সলাত আদায় করেন। সুতরাং তা যদি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি স্থানে হয়, তবেই ক্বিবলা ঠিক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যারা পশ্চিম দিকে সলাত পড়ে। তাদের ক্বিবলা হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণের মাঝামাঝি স্থানে।

প্রশ্ন ঃ (২২১) একদল লোক ক্বিবলামুখী না হয়েই সলাত আদায় করে নিয়েছে। তাদের এ সলাতের কি হবে?

উত্তর ঃ এ মাসআলাটির দু'টি অবস্থা হতে পারে ঃ

প্রথম অবস্থা ঃ তারা এমন স্থানে ছিল, যেখানে থেকে ক্বিবলা কোন দিকে জানা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেমন তারা সফরে ছিল এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফলে ক্বিবলা কোন দিকে বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় অনুমান ও গবেষণা করে ক্বিবলা নির্ধারণ করবে। সলাত শেষে যদি জানা যায়, তাদের ক্বিবলা ঠিক ছিল না। তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা তারা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করেছে। আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর"– (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)। নবী (ﷺ) বলেন, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ করলে, সাধ্যানুযায়ী তোমরা তা বাস্তবায়ন করবে।"[২] আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে এই মাসআলায় বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌র অধিকারে। তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।"

(সূরা বাক্বারা ঃ ১১৫)

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ তারা এমন স্থানে ছিল, কাউকে ক্বিবলা বিষয়ে প্রশ্ন করলেই সমাধান পেয়ে যেত। কিন্তু তারা উদাসীনতা করেছে। তাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে এ সলাত ফিরিয়ে পড়া। এ ভুলের কথা সলাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে জানা যাক বা পরে। কেননা এক্ষেত্রে ক্বিবলা নির্ধারণ

---

[১]. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্বিবলা। ইবনু মাজাহ্ (হাঃ ১০১১) মুস্তাদরাক হাকিম (১/ ২২৫) তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাব ও সুন্নাত আঁকড়ে ধরা, অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ জীবনে একবার হাজ্জ ফরয।

www.pathagar.com

করতে তাদের ভুল হয়ে গেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ক্বিবলা ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু তারা মানুষকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে ভুল করেছে। অলসতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। তবে জানা উচিত ক্বিবলার দিক থেকে সামান্য সরে গেলে সলাতের কোন ক্ষতি হবে না। ডান দিকে বা বাম দিকে সামান্য সরে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। কেননা নবী ﷺ মদীনার অধিবাসীদের বলেন, مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ "পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে ক্বিবলা।"[১] অতএব যারা কা'বা থেকে উত্তর দিকে রয়েছে তাদেরকে আমরা বলবঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্বিবলা। অনুরূপ তাদের ক্ষেত্রে যারা দক্ষিণ দিকে থাকে। আর যারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে থাকে, তাদের ক্বিবলা হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী স্থানে। অতএব সামান্য বাঁকা হলে সলাতে কোন প্রভাব পড়বে না বা ক্ষতি হবে না।

উল্লেখ্য যে, মাসজিদুল হারামে যারা কা'বা ঘর প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম তাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মূল কা'বাকে সামনে রাখা। কেননা মূল কা'বা থেকে কিছুটা বাঁকা হয়ে দাঁড়ালে সে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো না। দেখা যায় অনেক লোক মাসজিদুল হারামে দীর্ঘ কাতারে দাঁড়িয়ে পড়ে, অথচ মূল কা'বার সম্মুখবর্তী হয় না। নিশ্চিতভাবে এদের অনেকেই মূল কা'বা থেকে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। এটা বিরাট ধরনের ভুল। এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া ওয়াজিব। উদাসীন হওয়া উচিত নয়। কেননা এভাবে সলাত আদায় করলে ক্বিবলা ছাড়া সলাত আদায় হবে। ফলে সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অনুপস্থিত রয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ (২২২) নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নবী ﷺ বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى "কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করবে।"[২] নিয়ত আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প। নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর। তা মুখে উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি যখন ওযূ করবেন তখন এটা একটা নিয়ত। একজন বিবেকবান, সুস্থ মস্তিষ্ক বাধ্য করা হয়নি এমন লোক কোন কাজ করবে আর সেখানে তার কোন

[১]. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্বিবলা। ইবনু মাজাহ্ (হাঃ ১০১১) মুস্তাদরাক হাকিম (১/ ২২৫) তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন।

[২]. বুখারী অধ্যায় ঃ ওহীর সূচনা। হাঃ ১ মুসলিম, অধ্যায় ঃ ইমারত হাঃ ৩৫৩০

www.pathagar.com

নিয়ত বা ইচ্ছা থাকবে না এটা সম্ভব নয়। এজন্য কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, (নিয়ত ছাড়া কোন আমল করা যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি আবশ্যক করতেন, তবে তা হতো সাধ্যাতিত কাজ চাপিয়ে দেয়ার অন্তর্গত।)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কোন দলীল প্রমাণিত নেই। না প্রমাণিত আছে সাহাবায়ে কেরাম থেকে। যারা মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করে আপনি দেখবেন তারা হয় মূর্খ নতুবা কোন আলিম বা মুরব্বীর অন্ধানুসারী। মুখে নিয়ত পাঠকারীদের যুক্তি হচ্ছে, অন্তরের ইচ্ছার সাথে মুখের কথা ও কাজের মিলের জন্য নিয়ত পাঠ করা উচিত। কিন্তু তাদের এ যুক্তি অসাড়। একাজ শরীয়ত সম্মত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা বা কাজে উম্মাতের সামনে তার বর্ণনা পাওয়া যেত। (আল্লাহ্ই তাওফীকদাতা)

প্রশ্ন ঃ (২২৩) নফল আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ফরয সলাত আদায় করার বিধান কি? যেমন তারাবীহ্র সলাতের ইমামের পিছনে এশা সলাত আদায় করা?

উত্তর ঃ তারাবীহ্র সলাতের ইমামের পিছনে এশা সলাত আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, কোন লোক যদি সফরে থাকে আর তথাকার ইমামকে সলাতের প্রথম থেকেই পায়, তবে তার সাথেই সালাম ফেরাবে। নতুবা ইমামের সালামের পর অবশিষ্ট সলাত পূর্ণ করবে।

মুসাফিরের মুকীম ইমামের পিছনে সলাত আদায়ের বিধান

প্রশ্ন ঃ (২২৪) মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের শেষ দু'রাক'আতে সলাতে শরীক হয়। তবে কসরের নিয়ত করে উক্ত দু'রাক'আত শেষে ইমামের সাথে সালাম ফেরানো জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ কোন মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের পিছনে সলাতে দণ্ডায়মান হয়, তবে কসরের নিয়ত করা জায়েয হবে না। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا "ইমামের সাথে তোমরা যেটুকু সলাত পাবে তা আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা সালামের পর পূর্ণ করবে।"[১] অতএব মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের সাথে শেষ দু'রাক'আতে শামিল হয়, তবে

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ ধীরস্থীরভাবে মাসজিদে আগমন করা।

www.pathagar.com

ইমামের সালামের পর অবশিষ্ট দু'রাক'আত পূর্ণ করা ওয়াজিব। (আল্লাহ অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (২২৫) সলাতে শামিল হওয়ার জন্য দ্রুত পায়ে হেঁটে আসার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাতে শামিল হওয়ার জন্য দ্রুত পায়ে হেঁটে আসা নিষিদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"যখন সলাতের ইক্বামাত প্রদান করা হয় তখন তাড়াহুড়া করে সলাতের দিকে আসবে না। বরং হেঁটে হেঁটে ধীরস্থিরতার সাথে এবং শান্তভাবে আগমন করবে। অতঃপর সলাতের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।"[১] অবশ্য কোন কোন বিদ্বান বলেন, ইমাম যদি রুকূতে থাকে তখন রুকূ পাওয়ার জন্য সামান্য জোরে হেঁটে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু লোকেরা খুব জোরে হাঁটে বা দৌড় শুরু করে। এটাই নিষিদ্ধ। কিন্তু হাদীসের প্রতি আমল করে ধীর-স্থির ও শান্তভাবে হেঁটে যাওয়াই উত্তম- যদিও এক বা ততোধিক রাক'আত ছুটে যায়।

প্রশ্ন ঃ (২২৬) জামা'আত চলাবস্থায় ইমামের সাথে রাক'আত ধরার জন্য দ্রুত চলার বিধান কি?

উত্তর ঃ মাসজিদে প্রবেশ করে আপনি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেলে তাড়াহুড়া করে দ্রুত হেঁটে বা দৌড়িয়ে সলাতে শামিল হবেন না। কাতারে মিলিত না হয়ে একাকীও সলাতে দাঁড়াবেন না। কেননা জনৈক সাহাবী আবূ বাকরা (রাঃ) একাকী সলাতে দাঁড়ানোতে নবী ﷺ তাকে বলেছিলেন, زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ "আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করে দিন। তুমি এরূপ আর কখনো করিও না।"[২]

প্রশ্ন ঃ (২২৭) মুসল্লীদের মনোযোগে ব্যাঘাত হয় এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করার বিধান কি?

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ ধীরস্থিরভাবে মাসজিদে আগমন করা।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ কাতরের বাইরে রুকু করা।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ মাসজিদে বসে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করলে যদি মুসল্লীদের বা শিক্ষার্থীদের বা অন্য কুরআন পাঠকের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তবে তা হারাম। কেননা এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল বায়াযী (ফারওয়া বিন আমর) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মাসজিদে এসে দেখেন লোকেরা সলাত আদায় করছে কিন্তু কুরআন পাঠের কণ্ঠ উঁচু শোনা যাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন,

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَآءَةِ.

"একজন মুসল্লী সলাতে আপন পালনকর্তার সাথে গোপনে কথা বলে। অতএব সে যেন লক্ষ্য করে কি বলছে তার পালনকর্তাকে। আর পরস্পরে উঁচু স্বরে কুরআন পাঠ করবে না।" [১] অনুরূপভাবে হাদীসটি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে আবূ দাঊদও বর্ণনা করেন।[২]

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাতের বিধান

প্রশ্ন ঃ (২২৮) অনেক মানুষ ইকামাতের পূর্বে মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত শুরু হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আদায় করে না। এরূপ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাত শুরু হওয়ার সময় যদি অতি অল্প থাকে তবে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে কোন দোষ নেই। কিন্তু ইমাম কখন আসবেন তা যদি জানা না থাকে তবে উত্তম হচ্ছে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত শুরু করে দেয়া। তারপর ইমাম যদি এসে পড়েন আর আপনি প্রথম রাক'আতে থাকেন তবে তা ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হবেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে থাকলে হালকাভাবে তা পূর্ণ করে নিবেন।

মাসজিদুল হারামে নারী-পুরুষের কাতারের নিয়ম

প্রশ্ন ঃ (২২৯) মাসজিদুল হারামে দেখা যায় অনেক পুরুষ ফরয সলাতের জামা'আতে নারীদের পিছনেই কাতারবন্দী হয়। তাদের সলাত কি বিশুদ্ধ হবে? তাদের জন্য আপনি কিছু নসীহত করবেন?

---

[১]. মুওয়াত্বা মালিক, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে কুরআন পাঠ করবে। মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৫০৯৬।

[২]. আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সলাতে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করা।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ নারীদের কাতারের পিছনে পুরুষদের কাতার বেঁধে সলাত আদায় করার ব্যাপারে বিদ্বানগণ বলেন এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তা সুন্নাতের বিপরীত। কেননা সুন্নাত হচ্ছে, নারীরা পুরুষদের পিছনে দাঁড়াবে। তবে মাসজিদুল হারামে বর্তমান সময়ে প্রচণ্ড ভীড় দেখা যায়; ফলে নারীরা কাতারবন্দী হওয়ার পর পুরুষরা মাসজিদে এসে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই কাতারবন্দী হয়। তখন অনেক সময় নারীদের কাতারের পিছনে বাধ্য হয়ে তাদেরকে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু প্রতিটি মুসল্লীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী নারীদের পিছনে কাতারবন্দী হওয়া থেকে বিরত থাকা। কেননা এতে পুরুষদের জন্য ফিতনার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব পুরুষ নারীর পিছনে সলাত আদায় করা থেকে সতর্ক থাকবে। যদিও ফিক্বাহ্‌বিদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কাজ জায়েয। আর নারীদেরও উচিত দেখে শুনে পুরুষদের দাঁড়ানোর স্থান থেকে দূরে অন্য কোথাও দাঁড়ানো।

প্রশ্ন ঃ (২৩০) কাতার থেকে শিশু-কিশোরদেরকে সরিয়ে দেয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ কিশোর বা বালক যদি সলাতের কাতারে দণ্ডায়মান হয়, তবে তাকে কাতার থেকে সরিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ "কোন লোক যেন অন্য লোককে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে।"[১] তাছাড়া এতে বালকের অধিকার হরণ করা হয়, তার অন্তরে দুঃখ দেয়া হয়, হতে পারে সে সলাতকে ঘৃণা করবে বা তার অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে।

শিশুদেরকে যদি কাতারের শেষে দাঁড় করানো হয়, তবে তারা তো একস্থানে সমবেত হয়ে হাসাহাসি ও খেলাধূলায় মত্ত হয়ে পড়বে। ফলে মুসল্লীদের সলাতের আরো ক্ষতি হবে। কিন্তু দু'জন বা ততোধিক যদি একই স্থানে দণ্ডায়মান হয় তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দু'জনের মাঝে বড়দের দাঁড়ানোতে কোন অসুবিধা নেই।[২]

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জুমু'আ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে যেন না বসে, হাঃ ৮৬০। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সালাম, অনুচ্ছেদ ঃ বৈধ কোন স্থানে যদি কেউ আগে বসে থাকে তবে তাকে সেখান থেকে উঠানো হারাম, হাঃ ৪০৪৪।

[২]. কিন্তু যে সমস্ত শিশু সলাত বা তার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন কিছুই বুঝে না তাদেরকে মাসজিদে না নিয়ে আসাই উত্তম। কেননা তাদের অতিরিক্ত নড়াচড়া বা খেলাধূলার কারণে মুসল্লীদের সলাতের খুশু-খুযু

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (২৩১) দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে সলাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর ঃ কাতারে জায়গা থাকলে দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে সলাত আদায় করা জায়েয নয়। কেননা এ কারণে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১] কিন্তু যদি স্থানের সংকুলান না হয় জায়গা না পাওয়া যায়, তবে দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে সলাত আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই।

নারীদের জন্য উত্তম কাতার কোন্‌টি?

প্রশ্ন ঃ (২৩২) নারীদের কাতারের বিধান কি? তাদের জন্য উত্তম কাতার শেষেরটি এবং অনুত্তোম কাতার প্রথমটি এ কথাটি কি সর্বাবস্থায় নাকি এ কথা নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী স্থানে কোন আড়াল না থাকলে?

উত্তর ঃ নারী ও পুরুষ যদি একই স্থানে জামা'আতবদ্ধ হয়ে সলাতে দাঁড়ায় তবে সেক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রথম কাতারের চাইতে শেষের কাতার উত্তম। যেমনটি নবী ﷺ বলেন, خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا "নারীদের জন্য উত্তম কাতার হচ্ছে শেষেরগুলো আর অনুত্তোম কাতার হচ্ছে প্রথমগুলো।"[২] এটা এ কারণেই যে, কাতার যত পিছন দিকে হবে ততই তা পুরুষদের থেকে দূরে হবে। আর যত আগের দিকে হবে ততই পুরুষদের নিকটবর্তী হবে। তাই তাদের কাতার পুরুষদের থেকে যতদূরে হবে ততই কল্যাণজনক হবে। অবশ্য এটা একই মাসজিদের ভিতরের কথা।

আর নারীদের সলাতের জন্য যদি স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণ করা থাকে- যেমনটি বর্তমানে অধিকাংশ মাসজিদে দেখা যায়- তবে সেক্ষেত্রে পুরুষদের মত তাদের প্রথম কাতারই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ (২৩৩) মাসজিদের বাইরে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় সলাত আদায় করার বিধান কি?

(বিনয়-নম্রতা) নষ্ট হয়। কেউ যদি তাদেরকে সাথে নিয়ে যদি আসতেই চায় তবে কাতারের মাঝে দাঁড় করাবে না। কাতারের এক প্রান্তে বসিয়ে রাখবে। -অনুবাদক

[১]. আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আমরা এটা (দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে সলাতে দাঁড়ানো) থেকে বেঁচে থাকতাম। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে সলাতে দাঁড়ানো মাকরূহ। ইবনু মাজার বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে সলাতে দাঁড়ালে আমাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হতো।

[২]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করা।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ মাসজিদে যদি মুসল্লীদের সংকুলান না হয়, তবে বাইরে মাসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় সলাত পড়লে কোন অসুবিধা নেই। তবে ইমামের অনুসরণ করা ইমামের তাকবীর ধ্বনী শোনা আবশ্যক।

কাতারে মুসল্লীদের পরস্পর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর বিধান কি?

প্রশ্ন ঃ (২৩৪) কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা কি? মুসল্লীদের পরস্পর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো কি আবশ্যক?

উত্তর ঃ কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে পায়ের গোড়ালিসমূহ বরাবর করে নেয়া, পায়ের আঙ্গুলসমূহ বরাবর করা আবশ্যক নয়। কেননা শরীরের ভিত্তি থাকে পায়ের গোড়ালির উপর। আর পায়ের সাইজ অনুযায়ী আঙ্গুলের বিভিন্নতা হয়ে থাকে। কোন পা দীর্ঘ থাকে কোনটা খাটো। সুতরাং কাতার বরাবর ও সোজা করা গোড়ালি ছাড়া অন্য কোন ভাবে সম্ভব নয়।

আর পায়ের গোড়ালী সমূহ পরস্পরে মিলিত করা নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তাঁরা কাতার বন্দী হওয়ার সময় গোড়ালী সমূহ একজন অপরজনের সাথে মিলিত করে দিতেন।[১] অর্থাৎ- প্রকৃতভাবে কাতার সোজা ও বরাবর করার জন্য তাঁদের একজন পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিত করে দাঁড়াতেন। কিন্তু কাতার বন্দীর ক্ষেত্রে এটাই আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কাজ কাতার বরাবর ও সোজা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য করতে হয়। একারণে কাতারে দাঁড়ানোর পর উচিত হচ্ছে প্রত্যেকে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিবে, যাতে নিশ্চিত হতে পারে যে, কাতার সোজা হয়েছে। পূর্ণ সলাতে এভাবে পরস্পরের পাগুলোকে মিলিয়ে রাখা আবশ্যক নয়।

অনেকে বাড়াবাড়ি করে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর পায়ের সাথে গোড়ালী মিলাতে গিয়ে নিজের দু'পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক সৃষ্টি করে ফেলে। এটা যেমন

---

[১]. আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আমাদের একজন পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন। (বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পরে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো।)

www.pathagar.com

সুন্নাত বিরোধী হয় অনুরূপভাবে পরস্পরের কাঁধ থেকেও বহু দূরে চলে যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে গোড়ালী ও কাঁধ সমূহ বরাবর থাকা।

সলাতে রফউল ইয়াদায়ন বা হাত উত্তোলনের বিধান কি?

প্রশ্ন ঃ (২৩৫) সলাতে চারটি স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হাত উত্তোলনের কথা কি প্রমাণিত হয়েছে? অনুরূপভাবে জানাযা ও দু'ঈদের সলাতের তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করার কি বিধান?

উত্তর ঃ সলাতে যে চার স্থানে রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা সুন্নাত তা জেনে নেয়া আবশ্যক। ১) সলাতের প্রারম্ভে তাকবীর তাহরিমা বলার সময় ২) রুকূতে যাওয়ার সময় ৩) রুকূ থেকে উঠার সময় ৪) প্রথম তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় রাক'আআতে উঠার সময়। এচারটি স্থানের বিষয়ে নবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা এসেছে। ইবনু ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'কাঁধ বরাবর হাত দু'টিকে উত্তোলন (রফউল ইয়াদায়ন) করতেন- যখন সলাত শুরু করতেন, যখন রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ হাত দু'টিকে উঠাতেন এবং বলতেন 'সামিয়াল্লাহুলিমান হামীদাহ্ রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দু।' তিনি বলেন, সাজদার সময় তিনি এরূপ করতেন না।" [১]

ইবনু ওমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ক্রিয়াকলাপসমূহ অতি সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করতেন ও তার অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর সলাতের নিয়ম-কানুনগুলো অনুসন্ধান করে যা দেখেছেন তা ছিল- তাকবীরে তাহরিমা, রুকূ করা, রুকূ থেকে উঠা এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলন করা। আর তিনি বলেছেন, নবী ﷺ এরূপ হাত উঠানো সাজদার সময় করতেন না। এ রকম বলা ঠিক হবে না যে, হয়তো ইবনু ওমার সাজদার সময় হাত উঠানোর অবস্থাগুলো দেখেননি বা সে সময় সতর্ক ছিলেন না। কেননা

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাকবীর বলার সময় হাত উত্তোলন করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব...।

www.pathagar.com

তিনি কিছু কিছু স্থানের বর্ণনা দেয়ার পর বলেছেন- এরূপ তিনি সিজদার সময় করতেন না। এ দ্বারা বুঝা যায় তিনি নিশ্চিত হয়েই এ কথা বলেছেন- সন্দেহ বা সংশয়ের উপর ভিত্তি করে নয়।

আর জানাযা ও দু'ঈদের প্রত্যেক তাকবীরে রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন ঃ (২৩৬) কোন মুসল্লী যদি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পায়, তখন কি দু'টি তাকবীর দিতে হবে?

উত্তর ঃ ইমামের রুকূ অবস্থায় কোন মানুষ যদি সলাতে শামিল হয় তবে তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে সরাসরি রুকূ করবে। এ অবস্থায় রুকূর জন্য তাকবীর প্রদান করা সুন্নাত- ওয়াজিব নয়। তবে রুকূর জন্য আলাদা তাকবীর প্রদান করা উত্তম। তাকবীর না দিলেও কোন অসুবিধা নেই। এখানে কয়েকটি অবস্থা লক্ষণীয় ঃ

প্রথম অবস্থা ঃ ইমাম রুকূ থেকে উঠার আগে মুক্তাদী[১] রুকূ করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। তাহলেই এটা রাক'আত বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ রুকূতে যাওয়ার আগেই ইমাম রুকূ হতে উঠে গেছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। এ অবস্থায় তার ঐ রাক'আত ছুটে গেল। তাকে তা সালামের পর আদায় করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা ঃ মুক্তাদী ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেয়েছে কি না বা সে রুকূতে যাওয়ার আগেই ইমাম উঠে গিয়েছেন কি না এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহে থাকবে। তার ধারণা যদি প্রবল হয় যে সে রুকূ অবস্থাতেই ইমামকে পেয়েছে, তবে সে রাক'আত পেয়ে গেল। আর ধারণা যদি প্রবল হয় যে, ইমামকে রুকূ অবস্থায় পায়নি, তবে তার রাক'আত ছুটে গেল। এ অবস্থায় যদি তার সলাতের কোন কিছু ছুটে যায় তাবে সালামের পর সে সাহু সাজদা করবে। আর যদি কোন কিছু না ছুটে থাকে- অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত রাক'আতটি প্রথম রাক'আত হয়, কিন্তু তার প্রবল ধারণা যে, সে রুকূ পেয়েছে। এ অবস্থায় সাহু সাজদা রহিত হয়ে যাবে। কেননা তার সলাত ইমামের সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তার সলাতের কোন অংশ যদি ছুটে না যায় তবে ইমাম তার সাহু সাজদার ভার গ্রহণ করবে।

---

[১]. ইমামের পিছনে সলাত আদায়কারী সকল মুসল্লীকে মুক্তাদী বলা হয়। আর সলাতের কিছু অংশ চলে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি সলাতে শামিল হয় তাকে বলা হয় মাসবূক।

www.pathagar.com

সন্দেহের আরেকটি অবস্থা রয়েছে। তা হচ্ছে, রুকূ পেল কি না সে ব্যাপারে মুক্তাদী সন্দেহে থাকবে- কোন দিক তার কাছে প্রাধান্য পাবে না। সে অবস্থায় নিশ্চিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করবে। অর্থাৎ- রুকূ পায়নি। অতঃপর শেষে এই ছুটে যাওয়া রাক'আত আদায় করে সালাম ফেরানোর পূর্বে সাহু সাজদা করবে।

এখানে আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। ইমাম রুকূতে গেলে অনেক লোক (যারা পরে সলাতে শামিল হচ্ছে) জোরে জোরে গলা খোকরানী দেয়, কেউ কেউ বলে (ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরীন), কখনো জোরে জোরে পা ফেলে। যাতে করে ইমাম একটু দেরী করে রুকূ থেকে উঠেন। এ সমস্ত কাজ সুন্নাতের খেলাফ। এতে ইমাম এবং মুক্তাদীদের সলাতে একাগ্রতা নষ্ট হয়। আবার ইমাম রুকূ অবস্থায় থাকলে অনেকে দ্রুত বরং খুব জোরে দৌড়িয়ে সলাতে আসে। অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা নবী ﷺ বলেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"যখন সলাতের ইকামত প্রদান করা হয় তখন তাড়াহুড়া করে সলাতের দিকে আসবে না। বরং হেঁটে হেঁটে ধীর-স্থিরতা এবং প্রশান্তির সাথে আগমন করবে। অতঃপর সলাতের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।"[১]

সলাতে কোথায় হাত বাঁধতে হবে?

প্রশ্ন ঃ (২৩৭) ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তা কি বুকের উপর বা অন্তরের (heart) উপর রাখবে নাকি নাভীর নীচে রাখবে? হাত বাঁধার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ সলাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ ধীরস্থিরভাবে মাসজিদে আগমন করা।

www.pathagar.com

লোকেরা নির্দেশিত হত যে, সলাতে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করবে।"[১] কিন্তু হাত দু'টিকে কোন স্থানে রাখবে?

বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, হাত দু'টি বুকের উপর রাখবে। ওয়ায়িল বিন হুজ্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى صَدْرِهِ.

নবী ﷺ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করতেন।"[২] হাদীসটিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এক্ষেত্রে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের তুলনায় এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী।

আর বুকের বাম সাইডে অন্তরের উপর হাত বাঁধা একটি ভিত্তিহীন বিদআত।

নাভীর নীচে হাত বাঁধার ব্যাপারে আলী (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তা দুর্বল।[৩] ওয়ায়িল বিন হুজ্‌র বর্ণিত হাদীসটি অধিক শক্তিশালী।

সলাতের নিয়ম-পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সমস্ত বিধানে নারী-পুরুষ বরাবর। দলীল ছাড়া উভয়ের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা বৈধ নয়। এ সুন্নাতের ক্ষেত্রে নারী বুকের উপর হাত বাঁধবে বা তার বিপরীত কোন কাজ সহীহ সুন্নাত বা হাদীস থেকে আমার জানা নেই।[৪]

প্রশ্ন ঃ (২৩৮) স্বশব্দে "বিসমিল্লাহ্..." পাঠ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সঠিক কথা হচ্ছে, স্বশব্দে "বিসমিল্লাহ্..." পাঠ করা উচিত নয়। সুন্নাত হচ্ছে নীরবে পাঠ করা। কেননা "বিসমিল্লাহ্..." সূরা ফাতিহার অংশ

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।

[২]. আবূ দাউদ, ইবনু খুযায়মা, আহমাদ। সহীহুল বুখারীতে উল্লেখিত হাদীসটি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুকের উপর হাত বাঁধাই প্রমাণিত করে। ইমাম আলবানী ইবনু খুযায়মা বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (দেখুনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পদ্ধতি পৃঃ ৮৮) তিনি আরো বলেন, এর বিপরীত হাদীসগুলো হয় দুর্বল, না হয় ভিত্তিহীন।

[৩]. হাদীসটি এরূপঃ "সুন্নাত হচ্ছে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে স্থাপন করা।" (আহমাদ, আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।) ইমাম নববী বলেন, এর সনদে আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল ওয়াসিত্বী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। মুহাদ্দিসীনদের ঐকমত্যে সে দুর্বল। সুতরাং এ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

[৪]. অনুরূপভাবে রুকূ করা, সিজদা করা, তাশাহুদে বসা প্রভৃতি পদ্ধতিতে নারী পুরুষের মত করেই সলাত আদায় করবে। বিপরীত কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা প্রচলিত নিয়মে রুকূ সিজদা করে থাকে- রুকূর সময় সামান্য একটু মাথা নত করে, সিজদার সময় অনেকটা শুয়ে পড়ে ইত্যাদি নিয়ম সুস্পষ্টভাবে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাত বিরোধী।

www.pathagar.com

নয়। কিন্তু কখনো যদি স্বশব্দে তা পাঠ করে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বরং কখনো স্বশব্দে 'বিসমিল্লাহ্...' পাঠ করা উচিত। কেননা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, "তিনি কখনো স্বশব্দে 'বিসমিল্লাহ্...' পাঠ করতেন।"[১]

কিন্তু বিশুদ্ধভাবে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে, "তিনি তা স্বশব্দে পাঠ করতেন না।"[২] আর এটাই উত্তম। তবে যদি কখনো বিসমিল্লাহ্ স্বশব্দে পাঠ করে এতে কোন অসুবিধা হবে না।

প্রশ্ন ঃ (২৩৯) দু'আ ইস্তিফতাহ্ বা সলাত শুরুর দু'আ (সানা) পাঠ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ সলাত শুরুর দু'আ (সানা) ফরয-সুন্নাত সকল সলাতে পাঠ করা সুন্নাত- ওয়াজিব নয়।

উচিত হচ্ছে মুসল্লী সলাত শুরুর দু'আসমূহ থেকে একবার এটা একবার ওটা পাঠ করবে। যাতে করে সকল সুন্নাতের উপর আমল করা সম্ভব হয়। একটি দু'আ ছাড়া আর কিছু জানা না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দু'আ পাঠ করেছেন। যেমন- সলাতের শুরুতে, তাশাহুদে, সলাতের পরের যিক্র। এ ধরনের বিভিন্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মাতের জন্য সহজ করা। এর দু'টি উপকারিতা আছে ঃ

প্রথম উপকারিতা ঃ মানুষ সর্বদা এক ধরনের দু'আই পাঠ করবে না। কেননা একটা বিষয় সর্বদা করতে থাকলে সেটা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় উদাসীনতা বা অলসতা থাকলেও অভ্যাসবশতঃ তা হয়ে যায়। তখন অন্তরের উপস্থিতি সেখানে দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু দু'আগুলো থেকে যদি কখনো এটা কখনো ওটা পাঠ করে তবে অন্তর উপস্থিত থাকে। যা বলে তা বুঝার দরকার পড়ে।

---

[১]. নাসায়ী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ বিসমিল্লাহির... পাঠ করা। ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযায়মা, দারাকুতনী ও বায়হাক্বী।

[২]. আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি সলাত আদায় করেছি- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে, আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর পিছনে। তাদের কারো থেকে বিসমিল্লাহ্ পাঠের আওয়াজ শুনিনি।" মুসলিম অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন বিসমিল্লাহ্ স্বশব্দে পড়া যাবে না তাদের দলীল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উপকারিতা ঃ উম্মাতের জন্য সহজ করা। যার জন্য যেটা সহজ হবে সেটাই পাঠ করবে। সময় ও প্রয়োজন মোতাবেক কখনো এটা কখনো ওটা পাঠ করবে।

প্রশ্ন ঃ (২৪০) 'আমীন' বলা কি সুন্নাত?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমীন বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। বিশেষ করে ইমাম যখন আমীন বলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"ইমাম যখন আমীন বলেন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে।"[১]

ইমাম ও মুক্তাদীর আমীন বলা একই সময়ে হতে হবে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, "ইমাম যখন আমীন বলেন তোমরাও আমীন বলবে।"

প্রশ্ন ঃ (২৪১) (ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন) পাঠ করার সময় 'আমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাই'– এরূপ কথা বলার বিধান কি?

উত্তর ঃ মুক্তাদীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে ইমামের পড়া চুপ করে শোনা। ইমাম যখন ফাতিহা শেষ করে আমীন বলবেন সেও আমীন বলবে। এ আমীন বলা ইমামের ফাতিহা পাঠ করার সময় কোন দু'আ ইত্যাদি বলা থেকে যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন ঃ (২৪২) সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে বিদ্বানদের থেকে নিম্নরূপ কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত ঃ সলাতে কখনই সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়। স্বরব, নীরব কোন সলাতেই ইমাম, মুক্তাদী, একাকী- কারো জন্য পাঠ করা ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব হচ্ছে কুরআন থেকে সহজ যে কোন কিছু পাঠ করা। তাদের দলীল হচ্ছে ঃ আল্লাহ বলেন, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ "অতএব তোমরা কুরআন থেকে সহজ কোন কিছু পাঠ কর"– (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০)। তাছাড়া নবী

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জোরে আমীন বলা, হাঃ ৭৩৮ মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ তাসমীহ, তাহমীদ ও আমীন।

www.pathagar.com

ﷺ সলাত শেখাতে গিয়ে গ্রাম্য লোকটিকে বলেছিলেন, "কুরআন থেকে তোমার জন্য সহজ হয় এমন কিছু পাঠ করবে।"[১]

দ্বিতীয় মত ঃ স্বরব, নীরব সকল সলাতে ইমাম, মুক্তাদী, একাকী- সবার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন বা অবশ্য কর্তব্য। অনুরূপভাবে মাসবূক এবং সলাতের প্রথম থেকে জামা'আতে শামিল ব্যক্তির জন্যও রুকন।

তৃতীয় মত ঃ ইমাম ও একাকী ব্যক্তির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন। কিন্তু স্বরব বা নীরব কোন সলাতেই মুক্তাদীর জন্য ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ মত ঃ ইমাম ও একাকী ব্যক্তির জন্য স্বরব বা নীরব সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন। কিন্তু মুক্তাদীর জন্য নীরবের সলাতে রুকন স্বরব সলাতে নয়।

আমার মতে প্রাধান্যযোগ্য মতটি হচ্ছে ঃ স্বরব, নীরব সকল সলাতে ইমাম, মুক্তাদী, একাকী- সবার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন বা ফরয। তবে মাসবূক যদি ইমামের রুকূর সময় সলাতে শামিল হয়, তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে। এ কথার দলীল হচ্ছে নবী ﷺ-এর সাধারণ বাণী।

তিনি বলেন, لاصَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার সলাত হবে না।"[২]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

"যে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে অথচ তাতে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার সলাত অসম্পূর্ণ- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কথাটি তিনবার বলেছেন।"[৩] অর্থাৎ- তার সলাত বাত্বিল ।

উবাদা বিন সামিত বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ একদা ফজরের সলাত শেষ করে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ক্বিরআত পাঠ করা ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

[৩]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

"তোমরা কি ইমামের পিছনে কোন কিছু পাঠ কর? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দ্রুত পাঠ করে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করো না। তবে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে না তার সলাত হবে না।"[1] স্বশব্দের সলাতের ক্ষেত্রে এটি সুস্পষ্ট দলীল যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া সলাত হবে না।

কিন্তু মাসবূকের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে। এ কথার দলীল হচ্ছে ঃ আবূ বাক্‌রা (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি নবী ﷺ-কে রুকূ অবস্থায় পেলেন। তখন দ্রুতগতিতে কাতারে পৌছার আগেই তিনি রুকূ করলেন। এরপর ঐ অবস্থায় হেঁটে হেঁটে কাতারে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ সলাত শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ করেছে? আবূ বাক্‌রা বললেন, আমি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নবী ﷺ বললেন ঃ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ "আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে এরূপ আর কখনো করিও না।"[2]

এ হাদীসে দেখা যায়, আবূ বাক্‌রা যে রাক'আতটি ছুটে যাওয়ার ভয়ে তাড়াহুড়া করলেন, নবী ﷺ তাকে ঐ রাক'আতটি পুনরায় আদায় করার আদেশ করলেন না। এটা ওয়াজিব হলে নবী ﷺ সে আদেশ করতেন। যেমনটি আদেশ করেছিলেন ঐ ব্যক্তিকে যে কিনা তাড়াহুড়া করে সলাত আদায় করেছিল, আর সলাতের রুকন-ওয়াজিব যথাযথভাবে আদায় করছিল না। তখন নবী ﷺ তাকে সলাত ফিরিয়ে পড়ার আদেশ করেছিলেন।

মাসবূকের সূরা ফাতিহা পাঠ রহিত হওয়ার যুক্তিগত দলীল হচ্ছে ঃ এই মাসবূক তো কিরাআত পাঠ করার জন্য দাঁড়ানোর সুযোগই পায়নি। অতএব সুযোগ না পেলে তার আবশ্যকতাও রহিত হয়ে যাবে। যেমন- হাত কাটা ব্যক্তি ওযূ করার সময় তার হাতের কাটা অংশের পরিবর্তে বাহু ধৌত করবে না। বরং ধৌত করার স্থান উপস্থিত না থাকার কারণে এ ফরয রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেল তার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে। কেননা ক্বিরাআত পাঠ করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার সুযোগই সে পায়নি। আর ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে এখানে দণ্ডায়মান হওয়াও রহিত হয়ে যাবে।

---

[1]. আহমাদ, আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে যে ব্যক্তি ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিল। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করার বর্ণনা।

[2]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের বাইরে রুকু করা।

www.pathagar.com

আমার দৃষ্টিতে এ মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। পূর্বোল্লেখিত উবাদা বিন সামিত (রাঃ)-এর হাদীসটি- (ফজরের সলাতে ক্বিরাআত পাঠ সংক্রান্ত হাদীসটি) যদি না থাকতো, তবে স্বরব সলাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক হতো না। আর সেটাই হতো প্রাধান্যযোগ্য মত। কেননা নীরবে শ্রবণকারী পাঠকের মতই সাওয়াবের অধিকারী হয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا "তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হয়েছে"– (সূরা ইউনুস ঃ ৮৯)। অথচ সে সময় দু'আ শুধুমাত্র মূসা (আঃ) এককভাবে করেছিলেন। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ﴾

"তা[illegible] মূসা বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি ফিরআওন ও তার সভাসদদের প্রদান করেছো দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য, সৌন্দর্য ও সম্পদ। হে আমাদের পালনকর্তা! ওরা আপনার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের সম্পদ মুছে ফেলুন, তাদের হৃদয় কঠোর করে দিন, যাতে তারা ঈমান না আনে। যাতে করে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে।" (সূরা ইউনুস ঃ ৮৮)

এখানে কি আল্লাহ হারূনের দু'আর কথা উল্লেখ করলেন? উত্তর ঃ না। তারপরও আল্লাহ বললেন ঃ "তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হয়েছে।" বিদ্বানগণ বলেন ঃ এক ব্যক্তি দু'আ করা সত্ত্বেও দ্বিবচন শব্দ এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, মূসা (আঃ) দু'আ করছিলেন আর হারূন (আঃ) আমীন বলছিলেন।

আর আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ঃ (من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة) "যার ইমাম রয়েছে, তার ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত (হিসেবে যথেষ্ট)।"[১] কিন্তু হাদীসের সনদ (সূত্র) যঈফ (দুর্বল)। কেননা তা মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন। আরো কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি নবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু

---

১. আহমাদ ৩/৩৩৯ ইবনু মাজাহ্ অধ্যায় ঃ সলাত প্রতিষ্ঠা করা, অনুচ্ছেদ ঃ যখন ইমাম ক্বিরাআত করবেন।

www.pathagar.com

কোনটিই সহীহ নয়। তারপরও হাদীসটি দ্বারা যারা দলীল নিয়ে থাকে তারা সাধারণভাবে বলেন না যে, কোন অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকে বলেন ঃ নীরবের সলাতে মুক্তাদীকে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় ঃ ইমাম যদি না থামেন (অর্থাৎ- ফাতিহা শেষ করার পর মুক্তাদীদের ফাতিহা পাঠ করার সুযোগ দেয়ার জন্য কিছু সময় নীরব না থাকেন।)। তবে মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে? উত্তর হচ্ছে ঃ ইমামের পড়ার সময়ই মুক্তাদী পড়বে। কেননা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পড়ার সাথে সাথেই পড়তেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

"তোমরা উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে না তার সলাত হবে না।"

ইমামের পিছনে মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে?

প্রশ্ন ঃ (২৪৩) মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে? ইমামের ফাতিহা পাঠ করার সময়? নাকি ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করে অন্য সূরা পাঠ শুরু করলে?

উত্তর ঃ উত্তম হচ্ছে ইমামের ফাতিহা পাঠ শেষ হওয়ার পর মুক্তাদী ফাতিহা পাঠ করবে। কেননা ফরয ক্বিরাআত পাঠ করার সময় নীরব থাকা রুকন। ইমামের পড়ার সময় যদি মুক্তাদীও পাঠ করে তবে রুকন আদায় করার সময় নীরব থাকা হল না। আর ফাতিহা পাঠ করার পর যখন ইমাম অন্য ক্বিরাআত শুরু করবে, সে সময় তা শোনার জন্য নীরব থাকা মুস্তাহাব। অতএব উত্তম হল, ফাতিহা পাঠ করার সময় নীরব থাকবে। সলাতের সুন্নাত ক্বিরাআত পাঠের সময় নীরব থাকার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অন্যতম রুকন সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা। তাছাড়া ইমামের 'ওয়ালায্ যোওয়াল্লীন' বলার সময় মুক্তাদীও ('ওয়ালায্ যোওয়াল্লীন') পাঠ করলে তাঁর সাথে 'আমীন' বলা সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন ঃ (২৪৪) সলাত বা কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিভাবে অন্তর নম্র করা যায়?

উত্তর ঃ বিনয়-নম্রতা সলাতের অন্তঃসার ও আসল প্রাণ। এর অর্থ হচ্ছে, অন্তরের উপস্থিতি। ডানে-বামে অন্তরকে নিয়ে ঘুরাফেরা না করা। বিনয়-নম্রতা

www.pathagar.com

বিরোধী কোন কিছু যদি মানুষের অন্তরে আসে তবে সে পাঠ করবে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।' যেমনটি নবী ﷺ আদেশ করেছিলেন। সন্দেহ নেই শয়তান মানুষের সমস্ত ইবাদাত বিশেষ করে সর্বোত্তম ইবাদাত সলাত বিনষ্ট করার জন্য সর্বাধিক আগ্রহী। সলাতরত ব্যক্তির কাছে শয়তান আগমন করে বলে, উমুক কথা স্মরণ কর, উমুক কথা স্মরণ কর। তাকে এমন কিছুর খেয়ালে নিয়ে যায় যাতে কোন উপকার নেই। আবার সলাত শেষ হলে এ সমস্ত খেয়াল শেষ হয়ে যায়।

অতএব মানুষের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, সলাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদাত আদায় করার জন্য সবচেয়ে বেশী মনোযোগী ও বিনয়ী হওয়া। কেননা সে তো মহান আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর সাথে গোপনে কথা বলছে। মনে করবে সে যেন মহান আল্লাহকে দেখছে বা এতটুকু মনে করবে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। আর যখনই শয়তানের কুমন্ত্রণা ও বদখেয়াল মনের দুয়ারে উঁকি দিতে চাইবে তখনই আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইবে। পাঠ করবেঃ 'আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।'

প্রশ্ন ঃ (২৪৫) সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর কিছুক্ষণ চুপ থাকার বিধান কি?

উত্তর ঃ ফিক্বাহবিদদের মধ্যে থেকে কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা শুরু করার পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকবেন, যাতে করে মুক্তাদী ফাতিহা পাঠ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে তা হচ্ছে সামান্য বিরতি নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য এবং এই ফাঁকে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করা আরম্ভ করে দিবে। এরপর ইমাম অন্য ক্বিরাআত শুরু করে দিলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা সূরা ফাতিহা পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য রুকন। কিন্তু ইমামের ক্বিরাআত শ্রবণ করা তার জন্য মুস্তাহাব। মোটকথা নীরব থাকার মুহূর্তটি অতি সামান্য দীর্ঘ নয়।

প্রশ্ন ঃ (২৪৬) ফজরের এক রাক'আত সলাত ছুটে গেলে বাকী রাক'আতটি কি স্বশব্দে না নীরবে পাঠ করবে?

উত্তর ঃ বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু উত্তম হচ্ছে নীরব কণ্ঠে পাঠ করা। কেননা জোর কণ্ঠে পাঠ করলে হয়তো অন্য মুসল্লীদের সলাতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

www.pathagar.com

রুকূ থেকে উঠার পর আবার হাত বাঁধার মাসআলা।

প্রশ্ন ঃ (২৪৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পদ্ধতির উপর লিখিত একটি পুস্তকে পড়লাম, রুকূ থেকে উঠার পর আবার হাত বাঁধা একটি বিভ্রান্ত কর বিদ'আত। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা কি? আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

উত্তর ঃ যে বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে, সে বিষয়ে কাউকে সুন্নাতের পরিপন্থী বিদআতী বলতে আমি সংকোচবোধ করি। এটা উচিত নয়। যারা রুকূ থেকে উঠে আবার হাত বাঁধেন, তারা নিজেদের মতের পক্ষে সুন্নাত থেকে দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। এ বিষয়টি কারো গবেষণার বিরোধী হলে তাকে সরাসরি বিদআতী বলা খুবই কঠিন বিষয়। এ ধরনের বিষয়ে বিদআত শব্দ উচ্চারণ করা কারো পক্ষে উচিত নয়। কেননা যে সকল বিষয়ে গবেষণার অবকাশ থাকে এবং হতে পারে এ কথা সত্য অথবা ঐ কথা সত্য, তাতে পরস্পরে বিদআতের অপবাদ দিতে শুরু করলে মুসলিম সমাজে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে, একে অপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সূচনা হবে। ইসলামের শত্রুরা তা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে ঃ রুকূ থেকে উঠার পর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকে স্থাপন করা একটি সুন্নাত। দলীল ঃ সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "লোকেরা নির্দেশিত হত যে, সলাতে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করবে।"[১]

গভীরভাবে লক্ষ্য করে ও অনুসন্ধান করে হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করার যুক্তিসমূহ হচ্ছে ঃ

যদি প্রশ্ন করা হয় ঃ সাজদার সময় হাত দু'টি কোথায় থাকবে?

উত্তর ঃ জমিনের উপর।

প্রশ্ন ঃ রুকূ অবস্থায় হাত কোথায় থাকবে?

উত্তর ঃ হাঁটুদ্বয়ের উপর।

প্রশ্ন ঃ বসাবস্থায় হাত দু'টি কোথায়?

উত্তর ঃ রানের উপর।

থাকল দাঁড়ানো অবস্থার কথা। রুকূর আগে ও পরে উভয় অবস্থা হচ্ছে দাঁড়ানো। আর তা এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ "লোকেরা নির্দেশিত হত যে,

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।

www.pathagar.com

সলাতে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করবে।" অর্থাৎ- রুকূর আগে বা পরে যে কোন অবস্থার দাঁড়ানোতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে। এটাই হচ্ছে সত্য, সুন্নাতে নববী ﷺ যার প্রমাণ বহন করে।

মোটকথা উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দু'টি পয়েন্টে বিভক্ত ঃ

প্রথম ঃ কারো পক্ষে উচিত নয় বিদআত শব্দটি ব্যবহার করা এমন কাজে যেখানে ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে রুকূ থেকে উঠে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখাটা সুন্নাত, বিদআত নয়। উল্লেখিত সাহ্ল বিন সা'দের হাদীস হচ্ছে এর দলীল। কিন্তু এ অবস্থার ব্যতিক্রম হচ্ছে রুকূ, সাজদা ও বসাবস্থা। কেননা এ সকল স্থানে কিভাবে হাত রাখতে হবে হাদীসে তার বিশদ বিবরণ এসেছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (২৪৮) 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু' বলার পর 'ওয়াশ্ শুক্‌রু' শব্দ বৃদ্ধি করে বলার বিধান কি?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র প্রমাণিত দু'আ ও যিক্‌রসমূহ পাঠ করাই উত্তম। নিজের পক্ষ থেকে কোন শব্দ বৃদ্ধি না করা। রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে) পাঠ করবে ঃ 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু'। 'ওয়াশ্ শুক্‌রু' শব্দ বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। কেননা এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

উল্লেখ্য যে, এ সময় চার ধরনের শব্দ প্রমাণিত হয়েছে ঃ

১) 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু'

২) 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দু'

৩) 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু'

৪) 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দু'

এগুলো সবটাই এক সাথে বলবে না; বরং কোন সলাতে এটা কোন সলাতে ওটা পাঠ করবে।[১]

---

১. অবশ্য রাব্বানা... বলার পর আরো কিছু দু'আ পাঠ করার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমনঃ

﴿مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾

উচ্চারণ ঃ মিল্‌আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্‌আল আরযি ওয়া মিল্‌আ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু। আহ্‌লাস্ সানায়ি ওয়াল মাজ্‌দি লা মানি'আ লিমা আ'ত্বায়তা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য। হে প্রশংসা, স্তুতি এবং মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ!

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (২৪৯) সাজদায় যাওয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ সাজদায় যাওয়ার জন্য প্রথমে হাঁটু রাখবে তারপর হাত রাখবে। কেননা নবী ﷺ নিষেধ করেছেন প্রথমে হাত রেখে সাজদায় যেতে। তিনি এরশাদ করেন ঃ

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

"তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সাজদা করবে, সে যেন উটের মত করে না বসে। সে যেন হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখে।"[১] হাদীসের বাক্য এরূপ।

কিন্তু হাদীসটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। হাদীসের প্রথম বাক্য ঃ 'উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে।' নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সাজদার পদ্ধতিতে। কেননা (الكاف) তাসবীহ্ বা তুলনা বুঝানোর জন্য নেয়া হয়েছে। যে অঙ্গের উপর সাজদা করতে হবে তার নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য করা হয়নি। এখানে যদি অঙ্গ উদ্দেশ্য হতো তবে এরূপ বলতে হতো, (উট যে অঙ্গের উপর বসে সেরূপ যেন না বসে।) তখন আমরা বলতে পারি, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসবে না। কেননা উট হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে থাকে। কিন্তু নবী ﷺ এ কথা বলেননি ঃ (উট যে অঙ্গের উপর বসে সেরূপ যেন না বসে।) কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ 'উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে।' অতএব এখানে বসার পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, অঙ্গের উপর নয়।

এ কারণে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীসের শেষাংশ বর্ণনাকারীর নিকট উল্টা হয়ে গেছে। শেষাংশটা এরূপ বলা হয়েছে ঃ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ 'হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে।' কিন্তু সঠিক বাক্য এরূপ হবে ঃ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ 'হাত রাখার আগে হাঁটু রাখবে।' কেননা হাঁটুর আগে হাত রাখলেই উটের মত বসা হল। উট বসার সময় প্রথমে তার হাত দু'টো রাখে। উটের বসা প্রত্যক্ষ করলে এটাই প্রমাণিত হবে।

অতএব হাদীসের প্রথমাংশের সাথে শেষাংশের সামঞ্জস্য করতে চাইলে বলতে হবে ঃ 'হাত রাখার আগে হাঁটু রাখবে।'

তোমার প্রশংসায় কোন বন্দা যা বলে তুমি তার চাইতে ও অধিক প্রশংসার হকদার। আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তুমি যা বন্ধ কর তাও দেয়ার মত কেউ নেই। আর তোমার (শাস্তি) হতে কোন বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ ও পাদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। (মুসলিম)

[১] আহমাদ ২/৩৮১। আবূ দাঊদ ঃ অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ হাত রাখার আগে হাঁটু রাখার পদ্ধতি। নাসায়ী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় সর্বপ্রথম মাটিতে যা রাখতে হয়।

www.pathagar.com

জনৈক বিদ্বান এ ব্যাপারে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নাম দিয়েছেন ঃ (فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود) এতে তিনি খুব সুন্দরভাবে উপকারী কথা লিখেছেন।

সুতরাং সাজদায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশিত সুন্নাত হচ্ছে ঃ দু'হাত রাখার আগে হাঁটু রাখবে।[১]

প্রশ্ন ঃ (২৫০) সামনের দিকে অতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে সাজদা করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সাজদার সময় সামনের দিকে অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া সুন্নাতের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সলাতের বর্ণনা যারা করেছেন, তাদের কেউ এ কথা বলেননি যে, তিনি সাজদার সময় পৃষ্ঠদেশ অতিরিক্ত বৃদ্ধি করতেন। যেমনটি তিনি রুকূর সময় পিঠ অতিরিক্ত চওড়া করতেন।[২] শরীয়ত সম্মত সুন্নাত হচ্ছে, সাজদার সময় দু' রান থেকে পেট আলাদা রাখবে এবং উঁচু করবে। কিন্তু সামনের দিকে অতিরিক্ত বেড়ে যাবে না। যেমনটি অনেকে করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ (২৫১) সাজদার কারণে কপালে দাগ পড়া কি নেক লোকের পরিচয়?

উত্তর ঃ সাজদার কারণে কপালে দাগ পড়া নেক লোক পরিচয়ের কোন মাধ্যম নয়। বরং তা হচ্ছে মুখমণ্ডলের নূর, হৃদয়ের উন্মুক্ততা ও প্রশস্ততা, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি। সাজদার কারণে কপালে যে দাগ পড়ে তা অনেক সময় চামড়া নরম হওয়ার কারণে- যারা শুধুমাত্র ফরয সলাত আদায় করে- তাদেরও হয়ে

---

[১]. কিন্তু ইমামদের মধ্যে অনেকেই উল্লেখিত ব্যাখ্যার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী লিখেছেন ঃ হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে। এটাই সুন্নাত সম্মত। কেননা অন্য একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি ﷺ মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। (ইবনু খুযায়মা, দারাকুতনী; হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে তা সহীহ বলেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেন।) হাঁটুর আগে হাত রাখার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, ইমাম মালিক। ইমাম আহমাদও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। মারওয়াযী (মাসায়েল গ্রন্থে) সহীহ সনদে ইমাম আওয়াযাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি লোকদেরকে পেয়েছি তারা হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।'- অনুবাদক।

[২]. সহীহুল বুখারী। আবূ হুমায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী ﷺ রুকূ করলেন। অতঃপর পৃষ্ঠদেশ নীচু করে সোজা রেখে দীর্ঘ করলেন।' অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে পিঠ সোজা করা। সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তিনি ﷺ রুকূ করলে মাথা নীচু করতে না এবং খাড়া রাখতেন না; মাঝামাঝি পিঠ বরাবর রাখতেন। অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

www.pathagar.com

থাকে। অথচ অনেক লোক অধিক হারে এবং দীর্ঘ সাজদা করেও তাদের কপালে এ চিহ্ন দেখা যায় না।

প্রশ্ন ঃ (২৫২) দু'সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানোর বিধান কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস রয়েছে। ইবনু ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী ﷺ যখন সলাতে বসতেন... তিনি বলেন, তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।"[১] অন্য শব্দে বলা হয়েছে ঃ "যখন তিনি তাশাহুদে বসতেন।" প্রথম বাক্যটি 'আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। আর দ্বিতীয় বাক্যটি খাস বা বিশেষ অর্থবোধক। কায়েদা বা মূলনীতি হচ্ছে খাস বিষয়কে যদি এমন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যা 'আমের অর্থ বহন করে, তখন 'আম বিষয়কে আর খাস করা হবে না। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আপনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, ছাত্রদের সম্মানিত করুন এবং তাকে বললেন, মুহাম্মাদকে সম্মানিত করুন। মুহাম্মাদ ছাত্রদেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, অন্যান্য ছাত্রদেরকে সম্মানিত করা হবে না। উসূলবিদ বিদ্বানগণ এ কথা বলেছেন। শায়খ শানক্বীতী (আযওয়াউল বায়ান) গ্রন্থে এ মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু যদি বলে থাকে ছাত্রদেরকে সম্মানিত কর। তারপর বলল, ক্লাস রুমে যারা ঘুমায় তাদের সম্মানিত করো না। এখানে খাস বা বিশেষ করে দেয়া হল। কেননা 'আম বা ব্যাপকের বিধানের বিপরীত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া মাসআলাটির ব্যাপারে আলাদা হাদীসও পাওয়া যায়। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, 'ফতহুর্ রাব্বানী' গ্রন্থের (১/১৪৭) লেখক তার সনদকে হাসান বলেন। যাদুল মা'আদের টীকা লেখকদের কেউ কেউ তার সনদ সহীহ বলেও মন্তব্য করেছেন। "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'সাজদার মধ্যে বসলে আঙ্গুলসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।" [২]

আঙ্গুল নড়াতে হবে না- এ ব্যাপারে যারা কথা বলেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, তবে ডান হাত কি অবস্থায় থাকবে? যদি জবাবে বলা হয়, রানের উপর ছড়িয়ে রাখতে হবে। প্রশ্ন হবে, এ কথার দলীল কি? কোন হাদীসে তো এ কথা বলা হয়নি যে, তিনি ﷺ ডান হাতকে উরুর উপর ছড়িয়ে

---

[১]. মুসলিম। অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান। অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে বসার পদ্ধতি।

[২]. কিন্তু হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের কোথায় আছে আমি এখনও তা খুঁজে পাইনি।- অনুবাদক

www.pathagar.com

রাখতেন। এরূপ কোন হাদীস থাকলে সাহাবীগণ তার বর্ণনা দিতেন- যেমনটি বর্ণনা পাওয়া যায় বাম হাতকে উরুর উপর ছড়িয়ে রাখার ব্যাপারে।

প্রশ্ন ঃ (২৫৩) জালসা ইস্তিরাহা[১] করার বিধান কি?

উত্তর ঃ এ মাসআলাটিতে বিদ্বানদের তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

প্রথম ঃ জালসা ইস্তিরাহা করা সবসময় মুস্তাহাব।

দ্বিতীয় ঃ জালসা ইস্তিরাহা করা কখনই মুস্তাহাব নয়।

তৃতীয় ঃ উল্লেখিত দু'টি মতের মধ্যপন্থী মত। সরাসরি দাঁড়াতে যাদের কষ্ট হয় তারা জালসা ইস্তিরাহা করবে। আর যাদের কষ্ট হয় না তার জালসা ইস্তিরাহা করবে না।

মুগনী গ্রন্থে (১/৫২৯ দারুল মানার প্রকাশনী) বলা হয়েছে ঃ "এ তৃতীয় মতটি দ্বারা হাদীসসমূহের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে দু'টি মতের মধ্যপন্থী মত।" অতঃপর পরবর্তী পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরয সলাতে সুন্নাত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যখন প্রথম দু'রাক'আত শেষ করে উঠবে, তখন দু'হাত দিয়ে মাটিতে ভর করে যেন না উঠে। তবে যদি অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি অনুরূপ করতে সক্ষম না হয়, তবে সে হাত দ্বারা মাটিতে ভর করে উঠতে পারে। (হাদীসটি আসরাম বর্ণনা করেন।)[২] এরপর মুগনী গ্রন্থকার বলেন, মালিক বিন হুওয়াইরিস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

"নবী ﷺ যখন দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন, সোজা হয়ে বসতেন, তারপর জমিনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।"[৩]

এ হাদীসটি হচ্ছে সেই সময়ের কথা যখন নবী ﷺ দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সরাসরি দাঁড়াতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কেননা তিনি বলেন, "আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে। তাই তোমরা রুকূ সাজদায় আমার আগ বেড়ে কিছু করো না।"

---

[১]. প্রথম বা তৃতীয় রাক'আতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে সরাসরি না দাঁড়িয়ে একটু বসে তারপর দাঁড়ানোকে জালসা ইস্তিরাহা বলা হয়।

[২]. বায়হাক্বী ২/১৩৬। দ্রঃ মুগনী ২/২১৪।

[৩]. বুখারী। অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম রাক'আত থেকে উঠার সময় কিভাবে যমীনে ভর দিবে।

www.pathagar.com

এ তৃতীয় মতকে আমি সমর্থন করি। কেননা মালিক বিন হুওয়াইরিস (রাঃ) এমন সময় নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করেন যখন তিনি তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আর সে সময় নবী ﷺ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর দুর্বলতা সুস্পষ্ট হচ্ছিল। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا 'নবী ﷺ-এর শরীর মোবারক যখন মোটা ও ভারী হয়ে গিয়েছিল, তখন অধিকাংশ সলাত তিনি বসে বসে আদায় করতেন।'[১] আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, নবী ﷺ কি বসে বসে সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ 'হ্যাঁ, যখন তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।'[২]

হাফসা (রাঃ) বলেন,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا.

"আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো বসে নফল সলাত আদায় করতে দেখিনি। তবে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে থেকে তিনি বসে নফল সলাত আদায় করেছেন।"[৩] অপর বর্ণনায় 'একবছর বা দু'বছর পূর্বে থেকে।'

এ বর্ণনাগুলো সবই সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় মালিক বিন হুওয়াইরিস বর্ণিত হাদীসে, যাতে মাটিতে ভর করে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। আর সাধারণতঃ প্রয়োজন ছাড়া কোন বস্তুর উপর নির্ভর করার প্রশ্নই উঠে না।

সম্ভবতঃ আমাদের সমর্থনে আবদুল্লাহ্ বিন বুহায়না (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পেশ করা যায়। তিনি বলেন, 'নবী ﷺ একদা তাদেরকে নিয়ে যোহর সলাত আদায় করলেন। কিন্তু তিনি দু'রাক'আত পড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বসলেন না।'[৪] এখানে 'বসলেন না' শব্দটি দ্বারা সব ধরনের বসা বুঝা যায়। অর্থাৎ- জালসা ইস্তিরাহাতেও বসলেন না। কিন্তু এর জবাবে বলা যায়, এখানে

---

[১]. সহীহ্ মুসলিম। অধ্যায় ঃ মুসাফিরদের সলাত। অনুচ্ছেদ ঃ নফল সলাত দাঁড়িয়ে ও বসে পড়া জায়েয।

[২]. দ্রঃ পূর্বোক্ত উৎস।

[৩]. দ্রঃ পূর্বোক্ত উৎস।

[৪]. বুখারী। অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ যারা প্রথম তাশাহুদ ওয়াজিব মনে করে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে ভুল করা।

www.pathagar.com

'বসলেন না' বলতে তাশাহুদের জন্য বসা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত)

প্রশ্ন ঃ (২৫৪) তাশাহুদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তর্জনী আঙ্গুল নড়ানোর বিধান কি?

উত্তর ঃ তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানো শুধুমাত্র দু'আর সময় হবে। পুরা তাশাহুদে নয়। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ "তিনি তা নাড়াতেন ও দু'আ করতেন।"[১] এর কারণ হচ্ছে ঃ দু'আ আল্লাহ্র কাছেই করা হয়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমানে আছেন। তাই তাঁকে আহবান করার সময় উপরে আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

"তোমরা কি নিরাপদে আছো সেই সত্তা থেকে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না? তখন আকস্মিকভাবে জমিন থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা নাকি তোমরা নিরাপদ আছো সেই সত্তার ব্যাপারে যিনি আসমানের অধিপতি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে, আমার সকর্তকীকরণ কিরূপ ছিল।" (সূরা মুল্ক ঃ ১৬-১৭)

নবী ﷺ বলেন, أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ "তোমারা কি আমাকে আমানতদার মনে করো না? অথচ যিনি আসমানে আছেন আমি তার আমানতদার।"[২] সুতরাং আল্লাহ আসমানে তথা সবকিছুর উপরে আছেন। যখন আপনি দু'আ করবেন উপরের দিকে ইঙ্গিত করবেন। এ কারণে নবী ﷺ বিদায় হাজ্জে খুতবা প্রদান করে বললেন, "আমি কি পৌঁছিয়েছি?" তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠালেন এবং লোকদের দিকে আঙ্গুলটিকে ঘুরাতে থাকলেন বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ!! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।" এ দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপরে অবস্থান করেন। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত ফিতরাতীভাবে, বিবেক যুক্তি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে। এ ভিত্তিতে

---

১. ফাতহুর রব্বানী ৩/১৪৭। সনদ হাসান।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ আলী ও খালিদ (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণ। মুসলিম, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ খারিজীদের আলোচনা ও তাদের বিবরণ।

www.pathagar.com

যখনই আপনি আল্লাহ তা'আলাকে ডাকবেন তাঁর কাছে দু'আ করবেন, তখনই আসমানের দিকে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করবেন এবং তা নাড়াবেন। আর অন্য অবস্থায় তা স্থির রাখবেন।

এখন আমরা অনুসন্ধান করি তাশাহুদে দু'আর স্থানগুলো ঃ ১) আস্‌সালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বা রাক'আতুহু ২) আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। ৩) আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ৪) আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ ৫) আ'উযুবিল্লাহি মিন আযাবি জাহান্নাম ৬) ওয়া মিন আযাবিল ক্বাবরি। ৭) ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত। ৮) ওয়ামিন ফিতনাতল মাসীহিদ্দাজ্জাল। এই আটটি স্থানে আঙ্গুল নাড়াবে এবং তা আকাশের দিকে উত্থিত করবে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন দু'আ পাঠ করলেও আঙ্গুল উপরে উঠাবে। কেননা দু'আ করলেই আঙ্গুল উপরে উঠাবে।

প্রশ্ন ঃ (২৫৫) মুসল্লী কি প্রথম তাশাহুদে শুধু তাশাহুদের শব্দগুলো পাঠ করবে? নাকি দরূদও পাঠ করবে?

উত্তর ঃ তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতের প্রথম তাশাহুদে শুধুমাত্র পাঠ করবে ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبركاته، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

এটাই উত্তম। যদি এরপর দরূদ পাঠ করে তবেও কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু আমার মতে সুন্নাতের নিকটবর্তী কথা হচ্ছে দরূদের পূর্বের বাক্যটি পাঠ করা- দরূদ না পড়া। তবে ইমাম তাশাহুদ দীর্ঘ করলে দরূদ পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (২৫৬) সলাতে তাওয়ার্‌রুক[১] করার বিধান কি? এ বিধান কি নারী-পুরুষ সবার জন্যই?

উত্তর ঃ যে সকল সলাতে দু'টি তাশাহুদ আছে তার শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্‌রুক করা সুন্নাত। যেমন- মাগরিব, এশা, যোহর ও আসর সলাতে।

---

[১]. তাওয়ার্‌রুক হচ্ছে ঃ তাশাহুদের শেষ বৈঠকে বসার সময় ডান পাকে বাম পায়ের নীচে বের করে দিয়ে নিতম্ব যমীনে রেখে তার উপর বসা এবং ডান পাকে খাড়া রাখা।

www.pathagar.com

কিন্তু যে সলাতে শুধু একটিই তাশাহুদ- যেমন ফজর সলাত, তাতে তাওয়াররুক করা সুন্নাত নয়।

আর এ সুন্নাত নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। কেননা ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে বরাবর। তবে দলীলের ভিত্তিতে যে পার্থক্য পাওয়া যায় তার কথা ভিন্ন। কিন্তু এমন কোন সহীহ্ দলীল নেই যা দ্বারা নারী-পুরুষের সলাতে পার্থক্য প্রমাণিত হয়। সলাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলেই সমান।

প্রশ্ন ঃ (২৫৭) শুধুমাত্র ডান দিকে একবার সালাম ফেরানো কি যথেষ্ট হবে?

উত্তর ঃ বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ একদিকে সালাম ফেরানো যথেষ্ট মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, অবশ্যই দু'দিকে সালাম দিতে হবে। আবার কেউ বলেন, এক সালাম নফল সলাতের ক্ষেত্রে জায়েয, ফরযে নয়।

কিন্তু সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, দু'দিকে সালাম ফেরানো। কেননা এটাই নবী ﷺ থেকে অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম যদি একদিকে সালাম ফেরায় আর মুক্তাদী মনে করে একদিকে সালাম ফেরানো যথেষ্ট নয়, তবে সে দু'দিকেই সালাম ফেরাবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ইমাম যদি দু'দিকে সালাম দেয়, আর মুক্তাদী মনে করে একদিকে সালাম ফেরানো যথেষ্ট, তবে সে ইমামের অনুসরণ করার স্বার্থে উভয় দিকে সালাম ফেরাবে।

প্রশ্ন ঃ (২৫৮) সলাত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কি ইমাম উঠে চলে যেতে পারেন? নাকি কিছুটা অপেক্ষা করবেন?

উত্তর ঃ ইমামের জন্য উত্তম হচ্ছে সালাম ফেরানোর পর সামান্য কিছু সময় ক্বিবলামুখী হয়ে বসে থাকবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' ও একবার اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'আল্লাহুম্মা আন্তাস্সালাম ওয়া মিনকাস্সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' পাঠ করবেন। তারপর মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসবেন।

ইমাম উঠে চলে যেতে চাইলে যদি মুক্তাদীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় তবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে কিছুক্ষণ বসে থেকে অপেক্ষা করবে। ভীড় কম থাকলে ফিরে যেতে কোন বাধা নেই।

মুক্তাদীর জন্যে উত্তম হচ্ছে ইমামের আগে ফিরে না যাওয়া। কেননা নবী ﷺ বলেন, "আমার আগেই তোমরা ফিরে যেও না।" কিন্তু ইমাম যদি

www.pathagar.com

ক্বিবলামুখী হয়ে সুন্নাতী সময়ের চাইতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে। তবে মুক্তাদীদের ফিরে যেতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (২৫৯) সলাত শেষ করেই পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর সাথে মুসাফাহা করা ও 'তাক্বাব্বালাল্লাহু' (আল্লাহ কবূল করুন) বলা সম্পর্কে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ সলাত শেষ করেই পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর সাথে মুসাফাহা করা ও 'তাক্বাব্বালাল্লাহু' (আল্লাহ কবূল করুন) বলার কোন ভিত্তি নেই। এ সম্পর্কে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের থেকে কোন কিছু প্রমাণিত নেই।

প্রশ্ন ঃ (২৬০) তাসবীহ্ দানা দ্বারা তাসবীহ্ পড়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ তাসবীহ্ দানা ব্যবহার করা জায়েয। তবে উত্তম হচ্ছে, হাতের আঙ্গুল ও আঙ্গুলের কর ব্যবহার করা। কেননা নবী ﷺ বলেন,

اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

"আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ্ গণনা কর। কেননা (কিয়ামাত দিবসে) এগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং এগুলোকে কথা বলানো হবে।"[১]

তাছাড়া তাসবীহ ছড়া হাতে নিয়ে থাকলে রিয়া বা লোক দেখানো ভাবের উদ্রেক হতে পারে। আর যারা তাসবীহ্ ছড়া ব্যবহার করে সাধারণতঃ তাদের অন্তর উপস্থিত থাকে না। এদিক ওদিকে তাকায়। সুতরাং আঙ্গুল ব্যবহার করাই উত্তম ও সুন্নাত সম্মত।

প্রশ্ন ঃ (২৬১) সলাতের পর সুন্নাত সম্মত যিক্রসমূহ কি কি?

উত্তর ঃ সলাতের পর আল্লাহ্র যিক্র করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন।

তিনি বলেন,

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾

"যখন তোমরা সলাত সমাধা করবে, তখন আল্লাহ্র যিক্র করবে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায়।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

আল্লাহ্র এ নির্দেশের বর্ণনা দিয়েছেন নবী ﷺ তাঁর কর্ম ও বাণীর মাধ্যমে। অতএব সালাম ফেরানোর পর নিম্নলিখিত দু'আসমূহ পাঠ করবে ঃ

---

[১]. আহমাদ। আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ তাসবীহ্ পাঠ করার ফযীলত।

www.pathagar.com

১) তিনবার ইস্তিগফার করবে। অর্থাৎ- আস্তাগফিরুল্লাহ্ পাঠ করবে এবং বলবেঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তস্‌সালাম ওয়ামিন কাস্‌সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।[১]

অতঃপর বলবে ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ ঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

আল্লাহুম্মা লা মা নি'আ লিমা আ'ত্বায় তা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ ঃ এক আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। মালিকানা তাঁরই, সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য।

হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না।[২]

২)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদাত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত

---

১. মুসলিম অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতের পর যে সকল যিক্‌র মুস্তাহাব।

২. মুগিরা বিন কো'বা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। বুখারী অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতের পর যিক্‌র। মুসলিম. পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

www.pathagar.com

নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা ধর্ম পালন করি একনিষ্ঠ ভাবে। যদিও কাফিররা তা মন্দ ভাবে।[১]

৩) তাসবীহ পাঠ করবে অর্থ্যাৎ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে ৩৩ বার।[২]

৪) এবং একশ এর পূর্ণতা স্বরূপ এ দু'আটি বলবে ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ ঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। মালিকানা তাঁরই, সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য।

যে ব্যক্তি অত্র তাসবীহ্ ও দু'আটি বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশি পরিমাণ হয় না কেন।[৩]

পূর্বোল্লিখিত তাসবীহ্‌গুলো যে কোনটা দ্বারা শুরু করতে পারবে। আর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার একসাথে ৩৩ বার বলবে অথবা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ৩৩ বার করে বলবে কোন অসুবিধা নেই।

অনুরূপভাবে উক্ত তাসবীহ্‌সমূহ ৩৩ বারের পরিবর্তে ১০ বার করে বলতে পারবে।[৪]

৫) সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার- এই চারটি তাসবীহ্ পাঠ করবে ২৫ বার। সর্বমোট ১০০ বার।[৫]

উল্লেখিত তাসবীহ্‌গুলোর যে কোন একটি প্রকার পাঠ করলেই হবে। কেননা ইসলামী মূলনীতি হচ্ছে, (কোন ইবাদাত যদি কয়েকভাবে প্রমাণিত হয়, তবে তার প্রত্যেক প্রকার থেকে কখনো এটা কখনো ওটা বাস্তবায়ন করা সুন্নাত।) এ তাসবীহ সকল সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফজর, যোহর, আসর,

---

[১]. আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর বর্ণিত হাদীস। মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

[২]. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। বুখারী অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতের পর যিক্‌র। মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

[৩]. মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

[৪]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ আদব, অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার সময় তাসবীহ্ পাঠ করা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদ নং ২৫। নাসায়ী, অধ্যায় ঃ সাহু বা ভুল করা, অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পর তাসবীহ্‌র সংখ্যা। ইবনু মাজাহ্ অধ্যায় ঃ সলাত কায়েম করা, অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পর যা বলতে হয়।

[৫]. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদ নং ২৫।

www.pathagar.com

মাগরিব ও এশা। তবে ফজর ও মাগরিব সলাত বাদ নিম্নলিখিত দু'আটি ১০ বার পাঠ করবে ঃ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।' অনুরূপভাবে উক্ত দু'সলাতের পর সাত বার পাঠ করবে এই দু'আ ঃ (رَبِّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّـــارِ) 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।'

৬) অতঃপর আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে। যে ব্যক্তি প্রতেক ফরয সলাতান্তে অত্র আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বাধা দানকারী একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।[১]

৭) তারপর একবার করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করবে। তবে ফজর বা মাগরিব সলাত এর ব্যতিক্রম- এ দুই সলাতের পর অত্র তিনটি সূরা তিনবার করে পাঠ করবে। (আবূ দাঊদ, নাসাঈ)

প্রশ্ন ঃ (২৬২) সলাতের পর হাত উত্তোলন করে দু'আ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাত শেষে হাত তুলে দু'আ করা শরীয়ত সম্মত নয়। দু'আ করতে চাইলে সলাতের মধ্যে দু'আ করা উত্তম। এ কারণে ইবনু মাস'উদ বর্ণিত তাশাহুদ শিক্ষার হাদীসে নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন ঃ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ "তারপর ইচ্ছামত যে কোন দু'আ পাঠ করবে।"[২]

সাধারণ মানুষ অনেকেই ফরয বা সুন্নাত যে কোন সলাত শেষ হলেই হাত তুলে দু'আ আরম্ভ করে। এমনকি এদের অধিকাংশ এ কাজ কখনই পরিত্যাগ করে না। অনেক লোক এমন দেখবেন ফরয সলাত শুরু হয়ে যাচ্ছে আর সে সুন্নাত সলাতের তাশাহুদে বসে আছে। সালাম ফেরানো হলেই হাত উঠাবে কিছু বলল কি না আল্লাহই জানেন আবার হাত মুখে মুছে ফেলবে। মনে করে সলাত শেষ করে হাত দু'টো না উঠালে যেন সলাতটাই সুন্দর হল না।[৩]

---

১. নাসায়ী।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহুদের পর ইচ্ছাধীন দু'আ করা।

৩. অথচ নাবী ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কোন হাদীস পাওয়া যায় না। সাহাবী তাবেঈদের যুগেও এর সহীহ সনদ ভিত্তিক কোন প্রমাণ মিলে না। এমনকি নাবী ﷺ থেকে সহীহ তো দূরের কথা কোন যঈফ বর্ণনাও পাওয়া যায় না। তাই একাজ সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী বিদ'আত। যা পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানের মুসলমানগণ এই বিদ'আতটিকে একটি সুন্নাত তো বটেই বরং ফরযের মতই মনে করে। যার কারণে দেখবেন, যদি আপনি ফরয সলাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পঠিতব্য সহীহ হাদীসে দ্বারা প্রমাণিত দু'আ যিকিরে মাশগুল হন, ওদের সাথে

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (২৬৩) ফরয সলাতান্তে সমস্বরে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি পাঠ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাতান্তে সকলে মিলে সমস্বরে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী বা অন্যান্য যিক্‌র পাঠ করা বিদআত। কেননা নবী ﷺ এবং সাহাবীদের (রাঃ) থেকে যেটা প্রমাণিত রয়েছে, তাঁরা ফরয সলাত শেষ করে কিছুটা উঁচু আওয়াযে যিক্‌র পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে পাঠ করতেন। সমস্বরে নয়। অতএব ফরয সলাতান্তে উঁচু কণ্ঠে যিক্‌র করা সহীহ সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

"নবী ﷺ-এর যুগে লোকেরা ফরয সলাত শেষ করলে উঁচু কণ্ঠে যিক্‌র পাঠ করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উঁচু কণ্ঠের যিক্‌র শুনলে আমি বুঝতাম লোকেরা সলাত শেষ করেছেন।"[১]

কিন্তু সলাতের পর উঁচু কণ্ঠে বা নীচু কণ্ঠে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে নবী ﷺ হতে কোন হাদীস আমি জানি না। তবে সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে, আয়াতুল কুরসী ও মুআব্বিযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) পাঠ করা।[২]

প্রশ্ন ঃ (২৬৪) টয়লেট সারতে গেলে জামা'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে কি করবে?

উত্তর ঃ প্রথমের টয়লেটের কাজ সম্পন্ন করবে। তারপর ওযূ করে সলাতের দিকে অগ্রসর হবে। যদিও তার জামা'আত ছুটে যায় কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটা তার ওযর।

বিদ'আতী মুনাজাতে শরীক না হন- তবে অন্যান্য মুসল্লীরা আপনার প্রতি বাঁকা নজরে দেখবে, যেন মস্ত বড় একটি অপরাধ করেছেন! আর ইমাম সাহেব যদি কখনো এ মুনাজাত ছেড়ে দেন তবে অনেক ক্ষেত্রে তার চাকুরী নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে।

[১] . বুখারী অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতের পর যিক্‌র। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতের পর যে সকল যিক্‌র মুস্তাহাব।

[২] . আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সলাতান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বাধা দানকারী একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।' (নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লায়ল ১৮৫ পৃঃ) অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, 'নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয সলাতান্তে মুআব্বিযাত (সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস) পাঠ করতেন।' (আবূ দাউদ, নাসায়ী)

www.pathagar.com

নবী ﷺ বলেন,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"খাদ্য উপস্থিত হলে এবং দু'টি নাপাক বস্তুর চাপ থাকলে সলাত নেই।"[১]

প্রশ্ন ঃ (২৬৫) সলাত আদায়ের সময় চোখ বন্ধ রাখার বিধান কি?

উত্তর ঃ সলাত অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ। কেননা এটা নবী ﷺ-এর সুন্নাত বিরোধী। তবে যদি কোন কারণ থাকে যেমন, সম্মুখের দেয়াল বা কার্পেট বা জায়নামাযে এমন কোন নকশা থাকে যার কারণে সলাতের একাগ্রতা নষ্ট হয় বা সম্মুখে শক্তিশালী আলো থাকে যাতে চোখের ক্ষতির আশংকা হয়, তবে চোখ বন্ধ রাখতে কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ কারণবশতঃ হলে কোন অসুবিধা নেই। অন্যথা তা মাকরূহ। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের যাদুল মা'আদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ (২৬৬) সলাতরত অবস্থায় ভুলক্রমে আঙ্গুল ফুটালে কি সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ আঙ্গুল ফুটালে সলাত বাত্বিল হয় না। কিন্তু এটি একটি অনর্থক কাজ। যা থেকে বিরত থাকা উচিত। জামা'আতের সাথে থাকলে নিঃসন্দেহে এতে অন্যান্য মুসল্লীর সলাতে ব্যাঘাত ঘটবে। তখন তা আরো ক্ষতিকর।

এ উপলক্ষে আমি বলতে চাই, সলাত অবস্থায় নড়াচড়া পাঁচভাগে বিভক্তঃ

১) ওয়াজিব ২) সুন্নাত ৩) মাকরূহ ৪) হারাম ৫) জায়েয।

ওয়াজিব নড়াচড়া ঃ যেমন- সলাত শুরু করেছে এমন সময় স্মরণ হল, তার টুপিতে নাপাকি রয়েছে। তখন টুপি খুলে ফেলার জন্য নড়াচড়া করা ওয়াজিব। এ কথার দলীল হচ্ছে ঃ একদা নবী ﷺ জুতো পরে সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় জিবরীল (আঃ) এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন, তাঁর জুতায় নাপাকী রয়েছে। তিনি সলাতরত অবস্থাতেই জুতা খুলে ফেললেন এবং সলাত চালিয়ে গেলেন।[২]

সুন্নাত নড়াচড়া ঃ সলাত পরিপূর্ণ করার জন্য নড়াচড়া করা। যেমন- কাতারের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করার জন্য সলাত অবস্থায় সামনের কাতারে চলে যাওয়া বা ডানে-বামে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর কাছে সরে যাওয়া। এসবগুলো করা সুন্নাত।

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের উপস্থিতিতে সলাত পড়া মাকরূহ।

[২]. আবূ দাউদ অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরে সলাত আদায় করা। সহীহ ইবনু খুযায়মা (হাঃ ৭৮৬)

www.pathagar.com

মাকরূহ নড়াচড়া ঃ অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া। যার সাথে সলাতের কোনই সম্পর্ক নেই।

হারাম নড়াচড়া ঃ লাগাতার অধিকহারে নড়াচড়া করা। যেমন- দাঁড়ানো অবস্থায় অনর্থক কাজ করা, রুকূ অবস্থায় অধিকহারে নড়াচড়া করা, সাজদা বা বসা অবস্থায় অনর্থক নড়াচড়া করতে থাকা এমনকি এভাবে সলাত শেষ করা। এ ধরনের নড়াচড়া হারাম। এর মাধ্যমে সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে।

জায়েয নড়াচড়া ঃ যেমন শরীরের কোন স্থান চুলকানোর প্রয়োজন অনুভব করল। বা শরীর থেকে মশা তাড়ানোর দরকার পড়ল... ইত্যাদি ছোট-খাট বিষয় যা পরস্পর নয় এবং অধিকহারে নয় তা বৈধ।

প্রশ্ন ঃ (২৬৭) সুতরার বিধান কি? এবং এর সীমা কতটুকু?

উত্তর ঃ সুতরা গ্রহণ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। তবে জামা'আতের সাথে সলাত পড়লে মুক্তাদীর জন্য সুতরার দরকার নেই। ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। এর সীমা সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ

مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

"উটের উপর হেলান দিয়ে বসার জন্য তার পিঠে যে কাঠ রাখা হয় তার উচ্চতার বরাবর।"[১]

এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা। এর চাইতে কমও বৈধ আছে। কেননা হাদীসে এসেছে ঃ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন সলাত আদায় করে, সে যেন একটি তীর দিয়ে হলেও সুতরা করে নেয়।"[২]

হাসান সনদে আবূ দাউদ বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "কোন কিছু না পেলে যেন একটি দাগ টেনে নেয়।" হাফেয ইবনু হাজার বুলূগুল মারাম গ্রন্থে বলেন, যারা হাদীসটি মুযতারাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা সঠিক কথা বলেননি। সুতরাং হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার তেমন কোন কারণ নেই।

প্রশ্ন ঃ (২৬৮) মাসজিদে হারামে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার বিধান কি? সলাত ফরয হোক বা নফল। মুসল্লী মুক্তাদী হোক বা একাকী হোক।

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সুতরার বিবরণ।

২. ইবনু খুযায়মা, অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সুতরা। আহমাদ, হাঃ ১৪৭৯৯।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ মাসজিদুল হারাম বা অন্য কোন স্থানে মুক্তাদী মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) মিনায় আগমন করলেন। তখন নবী ﷺ লোকদের নিয়ে একটি দেয়াল সামনে রেখে সলাত আদায় করছিলেন। ইবনু আব্বাস কাতারের সম্মুখ দিয়ে একটি গাধার পিঠে চড়ে অতিক্রম করলেন। কেউ তার প্রতিবাদ করেনি।[১]

মুসল্লী যদি ইমাম বা একক হয়, তবে তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। চাই তা মাসজিদুল হারামে হোক বা অন্য কোন স্থানে। কেননা সাধারণভাবে হাদীসগুলোই এ কথাই প্রমাণ করে। এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যে, মক্কা বা মাসজিদে হারামে বা মদীনার মাসজিদে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা যাবে কোন গুনাহ্ হবে না।

প্রশ্ন ঃ (২৬৯) সলাতের সময় মুসল্লীদের সম্মুখে বৈদ্যুতিক হিটার (শীতকালে ঠাণ্ডা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হিটার) রাখার বিধান কি? এক্ষেত্রে কি কোন শরঈ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে?

উত্তর ঃ মুসল্লীদের সম্মুখভাগে ক্বিবলার দিকে হিটার রাখতে কোন অসুবিধা নেই। শরীয়তে এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আমার কোন কিছু জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ (২৭০) সলাতের ক্বিরাআতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা আসলে জান্নাতের প্রার্থনা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এটা জায়েয। এক্ষেত্রে ইমাম, মুক্তাদী বা একক ব্যক্তির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে মুক্তাদীর যেন ইমামের ক্বিরাআত নীরব থেকে শোনার ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

প্রশ্ন ঃ (২৭১) সাহু সাজদা করার কারণসমূহ কি কি?

উত্তর ঃ সাহু সাজদা সংবিধিবদ্ধ করার পিছনে রহস্য হল এই যে, তা সলাতের মধ্যে যে ত্রুটি হয় তার পূর্ণতা দান করে।

তিনটি কারণে সলাতে সাহু সাজদা দিতে হয় ঃ

১) সলাত বৃদ্ধি হওয়া। যেমন, কোন রুকূ বা সাজদা বা বসা ইত্যাদি বৃদ্ধি হওয়া।

২) হ্রাস হওয়া। কোন রুকন বা ওয়াজিব কম হওয়া।

---

[১] . বুখারী, অধ্যায় ঃ 'ইল্ম বা বিদ্যা, অনুচ্ছেদ ঃ কখন কম বয়সের বালকের নিকট থেকে হাদীস শোনা বিশুদ্ধ। মুসলিম অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সুতরা।

www.pathagar.com

৩) সন্দেহ হওয়া। কত রাক'আত পড়েছে তিন না চার এ ব্যাপারে সংশয় হওয়া।

প্রথমতঃ সলাতে বৃদ্ধি হওয়া ঃ

মুসল্লী যদি সলাতের অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু কাজ ইচ্ছাকৃত বৃদ্ধি করে যেমন- দাঁড়ানো, বসা, রুকূ', সাজদা ইত্যাদি- যেমন দু'বার করে রুকূ করা, তিন বার সাজদা করা, অথবা যোহর পাঁচ রাক'আত আদায় করা। তবে তার সলাত বাত্বিল বা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত আমল করেছে। নবী ﷺ বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"[১]

কিন্তু যদি ভুলবশতঃ তা করে এবং ঐভাবেই সলাত শেষ করে দেয়ার পর স্মরণ হয় যে, সলাতে বৃদ্ধি হয়ে গেছে, তবে শুধুমাত্র সাহু সাজদা করবে। তার সলাত ও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সলাত রত অবস্থায় যদি উক্ত বৃদ্ধি স্মরণ হয়- যেমন চার রাক'আত শেষ করে পাঁচ রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে- তবে সে ফিরে আসবে এবং শেষে সাজদায়ে সাহু করবে।

উদাহরণঃ জনৈক ব্যক্তি যোহরের সলাত পাঁচ রাক'আত আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু শেষ তাশাহুদে বসার সময় এ বৃদ্ধির কথা তার স্মরণ হল, তাহলে সে তাশাহুদ পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরাবে। তারপর সাহু সাজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি সালাম ফেরানোর পর তা স্মরণ হয়, তবে সাহু সাজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে।

আর যদি পঞ্চম রাক'আত চলা অবস্থায় স্মরণ হয় তবে তখনই বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। তারপর সাজদায়ে সাহু করে আবার সালাম ফেরাবে।

দলীল ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَزِيدَ فِي الصَّـــلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم. وفي رواية: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثم سلم.

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ আকযিয়া, অনুচ্ছেদ, বাত্বিল ফায়সালাসমূহ প্রত্যাখ্যান করা।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ যোহরের সলাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, সলাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, কিভাবে? তাঁরা বললেন, আপনি আজ পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তখন তিনি দু'টি সাজদা করলেন। অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, তখন তিনি পা গুটিয়ে ক্বিবলামুখী হলেন, দু'টি সাজদা করলেন অতঃপর সালাম ফেরালেন।[১]

সলাত পূর্ণ হওয়ার আগেই সালাম ফেরানো ঃ

সলাত পূর্ণ হওয়ার আগেই সালাম ফেরানো সলাতে বৃদ্ধি করার অন্তর্গত। কেননা সলাত রত অবস্থায় সে সালামকে বৃদ্ধি করেছে। এ কাজ যদি ইচ্ছাকৃত করে তবে সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলক্রমে হয়, কিন্তু অনেক পরে তার এ ভুলের কথা মনে পড়ল তবে সলাত পুনরায় ফিরিয়ে পড়বে। আর যদি একটু পরেই (যেমন দু' এক মিনিট) তবে সে অবশিষ্ট সলাত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরাবে। অতঃপর সাহু সাজদা করে সালাম ফিরাবে।

দলীল ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّه عَنْه أَنّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى بِهِم الظُّهْرَ أو العصر فسَلَّمَ من رَكْعَتَيْنِ فَخَرَجَ سَرَعَانُ من أبواب الْمَسْجِد يقولون: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلى خَشَبَةِ الْمَسْجِد فاتكأ عَلَيْهَا كأنه غضبانَ، فقام رجل فَقَالَ يَا رسول الله: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ، فقال الرجل: بَلَى نَسِيتَ فقال النَّبِيُّ ﷺ للصحابة: أَحقٌّ ما يقول؟ قَالُوا: نعم، فتقدم النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى ما بقي من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. (متفق عليه)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ তাদেরকে নিয়ে যোহর অথবা আসরের সলাত আদায় করলেন। কিন্তু দু'রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরিয়ে দিলেন। কিছু লোক দ্রুত মাসজিদ

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ ক্বিবলার বিবরণ। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে সাহু বা ভুল করা।

www.pathagar.com

থেকে এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেল যে, সলাত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। নবীজিও ﷺ মাসজিদের এক খুঁটির কাছে গিয়ে তাতে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন রাগান্বিত। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সলাত সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে? নবী ﷺ বললেন, আমি তো ভুলিনি, আর সলাতও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। লোকটি বলল, বরং আপনি ভুলেই গিয়েছেন। (কারণ আপনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছেন।) নবী ﷺ সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, একি সত্য বলছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অবশিষ্ট দু'রাক'আত আদায় করে তাশাহ্‌দ পড়ে সালাম ফিরলেন। তারপর দু'টি সাজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফেরালেন।[১]

দ্বিতীয়তঃ সলাতে হ্রাস হওয়াঃ

ক) রুকন হ্রাস হওয়া ঃ

মুসল্লী যদি কোন রুকন কম করে ফেলে- উক্ত রুকন যদি তাকবীরে তাহরিমা (সলাত শুরু করার তাকবীর) হয়, তবে তার সলাত ই হবে না। চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিক বা ভুলক্রমে ছেড়ে দিক। কেননা তার সলাত ই তো শুরু হয়নি।

আর উক্ত রুকন যদি তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য কিছু হয় আর তা ইচ্ছাকৃত হয় তবে তার সলাত বাত্বিল বা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে কোন রুকন ছুটে যায়- যেমন প্রথম রাক'আতে কোন রুকন ছুটে গেল, এখন যদি দ্বিতীয় রাক'আতে সেই ছুটে যাওয়া রুকনের নিকট পৌছে যায়- তবে এ অবস্থায় আগের রাক'আত বাত্বিল হয়ে যাবে এবং এটাকে প্রথম রাক'আত গণ্য করবে এবং বাকী অংশ পুরা করে সাহু সাজদা দিবে।

কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাক'আতে ছুটে যাওয়া সেই রুকনে না পৌছে, তবে ছুটে যাওয়া রুকনটি আগে আদায় করবে তারপর বাকী অংশগুলো আদায় করবে এবং সাহু সাজদা দিবে।

উদাহরণ ঃ জনৈক মুসল্লী প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদাটি ভুলে গেল। যখন সে কথা স্মরণ হল, তখন সে দ্বিতীয় রাক'আতের দু'সাজদার মধ্যবর্তী স্থানে বসেছে। এ অবস্থায় আগের রাক'আতটি বাত্বিল হয়ে যাবে এবং

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ মাসজিদে বসে আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করানো। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে সাহু বা ভুল করা।

www.pathagar.com

এটাকে প্রথম রাক'আত গণ্য করে অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে সলাত শেষে সাহু সাজদা করবে।

আর একটি উদাহরণ ঃ জনৈক ব্যক্তি প্রথম রাক'আতে একটি মাত্র সাজদা করেছে। তারপর দ্বিতীয় সাজদা না করেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূ করার পর সেই ভুলের কথা স্মরণ হয়েছে, তবে সে বসে পড়বে এবং সেই ছুটে যাওয়া সাজদা দিবে এবং সেখান থেকে সলাতের বাকী অংশ পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তারপর সাহু সাজদা করে সালাম ফিরাবে।

খ) কোন ওয়াজিব হ্রাস হওয়া ঃ

মুসল্লী যদি ইচ্ছাকৃত কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করে তবে তার সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলক্রমে হয় আর উক্ত স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগেই যদি স্মরণ হয়ে যায় তবে তা আদায় করবে এতে কোন দোষ নেই- সাহু সাজদা দিতে হবে না। কিন্তু যদি উক্ত ওয়াজিব ছেড়ে পরবর্তী রুকন শুরু করার আগেই স্মরণ হয়ে যায় তবে ফিরে গিয়ে সেই ওয়াজিব আদায় করবে এবং শেষে সাহু সাজদা করবে। কিন্তু পরবর্তী রুকন শুরু করার পর যদি স্মরণ হয় তবে উক্ত ছুটে যাওয়া ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট সলাত আদায় করে সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করলেই সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে।

উদাহরণ ঃ একজন মুসল্লী দ্বিতীয় রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে না বসে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতে যাচ্ছে। এমন সময় স্মরণ হল নিজ ভুলের কথা। তখন সে বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পড়ে সলাত পূর্ণ করবে। কোন সাহু সাজদা লাগবে না।

আর যদি কিছুটা দাঁড়ায় কিন্তু পরিপূর্ণরূপে দাঁড়ায়নি তবে সে বসে যাবে এবং তাশাহুদ পড়বে ও সলাত শেষে সাহু সাজদা করে সালাম ফিরাবে। কিন্তু যদি পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে পড়ে তবে আর বসবে না। তাশাহুদ রহিত হয়ে যাবে। ঐ ভাবেই সলাত পূর্ণ করবে এবং সলাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সাজদা করবে।

দলীল ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ.

আবদুল্লাহ্ বিন বুহাইনাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদেরকে নিয়ে (যোহর) সলাত আদায় করলেন। কিন্তু দু'রাক'আত

www.pathagar.com

শেষে (তাশাহুদ না পড়েই) দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি সলাত চালিয়ে যেতে থাকলেন। সলাত শেষে মানুষ সালামের অপেক্ষা করছে এমন সময় সালামের পূর্বে তিনি তাকবীর দিয়ে সাজদা করলেন, মাথা উঠিয়ে আবার তাকবীর দিয়ে সাজদা করলেন, তারপর মাথা উঠিয়ে সালাম ফেরালেন।[1]

তৃতীয়তঃ সন্দেহ হওয়া ঃ

সালাতের মধ্যে সন্দেহের দু'টি অবস্থা ঃ

প্রথম অবস্থা ঃ সন্দেহযুক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে যেটির প্রাধান্য পাবে সে অনুযায়ী কাজ করবে এবং সলাত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তারপর সাহু সাজদা করে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণ ঃ একজন লোক যোহরের সলাত আদায় করছে। কিন্তু সন্দেহ হল এখন সে কি দ্বিতীয় রাক'আতে না তৃতীয় রাক'আতে? এ সময় সে অনুমান করে স্থির করবে কোন্টা ঠিক। যদি অনুমান প্রাধান্য পায় যে এটা তৃতীয় রাক'আত, তবে তা তৃতীয় রাক'আত গণ্য করে সলাত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরানোর পর সাহু সাজদা করবে।

দলীল ঃ আবদুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

"তোমাদের কারো সলাতে যদি সন্দেহ হয় তবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবে এবং সে ভিত্তিতে সলাত পূর্ণ করবে। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সাজদা করবে।"[2]

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ সন্দেহযুক্ত দু'টি দিকের কোনটাই প্রাধান্য পায় না। এ অবস্থায় নিশ্চিত দিকটির উপর ভিত্তি করবে। অর্থাৎ কম সংখ্যাটি নির্ধারণ করে বাকী সলাত পূর্ণ করবে। তারপর সালামের আগে সাহু সাজদা করে শেষে সালাম ফিরাবে।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহুদ পড়া যারা ওয়াজিব মনে করেন না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে সাহু বা ভুল করা।

[2] . বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ ক্বিবলামুখী হওয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে সাহু বা ভুল করা।

www.pathagar.com

উদাহরণ ঃ জনৈক ব্যক্তি আসরের সলাতে সন্দেহ করল- তিন রাক'আত পড়েছে না দু' রাক'আত। কিন্তু অনুমান করে কোনটাই তার নিকট প্রাধান্য পেল না। এমতাবস্থায় সে তা দ্বিতীয় রাক'আত ধরে প্রথম তাশাহুদ পাঠ করবে। তারপর বাকী দু' রাক'আত সলাত পূর্ণ করবে এবং শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সাজদা করবে। **দলীল ঃ** আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

"তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি সলাতে সন্দেহ করে যে, তিন রাক'আত পড়েছে না চার রাক'আত? তবে সে সন্দেহকে বর্জন করবে এবং নিশ্চিতের উপর ভিত্তি করবে। তারপর সালাম ফেরানোর পূর্বে দু'টি সাজদা করবে। যদি পাঁচ রাক'আত পড়ে থাকে তবে সলাত বেজোড় থেকে জোড় হয়ে যাবে। আর যদি চার রাক'আতই পড়ে থাকে, তবে এ সাজদা দু'টি শয়তানকে অপমানের জন্য হবে।"[১]

সারকথা ঃ

পূর্বোল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, সাজদায়ে সাহু কখনো সালামের আগে কখনো সালামের পর করতে হয়।

সালামের পূর্বে সাহু সাজদা দু'ক্ষেত্রে করতে হয় ঃ

প্রথমতঃ সলাতে যদি কোন ওয়াজিব হ্রাস হয়। **দ্বিতীয়তঃ** সলাতে যদি সন্দেহ হয় এবং দু'টি দিকের কোনটিই প্রাধান্য না পায়, তবে সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করবে।

সালামের পর দু'ক্ষেত্রে সাহু সাজদা করতে হয় ঃ

প্রথমতঃ যদি সলাতে বৃদ্ধি হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ যদি সন্দেহ হয় এবং যে কোন একটি দিক অনুমানের ভিত্তিতে প্রাধ্যান্য লাভ করে, তবে সালামের পর সাহু সাজদা করবে।

প্রশ্ন ঃ (২৭২) ইমাম ভুলক্রমে এক রাক'আত সলাত বৃদ্ধি করেছেন। আমি মাসবূক হিসেবে ইমামের অতিরিক্ত সলাত আমার সলাতের সাথে মিলিয়ে

---

[১]. মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

www.pathagar.com

নিয়েছি। আমার সলাত কি বিশুদ্ধ হয়েছে? আর যদি ঐ রাক'আতের হিসাব না ধরি তবে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ সঠিক মত হচ্ছে আপনার সলাত বিশুদ্ধ হয়েছে। কেননা আপনি সলাত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন। ইমাম যে ভুল করেছেন সে তার উপর বর্তাবে। ভুল হওয়ার কারণে তিনি মা'যুর। কিন্তু আপনি যদি ঐ রাক'আতের হিসাব না ধরেন এবং অতিরিক্ত রাক'আত আদায় করেন, তবে কোন ওযর ছাড়াই এক রাক'আত বৃদ্ধি করলেন। যার কারণে আপনার সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ (২৭৩) তাহাজ্জুদ সলাতে ভুলক্রমে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লে করণীয় কি?

উত্তর ঃ স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বসে পড়বে। অন্যথায় তার সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে তার সলাত বৃদ্ধি হয়ে গেল। ইমাম আহমাদ বলেছেন, কোন লোক যদি রাতের নফল সলাতে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তবে সে যেন ফজর সলাতে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া বৈধ করে নিল। এ অবস্থায় সে যদি না বসে যায় তবে তার সলাত বাত্বিল হয়ে যাবে। তবে বিতর সলাত এর বিপরীত। যদি নিয়ত করে (দু'সালামে) তিন রাক'আত বিতর পড়বে। (অর্থাৎ- দু' রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে এক রাক'আত পড়বে) কিন্তু দু' রাক'আত পড়ে না বসে ভুলক্রমে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় না বসে যদি সলাত চালিয়ে যায় এবং তিন রাক'আত পুরা করে তবে তা বিতর হিসেবে যথেষ্ট হবে। কেননা একাধারে তিন রাক'আত বিতর সলাত আদায় করা বৈধ।

প্রশ্ন ঃ (২৭৪) প্রথম তাশাহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে পড়লে করণীয় কি? এক্ষেত্রে কখন সাহু সাজদা করতে হবে?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় ফিরে আসবেন না তথা বসে পড়বেন না; বরং সলাত চালিয়েই যাবেন। কেননা আপনি তাশাহুদ থেকে পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং পরবর্তী রুকনে চলে গিয়েছেন। এ অবস্থায় ফিরে আসা মাকরূহ, তবে যদি ফিরে এসে বসে পড়েন, তবে সলাত বাত্বিল হবে না। কেননা আপনি হারাম কিছু করেননি। তবে এ অবস্থায় সাহু সাজদা করতে হবে। আর তা সালামের পূর্বে।

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, সলাত চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব, আর ফিরে আসবেন না। আর ওয়াজিব তাশাহুদ ছুটে যাওয়ার কারণে সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করবেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (২৭৫) বিতর সলাতের বিধান কি? তা কি শুধু রামাযান মাসের জন্যই?

উত্তর ঃ বিতর সলাত রামাযান মাসে ও সকল মাসে সুন্নাতে মুআক্কাদা। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ 'যে বিতর সলাত পরিত্যাগ করে সে খারাপ লোক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।' সুন্নাতে মুআক্কাদা এ ইবাদাতটি রামাযান বা যে কোন সময় পরিত্যাগ করা কোন মু'মিনের জন্য উচিত নয়। বিতর হচ্ছে সর্বনিম্ন এক রাক'আতের মাধ্যমে রাতের সলাতের সমাপ্তি করা। অনেকে মনে করে বিতর মানেই কুনূত। কিন্তু তা ঠিক নয়। কুনূত এক বিষয় বিতর অন্য বিষয়। তবে বিতর সলাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা যায়। কিন্তু তা পাঠ করা আবশ্যক নয়। রাতের নফল সলাত শেষ করতে হয় এক রাক'আত বা একাধারে তিন রাক'আত বিতর সলাত আদায় করার মাধ্যমে।

মোটকথা বিতর সলাত সুন্নাতে মুআক্কাদা তা রামাযান মাসে হোক বা অন্য সময়। আর তা পরিত্যাগ করা কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ (২৭৬) দু'আ কুনূতের জন্য কি বিশেষ কোন দু'আ আছে? এ সময় দু'আ কি দীর্ঘ করা যায়?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে নবী ﷺ হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে যে দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাকেই দু'আ কুনূত বলা হয়। দু'আটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَـــارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি যাদেরকে হেদায়াত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ, তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করো, তোমার উপর তো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোনদিন অপমানিত হবে না। এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।"[১]

---

[১] . তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের কুনূতে যা পড়তে হয়।

www.pathagar.com

ইমাম এ দু'আ পাঠ করলে তিনি একবচনের স্থলে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করবেন। কেননা তিনি নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্যও দু'আ করবেন। তিনি যদি উপযুক্ত অন্য কোন দু'আ নির্বাচন করেন তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মুসল্লীদের কষ্ট হয় এমন দীর্ঘ সময় ধরে দু'আ করবেন না। কেননা মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) যখন সলাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে ইমামতি করেছেন, তখন নবী ﷺ রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেছিলেন, "হে মুআ'য তুমি ফিতনাবাজ হতে চাও।"[১]

প্রশ্ন ঃ (২৭৭) দু'আ কুনূত পাঠ করার সময় হাত উত্তোলন করা কি সুন্নাত? দলীলসহ জবাব চাই।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সুন্নাত হচ্ছে দু'আ কুনূত পাঠ করার সময় হাত উত্তোলন করা। কেননা মুসলিমদের উপর কোন বিপদ এলে নবী ﷺ ফরয সলাতে কুনূত পাঠ করার সময় এরূপ করেছিলেন। অনুরূপভাবে সহীহ্‌ভাবে প্রমাণিত হয়েছে আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বিতরের কুনূতে হাত উত্তোলন করেছেন। তিনি খুলাফা রাশেদার মধ্যে অন্যতম। যাদের অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

অতএব বিতর সলাতে কুনূতের সময় হাত উত্তোলন করা সুন্নাত। চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদী বা একাকী। যখনই কুনূত পড়বে হাত উত্তোলন করবে।

প্রশ্ন ঃ (২৭৮) ফরয সলাতে কুনূত পড়ার বিধান কি? যদি মুসলিমদের কোন বিপদ আসে তখন করণীয় কি?

উত্তর ঃ ফরয সলাতে কুনূত পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। তা উচিতও নয়। কিন্তু ইমাম যদি কুনূত পড়েন তার অনুসরণ করতে হবে। কেননা ইমামের বিরোধিতায় অকল্যাণ রয়েছে।

আর মুসলিমদের উপর যদি কোন বড় ধরনের বিপদ নেমে আসে তখন আল্লাহ্‌র কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করার জন্য ফরয সলাতে কুনূত পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (২৭৯) তারাবীহ্‌ সলাতের বিধান কি? এর রাক'আত সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ তারাবীহ্‌ সলাত রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সুন্নাত। বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রামাযানের এক রাতে

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম দীর্ঘ সলাত আদায় করলে অভিযোগ করার বিধান।

www.pathagar.com

(তারাবীহ) সলাত আদায় করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করল। পরবর্তী রাতেও সলাত আদায় করলেন। এ রাতে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী হল। অতঃপর তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতেও তারা সমবেত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আর বের হলেন না। প্রভাত হলে তিনি বললেন,

قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

"তোমরা যা করেছো আমি দেখেছি। কিন্তু তোমাদের কাছে আসতে আমাকে কোন কিছুই বাধা দেয়নি। তবে আমি আশংকা করেছি যে, এ সলাত তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে।" আর এটি ছিল রামাযান মাসের ঘটনা।[১]

তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা ঃ ১১ রাক'আত। বুখারী মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। মাহে রামাযানে নবী ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"তিনি রামাযান মাসে এবং অন্য সময় এগার রাক'আতের বেশী সলাত পড়তেন না।"[২]

তারাবীহ্ সলাত যদি ১৩ (তের) রাক'আত আদায় করে, কোন অসুবিধা নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "নবী ﷺ-এর সলাত ছিল ১৩ রাক'আত।" অর্থাৎ রাতের সলাত। বুখারী।[৩]

ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে ১১ এগার রাক'আতেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনটি মুওয়াত্বা মালিকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৪]

যদি এর চাইতে বেশী সংখ্যক রাক'আত আদায় করে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা নবী ﷺ-কে রাতের সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-কে রাতের সলাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করন। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ক্বিয়ামুল্লায়ল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ রাতে নবী ﷺ-এর ক্বিয়ামুল্লায়ল। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সলাত।

[৩]. বুখারী, অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর রাতের সলাত কিরূপ ছিল। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সলাতে দু'আ পাঠ।

[৪]. মুওয়াত্বা মালিক, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল্লায়ল করার বর্ণনা।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى "রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত করে।"[১] এখানে তিনি কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে দেননি।

সালাফে সালিহীন থেকে এ সলাতের বিভিন্ন ধরনের রাক'আত সংখ্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত সংখ্যার উপর আমল করা উত্তম। আর তা হচ্ছে এগার বা তের রাক'আত।

নবী ﷺ বা তাঁর খলীফাদের (রাঃ) থেকে কোন হাদীস বা বর্ণনা প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁদের কেউ ২৩ রাক'আত তারাবীহ্ আদায় করেছেন। বরং ওমর (রাঃ) থেকে এগার রাক'আতের কথাই প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তিনি উবাই বিন কা'ব এবং তামীম আদ্দারী (রাঃ)-কে ১১ রাক'আতেরই আদেশ করেছিলেন।[২] ওমর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তিত্বের জন্য এটাই শোভনীয় যে, তাঁর জীবন চরিত ও ইবাদাত বন্দেগী হবে ঠিক তেমনই, যেমনটি ছিল নবীকুল শিরোমণী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন চরিত ও ইবাদাত বন্দেগী।

আমাদের জানা নেই যে, সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে কেউ তেইশ রাক'আত তারাবীহ্ সলাত পড়েছিলেন। বরং বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। পূর্বে আয়েশা (রাঃ)-এর বাণী উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "নবী ﷺ রামাযান বা অন্য সময় এগার রাক'আতের বেশী রাতের সলাত আদায় করতেন না।"

নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইজমা বা ঐকমত্য হচ্ছে একটি হুজ্জত বা বড় দলীল। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খুলাফায়ে রাশেদা। যাঁদের অনুসরণ করতে নবী ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

জেনে রাখুন! তারাবীহ্ সলাতের রাক'আত সংখ্যায় বিভিন্নতা বিষয়টি এমন, যাতে ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে। বিষয়টি পারস্পারিক মতবিরোধ বা মুসলিমদের মধ্যে ফাটলের কারণ হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যখন কিনা এতে সালাফে সালিহীন থেকেই মতবিরোধ পাওয়া যায়। এ মাসআলায় এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যে, এতে ইজতিহাদ বা গবেষণার কোন সুযোগ নেই। কোন একটি ইজতিহাদী বিষয়ে বিরোধিতাকারীকে জনৈক বিদ্বান বলেছিলেন, আমার বিরোধিতা করে আপনি আমার মতটিই প্রকাশ

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ বিতর সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ বিতর সলাতের বিবরণ। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত করে।

[২]. মুওয়াত্বা মালিক, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল্লায়ল করার বর্ণনা।

www.pathagar.com

করেছেন। কেননা ইজতিহাদী বিষয়ে প্রত্যেকে সেটারই অনুসরণ করবে যা সে সত্য মনে করে। আমরা সবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি মুলক কাজ কামনা করছি।

প্রশ্ন ঃ (২৮০) রামাযান মাসে তারাবীহ্ সলাতে কুরআন খতম করার দু'আ পাঠ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ রামাযান মাসে তারাবীহ্ সলাতে কুরআন খতম করার দু'আ পাঠ করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সুন্নাত বা সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন হাদীস আমি জানি না। খুব বেশী যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। 'তিনি (আনাস) কুরআন খতম করলে পরিবারের লোকদের একত্রিত করে দু'আ করতেন।' তবে এটা সলাতের বাইরের কথা।

কুরআন খতমের দু'আ সুন্নাত থেকে তো প্রমাণিত নয়ই তারপরও এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু মাসজিদে অতিরিক্ত ভীড় লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ ব্যাপক আকারে দেখা যায়।

কিন্তু বিদ্বানদের কেউ বলেছেন, কুরআন খতম করার পর এ দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব।

ইমাম যদি শেষ রাতের সলাত সমাপ্ত করে বিতর সলাতে এ খতমে কুরআনের দু'আ পাঠ করে এবং কুনূত পাঠ করে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা বিতর সলাতে কুনূত শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন ঃ (২৮১) প্রতি বছরে কি লায়লাতুল কদর নির্দিষ্ট এক রাতেই হয়ে থাকে? নাকি তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাতে হয়ে থাকে?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে লায়লাতুল কদর রামাযান মাসে হয়ে থাকে।

আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"নিশ্চয় আমি এটিকে অবতীর্ণ করেছি কদরের রাত্রিতে।" (সূরা কদর ঃ ১)

অন্য আয়াতে পবিত্র কুরআন রামাযান মাসে নাযিল হয় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

"রামাযান সেই মাস যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৫) নবী ﷺ লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্য রামাযানের প্রথম দশকে ই'তেকাফ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় দশকে ই'তিকাফ করেছেন।

www.pathagar.com

অতঃপর তা দেখেছেন রামাযানের শেষ দশকে।[১] এরপর সাহাবীদের (রাঃ) একটি দল স্বপ্নে দেখেছেন লায়লাতুল কদর রামাযানের শেষ সাত দিনে।

তিনি ﷺ বলেন,

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

"আমি দেখছি তোমাদের সবার স্বপ্ন এক রকম হয়েছে শেষ সাত দিনে। অতএব কেউ যদি লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন শেষ সাত রাতে অনুসন্ধান করে।"[২] লায়লাতুল কদরের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বনিম্ন যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই।

লায়লাতুল কদরের ব্যাপারে প্রমাণিত দলীলসমূহ যদি আমরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করি, তবে দেখা যাবে যে, তা বিভিন্ন রাতে হয়ে থাকে। প্রতি বছর নির্দিষ্টভাবে এক রাতে নয়। নবী ﷺ একদা রাত্রে লায়লাতুল কদর স্বপ্নে দেখলেন। পরদিন ফজর সলাতের সময় পানি ও ভিজা মাটিতে সাজদা করলেন। সে রাতটি ছিল একুশে রাত।[৩] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

"তোমরা রামাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান কর।"[৪]

এ দ্বারা বুঝা যায় তা নির্দিষ্ট একটি রাতে নয়। এজন্য মু'মিন শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই অনুসন্ধান করবে ও যে কোন রাতে তা পেয়ে যাওয়ার জন্য আশা করবে।

যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় ক্বিয়ামুল্লায়ল করবে, সে নিশ্চিতভাবে তার প্রতিদান লাভ করবে। চাই সে জানতে পারুক বা না পারুক। কেননা নবী ﷺ বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদরে ক্বিয়াম করে, তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করা হবে।"[১]

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত, অনুচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত।

২. বুখারী ও মুসলিম পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

৩. বুখারী ও মুসলিম পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

৪. বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতুত্ তারাবীহ্, অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দশকের বেজোড় রাতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করা। মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

www.pathagar.com

এরূপ বলা হয়নি যে, কখন লায়লাতুল কদর হবে জানতে পারলে এ সাওয়াব হাসিল হবে। অতএব সাওয়াব পাওয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে কখন লায়লাতুল কদর হচ্ছে তা জানা শর্ত নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি রামাযানের শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই কিয়াম করবে, সে নিশ্চিতভাবে লায়লাতুল কদর পাবে। চাই তা শেষ দশকের প্রথম দিকে হোক বা মধ্যখানে বা শেষের দিকে হোক। (আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন।)

প্রশ্ন ঃ (২৮২) তারাবীহ্ সলাতে কুরআন হাতে নিয়ে ইমামের পড়ার অনুসরণ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ইমামের পড়ার অনুসরণ করবে এ উদ্দেশে হাতে কুরআন নিয়ে তারাবীহ্ সলাত আদায় করা কয়েকটি কারণে সুন্নাতের পরিপন্থী ঃ

১। এ কাজ করলে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার সুন্নাতের উপর আমল করা যায় না।

২। বিনা প্রয়োজনে অধিক নড়াচড়ার দরকার পড়ে। যেমন, কুরআন খোলা, বন্ধ করা, বগলের নীচে বা পকেটে রাখা প্রভৃতি।

৩। নিঃসন্দেহে এই নড়াচড়ার কারণে সলাতে অন্যমনস্ক হবে।

৪। সাজদার স্থানে দৃষ্টিপাত করায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। কেননা সুন্নাত ও উত্তম হচ্ছে, সাজদার স্থানে দৃষ্টিপাত করা।

৫। এ কারণে হতে পারে সলাতে অন্তর উপস্থিত থাকবে না। ফলে মুসল্লী ভুলেই যাবে সেকি সলাতে আছে না শুধু কুরআন তেলাওয়াত করছে। কিন্তু যদি বিনয়-নম্রতার সাথে দণ্ডায়মান হয়ে ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপন করে এবং মাথা ও দৃষ্টি অবনত রেখে সলাত আদায় করে, তবে অন্তরের উপস্থিতি অনেক বেশী অনুভব করবে এবং মনে থাকবে সে ইমামের পিছনে রয়েছে।

তারাবীহ্ সলাতে কণ্ঠস্বর সুন্দর করে কুরআন পাঠ

প্রশ্ন ঃ (২৮৩) কোন কোন ইমাম তারাবীহ্ সলাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে মানুষের অন্তর নরম ও তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে। কোন কোন মানুষ এটাকে অপছন্দ করে। আল্লাহ আপনার হেফাযত করুন- এ ক্ষেত্রে আপনার মত কি?

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে নফল সলাত পড়া ঈমানের অন্তর্গত। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে কিয়ামুল্লায়ল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আমি মনে করি, এ কাজ যদি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়াই শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। এ জন্যই আবূ মূসা আল আশআরী (রাঃ) নবী ﷺ-কে বলেছিলেন, "যদি জানতাম আপনি আমার ক্বিরাআত শুনছেন তবে আমি আপনার জন্য কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর করার চেষ্টা করতাম।"[১] অর্থাৎ- সুন্দর, সুললিত ও উৎকৃষ্ট করার চেষ্টা করতাম। অতএব কেউ যদি কণ্ঠস্বর সুন্দর করার চেষ্টা করে এবং এমনভাবে পাঠ করে যা দ্বারা মানুষের অন্তর নরম করা সম্ভব হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা আমি মনে করি না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি করে, যেমন সাধ্যাতিরিক্ত টানে বা গানের সূরের সাথে মিলায় বা প্রতিটি শব্দকেই গানের মত করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে, তবে তা উচিত নয়।

ফরয সলাতের পূর্বাপর সংশ্লিষ্ট সুন্নাত সলাতের সময়

প্রশ্ন ঃ (২৮৪) কোন কোন বিদ্বান বলেন, ফরয সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতসমূহের সময় হচ্ছে ফরয সলাতের সময় হওয়ার পর। ফরযের সময় শেষ হলে সুন্নাতের সময়ও শেষ। আবার কেউ বলেন, পূর্বের সুন্নাতগুলো ফরয শেষ হলেই শেষ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা কি?

উত্তর ঃ সঠিক কথা হচ্ছে, ফরযের পূর্বের সুন্নাত সলাতের সময় হল ফরয সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে ঐ সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত। যেমন, যোহরের ফরযের পূর্বের সুন্নাতের সময় শুরু হবে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর যোহরের আযান হলে। আর শেষ হবে যোহর সলাত শেষ হলে। আর ফরযের পরের সুন্নাতের সময় হচ্ছে, ফরয সলাত শেষ হওয়ার পর থেকে সলাতের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু অনিচ্ছাকৃত কারো যদি পূর্বের সুন্নাত ছুটে যায়, তবে ফরয সলাত আদায়ের পর তা কাযা আদায় করতে পারে। তবে ইচ্ছাকৃত বিনা ওযরে হলে পরে কাযা আদায় করাতে কোন ফায়দা নেই। কেননা বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদাত সমূহ যদি বিনা ওযরে তার সময় পার করে দেয়; তবে পরে আদায় করলে তা বিশুদ্ধও হবে না এবং কবূলও হবে না।

প্রশ্ন ঃ (২৮৫) ফজরের পূর্বের সুন্নাত ফরযের পর আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধমতে ফজর সলাত শেষ করে সুন্নাত সলাতের কাযা আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই। এটা ফজরের পর সলাত আদায় করার নিষিদ্ধতার

---

[১]. বায়হাক্বী, অধ্যায় ঃ শাহাদাত। অনুচ্ছেদ ঃ সুন্দর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা, ১০/২৩১। মুসনাদ আবূ ইয়ালা ১৩/২৬৬, হাঃ ৭২৭৯।

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা কারণবিহীন কোন সলাত উক্ত সময়ে আদায় করা নিষেধ।

কিন্তু যদি ভুলে যাওয়ার আশংকা না থাকে তবে তা কাযা আদায় করার জন্য সূর্য উঠার পর পর্যন্ত দেরী করা উত্তম।

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করার পর কি পুনরায় কোন নফল আদায় করা যায়?

প্রশ্ন ঃ (২৮৬) আযানের পূর্বে যদি মাসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আদায় করে। তবে আযানের পর কি পুনরায় কোন নফল সলাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ আযান যদি ফজর বা যোহর সলাতের হয়। তবে আযানের পর ফজরের দু' রাক'আত ও যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায় করবে। আর যদি অন্য সময়ে আযান হয় তবুও নফল আদায় করা শরীয়ত সম্মত। কেননা নবী ﷺ বলেছেন ঃ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ "প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সলাত রয়েছে।"[১]

প্রশ্ন ঃ (২৮৭) সুন্নাত সলাতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তা কি কাযা আদায় করা যায়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। নিদ্রা বা ভুলে যাওয়ার কারণে যদি সুন্নাত সলাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার কাযা আদায় করা যায়। কেননা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আম বা ব্যাপক হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"যে ব্যক্তি সলাত পড়তে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে স্মরণ হলেই তা আদায় করে নিবে।"[২]

উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের ফরযের পর ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে না পারলে, আছরের পর তার কাযা আদায় করতেন।[১]

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সলাত পড়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সলাত পড়া।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়তে ভুলে যায়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাত কাযা আদায় করা।

www.pathagar.com

কিন্তু ইচ্ছাকৃত না পড়ে সময় অতিবাহিত করে দিলে, তার কাযা আদায় করবে না। কেননা সুন্নাত সলাত সময় সাপেক্ষ ইবাদাত। আর সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদাতসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে তার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করলে তা কবূল করা হবে না।

প্রশ্ন ঃ (২৮৮) সুন্নাত আদায় করার জন্য স্থান পরিবর্তন করার কোন দলীল আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যা। মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

"নবী ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন এক সলাতের সাথে অন্য সলাতকে মিলিয়ে না দেই যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলি বা বের না হয়ে যাই।"[২]

এথেকে বিদ্বানগণ বলেন, ফরয এবং সুন্নাতের মধ্যবর্তী সময়ে কথা বলে বা স্থানান্তর হয়ে পার্থক্য করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ (২৮৯) চাশতের সলাত ছুটে গেলে তার কি কাযা আদায় করা যায়?

উত্তর ঃ চাশতের সময় পার হয়ে গেলে তা আদায় করার স্থান ও সময় ছুটে গেল। তা কাযা আদায় করার দরকার নেই। কেননা তা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার সাথে শর্তযুক্ত। কিন্তু সুন্নাত সলাত সমূহ ফরয সলাতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তা কাযা আদায় করা যাবে। অনুরূপভাবে বিতর সলাতও কাযা আদায় করা যাবে। সহীহ্ সুন্নাতে প্রমাণিত হয়েছে ঃ

كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"নবী ﷺ ঘুমিয়ে পড়ার কারণে বা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে রাতে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করতে অক্ষম হলে, দিনের বেলায় ১২ (বার) রাক'আত সলাত আদায় করে নিতেন।"[৩] অতএব তিনি বিতরও কাযা আদায় করতেন।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতে সাহু বা ভুল করা, অনুচ্ছেদ ঃ সলাত অবস্থায় কেউ কথা বলতে চাইলে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ তিনি ﷺ যে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন তা জানা।

[২]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ জুমু'আর সলাত। অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর পর সলাত আদায় করা।

[৩]. সহীহ মুসলিম, কিতাবু সলাতু ল মুসাফিরীন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (২৯০) তিলাওয়াতের সাজদা দেয়ার জন্য তাহারাত বা পবিত্রতা কি আবশ্যক? এ সাজদায় কি দু'আ পাঠ করতে হবে?

উত্তর ঃ কুরআনুল কারীমে নির্দিষ্টভাবে যে সমস্ত সাজদার আয়াত রয়েছে তা পাঠ করার সময় সাজদা প্রদান করা শরীয়ত সম্মত। সাজদার সময় হলে, তাকবীর দিয়ে (আল্লাহু আককবার বলে) সাজদা প্রদান করবে। পাঠ করবে ঃ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) (সুবহানা রাব্বীয়্যাল আ'লা) (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবি হামদিকা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী) (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু, ফাসাউওয়ারাহু, ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহু ফাতাবা রাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন।)[১] (اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ) আল্লাহুম্মাক্তুব লী বিহা আজরা, ওয়া যা' 'আন্নী বিহা ভিযরা, ওয়াজ্ আলহা লী ঈনদাকা যুখরা, ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন আ'বদিকা দাউদ) অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এর বিনিময়ে আমার জন্য প্রতিদান লিখে দাও। আমার গুনাহ্ মোচন কর। আমার জন্য আপনার কাছে তার তাকে সঞ্চিত রাখ। আমার নিকট থেকে তা কবূল করে নাও যেমনটি কবূল করেছো দাউদ (আঃ) থেকে।[২] তারপর সাজদা থেকে মাথা উঠাবে। তাকবীর দিবে না সালামও ফেরাবে না। কিন্তু সলাত অবস্থায় যদি সাজদার আয়াত পড়ে তবে আবশ্যক হচ্ছে সাজদা দেয়া এবং সাজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর দেয়া। কেননা নবী ﷺ-এর সলাতের বর্ণনা যারা দিয়েছেন, তারা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রত্যেকবার মাথা নীচু করা ও মাথা উঠানোর সময় তাকবীর দিতেন।[৩]

কিন্তু কিছু লোক সলাতের মধ্যে সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে, সাজদার সময় শুধু তাকবীর দেয় উঠার সময় দেয় না। তাদের এ কাজের পক্ষে আমি সুন্নাহ্ থেকে বা বিদ্বানদের উক্তি থেকে কোন দলীল খুঁজে পাইনি।

---

১. আবূ দাউদ, কিতাবুছ্ সলাত (১৪১৪) তিরমিযী, কিতাবুছ্ সলাত (৫৮০)

২. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্।

৩. বুখারী, কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ, হাঃ ১১৬৬।

www.pathagar.com

তিলাওয়াতের সাজদার জন্য তাহারাত বা ওযু আবশ্যক কি না? এব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ঃ ওযু আবশ্যক। কেউ বলেছেন ঃ এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইবনু ওমার (রাঃ) বিনা ওযুতে সাজদা করতেন। কিন্তু আমি যেটা মনে করি, তা হচ্ছে, সতর্কতার জন্য বিনা ওযূতে এ সাজদা না দেয়া।

প্রশ্ন ঃ (২৯১) কখন আল্লাহ্‌র জন্য সাজদা শুক্‌র দিতে হয়? এর পদ্ধতি কি? এর জন্য ওযূ করা কি আবশ্যক?

উত্তর ঃ সাজদায়ে শুক্‌র দিতে হয়- মানুষ যখন কোন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করে বা কোন নিয়ামতপ্রাপ্ত হয় বা আনন্দময় কোন কিছু লাভ করে। এ সাজদার নিয়ম সলাতের বাইরে তিলাওয়াতের সাজদার মত। বিদ্বানদের কেউ কেউ এ সাজদার জন্য ওযূ এবং তাকবীর আবশ্যক মনে করেন। কেউ শুধু প্রথম তাকবীর দেয়ার কথা বলেন। অর্থাৎ- তাকবীর দিয়ে সাজদাবনত হবে তারপর (সুবহানা রাব্বীয়্যাল আ'লা) বলার পর কিছু দু'আ করবে। এরপর তাকবীর না দিয়েই উঠে যাবে।

প্রশ্ন ঃ (২৯২) সলাতে ইস্তিখারার বিধান কি? তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা সুন্নাত সলাত পড়ে কি ইস্তিখারার দু'আ পড়া যায়?

উত্তর ঃ মানুষ যখন কোন কাজ বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা করে; কিন্তু স্থির করতে পারে না কাজটি বাস্তবায়ন করবে না ছেড়ে দিবে? তখন ইস্তিখারার সলাত আদায় করা সুন্নাত। তবে করা বা না করার কোন একটি দিক যদি তার কাছে প্রাধান্য পায় এবং স্থির হয়ে যায় তবে সে সময় ইস্তিখারা করা সুন্নাত নয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনেক কাজই করতেন। কিন্তু দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার পরেই তা করে ফেলতেন। তিনি এসব প্রত্যেকটা কাজের জন্য ইস্তিখারা করেছেন এ রকম বর্ণনা পাওয়া যায় না।

কোন মানুষ যদি ইচ্ছা করে- সলাত আদায় করবে বা যাকাত প্রদান করবে বা কোন হারাম গর্হিত বিষয় পরিত্যাগ করবে বা খানা-পিনা করবে বা ঘুমাবে তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইস্তিখারা শরীয়ত সম্মত নয়।[১]

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা সুন্নাত সলাত পড়ে ইস্তিখারার দু'আ পড়া যাবে না। কেননা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ এসেছে ইস্তেখারার নিয়তে দু' রাক'আত সলাত আদায় করার জন্য। সুতরাং অন্য নিয়তে সলাত আদায় করে ইস্তেখারার দু'আ পড়লে হাদীসের নির্দেশ বাস্তবায়ন হবে না।

---

[১]. বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি বৈধ বিষয়ে ইস্তিখারা করা সুন্নাত।

www.pathagar.com

কিন্তু যদি তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা সুন্নাত সলাত আদায় করার সময় ইস্তিখারার নিয়ত করে তারপর ইস্তিখারার দু'আ পাঠ করে, তবে হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী তা যথেষ্ট হবে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "তখন ফরয নয় এমন দু' রাক'আত সলাত যেন সে আদায় করে।" এখানে শুধু ফরযকেই বাদ দেয়া হয়েছে। তবে যথেষ্ট না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন...।" এদ্বারা উক্ত দু' রাক'আতের উদ্দেশ্য ইস্তিখারা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আমার মতে উত্তম হচ্ছে, এ দু' রাক'আত সলাত আলাদাভাবে শুধুমাত্র ইস্তিখারার নিয়তেই আদায় করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ (২৯৩) সলাতুত্ তাসবীহ্ সলাত কি?

উত্তর ঃ সলাতুত্ তাসবীহ্ সলাত নবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, এ সম্পর্কিত হাদীস সহীহ নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, 'এ সম্পর্কিত হাদীস মিথ্যা। ইমাম আহমাদ এবং তাঁর অনুসারী ইমামগণ এ সলাতকে মাকরূহ মনে করতেন। কোন ইমামই এ সলাতকে মুস্তাহাব বলেননি। আর অন্যান্য ইমামগণ আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিঈ এ সম্পর্কে কোন কিছু শোনেননি তাই কোন মন্ত ব্যও করেননি।" শাইখুল ইসলামের এ কথা খুবই সত্য। কেননা এ সলাত বিশুদ্ধ হলে নবী ﷺ থেকে উম্মাতের কাছে সন্দেহাতীতভাবে সহীহ সনদে বর্ণনা করা হত। কেননা তাতে রয়েছে বিরাট প্রতিদান ও উপকার। তাছাড়া সাধারণ সলাতের পদ্ধতি থেকেও তা সম্পূর্ণ আলাদা। বরং সমস্ত ইবাদাত থেকে এটি মূলতঃ আলাদা ধরনের। কেননা এমন কোন ইবাদাত আমরা দেখি না যা আদায় করার জন্য এ ধরনের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে- প্রতিদিন আদায় করবে অথবা সপ্তাহে একবার অথবা মাসে একবার অথবা বছরে একবার অথবা সারা জীবনে হলেও একবার। তাছাড়া কোন বিষয় মৌলিকতা থেকে আলাদা হলে মানুষ তার প্রতি গুরুত্বারোপ করতো, বিষয়টি অন্য রকম হওয়ার কারণে মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত থাকতো। এর কোনটিই না হওয়ার কারণে বুঝা যায়, এ সলাত শরীয়ত সম্মত নয়। আর এ কারণেই কোন ইমাম একে মুস্তাহাব বলেননি।[১] (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

---

[১]. কিন্তু এ বিষয়ের হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম আলবানী সহীহ তারগীব ও তারহীব গ্রন্থের মধ্যে হাদীসটির সহীহ হওয়া প্রমাণিত করেছেন। তাঁর পূর্বে ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদও হাদীসটির সহীহ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ সহীহ তারগীব ও তারহীব হাঃ ৬৭৭ ও ৬৭৮)

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (২৯৪) বিবাহের সময় দু' রাক'আত সলাত আদায়ের বিধান কি? বিশেষ করে বাসর রাতে এ দু' রাক'আতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়?

উত্তর ঃ বিবাহের সময় দু' রাক'আত সলাত আদায়ে সম্পর্কে কোন হাদীস নেই। তবে কোন কোন সাহাবী বাসর রাতে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছেন এ রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] তবে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন সহীহ্ হাদীস জানা যায় না। অবশ্য বাসর রাতে শরীয়ত সম্মত কাজ হচ্ছে, নববধূর কপাল ধরে এ দু'আ পাঠ করবে ঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

"হে আল্লাহ্! আপনার কাছে এর কল্যাণ এবং একে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় কামনা করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং একে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে।"[২]

এ রকম করলে স্ত্রী ভীত হবে বা অপছন্দ করবে এমন আশংকা থাকলে- তার নিকটবর্তী হওয়ার ভান করে আলতো করে কপালে হাত রাখবে এবং তাকে না শুনিয়েই চুপে চুপে উক্ত দু'আটি পাঠ করবে। কেননা ইসলামী জ্ঞানে অজ্ঞ থাকার কারণে কোন কোন নারী এ রকম খেয়াল করতে পারে যে, আমার মধ্যে কি অকল্যাণ আছে? এতে সে বিষয়টিকে অন্যখাতে নিতে পারে। সুতরাং ঝামেলা এড়ানোর জন্য নীরবে ও না জানিয়ে দু'আ পাঠ করাই ভাল।

প্রশ্ন ঃ (২৯৫) সলাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ কি কি? মাগরিবের পূর্বে মাসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আযানের পূর্বে না আযানের পর আদায় করবে?

উত্তর ঃ নিষিদ্ধ সময়সমূহ হচ্ছে ঃ

ফজর সলাতের পর থেকে তীর বরাবর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর ১৫/২০ মিনিটি পর্যন্ত।

১। ঠিক দুপুরের সময়। অর্থাৎ যোহরের সময় হওয়ার ১০ মিঃ আগে থেকে যোহরের সময় হওয়া পর্যন্ত।

২। আসর সলাতের পর থেকে পরিপূর্ণরূপে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

---

[১]. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক ৬/১৯১। হায়সামী মাজমা' যাওয়ায়েদ গ্রন্থে ৪/২৯১

[২]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের বর্ণনা, হাঃ ১৮৪৫।

www.pathagar.com

৩। তবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত যে কোন সময় আদায় করা শরীয়ত সম্মত। যখনই মাসজিদে প্রবেশ করে বসতে যাবে তখনই দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে - যদিও তা নিষিদ্ধ সময় হয়।

জানা উচিত যে, বিদ্বানদের মতামতের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, কারণ বিশিষ্ট নফল সলাতসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সময় বলতে কোন কিছু নেই। নিষিদ্ধ সময়েও তা আদায় করতে কোন বাধা নেই। সুতরাং ফজর সলাত বাদ বা আসর সলাত বাদ বা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার সামান্য পূর্বে বা রাতে দিনে যখনই মাসজিদে প্রবেশ করবেন, বসার আগে দু' রাক'আত সলাত আদায় করবেন। অনুরূপভাবে তাহিয়্যাতুল ওযূর সলাতও যে কোন সময় আদায় করা যায়।

প্রশ্ন ঃ (২৯৬) জামা'আতে সলাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর ঃ উলামাগণ এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, জামা'আতে সলাত আদায় করা শ্রেষ্ঠতম, গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত। বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং এমনকি ভীতির সময় জামা'আতবদ্ধভাবে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾

"আর যখন আপনি তাদের সাথে থাকেন আর তাদেরকে (জামা'আতের সাথে) সলাত আদায় করান, তবে তা এভাবে হবে যে, তাদের মধ্যে থেকে একদল আপনার সাথে সলাতে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখবে। অনন্তর যখন তারা সাজদা করবে (এক রাক'আত পূর্ণ করবে), তখন তারা আপনাদের পিছনে চলে যাবে এবং অন্য দল যারা এখনও সলাত পড়েনি তারা আসবে এবং আপনার সাথে সলাত (অবশিষ্ট এক রাক'আত) পড়ে নিবে। আর এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখবে। কাফিরগণ এটাই চায় যে, আপনারা যদি নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্যসম্ভার থেকে একটু অসতর্ক হন, তবে অমনি তারা একযোগে আপনাদের উপর আক্রমণ চালাবে।

www.pathagar.com

আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় অথবা আপনারা পীড়িত হন, তবে নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখতে কোন পাপ হবে না। আর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে রাখবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ১০২)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতেও অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যা জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত করে। যেমন নবী ﷺ বলেন,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

"নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করছি, সলাতের আদেশ দিব, সলাত কায়েম করা হবে। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ দিব সে লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করবে। অতঃপর কাঠের বোঝা বহনকারী কিছু লোক নিয়ে আমি বের হব এমন লোকদের উদ্দেশ্যে যারা সলাতের জামা'আতে উপস্থিত হয়নি। তারপর তাদেরকেসহ তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিব।"[১]

নবী ﷺ আরো বলেন,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"যে ব্যক্তি আযান শুনে তার জবাব দিবে না, ওযর ব্যতীত তার সলাত হবে না।"[২] জনৈক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দরবারে এসে জামা'আতে না যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বললেন, هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ "তুমি কি আযান ধ্বনি শুনে থাক?" সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَأَجِبْ "তবে অবশ্যই সলাতে হাজির হবে।"[৩]

আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রাঃ) বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ أو مريض، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

---

[১]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে সলাত আদায় ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে সলাত আদায় করার ফযীলত

[২]. ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে না আসার প্রতি কঠোরতা।

[৩]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ যে আযান শুনেছে তার মাসজিদে আসা.....ওয়াজিব

www.pathagar.com

'আমরা দেখেছি সুস্পষ্ট মুনাফিক ও অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ জামা'আতের সলাত থেকে পশ্চাতে থাকতেন না। আর অসুস্থ ব্যক্তিকে দু'জন ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।'[১]

সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গিও জামা'আতের সাথে সলাতকে ওয়াজিব প্রমাণ করে। ইসলামী উম্মত এক দলভুক্ত জাতি। ইবাদাতের একাত্মতা ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আর ইবাদাতসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত হচ্ছে সলাত। তাই মুসলিম জাতির উপর আবশ্যক হচ্ছে এ ইবাদাত আদায় করার সময় তারা একতাবদ্ধ হবে।

বিদ্বানগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, জামা'আতবদ্ধ সলাত শ্রেষ্ঠ, গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত। কিন্তু তারা মতবিরোধ করেছেন- সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামা'আতবদ্ধ হওয়া কি শর্ত? নাকি একাকী সলাত পড়লে সলাত হয়ে যাবে কিন্তু জামা'আতের সাথে না পড়ার কারণে সে গুনাহগার হবে?

সঠিক কথা হচ্ছে- জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা ওয়াজিব। সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। তাই শরীয়ত সম্মত কোন কারণ বা ওযর ব্যতিরেকে জামা'আত পরিত্যাগ করলে গুনাহগার হবে। এ কথার দলীল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একাকী সলাত আদায়ের চাইতে জামা'আতবদ্ধ সলাতকে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। এ কথার অর্থ হচ্ছে একাকী সলাত আদায় করলে যদি বিশুদ্ধ না হতো, তবে তার চাইতে জামা'আতবদ্ধ সলাতকে প্রাধান্য দেয়া হতো না।

মোটকথা প্রত্যেক মুসলিম, বিবেকবানপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব হচ্ছে জামা'আতের সাথে সলাতে হাযির হওয়া। চাই সে বাড়িতে অবস্থান করুক বা সফরে থাক।

বাসস্থানের মধ্যে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা কি জায়েয?

প্রশ্ন ঃ (২৯৭) একদল লোক কোন স্থানে বসবাস করে। ঐ বাসস্থানে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা কি তাদের জন্য জায়েয হবে? নাকি মাসজিদে গমন করা আবশ্যক?

উত্তর ঃ এ বাসস্থানে বসবাসকারী লোকদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে মাসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা। সকলের আশে পাশেই

---

[১]. মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শরীক হবে না; বরং অপেক্ষা করবে। কিন্তু দ্বিতীয় জামা'আত অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তাশাহুদে বসে পড়বে। কেননা বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এক রাক'আত সলাত না পেলে জামা'আত পাওয়া হল না।

নবী ﷺ এরশাদ করেনঃ

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল, সে পূর্ণ সলাত পেয়ে গেল।"[১] যেমনটি এক রাক'আত সলাত না পেলে জুমু'আর সলাত পাওয়া হল না, তেমনি জামা'আতের সলাত। সুতরাং ইমামের শেষ তাশাহুদে সলাতে শরীক হলে জামা'আত পাওয়া হল না। অতএব দ্বিতীয় জামা'আতের সম্ভাবনা থাকলে অপেক্ষা করাই ভাল। আর সম্ভাবনা না থাকলে ফিরে যাওয়ার চাইতে সলাতের শেষ তাশাহুদে শামিল হওয়াই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ (৩০১) নফল বা সুন্নাত সলাত শুরু করে দিয়েছি, এমন সময় ফরয সলাতের ইক্বামাত হয়ে গেল– এখন কি করব?

উত্তর ঃ সুন্নাত বা নফল সলাত শুরু করার পর যদি ফরয সলাতের ইক্বামাত হয়ে যায়, তবে একদল বিদ্বান বলেন, তখনই সলাত ছেড়ে দিতে হবে- যদিও শেষ তাশাহুদে বসে থাকে না কেন।

আরেক দল বিদ্বান বলেন, ইমামের সালাম ফেরানোর আগে তাকবীরে তাহরিমা দেয়ার সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত সলাত ছাড়বে না।

মত দু'টি পরস্পর বিরোধী। প্রথমটি হচ্ছে ঃ শেষ তাশাহুদে বসে থাকলেও সলাত ছেড়ে দিতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ আপনি সলাত চালাতে থাকেন। কিন্তু যদি আশংকা করেন যে, আপনার সলাত শেষ করে ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরিমা দেয়ার আগেই ইমাম সালাম ফিরিয়ে দিবেন, তবে সলাত ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে শামিল হবেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ ও মধ্যপন্থী মত হচ্ছে ঃ ইক্বামাত দেয়ার সময় আপনি যদি শেষ রাক'আআতে থাকেন তবে হালকা করে সেই রাক'আত পূর্ণ করে নিন। আর যদি প্রথম রাক'আতেই থাকেন তবে সলাত ছেড়ে দিন। কেননা নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল, সে সলাত পেয়ে গেল"– (বুখারী ও মুসলিম)। যখন আপনি ইক্বামাতের পূর্বে এক রাক'আত সলাত আদায়

---

[১]. সহীহুল বুখারী অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পায়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সলাত পেয়ে গেল ।

www.pathagar.com

করেছেন, তখন নিষিদ্ধ সময়ের আগেই এক রাক'আত পড়ে নিয়েছেন। আর যে এক রাক'আত সলাত পড়ে নিয়েছে সে পূর্ণ সলাতই পেয়েছে। কিন্তু সে অবশিষ্ট রাক'আত হালকাভাবে আদায় করবে। কেননা নফল সলাতের এক অংশ পাওয়ার চাইতে ফরয সলাতের এক অংশ পাওয়া অনেক উত্তম। কিন্তু আপনি যদি প্রথম রাক'আতেই থাকেন তবে তো পূর্ণ সলাত পাওয়ার সময়ই পেলেন না। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল, সে সলাত পেয়ে গেল।" অতএব এ অবস্থায় আপনি সলাত ছেড়ে দিবেন। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ "যখন কোন সলাতের ইক্বামাত দেয়া হয়; তখন উক্ত ফরয সলাত ছাড়া আর কোন সলাত নেই।"[১]

প্রশ্ন ঃ (৩০২) মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার পূর্বে ইমাম রুকূতে চলে গেলে মুক্তাদীর করণীয় কি?

উত্তর ঃ মুক্তাদী যদি এমন সময় সলাতে শরীক হয় যখন ইমাম রুকূর ইচ্ছা করছেন। আর মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পূর্ণ করতে পারেনি- যদি দু'এক আয়াত বা অনুরূপ বাঁকী থাকে তবে তা পড়ে নিয়েই ইমামের সাথে রুকূতে শামিল হবে। আর এটাই উত্তম। কিন্তু যদি সূরা ফাতিহা পূর্ণ করতে অনেকাংশ অবশিষ্ট রয়ে যায়, আর তা পূর্ণ করতে গেলে ইমামের সাথে রুকূতে শামিল হতে পারবে না আশংকা হয়, তবে ফাতিহা ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে রুকূতে চলে যাবে।

সর্বাবস্থায় ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীর উপর আবশ্যক

প্রশ্ন ঃ (৩০৩) মুক্তাদী যদি ইমামকে সাজদা অবস্থায় পায়, তবে কি ইমামের সাজদা থেকে উঠার অপেক্ষা করবে? নাকি সাজদা অবস্থাতেই সলাতে শামিল হবে?

উত্তর ঃ উত্তম হচ্ছে ইমামকে যে অবস্থাতেই মুক্তাদী পাবে সলাতে শামিল হবে, কোনরূপ অপেক্ষা করবে না। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا "তোমরা (ইমামের সাথে) যা পাবে তা আদায় করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

---

[১] .মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ মুআয্যিন ইক্বামাত শুরু করলে নফল শুরু করা মাকরূহ

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩০৪) নীরব সলাতে মুক্তাদীর ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ইমামের রুকূ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তাদী পড়তেই থাকবে। যদিও সে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে থাকে। চুপ থাকবে না। এমনকি প্রথম তাশাহুদের পর শেষের দু' রাক'আতেও সূরা ফাতিহা পড়ার পর যদি দেখে ইমাম রুকূ করেননি, তবে অন্য সূরা পড়া শুরু করবে। কেননা সলাতে শরীয়ত অনুমোদিত এমন কোন স্থান নেই যেখানে সলাত আদায়কারী চুপ করে থাকবে। তবে শুধুমাত্র ইমামের জোর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের সময় মুক্তাদী নীরব থাকবে ও শুনবে।

প্রশ্ন ঃ (৩০৫) ইমামের আগে আগে কোন কাজ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ইমামের আগ বেড়ে কোন কাজ করা হারাম।

কেননা নবী ﷺ বলেন,

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

"যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাটি গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন না? অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দিবেন না?"[১]

আরো প্রমাণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ.

"অনুসরণ করার জন্য ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি তাকবীর দেয়ার পর তোমরা তাকবীর দিবে, তিনি তাকবীর দিয়ে শেষ না করলে তোমরা তাকবীর দিবে না। তিনি রুকূ করলে তোমরা রুকূ করবে। তিনি রুকূতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা রুকূ করবে না।"[২]

উল্লেখ্য যে, ইমামের সাথে মুক্তাদীর চারটি অবস্থা রয়েছে ঃ

১। ইমামের আগ বেড়ে কোন কিছু করা।

২। ইমামের সাথে সাথে করা।

---

[১] . বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোর পাপ। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পূর্বে কোন কিছু করা হারাম।

[২] . আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৫১১।

www.pathagar.com

৩। ইমামের অনুসরণ করা

৪। ইমামের পিছনে পিছনে করা।

ইমামের আগ বেড়ে কোন কিছু করা ঃ অর্থাৎ ইমাম শুরু করার আগেই তা করে নেয়া। এরূপ করা হারাম। একাজ যদি তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে হয় তবে তার সলাতই হবে না। সলাত পুনরায় ফিরিয়ে পড়া ওয়াজিব।

ইমামের সাথে সাথে করা ঃ অর্থাৎ ইমামের রুকূর সাথে রুকূ করা, সাজদা করার সাথে সাথে সাজদা করা, উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে উঠে দাঁড়ানো। প্রকাশ্য দলীরসমূহ অনুযায়ী এরূপ করাও হারাম। তাছাড়া নবী ﷺ বলেছেন, **"তিনি রুকূতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা রুকূ করবে না।"**

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন এটা হারাম নয়; বরং মাকরূহ । তবে এটা যদি তাকবীরে তাহরীমার সময় হয়, তবে তার সলাতই হবে না। পুনরায় সলাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

ইমামের অনুসরণ করা ঃ অর্থাৎ ইমামের পর পর দেরী না করে তার অনুসরণ করা। এটাই হচ্ছে সুন্নাতী পদ্ধতি।

ইমামের পিছনে পিছনে করা ঃ অর্থাৎ অতিরিক্ত দেরী করে ইমামের অনুসরণ করা। এটা সুন্নাত বহির্ভূত।

প্রশ্ন ঃ (৩০৬) গুনাহ্‌গার (ফাসেক) লোকের পিছনে সলাত আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি- যদিও সে কিছু কিছু গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত থাকে- তার পিছনে সলাত আদায় করা জায়েয ও সলাত বিশুদ্ধ। এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু নিঃসন্দেহে পরহেজগার ও বাহ্যিকভাবে পরিশুদ্ধ লোকের পিছনে সলাত আদায় করা উত্তম। ঐ গুনাহ্‌গার ব্যক্তির পাপসমূহ যদি এমন পর্যায়ের হয় যা ইসলাম ভঙ্গকারী, তাহলে তার পিছে সলাত আদায় করা বৈধ হবে না। কেননা তার নিজের সলাতই তো বিশুদ্ধ নয়। কেননা উক্ত পাপের কারণে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে। অতএব ইমামের সলাত যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে তার কি অনুসরণ করা যায়? তখন তো ইমাম ছাড়াই ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা হল।

প্রশ্ন ঃ (৩০৭) নফল আদায়কারীর পিছনে কি ফরয আদায় করা জায়েয হবে? অথবা ফরয আদায়কারীর পিছনে কি নফল আদায় করা চলবে?

উত্তর ঃ উভয়টিই বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে আসর সলাত আদায়কারীর পিছনে যোহর আদায় করা জায়েয হবে এবং যোহর আদায়কারী ইমামের পিছনে আছর আদায় করা যাবে। কেননা প্রত্যেকে নিয়ত অনুযায়ী আমল করবে। তার

www.pathagar.com

ফল পাবে। এ কারণে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, আপনি যদি মাসজিদে গিয়ে দেখেন ইমাম তারাবীহ্ সলাত আদায় করছেন, আর আপনার এশা সলাত বাকী আছে, তবে তার সাথেই এশা সলাত আদায় করে নিন। তা আপনার জন্য ফরয আদায় হবে আর ইমামের হবে নফল।

সামনের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিয়ে পিছনে কাতার বানানোর বিধান?

প্রশ্ন ঃ (৩০৮) একটি বিষয় নিয়ে মুসল্লীদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, জনৈক লোক সলাত কয়েম হওয়ার পর মাসজিদে প্রবেশ করে দেখে কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কাতারে কোন জায়গা নেই। সে কি আগের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিয়ে তাকে নিয়ে নতুন কাতার করবে? নাকি একাকী কাতারে দাঁড়াবে? না কি করবে?

উত্তর ঃ সলাতে এসে যদি দেখে যে, কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তবে তার তিনটি অবস্থা রয়েছে ঃ

১। কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করবে।

২। অথবা সামনের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিবে এবং তাকে নিয়ে নতুন কাতার বানাবে।

৩। অথবা কাতারসমূহের আগে চলে গিয়ে ইমামের ডান দিকে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে।

৪। এ তিনটি অবস্থা হচ্ছে যদি সে সলাতে প্রবেশ করতে চায়। চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে, এর কোনটিই করবে না। অর্থাৎ- এ জামা'আতে শামিল হবে না, অপেক্ষা করবে।

এ চারটি অবস্থার মধ্যে কোন্টি গ্রহণ করা বিশুদ্ধ?

আমরা বলব, এ চারটি অবস্থার মধ্যে বিশুদ্ধতম অবস্থাটি হচ্ছে, কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়াবে এবং ইমামের সাথে সলাত আদায় করবে। কেননা ওয়াজিব হচ্ছে জামা'আতের সাথে এবং কাতারে শামিল হয়ে সলাত আদায় করা। এই দু'টি ওয়াজিবের মধ্যে একটি বাস্তবায়ন করতে অপারগ হলে অন্যটি বাস্তবায়ন করবে। অতএব আমরা বলব, কাতারের পিছনে একাকী হলেও জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করবেন। যাতে তার ফযীলত লাভ করতে পারেন। এ অবস্থায় কাতারে শামিল হওয়ার ওয়াজিব আপনার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা আপনি তাতে অপারগ। আর আল্লাহ সাধ্যের অতিত কোন কাজ বান্দার উপর চাপিয়ে দেননি।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْــعَهَا "আল্লাহ্ মানুষের সাধ্যাতিত কোন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেননি।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৬)

তিনি আরো বলেন, فَــاتَّقُوا اللهَ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর।" (সূরা তাগাবুন ঃ- ১৬)

এ মতের প্রমাণে বলা যায়, কোন নারী যদি কাউকে সাথী হিসেবে না পায় তবুও সে একাকী কাতারের পিছনে দাঁড়াবে। কেননা পুরুষের কাতারে দাঁড়ানো তার অনুমতি নেই। যখন কিনা শরঈ নির্দেশের কারণে পুরুষের কাতারে দাঁড়াতে সে অপারগ, তখন একাকী কাতারে দাঁড়াবে এবং সলাত আদায় করবে।

অতএব যে ব্যক্তি কাতার পূর্ণ হওয়ার পর মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং সে প্রকৃতপক্ষে কাতারে দাঁড়ানোর জন্য স্থান পাবে না, তখন তার এ ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। বাকী থাকবে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা। তাই সে কাতারের পিছনে একাকীই দাঁড়াবে ও সলাত আদায় করবে।

কিন্তু সম্মুখের কাতার থেকে কোন লোককে টেনে নিয়ে আসলে তিনটি নিষিদ্ধ কাজ করা হয় ঃ

ক) আগের কাতারে একটি স্থান ফাঁকা করা হল, ফলে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যা নবী ﷺ-এর নির্দেশের বিরোধী। তিনি কাতারকে বরাবর ও ফাঁকা স্থান পূর্ণ করতে আদেশ করেছেন।

খ) টেনে নিয়ে আসা লোকটিকে তার উত্তম স্থান থেকে কম সাওয়াবের স্থানে সরিয়ে দেয়া হল। যা রীতিমত একটি অপরাধ।

গ) লোকটির সলাতে ব্যাঘাত ঘটানো হল। কেননা তাকে টানাটানি করলে তার অন্তরে একাগ্রতা কমে যাবে। এটিও একটি অপরাধ।

তৃতীয় অবস্থায় ইমামের ডান দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বলা হয়েছে ঃ কিন্তু এটা উচিত নয়। কেননা ইমামের স্থান অবশ্যই মুক্তাদীদের থেকে আলাদা থাকতে হবে। যেমন করে ইমাম কথায় ও কাজে মুক্তাদীদের থেকে বিশেষ ও আলাদা থাকেন।

এটাই নবী ﷺ-এর হেদায়াত। ইমাম মুক্তাদীদের থেকে আলাদা স্থানে তাদের সম্মুখে এককভাবে অবস্থান করবেন। এটাই ইমামে বিশেষত্ব। এখন মুক্তাদীগণও যদি তাঁর সাথে দণ্ডায়মান হয়, তবে তো তার উক্ত বিশেষত্ব শেষ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

আর চতুর্থ অবস্থায় জামা'আত ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে ঃ এটা অযৌক্তিক বিষয়। কেননা জামা'আতে শামিল হওয়া ওয়াজিব এবং কাতারে শামিল হওয়াও ওয়াজিব। দু'ওয়াজিবের একটিতে অপারগ হলে তার কারণে অপরটিকে পরিত্যাগ করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৩০৯) মাসজিদের উপর তলার লোকেরা নীচের তলার লোকদের দেখতে না পেলে সলাত বিশুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ যখন মাসজিদ একটিই, উপর তলার লোকেরা যদি ইমামের তাকবীর ধ্বনী শুনতে পায় তবে একে অপরকে দেখার কোন শর্ত নেই। তাদের সকলের সলাত বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ঃ (৩১০) রেডিও-টিভিতে প্রচারিত সলাতের অনুসরণ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত সলাতে ইমামের অনুসরণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। কেননা সলাতের জন্য জামা'আতের অর্থ হচ্ছে একস্থানে সমবেত হওয়া। অতএব তাদেরকে একস্থানে একত্রিত হওয়া জরূরী। কাতারসমূহ মিলিত করা আবশ্যক। ঐ দু'টি কারণে মিডিয়ার মাধ্যমে সলাত জায়েয হবে না। কেননা তা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। যদি এটা জায়েয হয়, তবে আর মাসজিদের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ও জুমু'আর সলাত আদায় করে নিবে। নিঃসন্দেহে এটা জামা'আত ও জুমু'আ প্রতিষ্ঠিত করার শরীয়ত নির্দেশিত হিকমতের পরিপন্থী। অতএব নারী-পুরুষ কারো জন্য রেডিও বা টেলিভিশনের অনুসরণ করে সলাত আদায় করা বৈধ নয়। (আল্লাহ্ সবাইকে তাওফীক দিন)

অধ্যায় ঃ

সম্মানিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল উসাইমীন বলেন, আল্লাহ তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সলাত আদায় করবে?

১) অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল- ফরয ছালাত দাঁড়িয়েই আদায় করা। যদিও কিছুটা বাঁকা হয়ে দাঁড়াক বা কোন দেয়ালে হেলান দিয়ে বা লাঠিতে ভর করে দাঁড়াক না কেন।

www.pathagar.com

২) যদি কোন ভাবেই দন্ডায়মান হতে সক্ষম না হয় তবে বসে ছালাত আদায় করবে। উত্তম হল দাঁড়ানো ও রুকূর অবস্থার ক্ষেত্রে চার জানু হয়ে বসবে।

৩) যদি বসেও ছালাত আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে কিবলা মুখি হয়ে কাত হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় করবে। এক্ষেত্রে উত্তম হল ডান কাত হয়ে শোয়া। যদি কিবলামুখি হতে সক্ষম না হয় তবে যে দিকে ইচ্ছা মুখ করে ছালাত আদায় করবে। তার ছালাত বিশুদ্ধ হবে এবং তা ফিরিয়ে পড়ার দরকার হবে না।

৪) যদি ডান কাত হয়ে শুতে অক্ষম হয় তবে চিৎ হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় করবে। সে সময় পা দু'টি থাকবে কিবলার দিকে। উত্তম হল (বালিশ ইত্যাদি দিয়ে) মাথা উপরের দিকে কিছুটা উঠাবে যাতে করে কিবলামুখি হতে পারে। যদি পা দুটিকে কিবলামুখি করতে সক্ষম না হয়, তবে পা যে দিকেই থাক ঐভাবেই ছালাত আদায় করবে। ছালাত বিশুদ্ধ হবে এবং পরে তা ফিরিয়ে পড়তে হবে না।

রুগীর উপর ওয়াজিব হল ছালাতে রুকূ ও সিজদা করা। যদি তা করতে সামর্থ না হয় তবে মাথা দিয়ে ইশারা করবে। এ সময় রুকূর চাইতে সিজদার জন্য মাথাটা একটু বেশী নীচু করবে। যদি শুধু রুকূ করতে সক্ষম হয় তবে সিজদার জন্য রুকূর চাইতে মাথাটাকে একটু বেশী ঝুকাবে। আর যদি সিজদা করতে সক্ষম হয়, রুকূ না করতে পারে তবে সিজদার সময় সিজদা করবে আর রুকূর জন্য মাথা দিয়ে ইশারা করবে।

৫) রুকূ সিজদার সময় মাথা নীচু করে যদি ইশারা করতে সক্ষম না হয়, তবে চোখ দিয়ে ইশারা করবে। রুকূর সময় চোখ দুটোকে সামান্য বন্ধ করবে আর সিজদার জন্য বেশী করে বন্ধ করবে। কিন্তু রুকূ সিজদার জন্য আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যেমন কোন কোন রুগী করে থাকে- বিশুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ বা বিদ্বানদের থেকে কোন দলীল আমি পাই নি।

৬) যদি মাথা বা চোখের মাধ্যমে ইশারা করতেও সক্ষম না হয়, তবে মনে মনে ছালাত আদায় করবে। মুখে তাকবীর পড়বে কিরআত পড়বে এবং দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজদা করা, তাশাহহুদে বসা ইত্যাদী মনে

www.pathagar.com

মনে নিয়ত করবে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যার সে নিয়ত করে থাকে।

৭) রুগীর উপর ওয়াজিব হল প্রত্যেক ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করা এবং সে সময়ে তার উপর যা যা ওয়াজিব তার সবই সাধ্যানুযায়ী আদায় করা। যদি প্রত্যেক ছালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা তার জন্য কষ্টকর হয় তবে দু ছালাতকে একত্রিত আদায় করা জায়েয রয়েছে। যোহর ও আছর দু'ছালাত একত্রে যোহরের ওয়াক্তে বা দেরী করে আছরের ওয়াক্তে আদায় করবে। এমনিভাবে মাগরীব ও এশা দু'ছালাত মাগরীবের ওয়াক্তে একত্রে বা দেরী করে এশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করবে। মোটকথা যেভাবে তার জন্য সহজ হয় সেভাবেই আদায় করবে।

৯) অসুস্থ ব্যক্তি যদি অন্য কোন শহরে চিকিৎসার জন্য সফর করে তবে সে (মুসাফির হিসেবে) চার রাকাআত বিশিষ্ট ছালাতকে কসর কবে দু রাকাআত আদায় করবে। অর্থাৎ যোহর, আছর ও এশা দু রাকাআত করে আদায় করবে। যতদিন নিজ শহরে ফিরে না আসে এরূপই করতে থাকবে। চাই সফরের সময় অল্প হোক বা দীর্ঘায়িত হোক।[১]

প্রশ্ন ঃ (৩১১) সলাত উড়োজাহাজে আদায় করার পদ্ধতি কি?

১। উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে এ বিধান স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুস্থ-অসুস্থ সকল মানুষ যতক্ষণ তার হুশ থাকবে এবং সে প্রাপ্ত বয়স্ক- তার উপর সলাত ফরয এবং তার আগে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক। অসুখের ওযর দেখিয়ে কোন অবস্থাতেই সলাত ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছেড়ে দেয়া কুফুরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) সলাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী প্রমূখ হাদীছটি বর্ণনা করেন। হাদীছটি সহীসটি সহীহ।

এ কুফরী থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় একমাত্র তাওবা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়। অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত সলাত আদায় করে দিলেও হবে না, তার বিনিময়ে কাফ্ফারা হিসেবে টাকা-পয়সা আদায় করলেও হবে না বা কুরআন তেলাওয়াত করে বা কোন সৎকাজ করে তার জন্য হাদিয়া দিলেও হবে না। সুতরাং এ অবস্থায় কেউ যদি (তাওবা না করেই) মৃত্যু বরণ করে তবে সে কুফুরী অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করবে। তার পক্ষ থেকে কাফ্ফারা আদায় করার অনুমতি না কুরআনে আছে না কোন হাদীছে আছে, না সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এর আমল থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সমাজে কোন মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযার আগে- মৃত্যুপূর্ব বা মুমূর্ষু অবস্থায় অনাদায়কৃত ছালাতের কাফ্ফারা স্বরূপ- কিছু টাকা-পয়সা নির্ধারণ করা হয় এবং তা আদায় না করলে ইমাম সাহেব জানাযা পড়তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে কাফ্ফার স্বরূপ (সলাতের সংখ্যা অনুযায়ী) টাকা-পয়সা বা পাউল, গম ইত্যাদি আদায় করা হয়।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ সময় হলেই উড়োজহাজের উপর সলাত আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু সলাতের নির্দিষ্ট সময় বা দু'সলাত একত্রিত করার সময় শেষ হওয়ার আগেই যদি বিমান অবতরণ করার সম্ভাবনা থাকে, আর জমিনে থাকাবস্থায় যেভাবে সলাত আদায় করতে হয় সেভাবে যদি বিমানের উপর সম্ভব না হয়, তবে সেখানে ফরয সলাত আদায় করবে না। বরং অবতরণ করার পর জমিনে সলাত আদায় করবে। যেমন ঃ জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে সূর্য অস্তের পূর্বে বিমান উড্ডয়ন করল। এখন আকাশে থাকাবস্থায় মাগরিব সলাত আদায় করবে না। পরবর্তী এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করার পর সলাত পড়বে। কিন্তু যদি দেখে যে, মাগরিব সলাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে এশা সলাতের সাথে মাগরিবকে একত্রিত করার নিয়ত করে নিবে। অতঃপর অবতরণ করে মাগরিব সলাতকে পিছিয়ে দিয়ে এশার সাথে একত্রিত আদায় করবে। কিন্তু যদি বিমান চলতেই থাকে- অবতরণের সম্ভাবনা না থাকে এবং এশা সলাতেরও সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে বিমানের উপরেই সময় অতিক্রম হওয়ার আগেই মাগরিব ও এশা সলাত একত্রিত আদায় করে নিবে।

বিমানের উপর ফরয সলাত আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিবে। সানা, সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকূ করবে। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সাজদা করবে। নিয়ম মাফিক সাজদা করতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং বসাবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে সাজদা করবে। সলাত শেষ করা পর্যন্ত এরূপই করবে। আর পূর্ণ সময় ক্বিবলামুখী হয়েই থাকবে।

আর নফল সলাতের পদ্ধতি হচ্ছে, বিমানের সিটে বসে বসেই সলাত আদায় করবে। ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সাজদা করবে। সাজদার জন্য রুকূর চাইতে একটু বেশী মাথা ঝুকাবে। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)

প্রশ্ন ঃ (৩১২) কতটুকু দূরত্বে গেলে মুসাফির সলাত কসর করতে পারে? কসর না করেই কি দু'সলাতকে একত্রিত করা যায়?

উত্তর ঃ কোন কোন বিদ্বানের মতে ৮৩ (তিরাশি) কিলোমিটার পরিমাণ দুরত্ব অতিক্রম করলে সলাত কসর করতে হয়। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিতে বা দেশীয় প্রথায় যাকে সফর বলা হয় তাতেই সলাত কসর করবে। যদিও তা ৮০ কিলোমিটার না হয়। আর মানুষ যদি তাকে সফর না বলে, তবে তা সফর নয়; যদিও তা ১০০ কিঃ মিঃ হয়। এটাই শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর মত। কেননা আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্টভাবে

www.pathagar.com

সফরের কোন দূরত্ব নির্ধারণ করেননি। অনুরূপভাবে নবী ﷺ থেকেও সফরের দূরত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন,

إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"নবী ﷺ যদি তিন মাইল বা ফারসাখ পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতেন, তবে সলাত কসর করতেন ও দু' রাক'আত আদায় করতেন।"[১] এজন্য শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মতই অধিক সঠিক।

প্রচলিত রীতিনীতিতে মতভেদ দেখা দিলে ইমামদের যে কোন একটি মত গ্রহণ করলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইমামগণ সবাই মুজতাহিদ বা গবেষক। এক্ষেত্রে কোন দোষ হবে না ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু বর্তমানে মানুষের প্রচলিত রীতিনীতি যেহেতু সুনির্দিষ্ট তাই এটা গ্রহণ করাই অধিক সঠিক।

আর সলাত কসর করা বৈধ হলেই কি জমা (বা দু'সলাত একত্রিত) করা বৈধ? জবাবে বলব, একত্রিত করণের বিষয়টি শুধু কসরের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং তা প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব সফর বা গৃহে অবস্থান যে কোন সময় যদি মানুষ একত্রিত করণের প্রয়োজন অনুভব করে, একত্রিত করবে। অতএব বৃষ্টির কারণে যদি মাসজিদে যেতে কষ্ট হয়, তবে দু'সলাতকে একত্রিত করবে। শীতকালে যদি কঠিন ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সে কারণে মাসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয় তবে দু'সলাতকে একত্রিত করবে। নিজের মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তবে দু'সলাতকে একত্রিত করবে। এছাড়া এ ধরনের আরো কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে দু'সলাতকে একত্রিত করবে। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন,

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ.

"নবী ﷺ মদীনায় বৃষ্টি বা ভয়-ভীতির কারণ ছাড়াই যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা সলাতকে একত্রে আদায় করেছেন।" ইবনু

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত। অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সলাতের বিবরণ।

www.pathagar.com

আব্বাসকে প্রশ্ন করা হল, কেন তিনি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি উম্মতকে সংকটে ফেলতে চাননি।[১]

অর্থাৎ- এ ধরনের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দু'সলাতকে একত্রিত না করলে যে সংকট হওয়ার কথা তিনি তা চাননি।

এটাই হচ্ছে মূলনীতি। মানুষ যখনই দু'সলাতকে একত্রিত না করলে সমস্যা বা সংকটের সম্মুখীন হবে তখনই একত্রিত করণ তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। আর সমস্যা না হলে একত্রিত করবে না। কিন্তু যেহেতু সফর মানেই সমস্যা ও সংকট তাই মুসাফিরের জন্য দু'সলাতকে একত্রিত করা জায়েয। চাই তার সফর চলমান হোক বা কোন স্থানে অবস্থান করুক। তবে সফর চলমান থাকলে একত্রিত করা উত্তম। আর সফরে গিয়ে কোন গৃহে বা হোটেলে অবস্থান করলে একত্রিত না করাই উত্তম।

কিন্তু মুসাফির যদি এমন শহরে অবস্থান করে যেখানে সলাত জামা'আতের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, তখন জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা ওয়াজিব। ঐ সময় সলাত কসরও করবে না একত্রিতও করবে না। কিন্তু জামা'আত ছুটে গেলে কসর করবে একত্রিত করবে না। অবশ্য একত্রিত করা জরুরী হয়ে পড়লে করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ (৩১৩) জনৈক ব্যক্তি লেখা-পড়ার জন্য জুমু'আর দিন সন্ধ্যায় রিয়াদ গমন করে ও সোমবার দিন প্রত্যাবর্তন করে। সে কি মুসাফিরের মত সলাত কসর করে আদায় করবে?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি মুসাফির। কেননা লেখা-পড়ার শহর তার স্থায়ী আবাসস্থল নয়। সেখানে থেকে যাওয়ার বা বসবাস করারও কোন নিয়ত সে করেনি। বরং নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশে কয়েকদিন তথায় অবস্থান করছে। কিন্তু সে যদি এমন শহরে অবস্থান করে যেখানে জামা'আতের সাথে সলাত হয়, তবে সলাতের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া তার জন্য ওয়াজিব। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, মুসাফিরের জন্য জুমু'আ বা জামা'আতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয়- এ কথার কোন ভিত্তি নেই, কোন দলীল নেই। মুসাফির যদি যুদ্ধের ময়দানে লড়াইয়ে থাকে তবুও তার জন্য জামা'আতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব।

---

[১] . মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত। অনুচ্ছেদ ঃ গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় দু'সলাতকে একত্রিত করণ।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾

"আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকবেন, তাদের জন্য সলাত কায়েম করবেন, তখন তাদের মধ্যে থেকে একদল আপনার সাথে সলাতে দণ্ডায়মান হবে।"(সূরা নিসা ঃ ১০২)

আর যে ব্যক্তিই আযান শুনবে তার জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিন যখন আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা দ্রুত আল্লাহ্‌র যিক্‌রের (সলাতের) দিকে আস।"(সূরা জুমু'আ ঃ ৯)

প্রশ্ন ঃ (৩১৪) জুমু'আর সাথে আসরের সলাত একত্রিত করার বিধান কি? যারা শহরের বাইরে থাকে তাদের জন্য কি একত্রিত করা জায়েয?

উত্তর ঃ জুমু'আর সাথে আছর সলাত্‌কে একত্রিত করা জায়েয নয়। কেননা এর পক্ষে হাদীসে কোন দলীল পাওয়া যায় না। একে যোহ্‌রের সলাতের সাথে ক্বিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা জুমু'আ ও যোহরের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তাছাড়া আসল হচ্ছে প্রত্যেক সলাতকে নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করা। তবে শুধুমাত্র দলীলের ভিত্তিতেই এক সলাতকে অন্য সলাতের সাথে একত্রিত করা যায়।

যারা শহরের বাইরে দু' বা তিনদিন অবস্থান করবে তাদের জন্য দু'সলাতকে একত্রিত করা জায়েয। কেননা তারা মুসাফির। কিন্তু তারা যদি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করে- সাধারণভাবে যাদেরকে মুসাফির বলা হয় না- তারা দু'সলাত একত্রিত করবে না। দু'সলাত একত্রিত করার অর্থ হচ্ছেঃ যোহর ও আছর দু'সলাত এবং মাগরিব ও এশা দু'সলাতকে একত্রিত করা। কিন্তু জুমু'আ ও আছর কখনই একত্রিত করা জায়েয নয়।

দু'সলাতকে একত্রিত করার বিধান ঃ

একটি পত্র ঃ

মান্যবর শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ্ আল উসাইমীন (আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবা রাকাতুহু

বিগত দিনগুলোতে ব্যাপক আকারে দু'সলাতকে একত্রিত করা এবং এক্ষেত্রে মানুষের অতিরিক্ত শিথিলতা লক্ষ্য করা গেছে। অত্যধিক ঠাণ্ডাই কি এর কারণ? আপনি কি মনে করেন? আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

বিসমিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রহীম

উত্তর ঃ ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবা রাকাতুহু

অলসতা করে দু'সলাতকে একত্রিত করা কারো জন্য বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সলাতসমূহকে নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করা আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

তিনি আরো বলেন,

﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

"সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সলাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সলাত; ফজরের সলাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৭৮)

সলাত যখন কিনা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয, তখন প্রত্যেক সলাতকে তার বেঁধে দেয়া সময়-সীমার মধ্যেই আদায় করতে হবে। উল্লেখিত আয়াতে "সূর্য হেলে পড়বার পর হতে... সলাত কায়েম করবে।" কথাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বিস্তারিতভাবে নবী ﷺ-এর সময়-সীমা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

"সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর থেকে শুরু হয় যোহর সলাতের সময় এবং কোন ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হলে (তথা) আসরের সলাতের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (যোহরে সময় প্রলম্বিত)। সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত

www.pathagar.com

হচ্ছে আসর সলাতের সময়। সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময়। আর অর্ধরাত্রি পর্যন্ত হচ্ছে এশা সলাতের সময়। (রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি এ সলাত আদায় করা সম্ভব হয় তবে তা উত্তম।) ফজর সলাতের সময় হচ্ছে সুবহে সাদেক (পূর্বাকাশে সাদা রেখা) উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।"[১]

নবী ﷺ যখন কিনা সলাতের সময়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন, তখন কোন সলাত নির্ধারিত সময়ের বাইরে আদায় করা আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘনের শামিল। আর আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই অত্যাচারী।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২৯)

অতএব জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি সময় হওয়ার পূর্বে সলাত আদায় করবে, সে গুনাহগার হবে এবং পুনরায় তাকে সলাত পড়তে হবে। কিন্তু যদি অজ্ঞতাবশতঃ অনিচ্ছাকৃত এরূপ করে থাকে, সে গুনাহগার হবে না তবে সলাত তাকে পুনরায় পড়তে হবে। আর এটা হচ্ছে শরঈ কোন ওযর ছাড়াই বর্তমান সলাতের সাথে পরবর্তী সলাতকে অগ্রীম আদায় করার ক্ষেত্রে। কেননা সলাত অগ্রীম আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। তাকে পুনরায় তা আদায় করতে হবে।

আর বিনা ওযরে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে সলাত আদায় করবে, সে গুনাহগার হবে এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার সলাত কবূল হবে না। আর এটা হচ্ছে শরঈ কোন ওযর ছাড়াই বর্তমান সলাতের সাথে পূর্ববর্তী সলাতকে দেরী করে একত্রিত আদায় করার ক্ষেত্রে। কেননা সময় পার করে দিয়ে সলাত আদায় করলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার সলাত কবূল হবে না।

অতএব মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ভয় করা আর এ গুরুত্বপূর্ণ বিরাট বিষয়টিতে কোন ধরনের শিথিলতা না করা।

কিন্তু সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ.

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়, হাঃ ৯৬৬।

www.pathagar.com

"নবী ﷺ মদীনায় বৃষ্টি বা ভয়-ভীতির কারণ ছাড়াই যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা সলাতকে একত্রে আদায় করেছেন।"

এ হাদীসে দু'সলাতকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে শিথিলতার কোন অবকাশ নেই। কেননা ইবনু আব্বাসকে প্রশ্ন করা হল, কেন তিনি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি ﷺ উম্মাতকে সংকটে ফেলতে চাননি। অর্থাৎ- প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দু'সলাতকে একত্রিত না করলে যে সংকট হওয়ার কাথা তিনি তা চাননি।[১] সুতরাং দু'সলাতকে একত্রিত করে পড়া বৈধ হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক সলাতকে সময়মত আদায় করলে অসুবিধা হওয়া। কোন লোক যদি সময় মত সলাত আদায় করলে অসুবিধায় পড়ে তবে তার জন্য দু'সলাতকে একত্রিত আদায় করা জায়েয বরং সুন্নাত। কোন অসুবিধা না থাকলে প্রত্যেক সলাতকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করাই ওয়াজিব।

এ ভিত্তিতে শুধুমাত্র ঠাণ্ডার কারণে দু'সলাতকে একত্রিত করা বৈধ হবে না। কিন্তু ঠাণ্ডা যদি অতিরিক্ত হয় এবং সেই সাথে এমন বাতাস প্রবাহিত হয় বা বরফ পড়ে যে, মাসজিদে গমন করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে, তবে দু'সলাতকে একত্রিত করতে কোন বাধা নেই।

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার বিশেষ নসীহত বিশেষ করে ইমামদের প্রতি তারা যেন এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এমনভাবে এ ফরয ইবাদাতটি সম্পাদন করেন। (০৮/০৭/১৪১৩ হিঃ)

প্রশ্ন ঃ (৩১৫) সফর অবস্থায় কি কি বিষয়ে রুখসত বা অবকাশ রয়েছে?

উত্তর ঃ সফর অবস্থায় চারটি ক্ষেত্রে রুখসত বা অবকাশ রয়েছে ঃ

১। চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাত দু' রাক'আত আদায় করা।

২। রামাযানে সওম ভঙ্গ করা। এবং পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করা।

৩। তিন-দিন তিন-রাত মোজার উপর মাসেহ করা। প্রথমবার মাসেহ করার পর থেকে উক্ত সময়সীমা হিসাব করতে হবে।

৪। যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নাত আদায় করতে হবে না। তবে ফজরের সুন্নাত এবং অন্যান্য নফল সলাত আদায় করা শরীয়ত সম্মত ও মুস্ত াহাব।

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত। অনুচ্ছেদ ঃ গৃহে অবস্থানরত সময় দু'সলাতকে একত্রিত করণ।

www.pathagar.com

অতএব মুসাফির সফর অবস্থায় নিম্নলিখিত সলাতগুলো আদায় করতে পারে ঃ রাতের নফল (তাহাজ্জুদ), বিতর, ফজরের সুন্নাত, চাশত, তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, সফর থেকে ফেরত এসে দু' রাক'আত সলাত। (সুন্নাত হচ্ছে সফর থেকে ফেরত এসে গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে মাসজিদে গিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করা।)[১]

প্রশ্ন ঃ (৩১৬) শুক্রবার দিবসের প্রথম প্রহর কখন থেকে শুরু হয়?

উত্তর ঃ জুমু'আর দিবসের প্রহর সমূহ হচ্ছে পাঁচটি– নবী ﷺ বলেন ঃ

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"যে ব্যক্তি জুমু'আর দিবসে নাপাকী থেকে গোসল করার মত গোসল করবে, অতঃপর প্রথম প্রহরে মাসজিদে গমন করবে, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি দুম্বা কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি মুরগী উৎসর্গ করল। যে ব্যক্তি পঞ্চম প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি ডিম উৎসর্গ করল (আল্লাহ্র পথে দান করল)। অতঃপর ইমাম বের হয়ে এলে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়ে যিক্র (খুতবা) শুনতে বসে পড়েন।"[২]

এ হাদীসে সূর্য উদয় থেকে খুত্বার জন্য ইমামের মিম্বারে আরোহণ পর্যন্ত সময়কে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ ভাগগুলোর প্রতিটিই বর্তমান সময়ের এক ঘণ্টা বরাবর হতে পারে। এর কম বা বেশীও হতে পারে। কেননা দিন ছোট-বড় হয়। মোটকথা সূর্যোদয় থেকে ইমামের আগমন পর্যন্ত প্রহর হচ্ছে পাঁচটি। কেউ কেউ বলেন, এই প্রহরের গণনা ফজর উদিত হওয়া থেকে

---

[১]. কা'ব বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "নবী ﷺ সফর থেকে আগমন করে সর্বপ্রথম মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন।" (বুখারী, অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব বিন মালিকের হাদীস। মুসলিম, অধ্যায় ঃ তওবা, অনুচ্ছেদ ঃ কা'বের তাওবার হাদীস)

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জুমু'আর সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর ফযীলত। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জুমু'আর সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।

www.pathagar.com

শুরু করতে হবে। কিন্তু এটা ভুল। কেননা সূর্যোদয়ের পূর্বের সময় তো ফজর সলাতেরই সময়। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (৩১৭) ইমামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে কি নিজ গৃহে থেকে জুমু'আর সলাত আদায় করা জায়েয হবে?

উত্তর ঃ মাসজিদে এসে মুসলিমদের জামা'আতে শামিল না হলে জুমু'আর সলাত আদায় করা জায়েয হবে না। কিন্তু মাসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে গেলে কাতার মিলিত হওয়ার শর্তে পার্শ্ববর্তী রাস্তায় সলাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু বাড়ীতে বা দোকানে সলাত আদায় করা কোন মানুষের জন্য জায়েয বা বৈধ হবে না। কেননা জুমু'আ এবং জামা'আত অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের একস্থানে সমবেত হওয়া। তারা এক ঐক্যবদ্ধ জাতি এ কথা প্রমাণ করা। যাতে করে তাদের পরস্পরের মাঝে মমতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা আলিমদের নিকট থেকে দ্বীন শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি এই অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা নিজ গৃহে থেকে রেডিওতে বা মাইক্রোফোনের আওয়াজ শুনে সলাত আদায় করবে, তবে মাসজিদ নির্মাণ ও মুসল্লীদের উপস্থিত হওয়ার কোন দরকার নেই। তাছাড়া এর মাধ্যমে জুমু'আ ও জামা'আত পরিত্যাগ করার দরজা উন্মুক্ত করা হবে।

প্রশ্ন ঃ (৩১৮) জুমু'আর দিন মহিলারা কত রাক'আত সলাত আদায় করবে?

উত্তর ঃ নারী যদি মাসজিদের গিয়ে ইমামের সাথে জুমু'আ আদায় করে, তবে ইমামের অনুসরণ করে দু' রাক'আতই সলাত আদায় করবে। কিন্তু সে যদি নিজ গৃহে সলাত আদায় করে, তবে চার রাক'আত যোহর আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ (৩১৯) যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাত আদায় করবে সে কি যোহরও আদায় করবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাত আদায় করল সে যোহরের সময়ের ফরযই আদায় করল। তাই সে আর যোহর আদায় করবে না। কিন্তু কিছু লোক জুমু'আর সলাত আদায় করার পর যোহর সলাত আদায় করে থাকে। (সাধারণ পরিভাষায় এটাকে আখিরী যোহর বলা হয়।) এটি একটি বিদ'আত। কেননা আল্লাহ্র কুরআন ও নবী ﷺ-এর সুন্নাতে এর কোন প্রমাণ নেই। অতএব তা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। এমনকি যদিও কয়েক স্থানে জুমু'আ অনুষ্ঠিত হয়, তবুও জুমু'আর সলাত আদায় করার পর কোন মানুষের জন্য যোহর সলাত আদায় করা শরীয়ত সম্মত নয়; বরং তা নিকৃষ্ট বিদ'আত। কেননা আল্লাহ

তা'আলা একটি সময়ে একের অধিক ইবাদাত ফরয করেননি। আর তা হচ্ছে জুমু'আর সলাত। তা তো আদায় করা হয়েছে।

যারা জুমু'আ আদায় করার পর যোহর আদায় করতে বলেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে, "এক শহরে একাধিক জুমু'আ আদায় করা জায়েয নয়। একাধিক জুমু'আ হলে যে মাসজিদে প্রথমে সলাত অনুষ্ঠিত হবে সেটাই জুমু'আ হিসেবে গণ্য হবে। অন্যগুলো বাত্বিল হবে। কিন্তু যেহেতু কোন্ মাসজিদে জুমু'আ প্রথমে হয় তা জানা নেই। তাই সমস্ত জুমু'আ বাত্বিল। ফলে তার বদলে পরবর্তীতে যোহর আদায় করতে হবে।"

তাদেরকে আমি বলব ঃ এ দলীল ও যুক্তি আপনারা কোথায় পেলেন? এটার ভিত্তি কি কোন্ হাদীসে আছে? বা এটা কি বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক যুক্তি সঙ্গত কথা? উত্তর অবশ্যই না। বরং আমরা বলি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যদি একাধিক জুমু'আ অনুষ্ঠিত হয় তবে সবগুলোই বিশুদ্ধ। কেননা আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় কর"– (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)। আর শহর প্রশস্ত হওয়ার কারণে অথবা মাসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে এ শহরের অধিবাসীগণ প্রয়োজনের তাগিদেই বিভিন্ন স্থানে জুমু'আ অনুষ্ঠিত করেছে, এতে তারা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে। আর যে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে সে তার উপর নির্ধারিত ফরয বাস্তবায়ন করেছে। সুতরাং কিভাবে এ কথা বলা যায় যে তার আমল ফাসেদ বা বাত্বিল হয়ে গেছে, তাই জুমু'আর পরিবর্তে যোহর সলাত আদায় করতে হবে?

তবে বিনা প্রয়োজনে এক শহরে একাধিক জুমু'আ অনুষ্ঠিত করা নিঃসন্দেহে সুন্নাহ্ বিরোধী কাজ। নবী ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদার নীতি বিরোধী কাজ। তাই অধিকাংশ বিদ্বানের মত এরূপ করা হারাম। তারপরও আমরা বলতে পারি না যে তাদের ইবাদাতই বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এ দায়-দায়িত্ব বহণ করবে প্রশাসন যাদের অনুমতিতে বিনা প্রয়োজনে একাধিক জুমু'আ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই প্রশাসনের মধ্যে যারা মাসজিদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের কাছে আমরা আবেদন করি, প্রয়োজন দেখা না দিলে তারা যেন একাধিক জুমু'আর মাসজিদ প্রতিষ্ঠিত হতে অনুমতি না দেন। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুপ্রশস্ত ও সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ইবাদাতের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে একস্থানে সমবেত করে পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করা, অজ্ঞদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দান করা। এছাড়া আরো অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। শরীয়ত সম্মত সমাবেশ সমূহ হচ্ছে ঃ কোনটি সাপ্তাহিক, কোনটি বাৎসরিক,

www.pathagar.com

কোনটি দৈনিক। দৈনিক সমাবেশসমূহ হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাম ও মহল্লার মাসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত অনুষ্ঠিত করা। কেননা শরীয়ত প্রণেতা যদি মুসলিমদেরকে প্রতিদিন পাঁচবার শহরের একটি মাত্র স্থানে একত্রিত হওয়ার আদেশ করতেন তবে নিঃসন্দেহে তা কষ্টকর হত। এজন্য তাদের প্রতি সহজতা কল্পে এ সমাবেশকে প্রত্যেক মহল্লার প্রত্যেক মাসজিদে বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

আর সাপ্তাহিক সমাবেশ হচ্ছে জুমু'আর দিবসে। এলাকার সমস্ত লোক সপ্তাহে একবার একস্থানে সমবেত হবে। এজন্য সুন্নাত হচ্ছে তারা একটি মাত্র মাসজিদেই একত্রিত হবে বিভিন্ন স্থানে নয়। কেননা সাপ্তাহিক এ সমাবেশে আসা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে না বা বেশী কষ্টকর হবে না। তাছাড়া এতে রয়েছে বিশাল উপকারিতা। সমস্ত লোক একজন মাত্র ইমামের খুতবা শুনবে ও তার নেতৃত্বে ইবাদাত আদায় করবে। তিনি তাদেরকে নসীহত করবেন নির্দেশনা প্রদান করবেন। তখন লোকেরা একদিকে নসীহত ও অন্যদিকে সলাত নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। তাই বিনা প্রয়োজনে জুমু'আর সলাত একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত কার জায়েয নয়।

আর বাৎসরিক সমাবেশ হচ্ছে, দু'ঈদের সলাত। সমস্ত শহরবাসীর জন্য বাৎসরিক দু'টি সমাবেশ। এজন্য একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে একাধিক ঈদগাহ্ কায়েম করা জায়েয নয়।

মুসাফিরের জন্য জুমু'আর সলাতের বিধান

প্রশ্ন ঃ (৩২০) আমরা সমুদ্রের মধ্যে (জাহাজে) কাজ করি। জুমু'আর সলাতের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু যোহরের আযানের সময় হওয়ার আধা ঘন্টা পর স্থলে এসে আযান দিয়ে জুমু'আর সলাত আদায় করা কি আমাদের জন্য জায়েয হবে?

উত্তর ঃ শহর বা গ্রামের মাসজিদ ছাড়া কোথাও জুমু'আর সলাত অনুষ্ঠিত করা জায়েয হবে না। জলে বা স্থলে যারা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে তাদের জুমু'আর সলাত বিশুদ্ধ হবে না। কেননা নবী ﷺ-এর হেদায়াত এরূপ ছিল না যে, তিনি শহর বা গ্রাম ছাড়া কোথাও জুমু'আর সলাত অনুষ্ঠিত করেছেন। তিনি কখনো কয়েকদিন ব্যাপি সফর করতেন, কিন্তু সফরে জুমু'আ অনুষ্ঠিত করতেন না।

অতএব আপনারা এখন সমুদ্রে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন। কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে স্থানান্তর হতে থাকেন। কখনো নিজ দেশে কখনো অন্য শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। অতএব আপনাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যোহরের সলাত আদায় করা, জুমু'আ নয়। যদি আপনারা সফরের দূরত্বে থাকেন তবে সলাতসমূহ কসর করে আদায় করবেন। (আল্লাহ অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (৩২১) জুমু'আর সলাতের শেষ তাশাহুদে ইমামের সাথে সলাতে শামিল হলে কি করবে?

উত্তর ঃ কোন মানুষ যদি জুমু'আর দিন শেষ তাশাহুদে ইমামের সাথে সলাতে শামিল হয় তবে তার জুমু'আ ছুটে গেল। সে ইমামের সাথে সলাতে শামিল হবে ঠিকই কিন্তু চার রাক'আত যোহর আদায় করবে। কেননা নবী বলেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সলাত পেয়ে গেল।"[১]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি এক রাক'আতের কম সলাত পাবে সে সলাত পেল না। নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাতের এক রাক'আত পেল সে জুমু'আর সলাত পেয়ে গেল।"[২] অর্থাৎ- ইমামের সালাম ফেরানোর পর দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করলে সে জুমু'আর সলাত পেয়ে গেল।

প্রশ্ন ঃ (৩২২) জুমু'আর খুতবার শেষ প্রান্তে ইমাম যখন দু'আ করেন, তখন 'আমীন' বলা কি বিদ'আত?

উত্তর ঃ না এটা বিদ'আত নয়। ইমাম যদি খুতবায় মুসলিমদের জন্য দু'আ করেন, তবে তার দু'আয় আমীন বলা মুস্তাহাব। কিন্তু তা উঁচু আওয়াযে ও সমবেত কণ্ঠে যেন না হয়। প্রত্যেকে আলাদাভাবে নীরবে নীচু কণ্ঠে 'আমীন' বলবে। যাতে করে সেখানে অন্যের অসুবিধা এবং চেঁচামেচি না হয়।

---

[১]. সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পায়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক'আত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সলাত পেয়ে গেল ।

[২]. নাসায়ী, অধ্যায় ঃ জুমু'আর সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাতের এক রাক'আত পায়। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ সলাত কায়েম করা, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাতের এক রাক'আত পেল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩২৩) জুমু'আর খুতবায় দু'আর সময় হাত উত্তোলন করার বিধান কি?

উত্তর ঃ জুমু'আর খুতবায় ইমামের দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত নয়। জুমু'আর খুতবায় দু'আ করার সময় খলীফা বিশ্‌র বিন মারওয়ান দু'হাত উত্তোলন করলে সাহাবায়ে কেরাম তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে ইস্তিস্কার দু'আ। এদু'আ পাঠ করার সময় হাত উত্তোলন করবে। কেননা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি জুমু'আর খুতবায় বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আয় হাত উত্তোলন করেছেন। লোকেরাও তাঁর সাথে হাত উঠিয়েছেন। এছাড়া জুমু'আর খুতবায় অন্যান্য দু'আর ক্ষেত্রে হাত উত্তোলন করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ (৩২৪) আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা প্রদানের বিধান কি?

উত্তর ঃ এ মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, উপস্থিত মসল্লীগণ যে ভাষা বুঝে না সে ভাষায় জুমু'আর খুতবা প্রদান করা জায়েয নয়। যদি উপস্থিত মুসল্লীগণ আনারব হন- তারা আরবী না বুঝেন, তবে তাদের ভাষাতেই খুতবা প্রদান করবে। কেননা তাদেরকে বুঝানোর জন্য এ ভাষাই হচ্ছে বক্তৃতা করার মাধ্যম। আর জুমু'আর খুতবার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান বর্ণনা করা, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করা। তবে কুরআনের আয়াতসমূহ অবশ্যই আরবী ভাষায় পাঠ করতে হবে। অতঃপর মাতৃভাষায় তার তাফসীর করে দিবে। আর মাতৃভাষায় খুতবা প্রদানের দলীল হচ্ছে, আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে নিজ সম্প্রদায়ের ভাষা-ভাষী করে পাঠিয়েছি। যাতে তিনি তাদেরকে (আল্লাহ্‌র বিধান) বর্ণনা করে দেন।"

(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে দিলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভাষা বুঝে সে ভাষাতেই তাদের সামনে বক্তৃতা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৩২৫) জুমু'আর দিবসে গোসল করার বিধান কি- নারী ও পুরুষের সকলের জন্য? এ দিনের দু' এক দিন পূর্বে গোসল করার বিধান কি?

উত্তর ঃ জুমু'আর দিবসে গোসল ও সাজ-সজ্জার বিধান শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই। কেননা সে জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হবে। গোসল ও সৌন্দর্য গ্রহণ পুরুষকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্য এটা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে যে কোন মানুষ নিজের শরীরে বা অঙ্গে ময়লা-

www.pathagar.com

আবর্জনা দেখতে পেলেই তা পরিষ্কার করবে। কেননা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামে প্রশংসিত বিষয়, এতে উদাসীনতা কারো জন্য উচিত নয়।

কিন্তু জুমু'আর একদিন বা দু'দিন পূর্বে গোসল করলে কোন উপকার নেই। কেননা এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ শুধুমাত্র জুমু'আর দিবসকে কেন্দ্র করেই বলা হয়েছে। আর এ সময়টি হচ্ছে জুমু'আর দিবস ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে জুমু'আর সলাতের পূর্ব পর্যন্ত। এটাই হচ্ছে গোসল করার সময়। কিন্তু একদিন বা দু'দিন পূর্বে গোসল করা জুমু'আর দিবসের জন্য যথেষ্ট হবে না। (আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন)

প্রশ্ন ঃ (৩২৬) খুতবার জন্য দ্বিতীয় আযানের সময় মাসজিদে প্রবেশ করলে করণীয় কি?

উত্তর ঃ বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি জুমু'আর দিবসে মাসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে মুআয্যিন খুতবার জন্য দ্বিতীয় আযান প্রদান করছে। তখন সে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ শুরু করবে, মুআয্যিনের আযানের জাবাব দিতে ব্যস্ত হবে না। যাতে করে খুতবা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। কেননা খুতবা শোনা ওয়াজিব আর আযানের জাবাব দেয়া সুন্নাত। অতএব সুন্নাতের উপর ওয়াজিবকে প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৩২৭) জুমু'আর দিবসে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ খুতবা চলা অবস্থায় যদি কেউ মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যেতে চায়, তবে কোন কথা না বলেই তাকে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। বসে যাওয়ার জন্য তাকে ইঙ্গিত করবে বা তার কাপড় টেনে ধরবে। তবে উত্তম হচ্ছে খতীব নিজেই এ কাজ করবে এবং তাকে বসিয়ে দিবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন। তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল, তিনি তাকে বললেন, اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ "বসে পড় তুমি মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছো।"[১]

---

[১] . নাসায়ী, অধ্যায় ঃ জুমু'আর সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আয় ইমাম মিম্বরে থাকাবস্থায় মানুষের ঘাড় ডিঙ্গানো নিষেধ। আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিবসে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গানো। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ সলাত প্রতিষ্ঠিত করা, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিবসে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গানো। মুসনাদে আহমাদ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩২৮) ইমামের খুতবার সময় (মাসজিদে প্রবেশ কালে) সালাম দেয়ার এবং সালামের জবাব দেয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ ইমামের খুতবা চলাবস্থায় কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে শুধুমাত্র দু' রাক'আত সলাত হালকা করে আদায় করবে। কাউকে সালাম দিবে না। কেননা এ অবস্থায় মানুষকে সালাম দেয়া হারাম। কেননা নবী ﷺ বলেন,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"তুমি যদি জুমু'আর দিন খুতবা চলাবস্থায় পার্শ্ববর্তী মুসল্লীকে বল 'চুপ কর', তবে অনর্থক কাজ করলে।"[১]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কঙ্কর স্পর্শ করবে সে অনর্থক কাজ করবে।"[২] অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কোন অনর্থক কাজ করে, হতে পারে তার এই কাজ জুমু'আর সাওয়াব বিনষ্ট করে দিবে। এ কারণে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করে তার জুমু'আ হবে না।"[৩] অতএব কেউ যদি আপনাকে সালাম প্রদান করে তবে 'ওয়া আলাইকুম সালাম' শব্দে তার জবাব দিবে না। কিন্তু মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ না করে মুসাফাহা করতে কোন বাধা নেই। যদিও মুসাফাহা না করাই উত্তম।

অবশ্য বিদ্বানদের কেউ কেউ বলেন, সালামের জবাব দিতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, সে সালামের জবাব দিবে না। কেননা খুতবা শ্রবণের ওয়াজিবকে সালামের জবাব প্রদানের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। তাছাড়া এ অবস্থায় সালাম দেয়াও কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়। কেননা এতে মানুষের খুতবা শোনার ওয়াজিব কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। অতএব সঠিক কথা হচ্ছে ঃ ইমামের খুতবার সময় সালামও নেই, জবাবও নেই।

প্রশ্ন ঃ (৩২৯) ঈদের দিন কি বলে একে অপরকে অভিনন্দন জানাবে?

উত্তর ঃ ঈদের জন্য অভিনন্দন জানানো জায়েয। তবে এর জন্য বিশেষ কোন বাক্য নেই। মানুষের সাধারণ সমাজে প্রচলিত যে কোন শব্দ ব্যবহার করা

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জুমু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিবসে খুতবা চলাবস্থায় নীরব থাকা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জুমু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিবসে খুতবার সময় নীরব থাকা।

[২]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর ফযীলত। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিবসে অযুর বর্ণনা।

[৩]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর ফযীলত।

www.pathagar.com

যেতে পারে, তবে তা যেন কোন অশ্লীল শব্দ না হয় বা কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়।[১]

প্রশ্ন ঃ (৩৩০) ঈদের সলাতের বিধান কি?

উত্তর ঃ আমি মনে করি ঈদের সলাত ফরযে আঈন তথা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। কোন পুরুষের জন্য এ সলাত পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। কেননা নবী ﷺ-এর নির্দেশ প্রদান করেছেন। বরং কুমারী পর্দানশীন নারীদেরকেও এ সলাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; এমনকি ঋতুবতী নারীদেরকেও অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করেছেন। তবে ঋতুবতী সলাত আদায় করবে না। এ দ্বারা এ সলাতের অতিরিক্ত গুরুত্ব বুঝা যায়। এটাই প্রাধ্যান্যযোগ্য মত এবং শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াও (রহঃ) অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

এ সলাতটি জুমু'আর সলাতের মতো। কিন্তু ছুটে গেলে কাযা আদায় করা যাবে না।[২] কেননা কাযা আদায় করার পক্ষে কোন দলীল নেই। এর পরিবর্তে অন্য কোন সলাতও আদায় করবে না। অবশ্য জুমু'আর সলাত ছুটে গেলে তার পরিবর্তে যোহরের সলাত আদায় করবে। কেননা সময়টি যোহরের সলাতের সময়। কিন্তু ঈদের সলাত ছুটে গেলে তার কোন কাযা নেই।

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার নসীহত হচ্ছে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং এ সলাতটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। যাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও আল্লাহ্র কাছে দু'আ, লোকদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রীতি-ভালবাসার বিনিময়। দেখবেন মানুষকে যদি কোন খেলাধূলার আসরে আহবান জানানো হয়, তবে কত দ্রুত তারা সেখানে সমবেত হয়। তাদের জন্য কি উচিত নয় মুক্তি দূত বিশ্বনবীর আহবানে সাড়া দিয়ে এ সলাতের জন্য সুবিশাল সমাবেশের আয়োজন করা? যাতে রয়েছে আল্লাহ্র অফুরন্ত সাওয়াব এবং মাগফিরাত। কিন্তু নারীদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, এ সলাতে আসতে চাইলে তারা যেন পুরুষদের সাথে সংমিশ্রিত না হয়। তারা থাকবে মাসজিদ বা ঈদগাহের একপ্রান্তে পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্থানে। নারীরা যেন আতর-সুগন্ধি মেখে নিজের সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে বেপর্দা হয়ে বের না হয়। এ কারণে নবী ﷺ যখন নারীদেরকে ঈদের সলাতের জন্য বের হতে নির্দেশ

---

১. অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত আছে তারা অভিনন্দন জানানোর জন্য বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের থেকে নেক আমল কবূল করুন।'

২ যাঁকা আদায় করার দলীল রয়েছে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন, তারা প্রশ্ন করেছেন ঃ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের তো কারো কারো চাদর নেই? তিনি বললেন, لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا "তার অন্য বোন যেন নিজের চাদর তাকে পরতে দেয়।" আর পর্দার উপযুক্ত চাদর হচ্ছে বর্তমানের বোরখা। এ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় নারী অবশ্যই পূর্ণ পর্দা করে গৃহ থেকে বের হবে। কেননা নারীর চাদর না থাকলে সে কি করবে নবী ﷺ-কে এ প্রশ্ন করলে তিনি এরূপ বলেননি যে, সাধ্যানুযায়ী পর্দা করে বের হবে। বরং বলেছেন, "অন্য বোন বা নারী তার চাদর তাকে পরিয়ে দিবে।" আর ঈদের সলাতের ইমামের উচিত হচ্ছে, ঈদের খুতবার সময় পুরুষদেরকে নসীহত করার সময় বিশেষভাবে নারীদেরকেও নসীহত করবেন। তাদের সাথে বিশেষিত বিধি-বিধান সমূহ বর্ণনা করবেন। যেমনটি নবী ﷺ করেছিলেন। তিনি পুরুষদের নসীহত করার পর নারীদের দিকে আলাদাভাবে গিয়ে তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ (৩৩১) এক শহরে একাধিক ঈদের সলাত অনুষ্ঠিত করার বিধান কি?

উত্তর ঃ যদি প্রয়োজন দেখা যায় তবে কোন অসুবিধা নেই। যেমন প্রয়োজন দেখা দিলে জুমু'আর সলাত একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত করা যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "দ্বীনের মাঝে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কোন অসুবিধা রাখেননি"– (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)। একাধিক স্থানে সলাত অনুষ্ঠিত জায়েয না হলে নিশ্চিতভাবে অনেক মানুষ জুমু'আ ও ঈদের সলাত থেকে বঞ্চিত হবে। 'প্রয়োজন' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেমন শহর অনেক বড়। শহরের সকল প্রান্ত থেকে লোকদের একস্থানে সমবেত হওয়া কষ্টকর, অথবা ঈদগাহে জায়গার সংকুলান না হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এ ধরনের কোন অসুবিধা না থাকলে একাধিক স্থানে জুমু'আ বা ঈদের সলাত অনুষ্ঠিত করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ (৩৩২) দু'ঈদের সলাতের পদ্ধতি কিরূপ?

উত্তর ঃ দু'ঈদের সলাতের পদ্ধতি হচ্ছে ঃ প্রথমে ইমাম উপস্থিত লোকদের নিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা দেয়ার পর অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর দিবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং সূরা 'ক্বাফ' পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাক'আতে তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং সূরা পাঠ শুরু করার পূর্বে অতিরিক্ত পাঁচটি তাকবীর প্রদান করবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে সূরা 'ক্বামার' পাঠ করবে। নবী ﷺ দু'ঈদের

www.pathagar.com

সলাতে এ দু'টি সূরা পাঠ করতেন।[১] অথবা ইচ্ছা করলে প্রথম রাক'আতে 'সূরা আল আ'লা' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 'সূরা গাশিয়া' পাঠ করবে।[২]

জেনে রাখুন, জুমু'আ ও ঈদের সলাত দু'টি সূরার ক্ষেত্রে একই, আর দু'টি সূরার ক্ষেত্রে পৃথক। যে দু'টি সূরা উভয় সলাতে পাঠ করতে হয় তা হচ্ছেঃ 'সূরা আল আ'লা' ও 'সূরা গাশিয়া'। আর যে দু'টি সূরার ক্ষেত্রে এ দু'সলাত পৃথক তা হচ্ছে ঃ ঈদের সলাতে পাঠ করতে হয়, সূরা 'ক্বাফ' ও সূরা 'ক্বামার'। আর জুমু'আর সলাতে পাঠ করতে হয় সূরা 'জুমু'আ' ও সূরা 'মুনাফিকূন'। প্রত্যেক ইমামের জন্য উচিত হচ্ছে, এ সলাতগুলোতে উক্ত সূরাসমূহ পাঠ করার সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করা। যাতে করে মুসলমানগণ তা জানতে পারে এবং কেউ তা পাঠ করলে যেন প্রতিবাদ না করে।

তারপর সলাত শেষ করে ইমাম খুতবা দিবেন। উচিত হচ্ছে খুতবায় নারীদেরকে বিশেষভাবে নসীহত করবে। তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশনা দিবে অসৎ কাজের ভয়াবহতা বর্ণনা করবে ও তা থেকে নিষেধ করবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৩৩) ঈদের সলাতের পূর্বে দলবদ্ধভাবে মাইক্রোফোনে তাকবীর প্রদান করার বিধান কি?

উত্তর ঃ প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে তাকবীর পাঠ করা বৈধ নয়। কেননা এ ধরনের পদ্ধতি নবী ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। সুন্নাত হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে আলাদাভাবে তাকবীর পাঠ করবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৩৪) ঈদের তাকবীর কখন থেকে পাঠ করতে হবে? তাকবীর পড়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ ঈদের তাকবীর শুরু হবে রামাযানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে। শেষ হবে ঈদের সলাতে ইমাম উপস্থিত হলেই।

তাকবীরের পদ্ধতি ঃ

الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

অথবা পাঠ করবে ঃ

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ দু'ঈদের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ দু'ঈদের সলাতে কি পাঠ করতে হয়।
২. মুসলিম, অধ্যায় ঃ জুমু'আর সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সলাতে কি পাঠ করতে হয়।

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

অর্থাৎ- তাকবীরগুলো দু'বার করে পাঠ করবে অথবা তিনবার করে পাঠ করবে। সবগুলোই জায়েয। পুরুষদের জন্য উচিত হচ্ছে এ তাকবীরসমূহ সর্বস্থানে উঁচু কণ্ঠে পাঠ করবে। হাঁটে-বাজারে, মাসজিদে, গৃহে সবখানে। কিন্তু নারীদের জন্য উত্তম হচ্ছে নীচু কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করা।

প্রশ্ন ঃ (৩৩৫) সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর ঃ অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, ওয়াজিব নয়। নিঃসন্দেহে নবী ﷺ এ সলাতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতিব গুরুত্ব সহকারে অন্যান্য সলাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে এ সলাত আদায় করেছেন।

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ এ সলাতকে ফরযে আঈন বা ফরযে কিফায়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের দলীল হচ্ছে নবী ﷺ এ সলাতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর নির্দেশ মানেই ফরয বা ওয়াজিব। তাছাড়া অন্যান্য নিদর্শন থেকেও এ সলাতের অতিরিক্ত গুরুত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া বান্দার ত্রুটির কারণেই এ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটি একটি সতর্কতা। তাই বান্দাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এ শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতি করা এবং সলাত আদায় করা।

নিঃসন্দেহে এ মতের পক্ষের দলীল ও যুক্তি শক্তিশালী। সর্বনিম্ন বিষয়টি ফরযে কিফায়া। আমিও এটাই মনে করি। জমহুর (অধিকাংশ) বিদ্বান যে মত পোষণ করেন- অর্থাৎ সুন্নাতে মুআক্কাদা- তাদের মতের পক্ষে ওয়াজিবকে প্রত্যাখ্যান করার কোন দলীল নেই। তবে নবী ﷺ-এর এ হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল হতে পারে ঃ গ্রাম্য ব্যক্তিকে নবী ﷺ যখন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর নির্দেশনা দিলেন। তখন সে প্রশ্ন করল, এ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ছাড়া কি আমার উপর অন্য কিছু ফরয রয়েছে? তিনি বললেন, "না, তবে তুমি নফল আদায় করতে পার।"[১]

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাত ইসলামের একটি রুকন।

www.pathagar.com

এ হাদীসের মাধ্যমে অন্যান্য সলাতের আবশ্যকতা বা ফরয হওয়া অস্বীকার করা যাবে না- যদি তার যথোপযুক্ত কারণ থাকে। নবী ﷺ-এর 'না' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নাত সলাতসমূহ যা দিন-রাতে বার বার আদায় করতে হয় তা আবশ্যক নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট সলাতসমূহের আবশ্যকতা এখানে নিষেধ করা হয়নি।

মোটকথা, আমরা যেটা মনে করি তা হচ্ছে, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত ফরেয আঈন বা ফরযে কিফায়া।[১]

প্রশ্ন ঃ (৩৩৬) সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের সলাত ছুটে গেলে কিভাবে তা কাযা আদায় করবে?

উত্তর ঃ সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের সলাত থেকে কারো যদি এক রাক'আত ছুটে যায়, তবে সে সম্পর্কে হাদীসে এরশাদ হয়েছে। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"তোমরা যখন সলাতের ইকামাত শুনবে তখন হেঁটে হেঁটে ধীর-স্থির এবং প্রশান্তির সাথে সলাতের দিকে আগমন করবে। তাড়াহুড়া করবে না। অতঃপর সলাতের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।"[২]

অতএব যার এক রাক'আত সলাত ছুটে যাবে সে তা পূর্ণ করবে- ইমাম যেভাবে আদায় করেছিল সেভাবে। কেননা নবী ﷺ-এর বাণী (পূর্ণ করে নিবে) সাধারণভাবে এ অর্থই বহণ করে। এ প্রশ্নটি থেকে আরেকটি শাখা প্রশ্ন আরো জটিল আকারে দেখা দিয়েছে। তা হচ্ছে, কারো যদি প্রথম রুকূ ছুটে যায় তবে সে কি করবে? উত্তর ঃ কারো প্রথম রুকূ ছুটে গেলে তার রাক'আতটিই ছুটে গেল। ইমাম সালাম ফেরানোর পর পূর্ণ রাক'আতটি সে পুনরায় আদায়

---

[১] . এ সলাত চারটি রুকূ ও চারটি সিজদার মাধ্যমে সর্বমোট দু' রাক'আত আদায় করতে হয়। ইমাম প্রথমে সূরা ফাতিহা পাঠ করে দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবেন, এরপর রুকূ করবেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় না গিয়ে আবার দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবেন। তারপর দু'টি সিজদা করে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দণ্ডায়মান হবে এবং এ রাক'আতও প্রথম রাক'আতের ন্যায় দু'টি রুকূ ও দু'টি সিজদার মাধ্যমে আদায় করবেন।

[২] . বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ ধীরস্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে সলাতে আগমন করা।

www.pathagar.com

করবে। কেননা নবী ﷺ-এর সাধারণ বাণী এ কথাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন, "আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।"

ইস্তিস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) সলাতে চাদর উল্টানোর বিধান।

প্রশ্ন ঃ (৩৩৭) ইস্তিস্কার সলাতে চাদর উল্টিয়ে নেয়ার কাজটি কখন করতে হবে? দু'আর সময় নাকি গৃহ থেকে বের হওয়ার সময়? আর এ চাদর উল্টানোর হিকমত কি?

উত্তর ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার সলাতে চাদর উল্টিয়ে নেয়ার কাজটি সলাত শেষ করে ইমামের খুতবার সময় করতে হবে। যেমনটি বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন। একাজের হিকমত তিনটি উপকারিতার মাধ্যমে প্রকাশ পায় ঃ

প্রথমতঃ নবী ﷺ-এর অনুসরণ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র কাছে এ আশাবাদ পোষণ করা যে, তিনি দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিকে সাচ্ছন্দ ও উর্বরতায় পরিবর্তন করে দিবেন।

তৃতীয়তঃ মানুষকে এটি একটি ইঙ্গিত যে, নিজের অবস্থাকে আল্লাহ বিমুখতা ও নাফরমানী থেকে পরিবর্তন করে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত করা, তাঁর আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি আভ্যন্তরীণ পোশাক। আর চাদর বা কাপড় বাহ্যিক পোশাক। অতএব সে বাহ্যিক পোশাককে উল্টিয়ে নেয়ার সাথে সাথে যেন আভ্যন্তরীন পোশাকেরও অবস্থান ঠিক করে নেয়।

প্রশ্ন ঃ (৩৩৮) কোন কোন লোক বলে থাকে, "তোমরা ইস্তিস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ না করলেও বৃষ্টি হবে"– এ কথা সম্পর্কে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ আমি মনে করি এ ব্যক্তি ভয়ানক বিপজ্জনক ও অপরাধের কথা বলেছে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (দু'আ কর), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব"– (সূরা গাফির ঃ ৬০)। আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী। নিজ অনুগ্রহ প্রদান করতে কখনো তিনি দেরী করেন, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে তারা তাঁর কাছে কত অভাবী, কত মুখাপেক্ষী, তিনি ছাড়া তাদের আর কোন রক্ষাকারী আশ্রয়দাতা নেই। তিনি অনেক সময় মানুষের দু'আর কারণে বৃষ্টি নাযিল করেন। কিন্তু অনেক সময় বৃষ্টি হয়ও না। নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্র কোন হিকমত আছে এবং মানুষের কোন কল্যাণ আছে যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। কেননা আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। মানুষ নিজের উপর যতটুক দয়াশীল

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাদের উপর তার চাইতে অধিক দয়াশীল ও করুণাময়। অনেক সময় মানুষ দু'আ করে কিন্তু কবূল হয় না। কখনো দু'আ করে কাজ হয়, কখনো দু'আ করে কাজ হয় না। এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

"তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে যে পর্যন্ত তাড়াহুড়া না করবে। বলবে, দু'আ তো অনেক করলাম, কিন্তু কবূল হল না।"[১]

তখন অনেক লোক হা-হুতাশ করবে আক্ষেপ করবে এবং দু'আ করাই ছেড়ে দিবে। (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ মানুষ দু'আ করলেই তাকে সাওয়াব দেয়া হবে। কেননা দু'আ একটি ইবাদাত। তাই দু'আ যে ব্যক্তিই করুক না কেন সে-ই লাভবান। বরং হাদীসে এসেছে নবী ﷺ বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلاَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا.

"যে কোন মুসলিম আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে- যে দু'আয় কোন গুনাহ্ থাকবে না, কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কথা থাকবে না। তাহলে আল্লাহ তাকে নিম্নলিখিত তিনটির যে কোন একটি দান করবেন ঃ ১) তার দু'আ দুনিয়াতেই কবূল করা হবে ২) আখিরাতে তার জন্য তা সঞ্চয় করে রাখা হবে। ৩) তার দু'আর অনুরূপ একটি অমঙ্গল তার থেকে দূরীভূত করা হবে।"[২]

প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্য যে ব্যক্তি ব্যবহার করেছে তাকে নসীহত করছি, আপনি আল্লাহ্র কাছে তওবা করুন। কেননা এটি একটি মহা অপরাধমূলক কথা। আল্লাহ্র নির্দেশ বিরোধী কথা ও তাঁর সাথে চ্যালেঞ্জ করা।

প্রশ্ন ঃ (৩৩৯) কোন ব্যক্তি নিজের দাফনের ব্যাপারে স্থান নির্ধারণ করে ওসীয়ত করলে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন সে এ স্থান নিজের জন্য চয়ন করল? যদি এ রকম হয় যে, উক্ত স্থানে কোন ভণ্ড মিথ্যুক ওলীর

---

[১] , বুখারী, অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ বান্দার দু'আ কবূল হবে যে পর্যন্ত সে তাড়াহুড়া না করবে। মুসলিম, অধ্যায় ঃ দু'আ ও যিক্র, অনুচ্ছেদ ঃ দু'আ কবূল হবে যে পর্যন্ত তাড়াহুড়া না করবে।

[২] . আহমাদ, তিরমিযী, অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ বিপদোদ্ধার প্রভৃতির অপেক্ষা করা।

www.pathagar.com

মাজার আছে। অথবা এমন মাজার আছে যেখানে অহরহ শির্ক চর্চা হয়। অথবা এ রকম কোন কারণ আছে যা শরীয়ত বহির্ভূত। তবে এক্ষেত্রে তার ওসীয়ত বাস্তবায়ন করা যাবে না। বরং সে মুসলিম হলে তাকে মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখিত কোন কারণ যদি না থাকে। বরং এমনিই নিজ এলাকায় লাশ স্থানান্তরের ওসীয়ত করেছে। তবে এ ওসীয়ত পূর্ণ করতে গেলে যদি আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তা বাস্তবায়ন করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, বিশাল আকারের অর্থ ব্যয় না করলে তার ওসীয়তকৃত স্থানে লাশ নেয়া যাবে না, তবে তার ওসীয়ত বাস্তবায়ন করবে না। বরং মুসলিমদের যে কোন গোরস্থানে দাফন করে দিবে। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবীর সকল স্থানের মর্যাদা একই রকম।

প্রশ্ন ঃ (৩৪০) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কখন 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলার তালক্বীন দিতে হবে?

উত্তর ঃ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় তালক্বীন করতে হবে। যে ব্যক্তির রূহ বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে তার কাছে বসে তাকে পাঠ করতে বলবে, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'। যেমনটি নবী ﷺ চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "চাচা! আপনি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলুন। এ কালেমা দ্বারা আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার মুক্তির জন্য সুপারিশ করব।" কিন্তু চাচা আবূ তালিব তা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং শির্কের উপর মৃত্যুবরণ করেছে। (নাউযুবিল্লাহ্)[১]

কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী দাফনের পর তালক্বীন দেয়া একটি বিদ'আত। কেননা এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। তবে দাফনের পর যা করা উচিত সে সম্পর্কে আবূ দাউদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ কোন মৃতকে দাফন শেষ করলে তার কবরের কাছে দাঁড়াতেন এবং বলতেন,

اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

"তোমাদের ভায়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ়তা কামনা কর। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।"[২] কিন্তু কবরের কাছে

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় মুশরিক যদি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় ইসলাম গ্রহণ করা বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল।

[২]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ দাফন শেষে ফিরে যাওয়ার সময় কবরের কাছে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবা।

www.pathagar.com

কুরআন তেলাওয়াত বা সূরা পাঠ বা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর তালক্বীন দেয়া ভিত্তিহীন বিদ'আত।

প্রশ্ন ঃ (৩৪১) দূর-দূরান্ত থেকে নিকটাত্মীয়দের উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে বিলম্ব করার বিধান কি?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে দ্রুত দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা। কেননা নবী ﷺ বলেন,

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

"তোমরা জানাযা বহন করার সময় দ্রুত গতিতে চল। কেননা সে যদি নেক হয় তবে তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে খারাপ লোককে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে।"[১]

কোন কোন নিকটাত্মীয়ের উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় বিলম্বে করা উচিত নয়। তবে অল্প কিছু সময় দেরী করাতে কোন দোষ নেই। তারপরও দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা করাই উত্তম। নিকটাত্মীয়গণ বিলম্বে পৌঁছলেও কোন অসুবিধা নেই। তারা মৃতের কবরের উপর জানাযা সলাত আদায় করতে পারবে। যেমনটি করেছিলেন নবী ﷺ। জনৈক মহিলা মাসজিদে নববী ঝাড়ু দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল। সে মৃত্যুবরণ করলে লোকেরা বিষয়টি নবী ﷺ-কে না জানিয়েই তাকে দাফন করে দেয়। তখন নবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কবরের উপর জানাযা সলাত আদায় করেন।"[২]

প্রশ্ন ঃ (৩৪২) জানাযার সলাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবকে সংবাদ দেয়া কি নিষিদ্ধ 'নাঈ' তথা ঘটা করে মৃত্যু সংবাদ প্রচারের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি তা বৈধ?

উত্তর ঃ এ ধরনের সংবাদ প্রদান বৈধ। এজন্য নবী ﷺ নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনে তার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন।[৩] তাছাড়া মাসজিদে নববীর ঝাড়ুর

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত জানাযা দেয়া।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ দাফনের পর জানাযার সলাত আদায় করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ কবরে জানাযা পড়া।

৩. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের পরিবারকে তার মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় তাকবীর দেয়া।

www.pathagar.com

কাজে নিয়োজিত মহিলাটি মৃত্যুবরণ করলে সাহাবীগণ তাঁকে না জানিয়েই দাফন করে দেয়। তখন তিনি সাহাবীদেরকে বলেন, "কেন তোমরা আমাকে জানালে না?" অতএব মুসল্লী বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৃত্যু সংবাদ প্রদান করতে কোন দোষ নেই। কেননা এর উদাহরণ হাদীসে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে জানাযা সলাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিকটাত্মীয় ও শুভাকাঙ্খীদেরকে সংবাদ দেয়াতেও কোন দোষ নেই।

[নোটঃ কিন্তু যে বিষয়টি নিষিদ্ধ তা হচ্ছে, ঘটা করে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা। এর জন্য অর্থ ব্যয় করে মাইকিং করা বা রেডিও টিভিতে মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা। কেননা হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করতে নিষেধ করেছেন।[1] তিনি ﷺ আরো বলেন, إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ "তোমরা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা থেকে সাবধান! কেননা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহিলিয়্যাতের রীতি।"[2]]

প্রশ্ন ঃ (৩৪৩) মৃত ব্যক্তির গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে ঃ গোসল দেয়ার সুন্নাত হল, প্রথমে তার লজ্জাস্থান ঢেকে দেবে, তারপর তার সমস্ত কাপড় খুলে নিবে। অতঃপর তার মাথাটা বসার মত করে উপরের দিকে উঠাবে এবং আস্তে করে পেটে চাপ দিবে, যাতে করে পেটের ময়লা বেরিয়ে যায়। এরপর বেশী করে পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করে নিবে। তারপর হাতে কাপড় জড়িয়ে বা হাত মোজা পরে তা দিয়ে উভয় লজ্জাস্থানকে (নযর না দিয়ে) ধৌত করবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ্' বলবে এবং সলাতের ন্যায় ওযূ করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। বরং ভিজা কাপড় আঙ্গুলে জড়িয়ে তা দিয়ে উভয় ঠোঁটের ভিতরের অংশ ও দাঁত পরিষ্কার করবে। একইভাবে নাকের ভিতরও পরিষ্কার করবে। পানিতে কুল পাতা মিশিয়ে গোসল দেয়া মুস্তাহাব। প্রথমে ডান সাইডের সামনের দিক ও পিছন দিক ধৌত করবে। তারপর বাম দিক ধৌত করবে। এভাবে তিনবার গোসল দিবে। প্রতিবার হালকা ভাবে পেটে হাত বুলাবে এবং ময়লা কিছু বের হলে পরিষ্কার করে নিবে। গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজন মোতাবেক তিনবারের বেশী সাত বা

---

[1]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্ ও আহমাদ।

[2]. তিরমিযী, অধ্যায় ঃ জানাযা। নোটটি অনুবাদ কর্তৃক সংযোজিত।.

www.pathagar.com

ততোধিক গোসল দিতে পারে। শেষবার কর্পূর মিশ্রিত করে গোসল দেয়া সুন্নাত। কেননা নবী ﷺ তাঁর কন্যা যায়নাব (রাঃ)-এর শেষ গোসলে কর্পুর মিশ্রিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁকে প্রয়োজন মনে করলে তিনবার বা পাঁচবার বা তার চাইতে অধিকবার গোসল দিতে বলেছেন।[১]

প্রশ্ন ঃ (৩৪৪) দুর্ঘটনাকবলিত মৃত্যু, আগুনে পুড়া প্রভৃতি কারণে শুধুমাত্র দু'একটি অঙ্গ পাওয়া গেলে তার জানাযাহ্‌ ও গোসলের নিয়ম কি?

উত্তর ঃ মৃতের উপর জানাযা পাঠ করার পর যদি তার সামান্য কোন অঙ্গ পাওয়া যায়, তবে তার জানাযা আর পড়তে হবে না। যেমন, জনৈক মৃত ব্যক্তিকে জানাযা দিয়ে আমরা তাকে দাফন করলাম। কিন্তু একটি পা বা হাত কাটা ছিল। দাফন করার পর তা পাওয়া গেল। এখন এ কর্তিত অংশের জানায পড়তে হবে না। কেননা মৃতের উপর তো জানাযা হয়েই গেছে।

কিন্তু যদি মৃতের শরীরের মূল অংশই না পাওয়া যায়। শুধু তার কোন অঙ্গ পাওয়া গেল যেমন মাথা বা পা বা হাত। তবে যা পাওয়া যায় তাই গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে তার জানাযা পড়বে তারপর দাফন করবে। (আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর গর্ভপাত হলে জানাযা পড়তে হবে?

প্রশ্ন ঃ (৩৪৫) জনৈক মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের বয়স ছয় মাস হলে তা পড়ে যায়। সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর ও ক্লান্তিকর কাজ করতো এবং সেই সাথে রামাযান মাসে সিয়ামও পালন করতো। তার আশংকা হচ্ছে এ গর্ভপাতের কারণ সে নিজেই। কারণ, গর্ভ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতো। তাছাড়া জানাযা না পড়েই উক্ত মৃত সন্তানকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। তার জানাযা না পড়া কি ঠিক হয়েছে? আর এ মহিলাই বা কি করবে, যে কঠিন পরিশ্রম করার কারণে বাচ্চা মারা গেছে এ অনুশোচনায় ভুগছে?

উত্তর ঃ চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর যদি গর্ভস্থ সন্তান পড়ে যায়, তবে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও দাফন করা ওয়াজিব। কেননা চার মাস পূর্ণ হলে প্রত্যেক ভ্রূণে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। যেমনটি আবদুল্লাহ্‌ বিন মাস'উদ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে গোসল দেয়া।

www.pathagar.com

তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত ঃ "তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে তা মাংসপিণ্ডে রুপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়।"[১] এটা একশত বিশ দিন অর্থাৎ চার মাস। সে যদি এ সময় পর মাতৃগর্ভ থেকে পড়ে যায়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে এবং জানাযা পড়তে হবে। আর সে মানুষের সাথে ক্বিয়ামাত দিবসে পুনঃরুত্থিত হবে।

কিন্তু চার মাসের কম বয়সে পড়ে গেলে তাকে গোসল দিতে হবে না, কাফন পরাতে হবে না এবং জানাযাও দিতে হবে না। কেননা ওটা গোশতের একটি টুকরা মানুষ নয়।

প্রশ্নে উল্লেখিত সন্তানের বয়স ছয় মাস হওয়ার পর গর্ভপাত হয়ে গেছে। ওয়াজিব হচ্ছে, তার গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও জানাযা পড়া। কিন্তু যেহেতু এর কোনটাই করা হয়নি তাকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। তবে কবর কোনটি জানা থাকলে তার কবরে গিয়ে জানাযা সলাত আদায় করতে হবে। আর জানা না থাকলে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করে নিবে। যে কোন ভাবে একবার জানাযা পড়ে নিলেই হল।

আর প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলাটির যে আশংকা তার কোন ভিত্তি ও প্রভাব নেই। এ নিয়ে অনুশোচনায় ভোগা উচিত নয়। অনেক ভ্রূণই এভাবে মাতৃগর্ভে কারণে-অকারণে মরে যায় এবং পড়ে যায়। এ নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। তাকে কোন কিছুই করতে হবে না। অতএব আবশ্যক হচ্ছে এই সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা এবং স্বভাবিক জীবন-যাপন করা। (আল্লাই তাওফীক দাতা ও ক্ষমাকারী।)

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সৃষ্টির সূচনা, হাঃ ২৯৬৯। মুসলিম, অধ্যায় ঃ তক্বদীর, হাঃ ৪৭৮১।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩৪৬) জানাযা সলাত আদায় করার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ জানাযা পড়ার পদ্ধতি হচ্ছে, ইমাম পুরুষের লাশের মাথা বরাবর, আর মহিলার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দাঁড়াবে। চার তাকবীরের সাথে জানাযা আদায় করতে হয়। অন্তরে নিয়্যাত করে দাঁড়াবে। (আরবীতে বা বাংলায় মুখে নিয়ত বলা বা শিখিয়ে দেয়া বিদ'আত।) প্রথম তাকবীর দিয়ে আ'উযুবিল্লাহ্... বিসমিল্লাহ্... পাঠ করে সূরা ফাতিহা তারপর ছোট কোন সূরা পাঠ করবে। বিদ্বানদের অনেকে ছোট একটি সূরা পাঠ করা সুন্নাত বলেছেন। (তবে সানা পাঠ করার কোন সহীহ হাদীস নেই) দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদে ইবরাহীম (যা সলাতে পাঠ করতে হয়) পাঠ করবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

এরপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে জানাযার জন্য বর্ণিত যে কোন দু'আ পাঠ করবে। এ দু'আটি পাঠ করা যেতে পারে ঃ

اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَاتُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড় নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে যাদের আপনি জীবিত রেখেছেন তাদেরকে ইসলামের উপরে জীবিত রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার সাওয়াব হতে বঞ্চিত করবেন না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।"[১]

এবং এ দু'আটিও পড়তে পারে ঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ،

[১]. আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, আহমাদ।

www.pathagar.com

وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন। তাকে মাফ করে দিন। তার আতিথেয়তা সম্মানজনক করুন। তার বাসস্থানকে প্রশস্ত করে দিন। আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ্ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার করুন যেমন করে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার (দুনিয়ার) ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর দান করুন। তার (দুনিয়ার) পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান করুন। আরো তাকে দান করুন (দুনিয়ার) স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দিন, আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ দিন।[১]

এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।" তারপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে। বাম দিকেও সালাম ফেরাতে পারে। পঞ্চম তাকবীর প্রদান করলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটাও নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত। অতএব কখনো কখনো পঞ্চম তাকবীর দিয়ে জানাযা পড়াও সুন্নাত। আর যা নবী ﷺ থেকে সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে মানুষের উচিত হচ্ছে সেগুলোর উপর আমল করা। কখনো এটা আমল করবে কখনো ওটা আমল করবে। যদিও চার তাকবীরে জানাযা পাঠ করার বিষয়টি বহুল প্রচলিত।

কয়েকটি লাশ একত্রিত হলে একসাথে জানাযা পড়া যাবে। তখন ইমামের নিকটবর্তী রাখবে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে, তারপর নাবালেগ পুরুষ, এরপর প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, অতপর নাবালেগ মেয়েদেরকে রাখবে। এদেরকে সাজানোর তারতীব হচ্ছে, মহিলাদের বুক বরাবর পুরুষদের মাথা রাখতে হবে। আর ইমাম দাঁড়াবে পুরুষদের মাথা বরাবর। যাতে করে প্রত্যেকটি লাশের সামনে ইমামের দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত হয়।

লক্ষনীয় একটি বিষয়, সাধারণ মানুষের অনেকে ধারণা করে যে, যারা জানাযা উপস্থাপন করবে তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে, ইমামের ডানে বামে

---

১. সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, হাঃ ১৬০০।

www.pathagar.com

দাঁড়ানো। বরং কমপক্ষে একজন হলেও ইমামের সাথে দাঁড়াবে। কিন্তু এটা ভুল। কেননা সুন্নাত হচ্ছে, ইমাম সম্মুখে একাকী দাঁড়াবেন। যদি তারা প্রথম কাতারে স্থান না পায় তবে ইমামের পিছনে প্রথম কাতারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে।

সলাত পরিত্যাগকারীর জানাযা পড়া জায়েয নয়

প্রশ্ন ঃ (৩৪৭) মৃত ব্যক্তি যদি সলাত ত্যাগকারী হয় বা সলাত ত্যাগকারী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে বা সে মূলতঃ সলাত আদায়কারী বা সলাত ত্যাগকারী তার বিষয়টি অজানা থাকে, তবে তার জানাযা পড়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ যদি জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তি সলাত ত্যাগকারী ছিল, তবে তার জানাযা আদায় করা নাজায়েয। সলাত ত্যাগকারী মৃতের অভিভাকদের জন্য বৈধ নয়, তার লাশকে মুসলিমদের সামনে জানাযার জন্য উপস্থিত করা। কেননা সে কাফির মুরতাদ। আবশ্যক হচ্ছে, তার জানাযা না পড়া এবং মুসলিমদের গোরস্থান ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে গর্ত খনন করে তার লাশ সেখানে নিক্ষেপ করা। তার কোনই মর্যাদা নেই। কেননা ক্বিয়ামাত দিবসে তার হাশর হবে ফির'আওন, হামান, ক্বারূন ও উবাই বিন খাল্ফের সাথে।

কিন্তু যে ব্যক্তির অবস্থা অজ্ঞতা বা সন্দেহপূর্ণ তার জানাযা পড়তে হবে। কেননা আসল হচ্ছে সে মুসলিম এবং সলাত আদায়কারী। যতক্ষণ না প্রমাণিত হবে যে সে মুসলমান নয়। তবে সন্দেহ হলে দু'আর ক্ষেত্রে শর্ত করা যায়। দু'আয় এরূপ বলবে ঃ اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه "হে আল্লাহ্! লোকটি যদি মু'মিন হয় তবে তাকে ক্ষমা কর, দয়া কর...।" আর দু'আয় শর্ত করা বৈধ আছে। লি'আনের মাসআলায় স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরকে ব্যভিচারের দোষারোপ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে লি'আন করবে। পুরুষ পঞ্চমবারে বলবে, "আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে আমার উপর আল্লাহ্র লা'নাত।" আর স্ত্রীও পঞ্চমবারে বলবে, "আমার উপর আল্লাহ্র লা'নাত, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই।"

জানাযার জন্য সময় এবং স্থান নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়

প্রশ্ন ঃ (৩৪৮) জানাযা সলাতের জন্য কোন সময় নির্ধারিত আছে কি? রাতে কি দাফন করা জায়েয। জানাযার উপস্থিতিতে লোক সংখ্যার কি কোন সীমারেখা আছে?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ জানাযা সলাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। এ কারণে যে, মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনই মানুষ মৃত্যুবরণ করবে তাকে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে তার জানাযা আদায় করবে। তা রাতে হোক বা দিনে। দাফন করবে রাতে হোক বা দিনে। তবে তিনটি সময়ে দাফন করা জায়েয নয় ঃ

১) সূর্য উদয় থেকে নিয়ে এক তীর পরিমাণ সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত।

২) মধ্য দুপুরে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলা পর্যন্ত। অর্থাৎ- পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার পূর্বে প্রায় দশ মিনিট।

৩) সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ- এক তীর পরিমাণ সূর্য থাকার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

এ তিনটি সময়ে দাফন করা জায়েয নয়। এ সময়গুলোতে দাফন করা নিষেধ অর্থাৎ দাফন করা হারাম। কেননা উক্ববা বিন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, সলাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে।"[১]

জানাযা সলাতে সর্বনিম্ন কত লোক হতে হবে তার কোন সীমা নির্ধারণ করা নেই। বরং একজন লোকও যদি জানাযা পড়ে যথেষ্ট হবে।

গোরস্থানে গিয়ে জানাযা পড়া জায়েয। এজন্য বিদ্বানগণ গোরস্থানে সলাত আদায় করার নিষেধাজ্ঞা থেকে জানাযার বিষয়টিকে স্বতন্ত্র রেখেছেন। তাঁরা বলেন, গোরস্থানে জানাযা সলাত আদায় করা জায়েয।

হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে, মাসজিদে নববী ঝাড়ুর কাজে নিয়োজিত মহিলাটির জানাযা নবী ﷺ তার কবরে গিয়ে আদায় করেছিলেন। সে রাতে মৃত্যুবরণ করলে সাহাবীগণ তাঁকে না জানিয়েই দাফন করে দেয়। অতঃপর নবী ﷺ তাদেরকে বললেন, "তার কবর কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও।" তারপর তিনি তার কবরে জানাযা আদায় করলেন।[২]

প্রশ্ন ঃ (৩৪৯) গায়েবানা জানাযার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিদ্বানদের মতামতের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে গায়েবানা জানাযা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে যে ব্যক্তির জানাযা হয়নি তার গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে। যেমন জনৈক মুসলমান কোন কাফির ভুখণ্ডে মৃত্যুবরণ

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অধ্যায় ঃ সলাত আদায় করার নিষিদ্ধ সময়।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ দাফনের পর জানাযার সলাত আদায় করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ কবরে জানাযা পড়া।

www.pathagar.com

করল অথবা সমুদ্র বা নদীর পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করল কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেল না। তখন তার গায়েবানা জানাযা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু যার জানাযা পড়া হয়েছে তার গায়েবানা জানা আদায় করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা এ ব্যাপারে নাজ্জাশীর জন্য গায়েবানা জানাযা ছাড়া হাদীসে আর কোন দীলল নেই। কিন্তু নাজ্জাশীর জানাযা তার নিজ দেশে পড়া হয়নি। এজন্য নবী ﷺ মদীনায় তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।[১]

নবী ﷺ-এর যুগে অনেক নেতৃবৃন্দ ও গোত্রপ্রধান মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু এ রকম কোন বর্ণনা নেই যে, নবী ﷺ তাদের গায়েবানা জানাযা আদায় করেছেন। বিদ্বানদের মধ্যে আবার কেউ বলেন, মৃত ব্যক্তি যদি এমন পর্যায়ের লোক হয় যার সম্পদ, কার্যক্রম ও জ্ঞান-বিদ্যা দ্বারা ধর্মের উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়েছে তবে তার গায়েবানা জানাযা পড়া যায়। আর এরূপ না হলে গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না। আবার কেউ বলেন, কোন শর্ত ছাড়াই সব ধরনের ব্যক্তির জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েয। এটি সর্বাধিক দুর্বল মত। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কি?

প্রশ্ন ঃ (৩৫০) কোন কোন দেশে মৃত ব্যক্তিকে পিঠের উপর শুইয়ে হাত দু'টো পেটের উপর রেখে দাফন করা হয়। দাফনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, মৃতকে ডান কাতে শুইয়ে কিবলামুখী রেখে দাফন করা। কেননা কা'বা শরীফ হচ্ছে সকল মুসলমানের জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থার কিবলা। যেমন করে ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হচ্ছে ডান কাতে শোয়া। তেমনি মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে রেখে দাফন করতে হবে। কেননা নিদ্রা ও মৃত্যুকে আল্লাহ্ তা'আলা ওফাতরূপে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্যে মৃত্যুর

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আনসারদের ফযীলত, অনুচ্ছেদ ঃ নাজ্জাশীর মৃত্যু। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় তাকবীর দেয়া।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা যুমার ঃ ৪২)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"আর সেই মহা প্রভুই রাত্রিকালে নিদ্রারূপে তোমাদের নিকট এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, তারপর পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃত-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।" (সূরা আন'আম ঃ ৬০)

প্রশ্নকারী যা দেখেছে তা হয়তো ঐ এলাকার লোকদের অজ্ঞতার ফল। অন্যথা আমি জানি না বিদ্বানদের কেউ এ মত পোষণ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে পিঠের উপর শুইয়ে তার হাত দু'টোকে পেটের উপর রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৫১) গোরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দু'আ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ কবরে বা গোরস্থানে কুরআন তিলাওয়া করা বিদ'আত। এ সম্পর্কে নবী ﷺ বা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই। আর যে ব্যাপারে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই তা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভাবন করা জায়েয নয়। কেননা নবী ﷺ বলেন,

وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত কাজই বিদ'আত। প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম।" [১]

অতএব মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, পূর্ববর্তী নেক সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। যাতে করে তারা কল্যাণ ও হিদায়াত লাভ করতে পারে। নবী ﷺ বলেন, إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ

---

১. নাসায়ী, অধ্যায় ঃ দু'ঈদের সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার নিয়ম।

www.pathagar.com

وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "নিশ্চয় সর্বত্তোম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত।"[১]

আর কবরের কাছে গিয়ে মৃতের জন্য দু'আ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কবরের কাছে দণ্ডায়মান হয়ে সাধ্যানুযায়ী মৃতের জন্য দু'আ করবে। যেমন এরূপ বলবে, "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তাকে দয়া কর। হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে আল্লাহ! তার কবরকে প্রশস্থ করে দাও। ... ইত্যাদি।

আর কবরের কাছে নিজের জন্য দু'আ করার উদ্দেশে কেউ যদি সেখানে যায়, তবে তা বিদ'আত। কেননা শরীয়তের প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন স্থানকে দু'আর জন্য নির্ধারণ করা যাবে না। আর যে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা নেই তা নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা বিদআত।

প্রশ্ন ঃ (৩৫২) কবর যিয়ারত করার নিয়ম কি? নারীদের কবর যিয়ারত করার বিধান কি?

উত্তর ঃ কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করার পর নবী ﷺ তার অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

"পূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করতে পার। কেননা কবর যিয়ারত তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করাবে।"[২] অতএব মরণের কথা স্মরণ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য কবর যিয়ারত করতে হবে। কেননা মানুষ যখন মৃত লোকদের কবর যিয়ারত করবে- যারা কিনা তাদের সাথে তাদের মতই পৃথিবীতে বিচরণ করত, খানা-পিনা করত, দুনিয়াদারী করত। আজ তারাই নিজেদের কর্মের হাতে বন্দী। কর্ম ভাল থাকলে তাদের পরিণাম ভাল। কর্ম মন্দ থাকলে পরিণাম মন্দ- তখন নিঃসন্দেহে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে তার অন্তর নরম হবে, সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। তখন আল্লাহ্‌র নাফারমানী থেকে ফিরে আসবে তাঁর আনুগত্যের দিকে। কবর যিয়ারতের সময় সুন্নাত হচ্ছে নবী ﷺ-এর পঠিত দু'আ পাঠ করা। কবরবাসীকে সালাম দিবে ঃ

---

[১] ইবনু মাজাহ্‌, ভূমিকা হাঃ ৪৪। আহমাদ, হাঃ ১৪৪৫৫

[২]. আহমাদ হাঃ ১১৭৩। হাদীসটি সহীহ মুসলিমে প্রায় একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ মায়ের কবর যিয়ারত করার জন্য নবী ﷺ-এর আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি প্রার্থনা, হাঃ ৯৭৭।

www.pathagar.com

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وإِنَّا إِنْ شَـآءَ اللهُ بِكُـمْ لاَحِقُوْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

অর্থ ঃ "হে কবরের অধিবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! আপনাদের প্রতি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর রহম করুন। আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি।"[১]

আর নবী ﷺ থেকে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি কবর যিয়ারতের সময় সূরা ফাতিহা, বা সূরা ইখলাস বা দরূদ পাঠ করেছেন। অতএব কবর যিয়ারতের সময় এগুলো পাঠ নবী ﷺ-এর শরীয়ত বহির্ভূত কাজ।

নারীদের কবর যিয়ারত করা হারাম। কেননা নবী ﷺ কবর যিয়ারত কারিণীদেরকে লা'নত করেছেন। আরো লা'নত করেছেন কবরে বাতি জ্বালানো ও মাসজিদ নির্মাণকারীদেরকে।[২] অতএব নারীদের জন্য কবর যিয়ারত হালাল নয়। এ নিষিদ্ধতা যদি কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়। কিন্তু কবর যিয়ারতের নিয়্যাত ছাড়া অন্য কোন কারণে যদি ঘর থেকে বের হয়; তারপর চলার পথে কবর বা গোরস্থান পাওয়া যায় তবে নবী ﷺ-এর শিখানো পদ্ধতিতে সালাম প্রদান করবে। অতএব ঘর থেকে শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশে বের হয়ে কবর যিয়ারত করা হারাম। কেননা এর মাধ্যমে নিজেকে ফিৎনার সম্মুখীন করবে। কিন্তু কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য না করে বের হয়ে চলতি পথে পাওয়া কবরে সালাম প্রদান করাতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (৩৫৩) মৃতের বাড়ীতে কোরানখানী অনুষ্ঠান করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে কুরআনখানী মাহফিল করা একটি বিদ'আত। কেননা এটা নবী ﷺ বা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রচলিত ছিল না। কুরআন দ্বারা দুঃখ-চিন্তা হালকা হয়- যদি কোন ব্যক্তি তা নীচু স্বরে তিলাওয়াত করে থাকে। জোরে চিৎকার করে বা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে পাঠ করলে এরূপ হয় না। কেননা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে সমস্ত মানুষ তা শুনে থাকে এমনকি খেলাধূলায় লিপ্ত লোকদের কানেও তা পৌঁছে কিন্তু তারা তার

---

[১] . মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ গোরস্থানে প্রবেশ করলে যা পাঠ করতে হয়।

[২] . আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের কবর যিয়ারত। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ কবরে মাসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধি। নাসায়ী, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ কবরে বাতি জ্বালানোতে কঠোরতা।

www.pathagar.com

প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। এমনকি আপনি দেখবেন যারা গান-বাদ্য শুনে তাদের কাছেও ঐ কুরআনের আওয়াজ পৌঁছে। তারা গানও শুনছে কুরআনও শুনছে। ফলে তারা যেন এই কুরআনকে ঠাট্টা ও তাচ্ছিল্যের বিষয়ে পরিণত করেছে। কুরআনের অবমাননা করছে।

আর শোক-সমবেদনা জানাতে ও আগত লোকদের স্বাগত জানানোর জন্য মৃতের পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া একটি বিদ'আত। অনুরূপভাবে মৃতের বাড়ীতে ভোজের আয়োজন করাও একটি বিদ'আত। কেননা বিষয়টি নবী ﷺ-এর যুগে পরিচিত ছিল না। তবে চলতে ফিরতে, মাসজিদে, বাজারে মৃতের পরিবারকে শোক জানানোতে কোন অসুবিধা নেই। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তার বাড়িতে সমবেত লোকদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাকে সাহাবায়ে কেরাম নিষিদ্ধ নিয়াহা বা 'মৃতের জন্য বিলাপ' এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। আর মৃতের জন্য বিলাপ করা কাবীরা গুনাহ। কেননা নবী ﷺ বিলাপকারিণী ও বিলাপ শ্রবণকারিণীকে লা'নত করেছেন। তিনি বলেন,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তবে ক্বিয়ামত দিবসে এমনভাবে উত্থিত করা হবে যে, তার গায়ে আলকাতরার একটি পায়জামা পরানো হবে এবং পরানো হবে খাঁজলী যুক্ত চাদর।"[১]

(আমরা আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি)

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার নসীহত, তারা যেন এ রকম সব ধরনের বিদ'আত থেকে সাবধান হয়। কেননা বিদ'আত পরিত্যাগে তাদের যেমন কল্যাণ আছে, তেমনি উপকার আছে মৃত ব্যক্তির। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দন ও বিলাপের কারণে।"[২] এখানে 'শাস্তি দেয়া হবে' এ কথার অর্থ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি এ ক্রন্দন ও বিলাপের কারণে ব্যথিত হয় কষ্ট পায়। যদিও বিলাপকারীর শাস্তি তাকে দেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "একজন অন্যজনের পাপের বোঝা বহণ করবে

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ বিলাপ করার প্রতি কঠোরতা।
[২]. বুখারী অধ্যায় ঃ জানাযা হাঃ ১২০৭। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জানাযা হাঃ ১৫৩৭।

www.pathagar.com

না"– (সূরা আন'আম ঃ ১৬৪)। আর শাস্তি মানেই দণ্ডিত হওয়া নয়। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "সফর শাস্তির একটি অংশ।"[১] অথচ এখানে কোন দণ্ড নেই; বরং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুঃখ, চিন্তা, মনোকষ্ট প্রভৃতি।

সারকথা মুসলিম ভাইদেরকে আমি নসীহত করি, তারা যেন শরীয়ত বহির্ভূত এ কুসংস্কার পরিত্যাগ করে যা তাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং মৃতদের শাস্তি বৃদ্ধি করবে।

---

[১]. বুখারী অধ্যায় ঃ উমরা, অনুচ্ছেদ ঃ সফর শাস্তির একটি অংশ, হাঃ ১৮০৪। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদ ঃ সফর শাস্তির একটি অংশ, হাঃ ১৯২৭।

www.pathagar.com

فتاوى الزكاة

যাকাত বিষয়ক ফাতাওয়া

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩৫৪) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী কি?

উত্তর ঃ যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) ইসলাম

খ) স্বাধীন

গ) নিসাবের মালিক হওয়া ও তা স্থিতিশীল থাকা।

ঘ) বছর পূর্ণ হওয়া।

ইসলাম ঃ কাফিরের উপর যাকাত ফরয নয়। যাকাতের নামে সে প্রদান করলেও আল্লাহ তা কবূল করবেন না। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

"তাদের সম্পদ ব্যয় শুধুমাত্র এ কারণে গ্রহণ করা হবে না যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। অলস ভঙ্গিতে ছাড়া তারা সলাতে আসে না এবং মনের অসন্তুষ্টি নিয়ে খরচ করে।" (সূরা তওবা ঃ ৫৪)

কাফিরের উপর যাকাত ফরয নয় এবং আদায় করলেও গ্রহণ করা হবে না এ কথার অর্থ এটা নয় যে, পরকালেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে; বরং তাকে এজন্য শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، عَنْ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কিন্তু ডান দিকরা। তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে। বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমরা সলাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। এমনকি আমাদের মৃত্যু এসে গেছে।" (সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ৩৮-৪৭)

এথেকে বুঝা যায়, ইসলামের বিধি-বিধান না মেনে চলার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

স্বাধীনতা ঃ ক্রীতদাসের কোন সম্পদ নেই। কোন সম্পদ থাকলেও তা তার মালিকের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নবী ﷺ বলেন, مَنِ ابْتَاعَ

عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "সম্পদের অধিকারী কোন ক্রীতদাস যদি কেউ বিক্রয় করে, তবে উক্ত সম্পদের মালিকানা বিক্রেতা থাকবে। কিন্তু যদি ক্রেতা উক্ত সম্পদের শর্তারোপ করে থাকে তবে ভিন্ন কথা।"[১]

নিসাবের মালিক হওয়া ঃ অর্থাৎ- তার কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ থাকবে, শরীয়ত যা নিসাব হিসেবে নির্ধারণ করেছে। সম্পদের প্রকারভেদ অনুযায়ী এর পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অতএব মানুষের কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে বা নিসাবের কম সম্পদ থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার সম্পদ কম। আর অল্প সম্পদ দ্বারা অন্যের কল্যাণ করা সম্ভব নয়।

চতুস্পদ জন্তুর নিসাবে শুরু এবং শেষ সংখ্যার খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু অন্যান্য সম্পদে শুধু প্রথমে কত ছিল তার হিসাব ধর্তব্য। পরে যা অতিরিক্ত হবে তার হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

বছর অতিক্রান্ত হওয়া ঃ কেননা বছর পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যাকাতের আবশ্যকতা সম্পদশালীর প্রতি কঠোরতা করা হয়। বছর পূর্তি হওয়ার পরও যাকাত বের না করলে যাকাতের হকদারদের প্রতি অবিচার করা হয়; তাদের ক্ষতি করা হয়। এ কারণে প্রজ্ঞাপূর্ণ শরীয়তের জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করেছে এবং এর মধ্যে যাকাতের আবশ্যকতা নির্ধারণ করেছে। আর তা হচ্ছে বছর পূর্তী। অতএব এর মধ্যে সম্পদশালী ও যাকাতের হকদারদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা বিধান করা হয়েছে।

এ কারণে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে বা তার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য তিনটি জিনিস এ বিধানের ব্যতিক্রম ঃ ১) ব্যবসার লভ্যাংশ ২) চতুস্পদ জন্তুর বাচ্চা ৩) উশর।

ব্যবসার লভ্যাংশে ব্যবসার মূল সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত দিতে হবে। আর চতুস্পদ জন্তুর ভূমিষ্ট বাচ্চার যাকাত তার মায়ের সাথে মিলিত করে দিতে হবে। আর উশর অর্থাৎ জমিনে উৎপাদিত ফসল ঘরে উঠালেই যাকাত দিতে হবে।

---

[১]. বুখারী, কিতাবুল মুসাক্বাত, অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের বাগানে কারো যদি চলার পথ থাকে বা পানির ব্যবস্থা থাকে। মুসলিম, অধ্যায় ঃ বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদ ঃ ফল সমৃদ্ধ যে ব্যক্তি খেজুর গাছ বিক্রয় করে ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩৫৫) প্রতি মাসে প্রাপ্য বেতনের যাকাত কিভাবে প্রদান করতে হবে?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা হচ্ছে, প্রথম বেতনের যদি এক বছর পূর্তী হয়; তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে সবগুলোর যাকাত আদায় করে দিবে। তাহলে যে বেতনে বছর পূর্ণ হয়েছে তার যাকাত সময়ের মধ্যেই আদায় করা হয়েছে। আর যাতে বছর পূর্ণ হয়নি তার অগ্রিম যাকাত দিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি মাসের বেতন আলাদা হিসাব রাখার চাইতে এটাই হচ্ছে সহজ পন্থা। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের বেতন আসার আগেই যদি প্রথম মাসের বেতন খরচ হয়ে যায়, তবে তার উপর কোন যাকাত নেই। কেননা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে বছর পূর্ণ হওয়া।

প্রশ্ন ঃ (৩৫৬) শিশু ও পাগলের সম্পদে কি যাকাত ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ বিষয়টি বিদ্বানদের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ। কেউ বলেন, নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা এরা তো শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলার বাধ্যবাধকতার বাইরে। অতএব তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে না।

কোন কোন বিদ্বান বলেন, বরং তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা যাকাত সম্পদের অধিকার। মালিক কে তা দেখার বিষয় নয়। আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন"– (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)। এখানে আবশ্যকতার নির্দেশ সম্পদে করা হয়েছে। তাছাড়া মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে নবী ﷺ ইয়ামান প্রেরণ করে বলেছিলেন,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"[১]

অতএব এ ভিত্তিতে নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। তাদের অভিভাবক এ যাকাত বের করার দায়িত্ব পালন করবেন।

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আবশ্যক হওয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ কালেমায়ে শাহাদাত ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আহবান করা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩৫৭) প্রদত্ত ঋণের যাকাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সম্পদ যদি ঋণ হিসেবে অন্যের কাছে থাকে, তবে ফিরিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। কেননা তা তার হাতে নেই। কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সম্পদশালী লোক হয়, তবে প্রতি বছর তাকে (ঋণদাতাকে) যাকাত বের করতে হবে। নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে তার যাকাত আদায় করে দিলে যিম্মামুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথা তা ফেরত পাওয়ার পর হিসাব করে বিগত প্রত্যেক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা তা সম্পদশালী লোকের হাতে ছিল। আর তা তলব করাও সম্ভব ছিল। সুতারং ঋণদাতার ইচ্ছাতেই চাইতে দেরী করা হয়েছে।

কিন্তু ঋণ যদি অভাবী লোকের হাতে থাকে। অথবা এমন ধনী লোকের হাতে যার নিকট থেকে উদ্ধার করা কষ্টকর, তবে তার উপর প্রতি বছর যাকাত আবশ্যক হবে না। কেননা তা হাতে পাওয়া তার জন্য অসম্ভব।

কেননা আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾

"যদি অভাবী হয় তবে তাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৮০)

অতএব তার জন্য সম্ভব নয় এ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। কিন্তু পুনরুদ্ধার করতে পারলে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, তখন থেকে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে। আবার কেউ বলেন, বিগত এক বছরের যাকাত বের করবে এবং পরবর্তী বছর আসলে আবার যাকাত আদায় করবে। এটাই অত্যধিক সতর্ক অভিমত। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্ন ঃ (৩৫৮) মৃত ব্যক্তির ঋণ কি যাকাত থেকে পরিশোধ করা যাবে?

উত্তর ঃ ইবনু আবদুল বার্ ও আবূ উবাইদা বলেন, বিদ্বানদের ইজমা বা ঐকমত্য হচ্ছে, কোন সম্পদ রেখে যায়নি এমন অভাবী ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কিন্তু আসলে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। অবশ্য অধিকাংশ আলিম বলে থাকেন, যাকাত দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। কেননা মৃত ব্যক্তি তো আখিরাতে পাড়ি জমিয়েছে। ঋণের কারণে জীবিত ব্যক্তি যে ধরনের লাঞ্ছনা ও অবমাননার স্বীকার হয় মৃত ব্যক্তি এরূপ হয় না। তাছাড়া নবী ﷺ মৃতের ঋণ যাকাত থেকে আদায় করতেন না; বরং গনীমতের সম্পদ থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতেন। এথেকে বুঝা যায় যাকাত থেকে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা বিশুদ্ধ নয়।

বলা হয়, মৃত ব্যক্তি যদি পরিশোধ করার নিয়ত রেখে ঋণ করে থাকে, তবে আল্লাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দিবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু গ্রহণ করার সময় পরিশোধের নিয়ত না থাকলে, অপরাধী হিসেবে তার জিম্মায় তা অবশিষ্ট থাকবে এবং ক্বিয়ামাত দিবসে তা পরিশোধ করবে। আমার মতে এ মতটিই অধিক পছন্দনীয়- যাকাত থেকে তার ঋণ পরিশোধ করার মতের চাইতে।

এমনও বলা হয়, প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। জীবিত লোকদের অভাব, ঋণ, জিহাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি যাকাতের অধিক প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে তাদের বিষয়টি অগ্রগণ্য। কিন্তু তাদের এ ধরনের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকলে কোন সম্পদ রেখে যায়নি এমন অভাবী মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা নেই। সম্ভবতঃ এটি মধ্যপন্থী মত।

প্রশ্ন ঃ (৩৫৯) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সদাকা করা কি ঠিক হবে? ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন ধরনের শরীয়তের দাবী থেকে মুক্তি পাবে?

উত্তর ঃ শরীয়ত নির্দেশিত একটি খরচ হচ্ছে দান-সদাকা। সদাকা জায়গা মত দেয়া হলে তা হবে আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অনুগ্রহ। সদাকাকারী সাওয়াব পাবে, ক্বিয়ামাত দিবসে সদাকার ছায়ার নীচে অবস্থান করবে। সদাকা কবূল হওয়ার শর্ত পূর্ণ করে যাকেই দান করা হোক তার দান গ্রহণ করা হবে। চাই দানকারী ঋণগ্রস্ত হোক বা না হোক। ইখলাস বা একনিষ্ঠতার সাথে, হালাল উপার্জন থেকে জায়গা মত দান করলেই শরীয়তের দলীল অনুযায়ী তার দান কবূল হবে। দানকারী ঋণমুক্ত হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এমন ঋণে ডুবে থাকে যা পরিশোধ করার জন্য তার সমস্ত সম্পত্তি দরকার, তবে এটা কোন যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত কথা নয় যে, জরুরী ও আবশ্যক ঋণ পরিশোধ না করে সে নফল দান-সদাকা করবে! অতএব তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, প্রথমে ফরয কাজ করা, তারপর নফল কাজ করা। তারপরও ঐ অবস্থায় দান করলে তার ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন, এরূপ করা জায়েয নয়। কেননা এতে পাওনাদারের ক্ষতি করা হয় এবং নিজের জিম্মায় আবশ্যিক ঋণের বোঝা জিইয়ে রাখা হয়। আবার কেউ বলেন, দান করা জায়েয আছে কিন্তু উত্তমতার বিপরীত।

মোটকথা, যে ব্যক্তির আপাদমস্তক ঋণে জর্জরিত আর পরিশোধ করার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি দরকার, তার পক্ষে দান-সদাকা করা উচিত নয়। কেননা নফল কাজের চাইতে ওয়াজিব কাজের গুরুত্ব বেশী এবং তা অগ্রগণ্য।

আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত কোন্ ধরনের শরীয়তের দাবী থেকে মুক্তি পাবে?

www.pathagar.com

তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হাজ্জ। ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হাজ্জের দায়িত্ব নেই বা হাজ্জ ফরয নয়।

কিন্তু যাকাতের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ঋণগ্রস্তের উপর থেকে যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হবে কি হবে না?

একদল আলিম বলেছেন, ঋণ পরিমাণ সম্পদে যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হবে। চাই উক্ত সম্পদ প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য।

আরেক দল আলিম বলেন, তার উপর কোন সময় যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হবে না। হাতে যে সম্পদই থাক না কেন হিসাব করে তার যাকাত বের করতে হবে। যদিও তার উপর এমন ঋণ থাকে যা পরিশোধ করে দিলে অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় না।

অন্যদল আলিম বলেন, বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তার সম্পদ যদি অপ্রকাশ্য ধরনের হয় যা প্রত্যক্ষ নয় গোপন থাকে, যেমন- টাকা-পয়সা এবং ব্যবসায়িক পণ্য, তবে তাতে ঋণ পরিমাণ সম্পদে যাকাত রহিত হবে। আর সম্পদ যদি প্রকাশ্য ধরনের হয়, যেমন- পশু, জমিন থেকে উৎপাদিত ফসল ইত্যাদি, তবে তাতে যাকাত রহিত হবে না।

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে ঃ কোন সময়ই যাকাত রহিত হবে না। চাই সম্পদ প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য। তার হাতে যে সম্পদ আছে তা যদি যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার যাকাত দিতে হবে। যদিও তার উপর ঋণ থাকে। কেননা যাকাত হচ্ছে সম্পদের অধিকার। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"(হে নবী) আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন, আর তাদের জন্য দু'আ করুন। নিঃসন্দেহে আপনার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ। আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

তাছাড়া মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে নবী ﷺ ইয়ামান প্রেরণ করে বলেছিলেন,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

www.pathagar.com

"তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"[১]

কুরআন-সুন্নাহ্র এ দলীলের ভিত্তিতে বিষয় দু'টি আলাদা হয়ে গেল। অতএব যাকাত ও ঋণের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব থাকল না। কেননা ঋণ হচ্ছে ব্যক্তির যিম্মায় আবশ্যক। আর যাকাত সম্পদে আবশ্যক। প্রত্যেকটি বিষয় তার নির্দিষ্ট স্থানে আবশ্যক হবে। কেউ কারো স্থলাভিষিক্ত হবে না। অতএব ঋণ ব্যক্তির যিম্মায় বাকী থাকবে। আর সময় হলে শর্ত পূর্ণ হলে অবশ্যই যাকাত বের করে দিবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৬০) জনৈক ব্যক্তি চার বছর যাকাত আদায় করেনি। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ যাকাত না দেয়ার কারণে এ লোক গুনাহ্গার। কেননা মানুষের উপর ওয়াজিব হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে যাকাত আদায় করে দেয়া। আবশ্যিক বিষয়ের মূল হচ্ছে, সময় হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে তা সম্পাদন করে ফেলা। এ লোকের উচিত আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাওবা করা। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে বছরগুলোর হিসাব করে যাকাত আদায় করে দেয়া। উক্ত যাকাতের কোন কিছুই তার থেকে রহিত হবে না। তাকে তাওবা করতে হবে এবং দ্রুত যাকাত আদায় করে দিতে হবে। যাতে করে দেরী করার কারণে গুনাহ্ আরো বাড়তে না থাকে।

প্রশ্ন ঃ (৩৬১) বছরের অর্ধেক সময় পশু চারণ ভূমিতে চরে খেলে তাতে কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ যে পশু বছরের পূর্ণ অর্ধেক সময় চারণ ভূমিতে চরে খায় তাতে যাকাত দিতে হবে না। কেননা পশু সায়েমা না হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। সায়েমা সেই পশুকে বলা হয়, যা বছরের পূর্ণ সময় বা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ঘাটে চরে বেড়ায় ও তৃণ-লতা খেয়ে বড় হয়। কিন্তু বছরের কিছু সময় বা অর্ধেক সময় চরে খেলে তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। অবশ্য যদি তা ব্যবসার জন্য হয়ে থাকে, তখন তার বিধান ভিন্ন। ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে যাকাত বের করতে হবে। বছর পূর্ণ হলে মূল্য নির্ধারণ করে ২.৫% (আড়াই শতাংশ) হারে যাকাত বের করবে।

---

[১] . (বুখারী, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আবশ্যক হওয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ কালেমায়ে শাহাদাত ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আহবান করা।)

www.pathagar.com

বাড়ী-ঘরের আশেপাশে ফলদার বৃক্ষের ফলে যাকাত

প্রশ্ন ঃ (২৬২) তিন বছর আগে আমি বাড়ী ক্রয় করেছি। (আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ্) বাড়ীর সীমানার মধ্যে তিনটি খেজুর গাছ আছে। প্রত্যেক গাছে প্রচুর পরিমাণে খেজুর পাওয়া যায়। এ খেজুরে কি যাকাত দিতে হবে? যাকাত দেয়া ওয়াজিব হয়ে থাকলে তো এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ১) খেজুরগুলো নিসাব পরিমাণ হল কিনা তা জানার উপায় কি? আমি তো বিভিন্ন সময় খেজুর পেড়ে থাকি?

২) কিভাবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে? প্রত্যেক প্রকার খেজুরের যাকাত কি আলাদাভাবে বের করতে হবে? নাকি সবগুলো একত্রিত করে যে কোন এক প্রকার থেকে যাকাত দিলেই চলবে?

৩) খেজুর থেকে যাকাত না দিয়ে এর বিনিময় মূল্য দিলে চলবে কি?

৪) বিগত বছরগুলোতে তো যাকাত বের করিনি তার কি হবে?

উত্তর ঃ বাড়ির আশে পাশে খেজুর গাছে প্রাপ্ত খেজুর থেকে যে যাকাত আবশ্যক হতে পারে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না প্রশ্নকারীর এ কথা সত্য ও সঠিক। কারো বাড়িতে সাতটি, কারো দশটি, কারো কম বা বেশী সংখ্যার গাছ থাকে। এগুলোর ফল নিসাব পরিমাণও হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না যে, এতেও যাকাত দিতে হবে। তাদের ধারণা যে, বাগানের খেজুরেই শুধু যাকাত দেয়া লাগবে। অথচ খেজুর বৃক্ষ বাগানে হোক বা বাড়ীতে হোক উৎপাদিত ফসল হিসেবে নিসাব পরিমাণ হলেই তাতে যাকাত দিতে হবে। এ ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষ অনুমান করবে, এ গাছগুলোতে যাকাতের নিসাব পরিমাণ খেজুর আছে কিনা? যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে কিভাবে যাকাত দিবে সে তো বিভিন্ন সময় ফল পেড়ে খেয়ে থাকে?

আমি মনে করি, এ অবস্থায় খেজুরের মূল্য নির্ধারণ করবে এবং পূর্ণ মূল্যের এক বিশমাংশ যাকাত হিসেবে বের করবে। কেননা এ পদ্ধতি মালিকের জন্য যেমন সহজ তেমনি অভাবীদের জন্যও উপকারী। এতে যাকতের পরিমাণ হবে ৫% (শতকরা পাঁচ) টাকা। কেননা এটা হচ্ছে ফসলের যাকাত ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত নয়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদ যদি হয় যেমন- স্বর্ণ-রৌপ্য, টাকা-পয়সা, তবে তাতে যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে ২.৫% (শতকরা আড়াই) টাকা।

আর অজ্ঞতাবশতঃ বিগত যে কয় বছরের যাকাত আদায় করেনি, তার জন্য অনুমান করে সর্বমোট একটা পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তারপর তার যাকাত এখনই আদায় করে দিবে। আর যাকাত আদায় করতে এ দেরীর কারণে তার

www.pathagar.com

কোন গুনাহ্ হবে না। কেননা সে ছিল অজ্ঞ। কিন্তু বিগত বছরগুলোর যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৬৩) স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নিসাব কি? আর কিলোগ্রাম হিসেবে নবী ﷺ-এর সা' এর পরিমাণ কত?

উত্তর ঃ স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ মিসক্বাল তথা ৮৫ পঁচাশি গ্রাম।

আর রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে ১৪০ (একশ চল্লিশ) মিসক্বাল তথা সঊদী আরবের রৌপ্যের দিরহাম অনুযায়ী ৫৬ রিয়াল, অর্থাৎ ৫৯৫ গ্রাম।

আর কিলোগ্রাম হিসেবে নবী ﷺ-এর সা' এর পরিমাণ হচ্ছে, দু'কিলো চল্লিশ গ্রাম (২.৪০ কেজি) পাকা পুষ্ট গম।

প্রশ্ন ঃ (৩৬৪) মেয়েদেরকে দেয়া স্বর্ণ একত্রিত করলে নিসাব পরিমাণ হয়। একত্রিত না করলে নিসাব হয় নয়। করণীয় কি?

উত্তর ঃ কোন মানুষ যদি গয়নাগুলো তার মেয়েদেরকে ধার স্বরূপ শুধুমাত্র পরিধান করার জন্য দিয়ে থাকে, তবে সেই তার মালিক। সবগুলো একত্রিত করে যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু যদি তাদেরকে সেগুলো দান স্বরূপ প্রদান করে থাকে অর্থাৎ মেয়েরাই সেগুলোর মালিক, তবে গয়নাগুলো একত্রিত করা আবশ্যক নয়। কেননা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে স্বর্ণগুলোর মালিক। অতএব তাদের একজনের স্বর্ণ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবেই যাকাত প্রদান করবে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন ঃ (৩৬৫) নিজের প্রদত্ত যাকাত থেকে গ্রহীতা যদি উপহার স্বরূপ কিছু প্রদান করে, তা কি গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর ঃ যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্ত যাকাত থেকে প্রদানকারীকে কিছু হাদিয়া বা উপহার স্বরূপ দেয়, তবে তা নিতে কোন বাধা নেই। কিন্তু তাদের মাঝে যদি পূর্ব থেকে কোন গোপন সমঝোতা হয়ে থাকে তবে তা হারাম। এ কারণে তার উক্ত হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ না করাই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ (৩৬৬) সম্পদের যাকাতের পরিবর্তে কাপড় ইত্যাদি প্রদান করা কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ না, তা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৩৬৭) স্বর্ণের সাথে মূল্যবান ধাতু হীরা প্রভৃতি থাকলে কিভাবে স্বর্ণের যাকাত দিবে?

উত্তর ঃ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তা নির্ধারণ করবে। স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে তাদের কাছে পরিমাণ জেনে নিবে। এখানে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে তা নিসাব পরিমাণ হয় কি না? নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত নেই। তবে তার

www.pathagar.com

কাছে অন্য স্বর্ণ থাকলে তা দ্বারা নিসাব পূর্ণ করে হীরা প্রভৃতি মিশ্রিত স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করে তা থেকে ২.৫% (আড়াই শতাংশ) হারে যাকাত আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৬৮) যাকাতের অর্থ দ্বারা মাসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি? ফক্বীর বা অভাবী কাকে বলে?

উত্তর ঃ যাকাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে আট শ্রেণীর কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন খাতে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আয়াতে إنما অব্যয় দ্বারা যাকাত প্রদানের খাতকে আট শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"যাকাত তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের আর এ যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং মুসলিম বা ইসলামের প্রতি তাদের (কাফিরদের) হৃদয় আকৃষ্ট করতে, ঋণ পরিশোধে, আল্লাহর পথে জিহাদে, আর মুসাফিরদের সাহায্যে। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তওবা ঃ ৬০)

সুতরাং তা মাসজিদ নির্মাণের কাজে বা জ্ঞানার্জনের কাজে খরচ করা জায়েয হবে না। আর নফল সদাকাসমূহের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে যেখানে বেশী উপকার পাওয়া যাবে সেখানে প্রদান করা।

ফক্বীরের সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ স্থান ও কাল ভেদে যার কাছে পূর্ণ এক বছরের নিজের ও পরিবারের খরচ পরিমাণ অর্থ না থাকবে তাকে বলা হয় ফক্বীর। স্থান-কাল ভেদে এজন্য বলা হয়েছে, হয়তো কোন কালে বা কোন স্থানে এক হাজার রিয়ালের অধিকারীকে ধনী বলা হয়। আবার কোন কালে বা কোন স্থানে এটা কোন সম্পদই নয়। কেননা সে সময় বা স্থানে জীবন ধারণের উপকরণ খুবই চড়া মূল্যের।

প্রশ্ন ঃ (৩৬৯) ভাড়া বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত গাড়ীতে কি যাকাত আবশ্যক?

উত্তর ঃ ভাড়ার কাজে মানুষ যে গাড়ী ব্যবহার করে অথবা নিজের ব্যক্তিগত কাজে যে গাড়ী ব্যবহার করা হয় তার কোনটাতেই যাকাত নেই। তবে প্রাপ্ত ভাড়া যদি নিসাব পরিমাণ হয় বা তা অন্য অর্থের সাথে মিলিত করে তা নিসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হয় তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে ভাড়ায় ব্যবহৃত জমি বা ভূমিতে যাকাত নেই। তার প্রাপ্ত ভাড়া থেকে যাকাত দিতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩৭০) ভাড়া দেয়া হয়েছে এমন বাড়ীর যাকাত দেয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ ভাড়া দেয়া হয়েছে এমন বাড়ী যদি ভাড়ার জন্যই নির্মাণ করা হয়ে থাকে তবে বাড়ীর মূল্যে কোন যাকাত নেই। তবে বাড়ী থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার যাকাত দিতে হবে, যদি ভাড়া দেয়ার দিন থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর বছর পূর্ণ হয়। ভাড়ার চুক্তিনামা স্বাক্ষর করার দিন থেকে যদি বছর পূর্ণ না হয় তবে তাতে যাকাত নেই। যেমন বছরে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদানের চুক্তিতে ঘর ভাড়া দেয়া হল। চুক্তির শুরুতে পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করে তা খরচ হয়ে গেল। অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা বছরের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রহণ করে তাও বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই খরচ হয়ে গেল, তবে এক বছরে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকার এ ভাড়ার মধ্যে কোন যাকাত দিতে হবে না। কেননা এ অর্থে বছর পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু বাড়ীটি যদি ব্যবসার জন্য নির্মাণ করে মূল্য বৃদ্ধি বা লাভের অপেক্ষায় থাকে এবং বিক্রি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভাড়া দেয়, তবে উক্ত বাড়ীর মূল্যের যাকাত দিতে হবে এবং ভাড়ারও যাকাত দিতে হবে যদি বছর পূর্ণ হয়। কেননা তা ব্যবসার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। নিজ মালিকানায় থেকে যাওয়া বা তা থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশে নয়। আর এমন প্রত্যেক বস্তু যা ব্যবসা বা উপার্জনের উদ্দেশে প্রস্তুত করা হয় তাতেই যাকাত রয়েছে। কেননা নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেকটি কর্ম নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ যা নিয়ত করে তাই রয়েছে তার জন্য।"[১]

এ ব্যক্তির নিকট উপার্জনের জন্য যে সম্পদ রয়েছে। তার লক্ষ্য তো বস্তুটির মূল্যের প্রতি- মূল বস্তু নয়। আর তার মূল্য হচ্ছে দিরহাম বা টাকা বা নগদ অর্থ আর নগদ অর্থে বা টাকা-পয়সায় যাকাত ওয়াজিব। অতএব যে গৃহ ব্যবসার উদ্দেশে করা হয়েছে বছর শেষে তার মূল্য নির্ধারণ করে তাতে এবং তা যদি ভাড়ায় থাকে তবে ভাড়ার চুক্তির দিন থেকে বছর পূর্ণ হলে তাতেও যাকাত দিতে হবে।

বসবাসের উদ্দেশে জমিন খরিদ করার পর তা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করলে তার যাকাত

প্রশ্ন ঃ (৩৭১) জনৈক ব্যক্তি বসবাসের উদ্দেশে একটি জমিন খরিদ করেছে। তিন বছর পর সে তা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করল। এখন উক্ত তিন বছরের কি যাকাত দিতে হবে?

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ বিগত বছরগুলোর জন্য কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো বসবাসের জন্য তা খরিদ করেছিল। কিন্তু ব্যবসা ও উপার্জনের নিয়ত করার সময় থেকেই বছরের হিসাব শুরু করতে হবে। যখন বছর পূর্ণ হবে তখনই তাতে যাকাত আবশ্যক হবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৭২) রামাযানের প্রথম দশকে যাকাতুল ফিত্‌র (ফিত্‌রা) আদায় করার বিধান কি?

উত্তর ঃ যাকাতুল ফিত্‌র শব্দটির নামকরণ করা হয়েছে সওম ভঙ্গকে কেন্দ্র করে। সওম ভঙ্গ বা শেষ করার কারণেই উক্ত যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। সুতরাং উক্ত নির্দিষ্ট কারণের সাথেই সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে, অগ্রিম করা চলবে না। এ কারণে ফিত্‌রা বের করার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন সলাতের পূর্বে। কিন্তু ঈদের একদিন বা দু'দিন আগে তা আদায় করা জায়েয। কেননা এতে প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর জন্য সহজতা রয়েছে। কিন্তু এরও আগে বের করার ব্যাপারে বিদ্বানদের প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তা জায়েয নয়। এ ভিত্তিতে ফিতরা আদায় করার সময় দু'টি ঃ ১) জায়েয বা বৈধ সময়। তা হচ্ছে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে। ২) ফযীলতপূর্ণ উত্তম সময়। তা হচ্ছে ঈদের দিন- ঈদের সলাতের পূর্বে। কিন্তু সলাতের পর পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা হারাম। ফিত্‌রা হিসেবে কবূল হবে না। ইবনু আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"সলাতের পূর্বে যে তা আদায় করে তার যাকাত গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি সলাতের পর আদায় করবে তার জন্য তা একটি সাধারণ সদাকা বা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে।"[১]

তবে কোন লোক যদি জঙ্গল বা মরুভূমি বা এ ধরনের জনমানবহীন কোন স্থানে থাকার কারণে ঈদের দিন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং ঈদের সলাত শেষ হওয়ার পর সে সম্পর্কে অবগত হয়, তবে ঈদের পর ফিত্‌রা আদায় করলেও তার কোন অসুবিধা হবে না।

---

[১]. আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতুল ফিতর, ইবনু মাজাহ্‌, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ সদাকা ফিত্‌র।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৩৭৩) সদাকার নিয়তে বেশী করে ফিত্‌রা আদায় করা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বেশী করে ফিত্‌রা আদায় করা জায়েয। ফিত্‌রার অতিরিক্ত বস্তু সদাকার নিয়্যাতে প্রদান করবে। যেমন আজকাল বহু লোক এরূপ করে থাকে। তাকে দশ জনের ফিত্‌রা আদায় করতে হবে। এ উদ্দেশে সে এক বস্তা চাউল খরিদ করে যাতে দশ জনের অধিক ব্যক্তির ফিত্‌রা আদায় করা যাবে। অতঃপর তা নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে আদায় করে। এটা জায়েয যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তার চাইতে বেশী চাউল আছে। বস্তার মধ্যে নির্দিষ্ট ফিত্‌রার পরিমাপ যদি জানা যায় তবে তা আদায় করাতে কোন দোষ নেই।

চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করা

প্রশ্ন ঃ (৩৭৪) কতিপয় বিদ্বান মনে করেন, যে সমস্ত বস্তু দ্বারা ফিতরা দেয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা যেহেতু বর্তমানে পাওয়া যায়, তাই চাউল দ্বারা ফিতরা দেয়া বিধিসম্মত নয়। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই?

উত্তর ঃ একদল আলিম বলেন, হাদীসে উল্লেখিত পাঁচ প্রকার বস্তু ঃ গম, খেজুর, যব, কিসমিস এবং পনীর- এগুলো যদি থাকে তবে অন্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়েয হবে না।

অন্য একটি মত হচ্ছে উল্লেখিত বস্তু এবং অন্য যে কোন বস্তু এমনকি টাকা-পয়সা দ্বারাও ফিতরা আদায় করা বৈধ। পরস্পর বিরোধী দু'টি মত। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে ঃ মানুষের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। কেননা সহীহুল বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِـنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক সা' পরিমাণ খাদ্য ফিত্‌রা হিসেবে বের করতাম। সে সময় আমাদের খাদ্য ছিল খেজুর, যব, কিসমিস ও পনীর।"[১] এ হাদীসে গমের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া যাকাতুল ফিত্‌রে গম

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতরা হচ্ছে এক সা' পরিমাণ খাদ্য।

www.pathagar.com

দেয়া যাবে এ রকম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোন হাদীস আমার জানা নেই। কিন্তু তারপরও নিঃসন্দেহে গম দ্বারা ফিত্‌রা আদায় বৈধ।

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাতুল ফিত্‌র ফরয করেছেন রোযাদ্বারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের জন্য খাদ্য স্বরূপ।"[১]

অতএব মানুষের প্রচলিত খাদ্য থেকে ফিত্‌রা বের করাই যথেষ্ট। যদিও তা ফিকাহ্‌বিদদের উক্তিতে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হয়। কেননা এ প্রকার সমূহ যেমনি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- চারটি ছিল। যা নবী ﷺ-এর যুগে মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। অতএব চাউল দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করা জায়েয। বরং আমি মনে করি বর্তমান যুগে ফিত্‌রা হিসেবে চাউলই উত্তম। কেননা তা সহজলভ্য ও মানুষের অধিক পছন্দনীয় বস্তু। তাছাড়া বিষয়টি স্থানভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। হতে পারে গ্রামাঞ্চলে কোন কোন গোষ্ঠীর নিকট খেজুর অধিক প্রিয় খাদ্য। তারা খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করবে। কোন এলাকায় কিসমিস, কোন এলাকায় পনীর প্রিয় খাদ্য হতে পারে তারা তা দিয়েই ফিত্‌রা আদায় করবে। প্রত্যেক এলাকা ও সম্প্রদায়ের জন্য সেটাই উত্তম যেটাতে রয়েছে তাদের জন্য অধিক উপকার।

মৃত ব্যক্তির ওসীয়তকৃত সম্পদে এবং ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত

প্রশ্ন ঃ (৩৭৫) কারো নিকট যদি মৃত ব্যক্তির ওসীয়তকৃত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থাকে এবং ইয়াতীমের কিছু সম্পদ থাকে, তাতে কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদের উক্ত এক তৃতীয়াংশে কোন যাকাত নেই। কেননা তার কোন মালিক নেই। তা তো অসীয়ত অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ইয়াতীমের অর্থ যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং বছর পূর্ণ হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইয়াতীমের

---

[১]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতুল ফিত্‌র, ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকা ফিত্‌র।

www.pathagar.com

অভিভাবক সে যাকাত বের করবে। বিদ্বানদের মতসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বা বিবেকবান হওয়া শর্ত নয়। কেননা যাকাত সম্পদে ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন ঃ (৩৭৬) ব্যক্তিগত গাড়ীতে কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ এতে কোন যাকাত নেই। স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া মানুষের ব্যবহৃত কোন বস্তুতে যাকাত নেই। যেমন গাড়ী, উট, ঘোড়া, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি। কেননা নবী ﷺ বলেন,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

"মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস, ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই।"[১]

প্রশ্ন ঃ (৩৭৭) যাকাত দেয়ার সময় কি বলে দিতে হবে যে, এটা যাকাত?

উত্তর ঃ যাকে যাকাত প্রদান করা হবে সে যদি যাকাতের হকদার হয় কিন্তু সাধারণতঃ সে যাকাত গ্রহণ করে না, তাহলে যাকাত দেয়ার সময় তাকে বলে দিতে হবে যে, এটা যাকাত। যাতে করে বিষয়টি তার নিকট সুস্পষ্ট হয় ফলে সে ইচ্ছা হলে যাকাত গ্রহণ করবে ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করবে। আর যে লোক যাকাত গ্রহণে অভ্যস্ত তাকে যাকাত দেয়ার সময় কোন কিছু না বলাই উচিত। কেননা এতে তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের খোঁটা দেয়া হয়।

আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾

"হে ঈমানদারগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের সদাকা বা দানসমূহকে বিনষ্ট করে দিও না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

প্রশ্ন ঃ (৩৭৮) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাকাত স্থানান্তর করার বিধান কি?

উত্তর ঃ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করলে যদি কল্যাণ থাকে তবে তা জায়েয। যাকাত প্রদানকারীর কোন নিকটাত্মীয় যাকাতের হকদার অন্য শহরে থাকে তবে তার নিকট যাকাত প্রেরণ করলে কোন অসুবিধা নেই।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাসে যাকাত নেই। মুসলিম, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাত নেই।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে জীবন যাত্রার মান উঁচু এমন দেশে বসবাস করে এবং তুলনামূলক অভাবী দেশে যদি যাকাত প্রেরণ করে তবেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি অন্য শহরে বা দেশে যাকাত প্রেরণ করাতে তেমন কোন কল্যাণ না থাকে তবে তা স্থানান্তর করা যাবে না।

অন্য স্থানে বসবাসকারী পরিবারের লোকদের ফিতরা আদায় করা।

প্রশ্ন ঃ (৩৭৯) জনৈক ব্যক্তি মক্কায় থাকে আর তার পরিবার রিয়াদে। সে কি নিজ পরিবারের লোকদের ফিতরা মক্কায় আদায় করতে পারবে?

উত্তর ঃ নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে ফিত্‌রা আদায় করা জায়েয যদিও তারা তার সাথে তার শহরে না থাকে। অতএব সে মক্কায় আর তার পরিবার রিয়াদে, সে মক্কাতেই তার ও তার পরিবারের ফিত্‌রা আদায় করতে পারে। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, যে স্থানে ফিত্‌রা আদায় করার সময় হবে সে স্থানেই তা আদায় করা। ফিত্‌রা আদায় করার সময় সে যদি মক্কায় থাকে তবে মক্কাতেই আদায় করবে। রিয়াদে থাকলে রিয়াদে। পরিবারের কিছু লোক মক্কায় কিছু রিয়াদে। যারা মক্কায় আছে তারা মক্কায় যারা রিয়াদে আছে তারা রিয়াদে ফিত্‌রা আদায় করবে। কেননা ফিতরা শরীরের সাথে সম্পর্কিত। সওম পালনকারী যেখানে তার ফিত্‌রাও সেখানে।

প্রশ্ন ঃ (৩৮০) ঋণগ্রস্তের হাতে যাকাত দেয়া উত্তম নাকি তার পাওনাদারের নিকট গিয়ে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা উত্তম?

উত্তর ঃ বিষয়টির বিধান অবস্থা ভেদে ভিন্ন রকম হতে পারে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দায়মুক্তি ও ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। অর্থ হাতে এলে ঋণ পরিশোধ করবে এ রকম বিশ্বস্ত হয় তবে যাকাতের অর্থ তার হাতেই প্রদান করা উচিত। যাতে করে তা পরিশোধ করতে পারে। তার ব্যাপারটা গোপন থাকে। দাবীদারদের সামনে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বেহিসাবী অপব্যয়ী হয়। তার হাতে অর্থ আসলে ঋণ পরিশোধের পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় খাতে তা খরচ করে, তবে যাকাতের অর্থ তাকে না দিয়ে সারসরি পাওনাদারের নিকট গিয়ে প্রাপ্য জেনে নিয়ে তা পরিশোধ করে দিবে অথবা সাধ্যানুযায়ী তার ঋণ হালকা করে দিবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৮১) যারাই যাকাত গ্রহণের জন্য হাত বাড়ায় তারাই কি তার হকদার?

উত্তর ঃ যাকাতের জন্য যে কেউ হাত বাড়ালেই তাকে যাকাত দেয়া উচিত নয়। কেননা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও অনেক মানুষ টাকার লোভে হাত

www.pathagar.com

বাড়ায়। উচিত অনুচিতের ধার ধারে না। এসমস্ত লোক কিয়ামাত দিবসে এমন অবস্থায় আসবে যে তার মুখমণ্ডলে এক টুকরা গোশতও থাকবে না (না'উযুবিল্লাহ) সমস্ত মানুষের সাক্ষাতে কিয়ামাত দিবসে তার মুখ মণ্ডলের শুধুমাত্র হাড়-হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। নবী ﷺ বলেন,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

"যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশে মানুষের কাছে হাত পাতে সে যেন জাহান্নামের আগুন চাইল। অতএব বেশী চাইলে চাক অথবা কম চাইলে কাচ।"[১]

এ সুযোগে আমি সর্তক করছি সেই লোকদেরকে যারা ভিক্ষা বৃত্তি চর্চা করে। সর্তক করছি সেই লোকদেরকে যারা যাকাতের হকদার না হওয়া সত্ত্বেও যাকাত গ্রহণ করে। সাবধান! যাকাতের হকদার না হয়েও আপনি যদি যাকাত গ্রহণ করেন, তবে আপনি হারাম খেলেন। (না'উযুবিল্লাহ) আল্লাহকে ভয় করুন। অথচ নবী ﷺ বলেন,

﴿وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ﴾

"যে ব্যক্তি অভাব মুক্ত থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র করে দেন।"[২]

তবে কোন লোক যদি আপনার কাছে হাত পাতে, আর তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে আপনি মনে করেন সে যাকাতের হকদার, তবে তাকে যাকাত দিলে আদায় হয়ে যাবে এবং আপনি দায় মুক্ত হবেন। পরবর্তীতে যদি জানা যায় যে, সে যাকাতের হকদার ছিল না তবে পুনরায় যাকাত দিতে হবে না। দলীল ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়া নাজায়েয।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদের প্রতি লোভমুক্ত না হয়ে সাদকা হয় না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র থাকা ও ধৈর্য অবলম্বন করার ফযীলত।

www.pathagar.com

عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "একদা (বনী ইসরাইলের) জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি এ রাত্রে কিছু দান করব। এ উদ্দেশ্যে যে স্বীয় দান নিয়ে বের হল, এবং (গোপনীয়তার কারণে নিজের অজান্তে) এক চোরের হাতে তা রেখে দিল। সকালে মানুষে বলাবলি করতে লাগল, কি আশ্চর্য! আজ রাতে এক চোরকে দান করা হয়েছে! সে বলল, হে আল্লাহ চোরের হাতে আমার দান যাওয়ার কারণে সকল প্রশংসা তোমার জন্য। অবশ্যই (আবার) দান করব। অতঃপর সে তার দান নিয়ে বের হল এবং এক ব্যভিচারিনীর হাতে রেখে দিন। সকালে মানুষ বলাবলি করতে লাগল, কি আশ্চর্য! গত রাতে একজন ব্যভিচারিণীকে দান করা হয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ ব্যভিচারিণীকে দান করার কারণে সমস্ত প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। অবশ্যই (আবার) এ রাত্রে সাদকা করব। সে তার দান নিয়ে বের হল অতঃপর এক ধনী লোকের হাতে দিয়ে দিল। সকালে মানুষ বলতে লাগগ, আশ্চর্য ব্যাপার! আজ রাতে একজন ধনী মানুষকে দান করা হয়েছে। সে বলল ঃ হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। চোর ব্যভিচারিণী এবং ধনী লোককে দান করার কারণে।

তার নিকট আসা হল (কোন আসমানিদূত হতে পারে), অতঃপর তাকে বলা হল, তোমার দান চোরের হাতে যাওয়ার কারণে– হতে পারে সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। আর ব্যভিচারিণী, হতে পারে সে এ দানের কারণে ব্যভিচার থেকে বিরত হবে। আর ধনী ব্যক্তি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে হতে পারে সেও তার সম্পদ থেকে দান করবে।[১]

দেখুন সৎ নিয়তের কিরূপ প্রভাব হয়। অতএব যে ব্যক্তি আপনার কাছে হাত পেতেছে আপনি তাকে ফকীর বা অভাবী মনে করে দান করেছেন কিন্তু পরে জানা গেল সে অভাবী নয় সম্পদশালী তবে আপনার যাকাত হয়ে যাবে। পুনরায় আদায় করতে হবে না।

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ধনী মানুষের অজান্তে তাকে দান করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ দানকারীর প্রতিদানের আবশ্যকতা যদিও তা অপাত্রে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

যাকাত বন্টনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি যাকাতের হকদার নয়

প্রশ্ন ঃ (৩৮২) জনৈক ধনী ব্যক্তি একজন লোককে বলল আপনি যাদেরকে হকদার মনে করেন তাদের কাছে আমার এই যাকাত বন্টন করে দিন। এখন এ ব্যক্তি কি যাকাতের কাজে নিযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের হকদার হবে?

উত্তর ঃ না, এ লোক যাকাতের কাজে নিযুক্ত বলে গণ্য হবে না। ফলে সে যাকাতেরও হকদার হবে না। কেননা সে নির্দিষ্টভাবে এক ব্যক্তির যাকাত শুধুমাত্র বন্টন করার দায়িত্ব নিয়েছে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন) পবিত্র কুরআনের বাক্য ভঙ্গির গোপন উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই- আল্লাহ বলেন, (والعاملين عليها) এখানে على অব্যয় দ্বারা এক প্রকার কর্তৃত্ব বুঝা যায়। অর্থাৎ যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর্মচারী। এজন্য নির্দিষ্টভাবে একক ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর্মচারী কুরআনে বর্ণিত উক্ত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৩৮৩) দুর্বল ঈমানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে ঈমান শক্তিশালী করার জন্য যাকাত দেয়া যাবে কি? সে কিন্তু কোন এলাকার নেতা বা সরদারও নয়।

উত্তর ঃ মাসআলাটি বিদ্বানদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। আমার মতে ইসলামের প্রতি ধাবিত করতে ঈমান শক্তিশালী করার জন্য তাকে যাকাত দিলে কোন অসুবিধা নেই। যদিও সে কোন কবীলা বা এলাকায় সরদার বা নেতা না হয়। যদিও একান্ত ব্যক্তিগতভাবে উক্ত উদ্দেশে দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "তাদের হৃদয়গুলো ইসলামের দিকে ধাবিত করার জন্য।" যখন ফকীর ও অভাবীকে যাকাত দেয়া বৈধ তখন কমজোর ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিকে তা প্রদান করা তো আরো অধিক বৈধ। কেননা কোন ব্যক্তির শরীর শক্তিশালী করার চেয়ে তো তার ঈমানকে শক্তিশালী করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ (৩৮৪) ইসলামী জ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রকে যাকাত দেয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ছাত্রদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয, যদিও তারা কামাই রোজগার করার সামর্থ্য রাখে। কেননা ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করা এক প্রকার জিহাদ। আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে যাকাতের একটি খাত। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"যাকাত তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের আর এ যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং ইসলামের প্রতি যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে হয়, ঋণ পরিশোধে, আল্লাহর পথে জিহাদে আর মুসাফিরদের সাহায্যে। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ঃ ৬০)

কিন্তু শিক্ষার্থী যদি শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী থাকে তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। আমরা তাকে বলব, তুমি তো দুনিয়ার কর্মেই ব্যস্ত আছ। অতএব চাকরী-বাকরী করার মাধ্যমে তো দুনিয়া অর্জন করতে পার। তাই তোমাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

কিন্তু আমরা যদি এমন লোক পাই, যে নিজ পানাহার ও বাসস্থানের জন্য রোজগার করতে সক্ষম কিন্তু তার নিকট এমন সম্পদ নেই যা দ্বারা সে বিবাহ করতে পারে, তবে যাকাতের অর্থ দিয়ে কি এ ব্যক্তির বিবাহের ব্যবস্থা করা যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বিবাহের জন্য তাকে যাকাত দেয়া যাবে। যাকাত থেকে তার পূর্ণ মোহর আদায় করা যাবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় বিবাহে অপরাগ ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে?

জবাবে আমরা বলব ঃ কেননা মানুষের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কখনো খানাপিনার মতই এর প্রয়োজনীয়তা মানুষের জীবনে প্রকট হয়ে দেখা যায়। এজন্য বিদ্বানগন বলেন, কারো ভরণ-পোষণের অর্থ বহন করা যার উপর আবশ্যক থাকে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে তার বিবাহেরও ব্যবস্থা করে দেয়া- যদি তার কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকে। অতএব পুত্র যদি বিবাহ উপযুক্ত হয় এবং বিবাহের দরকার মনে করে তবে পিতার উপর ওয়াজিব হচ্ছে পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়া। কিন্তু আমি শুনেছি পুত্র যদি বিবাহের কথা উত্থাপন করে তবে কোন কোন পিতা নিজেদের যৌবনকালের কথা ভুলে গিয়ে পুত্রকে ধমক দেন আর বলেন, নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে উপার্জন কর তারপর বিবাহ কর। এটা মোটেও জায়েয না। পিতা সামর্থ্যবান থাকলে পুত্রের সাথে এ রকম ব্যবহার করা হারাম। পিতার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা না করলে সে অবশ্যই কিয়ামাত দিবসে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে।

একটি মাসাআলা ঃ জনৈক ব্যক্তির কয়েকটি পুত্র সন্তান আছে। সে যদি উপযুক্ত বড় ছেলের বিবাহ নিজের খরচে প্রদান করে, তবে মৃত্যুর পূর্বে ছোট ছেলেদের জন্য কি নিজ সম্পত্তি থেকে বড় ছেলের মোহরের অনুরূপ প্রদান করার ওসীয়ত করে যেতে পারে?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ না, এরূপ করা জায়েয হবে না। তবে পিতার জীবদ্দশাতেই যদি ছোট ছেলেরা বিবাহের উপযুক্ত হয় এবং বড় ছেলের ন্যায় তাদের নিজ খরচে বিবাহ দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয। কিন্তু তারা এখনও ছোট তাই মৃত্যুর পর তাদের জন্য আলাদা অসীয়ত করে যাবে তা হারাম। এর দলীল হচ্ছে ঃ নবী ﷺ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক অধিকারীকে তার নির্দিষ্ট অধিকার প্রদান করেছেন। অতএব উত্তরাধিকারের জন্য কোন অসীয়ত নেই।"[১]

প্রশ্ন ঃ (৩৮৫) মুজাহিদদেরকে যাকাত প্রদান করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ যাকাত প্রদানের খাতসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদ 'ফী সাবিলিল্লাহ'র কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয। কিন্তু আল্লাহর পথে মুজাহিদ কে? জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লড়াইকারী সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, একজন বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য লড়াই করে, একজন গোত্রীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য লড়াই করে, একজন নিজের শক্তি প্রর্দশনের জন্য যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে কে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পথে? এর জবাবে নবী ﷺ আমাদের ইনসাফপূর্ণ মূল্যবান একটি মাপ্‌কাঠি প্রদান করেছেন, তিনি বলেন ঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"যে ব্যক্তি লড়াই করবে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে।"[২]

অতএব প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করবে, লড়াই করবে আল্লাহর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, কাফির রাষ্ট্রে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য সে-ই আল্লাহর পথে, সে-ই মুজাহিদ। তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। তাকে নগদ অর্থ প্রদান করবে যাতে জিহাদের পথে তা ব্যয় করতে পারে অথবা যাকাতের অর্থ দ্বারা যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয় করে দিবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৮৬) মাসজিদ নির্মাণের কাজে যাকাত প্রদান করার বিধান কি?

---

[১]. আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকারকে ওসীয়ত করার বর্ণনা। তিরমিযী, ওসীয়ত করার বর্ণনা,

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ মাসজিদ নির্মাণের কাজ কুরআনের বাণী 'ফী সাবিলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাফসীরবিদগণ 'ফী সাবিলিল্লাহ'র তাফসীরে উল্লেখ করেছেনঃ এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।

মাসজিদ নির্মাণসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাত ব্যয় করা প্রকৃত কল্যাণের পথকে বিনষ্ট করারই নামান্তর। কেননা কৃপণতা ও লোভ অনেক লোকের মধ্যে স্বভাবজাত প্রকৃতি। যখন তারা দেখবে মাসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য সব ধরনের কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া হচ্ছে, তখন তারা সমস্ত যাকাত সে সকল কাজেই ব্যবহার করা শুরু করবে। ফলে দুঃস্থ অভাবী মানুষ তাদের অভাব অনটনের মধ্যেই রয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৮৭) নিকটাত্মীয়দের যাকাত প্রদান করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে ঃ নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করা যদি যাকাত প্রদানকারীর উপর ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে থাকে, তবে তাকে (উক্ত নিকটাত্মীয়কে) যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কিন্তু সে যদি এমন ব্যক্তি হয় যার খরচ বহন করা যাকাত প্রদানকারীর উপর আবশ্যক নয়, তবে তাকে যাকাত প্রদান করা জায়েয। যেমন সহদোর ভাই। যদি ভাইয়ের পুত্র সন্তান থাকে, তবে তার ব্যয়ভার বহন করা অন্য ভাইয়ের উপর আবশ্যক নয়। কেননা তার পুত্র সন্তান থাকার কারণে দু'ভাই পরস্পর মীরাস (উত্তরাধিকার) পাবে না। এ অবস্থায় উক্ত ভাই যদি যাকাতের হকদার হয় তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়ের কোন ব্যক্তি ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে যদি অভাবী না হয়, কিন্তু সে ঋণগ্রস্ত, তবে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। যদিও উক্ত নিকটাত্মীয় নিজের পিতা মাতা ছেলে বা মেয়ে হোক না কেন। যখন কিনা এই ঋণ ভরণ-পোষণে ত্রুটির কারণে নয়।

উদাহরণ ঃ জনৈক ব্যক্তির পুত্র গাড়ি দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার কারণে বড় একটি জরিমানার সম্মুখীন হয়েছে। অথচ তার নিকট জরিমানা আদায় করার মত কোন অর্থ নেই। এ অবস্থায় তার পিতা নিজের যাকাতের অর্থ পুত্রের ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রদান করলে তা বৈধ হবে। কেননা এ ঋণ ভরণ-পোষণের কারণে নয়। এমনিভাবে কোন মানুষ যাকাতের কারণ ছাড়া অন্য কারণে যদি কোন আত্মীয়কে যাকাত থেকে প্রদান করে, তবে তা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ (৩৮৮) যাকাত সদাকা আদায় করা কি শুধু রামাযান মাসের জন্যই বিশিষ্ট?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ দান-সদাকা রামাযান মাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং তা সর্বাবস্থায় সবসময় প্রদান করা মুস্তাহাব। আর নিসাব পরিমাণ সম্পদে বছর পূর্ণ হলেই যাকাত বের করা ওয়াজিব। রামাযানের অপেক্ষা করবে না; হ্যাঁ রামাযান যদি নিকটবর্তী হয় যেমন শা'বান মাসে বছর পূর্ণ হচ্ছে- তবে রামাযান পর্যন্ত বিলম্ব করে যাকাত বের করলে কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু যাকাত যদি উদাহরণ স্বরূপ মুহাররমে আবশ্যক হয়, তবে রামাযান পর্যন্ত অপেক্ষা করা জায়েয হবে না। অবশ্য যদি পূর্ববর্তী রামাযানে অগ্রিম যাকাত বের করে তবে তা জায়েয। কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার পর বিলম্ব করা জায়েয নয়। কেননা নির্দিষ্ট কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়াজিবসমূহ উক্ত কারণ পাওয়া গেলেই আদায় করতে হবে। বিলম্ব করা জায়েয হবে না। তাছাড়া মানুষের জীবনের এমন তো কোন গ্যারান্টি নেই যে, বিলম্বিত সময় পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে। যদি যাকাত প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তার যিম্মায় যাকাত রয়েই গেল। হতে পারে উত্তরাধিকারীগণ বিষয়টি না জানার কারণে তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবে না অথবা হতে পারে সম্পদের লোভে ও মোহে পড়ে তারা তা করবে না।

কিন্তু দান-সদাকার জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই। বছরের প্রতিদিনই তার সময়। কিন্তু লোকেরা রামাযান মাসে দান-সদাকা ও যাকাত প্রদান পছন্দ করে। কেননা সময়টি ফযীলতপূর্ণ। দান ও বদান্যতার সময়। নবী ﷺ ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। রামাযান মাসে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন। যখন জিবরীল (আঃ) তার সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাঁকে কুরআন পড়াতেন।

কিন্তু জানা আবশ্যক যে, রামাযান মাসে যাকাত প্রদান বা দান-সদাকার ফযীলত নির্দিষ্ট সময়ের (শুধু এক মাস) ফযীলতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর চাইতে ফযীলতপূর্ণ অন্য কোন সময় বা অবস্থা যদি পাওয়া যায়, তবে সে সময়ই দান করা বা যাকাত প্রদান করা উত্তম। যেমন রামাযান ছাড়া অন্য সময় যদি ফকীর মিসকীনদের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে বা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, তবে সে সময় দান করার সাওয়াব রামাযান মাসে দান করার চাইতে নিঃসন্দেহে বেশী।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফকীর মিসকীনদের অবস্থা রামাযান ছাড়া অন্যান্য মাসে বেশী শোচনীয় থাকে। রমাযান মাসে দান-সদাকা বা যাকাতের ব্যাপকতার কারণে তারা সে সময় অনেকটা অভাবমুক্ত হয়। কিন্তু বছরের অবশিষ্ট সময়ে তারা প্রচণ্ড অভাব ও অনটনের মাঝে দিন কাটায়। সুতরাং বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

www.pathagar.com

সদাকায়ে জারিয়া কাকে বলে?

প্রশ্ন ঃ (৩৮৯) মানুষ তার জীবদ্দশায় যা দান করে তাকেই কি সদাকায়ে জারিয়া বলে? নাকি মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের দানকে সদাকায়ে জারিয়া বলে?

উত্তর ঃ হাদীসে এরশাদ হয়েছে, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়।

১) সদাকায়ে জারিয়া

২) ইসলামী জ্ঞান, উপকারী বিদ্যা লিপিবদ্ধ করে যাওয়া

৩) সৎ সন্তানদের দু'আ।[১]

এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, জীবিত অবস্থায় ব্যক্তির দানকেই সদাকা জারিয়া বলা হয়। মৃত্যুর পর তার সন্তানদের দানকে নয়। কেননা মৃত্যুর পর সন্তানদের থেকে যা হবে তা রাসূল ﷺ বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।'

অতএব কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে কিছু দান করার অসীয়ত করে যায় অথবা ওয়াক্‌ফ করে যায়, তবে তা সদাকা জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। মৃত্যুর পর কবরে সে তা থেকে উপকৃত হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী জ্ঞান, তার উপার্জন থেকে হতে হবে। এমনিভাবে সন্তান, যদি পিতার জন্য দু'আ করে।

এ জন্য কেউ যদি প্রশ্ন করে আমি কি পিতার জন্য দু' রাক'আত সলাত পড়ব? নাকি নিজের জন্য দু' রাক'আত সলাত আদায় করে এর মধ্যে পিতার জন্য দু'আ করব? আমি বলব ঃ উত্তম হচ্ছে, নিজের জন্য দু' রাক'আত সলাত আদায় করবেন এবং এর মধ্যে পিতার জন্য দু'আ করবেন।

কেননা এ দিকেই নবী ﷺ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, অথবা 'সৎ সন্তান' যে তার জন্য দু'আ করবে, এরূপ বলেননি যে, তার জন্য সলাত আদায় করবে বা অন্য কোন নেক আমল করবে।

স্বামীর সম্পদ থেকে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান করা জায়েয নয়

প্রশ্ন ঃ (৩৯০) স্ত্রী যদি স্বামীর সম্পদ থেকে নিজের জন্য দান করে বা তা মৃত নিকটাত্মীয়ের জন্য দান করে, তবে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ এ কথা নিশ্চিত জানা যে, স্বামীর সম্পদ স্বামীরই। অনুমতি ছাড়া কারো সম্পদ দান করা কারো জন্য বৈধ নয়।

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ অসীয়ত, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর পর মানুষ যার সাওয়াব পেয়ে থাকে তার বর্ননা।

www.pathagar.com

স্বামী যদি অনুমতি প্রদান করে তবে স্ত্রীর নিজের জন্য বা তার মৃত আত্মীয়ের জন্য দান করা জায়েয, কোন অসুবিধা নেই। অনুমতি না পেলে এরূপ করা হালাল নয়। কেননা এটা তার সম্পদ। আত্মার সন্তুষ্টি ছাড়া কারো জন্য কারো সম্পদ খরচ করা বৈধ নয়।

বন্টনের জন্য যাকাত নিয়ে এসে নিজের কাছেই রেখে দেয়া

প্রশ্ন ঃ (৩৯১) জনৈক ফক্বীর এক ধনী লোকের যাকাতের টাকা নিয়ে এসে এ কথা বলে যে, তার পক্ষ থেকে সে তা বিতরণ করে দিবে। তারপর তা সে নিজের কাছেই রেখে দেয়। তার এ কাজের বিধান কি?

উত্তর ঃ এটা হারাম। এটা আমানতের খিয়ানত। কেননা মালিক তো দায়িত্বশীল হিসেবে তাকে যাকাতের টাকা দিয়েছে। যাতে করে তা বন্টন করে দেয়। অথচ সে নিজেই তা রেখে দেয়। বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন, কোন বস্তুর জিম্মাদারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত বস্তু থেকে নিজের জন্য কোন কিছু নিতে পারবে না। অতএব এ ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে যাকাতের মালিককে এ কথা বলে দেয়া যে, ইতোপূর্বে যা সে নিয়েছিল তা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। মালিক যদি তাতে অনুমতি দিয়ে দেয় তো ভাল, অন্যথা যা সে নিয়েছে তার জিম্মাদার হবে এবং তাকে তা আদায় করতে হবে।

এ উপলক্ষে একটি বিষয়ে আমি মানুষকে সতর্ক করতে চাই। তা হচ্ছে, ফক্বীর থাকাবস্থায় যাকাত নিয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ তাকে সম্পদশালী করেন। কিন্তু তখনও মানুষ তাকে যাকাত দিতে থাকে আর সেও নিতে থাকে। বলে, আমি তো চাইনি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার কাছে এ রিয্‌ক এসেছে...। কিন্তু এটা হারাম। তার একাজ মূর্খতাসুলভ। কেননা আল্লাহ যাকে অভাবমুক্ত করেন, যাকাত গ্রহণ করা তার জন্য হারাম।

আবার কেউ কেউ যাকাত নিয়ে নিজে খায় না, অন্য মানুষকে দিয়ে দেয়। কিন্তু যাকাতের মালিক বিষয়টি জানে না বা তাকে এ ব্যাপারে দায়িত্বও দেয়া হয়নি। এরূপ করাও তার জন্য জায়েয নয়। যদিও এ লোকের বিষয়টি আগের জনের চাইতে কিছুটা হালকা। কিন্তু তারপরও নাজায়েয। সে যাকাতের মালিককে বিষয়টি অবহিত করে অনুমতি নিয়ে নিবে। অনুমতি না দিলে তার ঘাড়ে জিম্মাদারী রয়ে যাবে। (আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

www.pathagar.com

فتاوى

الصيام

সওম বিষয়ক

ফাতাওয়া

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ সিয়াম

প্রশ্ন ঃ (৩৯২) সওম ফরয হওয়ার হিকমত কি?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেই আমরা জানতে পারি সওম ফরয হওয়ার হিকমত কি? আর তা হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি অর্জন করা ও আল্লাহ্র ইবাদাত করা। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সওম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৩)

তাক্বওয়া হচ্ছে হারাম কাজ পরিত্যাগ করা। ব্যাপক অর্থে তাক্বওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয় বাস্তবায়ন করা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। নবী ﷺ বলেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"যে ব্যক্তি (সওম রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যার কারবার ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার খানা-পিনা পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।"[১]

অতএব এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, সওম পালনকারী যাবতীয় ওয়াজিব বিষয় বাস্তবায়ন করবে এবং সব ধরনের হারাম থেকে দূরে থাকবে। মানুষের গীবত করবে না, মিথ্যা বলবে না, চোগলখোরী করবে না, হারাম বেচা-কেনা করবে না, ধোঁকাবাজী করবে না। মোটকথা চরিত্র ধ্বংসকারী অন্যায় ও অশ্লীলতা বলতে যা বুঝায় সকল প্রকার হারাম থেকে বিরত থাকবে। আর একমাস এভাবে চলতে পারলে বছরের অবশিষ্ট সময় সঠিক পথে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

কিন্তু আফসোসের বিষয় অধিকাংশ সওম পালনকারী রামাযানের সাথে অন্য মাসের কোন পার্থক্য করে না। অভ্যাস অনুযায়ী ফরয কাজে উদাসীনতা

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সওম রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তার কারবার পরিত্যাগ করে না। হাদীসটির বাক্য ইবনু মাজাহ্ থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রদর্শন করে, হালাল-হারামে কোন পার্থক্য নেই। তাকে দেখলে বুঝা যাবে না তার মধ্যে সিয়ামের মর্যাদার কোন মূল্য আছে। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় সিয়ামকে ভঙ্গ করে দিবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার সাওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

সারাবিশ্বে একসাথে রামাযানের সওম শুরু করা

প্রশ্ন ঃ (৩৯৩) মুসলিম জাতির একতার লক্ষ্যে কেউ কেউ চাঁদ দেখার বিষয়টিকে মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। তারা বলে মক্কায় যখন রামাযান মাস শুরু হবে তখন বিশ্বের সবাই সওম পালন করবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ বিষয়টি মহাকাশ গবেষণার দিক থেকে অসম্ভব। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, চন্দ্র উদয়ের স্থান বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ ঐকমত্য। আর এ বিভিন্নতার দাবী হচ্ছে প্রত্যেক এলাকায় ভিন্ন রকম বিধান হবে। এ কথার স্বপক্ষে দলীল– কুরআন হাদীস ও সাধারণ যুক্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন সওম পালন করে"– (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫)। যদি পৃথিবীর শেষ সীমান্তের লোকেরা এ মাসে উপস্থিত না হয়- অর্থাৎ চাঁদ না দেখে- আর মক্কার লোকেরা চাঁদ দেখে, তবে কিভাবে এ আয়াত তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে--যারা কিনা চাঁদই দেখেনি। আর নবী ﷺ বলেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه "তোমরা চাঁদ দেখে সওম পালন কর, চাঁদ দেখে সওম ভঙ্গ কর।"[১] মক্কার অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে তবে পাকিস্তান এবং তার পূর্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের কিভাবে আমরা বাধ্য করতে পারি যে, তারাও সওম পালন করবে? অথচ আমরা জানি যে, তাদের আকাশে চাঁদ দেখা যায়নি। আর নবী ﷺ সিয়ামের বিষয়টি চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন।

যুক্তিগত দলীল হচ্ছে, বিশুদ্ধ ক্বিয়াস যার বিরোধিতা করার অবকাশ নেই। আমরা ভালভাবে অবগত যে, পশ্চিম এলাকার অধিবাসীদের আগেই পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের নিকট ফজর উদিত হয়। এখন পূর্ব এলাকায় ফজর উদিত হলে কি আমরা পশ্চিম এলাকার লোকদের বাধ্য করব একই সাথে খানা-পিনা থেকে বিরত হতে? অথচ তাদের ওখানে এখনও রাতের অনেক অংশ

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সওম অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী যখন তোমরা চাঁদ দেখবে...। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সওম অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখে রামাযানের রোযা রাখা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

বাকী আছে? উত্তর ঃ কখনই না। সূর্য যখন পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের আকাশে অস্তমিত হয়, তখন পশ্চিম এলাকার দিগন্তে তো সূর্য দেখাই যাচ্ছে তাদেরকে কি আমরা ইফতার করতে বাধ্য করব? উত্তর ঃ অবশ্যই না। অতএব চন্দ্রও সম্পূর্ণরূপে সূর্যের মতই। চন্দ্রের হিসাব মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সূর্যের হিসাব দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

"সিয়ামের রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে; তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ। তোমরা যে নিজেদের খিয়ানত করছিলে, আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন। এজন্যে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের (ভার) লাঘব করে দিলেন; অতএব এক্ষণে তোমরা (সিয়ামের রাত্রেও) তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর এবং প্রত্যুষে (রাতের) কালো রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা সওম পূর্ণ কর। তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফ করার সময় (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করবে না; এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না। এভাবে আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর জন্যে তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযত হয়।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৭)

সেই আল্লাহ্ই বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন সওম পালন করে।" অতএব যুক্তি ও দলীলের নিরীখে সওম ও ইফতারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থানের জন্য আলাদা বিধান হবে। যার সম্পর্ক হবে বাহ্যিক আলামত বা চিহ্ন দ্বারা যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এবং নবী ﷺ তাঁর সুন্নাতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে চাঁদ প্রত্যক্ষ করা এবং সূর্য বা ফজর প্রত্যক্ষ করা।

www.pathagar.com

মানুষ যে এলাকায় থাকবে সে এলাকায় চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে সওম ভঙ্গ করবে।

প্রশ্ন ঃ (৩৯৪) সওম পালককারী যদি এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হয়, কিন্তু আগের দেশে ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সে কি এখন সওম ভঙ্গ করবে? উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় দেশে ঈদের চাঁদ এখনও দেখা যায়নি।

উত্তর ঃ কোন মানুষ যদি এক ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অপর ইসলামী রাষ্ট্রে গমন করে আর উক্ত রাষ্ট্রে সওম ভঙ্গের সময় না হয়ে থাকে, তবে সে তাদের সাথে সওম চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না তারা সওম ভঙ্গ করে। কেননা মানুষ যখন সওম পালন করে তখন সওম পালন করতে হবে, মানুষ যখন সওম ভঙ্গ করে তখন সওম ভঙ্গ করতে হবে। মানুষ যেদিন কুরবানীর ঈদ করে সেদিন কুরবানীর ঈদ করবে। যদিও তার একদিন বা দু'দিন বেশী হয়ে যায় তার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন কোন লোক সওম রেখে পশ্চিম দিকের কোন দেশে ভ্রমণ শুরু করল। সেখানে সূর্য অস্ত যেতে দেরী হচ্ছে। তখন সে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবশ্যই দেরী করবে। যদিও সময় সাধারণ দিনের চেয়ে দু'ঘন্টা বা তিন ঘন্টা বা তার চাইতে বেশী হয়।

দ্বিতীয় শহরে সে যখন পৌঁছেছে তখন সেখানে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি। অতএব সে অপেক্ষা করবে। কেননা নবী ﷺ আমাদেরকে চাঁদ না দেখে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ "তোমরা চাঁদ দেখে সওম পালন কর, চাঁদ দেখে সওম ভঙ্গ কর।"[১]

এর বিপরীত কেউ যদি এমন দেশে সফর করে যেখানে নিজের দেশের পূর্বে চাঁদ দেখা গেছে (যেমন কেউ বাংলাদেশ থেকে সঊদী আরব সফর করে) তবে সে ঐ দেশের হিসাব অনুযায়ী সওম ভঙ্গ করবে এবং ঈদের সলাত পড়ে নিবে। আর যে কটা সওম বাকী থাকবে তা রামাযান শেষে কাযা আদায় করে নিবে। চাই একদিন হোক বা দু'দিন। কেননা আরবী মাস ২৯ দিনের কম হবে না বা ৩০ দিনের বেশী হবে না। ২৯ দিন পূর্ণ না হলেও সওম ভঙ্গ করবে এজন্য যে, চাঁদ দেখা গেছে। আর চাঁদ দেখা গেলে তো সওম ভঙ্গ করা আবশ্যক। কিন্তু যেহেতু একটি সওম কম হল তাই রামাযান শেষে তা কাযা করতে হবে। কেননা মাস ২৮ দিনে হয় না।

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ সওম অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী যখন তোমরা চাঁদ দেখবে...। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সওম অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখে রামাযানের রোখা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

কিন্তু পূর্বের মাসআলাটি এর বিপরীত। নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সওম ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা নতুন চাঁদ না উঠা পর্যন্ত রামাযান মাস বহাল। যদিও দু'একদিন বেশী হয়ে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। সেটা এক দিনে কয়েক ঘণ্টা বৃদ্ধি হওয়ার মত। (অতিরিক্ত সওম নফল হিসেবে গণ্য হবে।)

কষ্টকর কঠিন কাজ করার কারণে সওম ভঙ্গ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ (৩৯৫) যে ব্যক্তি কষ্টকর কঠিন কাজ করার কারণে সওম পালন করতে অসুবিধা অনুভব করে তার কি সওম ভঙ্গ করা জায়েয?

উত্তর ঃ আমি যেটা মনে করি, কাজ করার কারণে সওম ভঙ্গ করা জায়েয নয়, বরং হারাম। সওম পালনকালে কাজ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে রামাযান মাসে ছুটি নিয়ে নিবে, অথবা কাজ কমিয়ে দিবে, যাতে করে রামাযানের সওম পালন করা সম্ভব হয়। কেননা রামাযানের সওম ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। যার মধ্যে শিথিলতা করা জায়েয নয়।

ঋতুর দিনগুলোতে ছেড়ে দেয়া সওম কাযা আদায় করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ঃ (৩৯৬) জনৈক বালিকা ছোট বয়সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। সে অজ্ঞতাবশতঃ ঋতুর দিনগুলোতে সওম পালন করেছে। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, ঋতু অবস্থায় যে কয়দিনের সওম আদায় করেছে সেগুলোর কাযা আদায় করা। কেননা ঋতু অবস্থায় সওম পালন করলে বিশুদ্ধ হবে না এবং গ্রহণীয় হবে না। যদিও তা অজ্ঞতাবশতঃ হয়ে থাকে। তাছাড়া পরবর্তীতে যে কোন সময় তা কাযা করা সম্ভব। কাযা আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

এর বিপরীত আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, অল্প বয়সে জনৈক বালিকা ঋতুবতী হয়ে গেছে। কিন্তু লজ্জার কারণে বিষয়টি কারো সামনে প্রকাশ করেনি এবং তার সিয়ামও পালন করেনি। এর উপর ওয়াজিব হচ্ছে, উক্ত মাসের সওম কাযা আদায় করা। কেননা নারী ঋতুবতী হয়ে গেলেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা তার উপর ফরয হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ (৩৯৭) জনৈক ব্যক্তি নিজের জীবিকা এবং পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে রামাযানের সওম পরিত্যাগ করেছে। এর বিধান কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের সওম পরিত্যাগ করে এ যুক্তিতে যে, সে নিজের এবং পরিবারের জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত। সে যদি এ তা'বীল বা ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য এবং তাদের সওম বিশুদ্ধ। এই কারণে তারা যদি জানতে পারত যে আজ রামাযান শুরু হয়েছে, তবে সওম রাখা তাদের জন্য আবশ্যক হত।

❁❁❁

প্রশ্ন ঃ (৩৯৯) রামাযান মাস শুরু হয়েছে কিনা এ সংবাদ না পেয়েই জনৈক ব্যক্তি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে সে সিয়ামের নিয়ত করেনি ফজর হয়ে গেছে। ফজরের সময় সে জানতে পারল, আজ রামাযানের প্রথম দিন। এ অবস্থায় তার করণীয় কি? উক্ত দিনের সওম কি কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ যখন সে জানতে পারবে তখনই সওমের নিয়ত করে ফেলবে এবং সওম পালন করবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এ দিনটির সওম পরে সে কাযা আদায় করবে। তবে ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এতে বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, জানার সাথে নিয়্যাতের সম্পর্ক। এ লোক তো জানতেই পারেনি। অতএব তার ওযর গ্রহণযোগ্য। সে জানতে পারলে রাতে কখনই সিয়ামের নিয়্যাত করা ছাড়তো না। কিন্তু সে তো ছিল অজ্ঞ। আর অজ্ঞ ব্যক্তির ওযর গ্রহণযোগ্য। অতএব জানার পর যদি সওমের নিয়ত করে ফেলে তবে সওম বিশুদ্ধ। তাকে কাযা আদায় করতে হবে না।

অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, তাকে উক্ত দিনের সওম রাখা আবশ্যক এবং তার কাযা আদায় করাও আবশ্যক। এর কারণ হিসেবে বলেন, এ লোকের দিনের একটি অংশ নিয়্যাত ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে। তাই তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

আমি মনে করি, সতর্কতাবশতঃ উক্ত দিনের সওম কাযা করে নেয়াই উচিত।

প্রশ্ন ঃ (৪০০) ওযরবশতঃ কোন ব্যক্তি যদি সওম ভঙ্গ করে আর দিন শেষ হওয়ার আগেই উক্ত ওযর দূর হয়ে যায়। সে কি দিনের বাকী অংশ সওম অবস্থায় কাটাবে?

উত্তর ঃ না, দিনের বাকী অংশ সওম অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। তবে রামাযান শেষে উক্ত দিবসের কাযা তাকে আদায় করতে হবে। কেননা শরীয়ত অনুমোদিত কারণেই সে সওম ভঙ্গ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ অসুস্থ ব্যক্তির অপারগতার কারণে শরীয়ত তাকে ঔষুধ সেবনের অনুমতি দিয়েছে। ঔষুধ সেবন করা মানেই সওম ভঙ্গ। অতএব পূর্ণ এ দিনটির সওম তার উপর আবশ্যক নয়। দিনের বাকী অংশ সওম অবস্থায় থাকার আবশ্যকতায় শরীয়ত সম্মত কোন ফায়েদা নেই। যেখানে কোন উপকার নেই তা আবশ্যক করাও চলে না।

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ ঃ জনৈক ব্যক্তি দেখল একজন লোক পানিতে ডুবে যাচ্ছে। সে বলছে আমি যদি পানি পান করি তবে এ ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারব। পানি পান না করলে তাকে বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় সে পানি পান করবে এবং তাকে পানিতে ডুবা থেকে উদ্ধার করবে। অতঃপর দিনের অবশিষ্ট অংশ খানা-পিনা করবে। এ দিনের সম্মান তার জন্য আর নেই। কেননা শরীয়তের দাবী অনুযায়ীই সওম ভঙ্গ করা তার জন্য বৈধ হয়েছে। তাই দিনের বাকী অংশ সওম রাখা আবশ্যক নয়।

যদি কোন লোক অসুস্থ থাকে তাকে কি আমরা বলব, ক্ষুধার্ত না হলে খানা খাবে না? পিপাসিত না হলে পানি পান করবে না? অর্থাৎ- প্রয়োজন না হলে খানা-পিনা করবে না? না, এরূপ বলব না। কেননা এ লোককে তো সওম ভঙ্গের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব শরঈ দলীলের ভিত্তিতে রামাযানের সওম ভঙ্গকারী প্রত্যেক ব্যক্তি দিনের অবশিষ্ট অংশ সওম অবস্থায় অতিবাহিত করা আবশ্যক নয়।

এর বিপরীত মাসআলায় বিপরীত সমাধান। অর্থাৎ- বিনা ওযরে যদি সওম ভঙ্গ করে তবে তাকে দিনের অবশিষ্ট অংশ সওম অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা সওম ভঙ্গ করা তার জন্য বৈধ ছিল না। শরীয়তের অনুমতি ছাড়াই সে এ দিনের সম্মান নষ্ট করেছে। অতএব দিনের বাকী অংশ সওম পালন করা যেমন আবশ্যক তেমনি কাযা আদায় করাও জরুরী।

প্রশ্ন ঃ (৪০১) জনৈক মহিলা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ডাক্তারগণ তাকে সওম রাখতে নিষেধ করেছে। এর বিধান কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"রামাযান হচ্ছে সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের সওম রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য কঠিন কামনা করেন না।"

(সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫)

www.pathagar.com

মানুষ যদি এমন রোগে আক্রান্ত হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার কোন আশা নেই। তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। খাদ্য দেয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, মিসকীনকে পরিমাণমত চাউল প্রদান করা এবং সাথে মাংস ইত্যাদি তরকারী হিসেবে দেয়া উত্তম। অথবা দুপুরে বা রাতে তাকে একবার খাইয়ে দিবে। এটা হচ্ছে ঐ রুগীর ক্ষেত্রে যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই। আর এ নারী এ ধরনের রোগে আক্রান্ত। তাই আবশ্যক হচ্ছে সে প্রতিদিনের জন্য একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে।

প্রশ্ন ঃ (৪০২) কখন এবং কিভাবে মুসাফির সলাত ও সওম আদায় করবে?

উত্তর ঃ মুসাফির নিজ শহর থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত দু' দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ.

"সর্বপ্রথম যে সলাত ফরয করা হয়েছিল তা হচ্ছে দু' রাক'আত করে। সফরের সলাতকে ঐভাবেই রাখা হয়েছে এবং গৃহে অবস্থানের সময় সলাতকে পূর্ণ (চার রাক'আত) করা হয়েছে।"

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "গৃহে অবস্থানের সময় সলাত বৃদ্ধি করা হয়েছে।"[১] আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রাওয়ানা হলাম। তিনি মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত দু' দু' রাক'আত করে সলাত আদায় করলেন।

কিন্তু মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের সাথে সলাত আদায় করে তবে পূর্ণ চার রাক'আতই পড়বে। চাই সলাতের প্রথম থেকে ইমামের সাথে থাক বা পরে এসে অংশ নিক। কেননা নবী ﷺ-এর সাধারণ বাণী এ কথার দলীল।

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"যখন সলাতের ইকামাত প্রদান করা হয় তখন হেঁটে হেঁটে ধীর-স্থির এবং প্রশান্তির সাথে সলাতের দিকে আগমন করবে। তাড়াহুড়া করবে না।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত কসর করা, অনুচ্ছেদ ঃ নিজ এলাকা থেকে বের হলে সলাত কসর করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত এবং কসর করা, অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সলাত এবং কসর করা।

www.pathagar.com

অতঃপর সলাতের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (সালামের পরে) পূর্ণ করে নিবে।"[১]

এ হাদীসটি স্থানীয় ইমামের পিছনে সলাত আদায়কারী মুসাফিরদেরও শামিল করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এটা কি কথা মুসাফির একাকী সলাত পড়লে দু' রাক'আত পড়বে আর স্থানীয় ইমামের পিছনে পড়লে চার রাক'আত পড়বে? তিনি বললেন, [এটা সুন্নাত]।

মুসাফিরের জন্য জামা'আতের সাথে সলাত রহিত নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾

"আর যখন আপনি তাদের সাথে থাকেন আর তাদেরকে (জামা'আতের সাথে) সলাত পড়ান, তবে তা এভাবে হবে যে, তাদের মধ্যে থেকে একদল আপনার সাথে সলাতে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখবে। অনন্তর যখন তারা সাজদা করবে (এক রাক'আত পূর্ণ করবে), তখন তারা আপনাদের পিছনে চলে যাবে এবং অন্য দল যারা এখনও সলাত পড়েনি তারা আসবে এবং আপনার সাথে সলাত (অবশিষ্ট এক রাক'আত) পড়ে নিবে।" (সূরা নিসা ঃ ১০২)

অতএব মুসাফির যদি নিজ শহর ছেড়ে অন্য শহরে অবস্থান করে, তবে আযান শুনলেই মাসজিদে জামা'আতের সলাতে উপস্থিত হবে। তবে যদি মাসজিদ থেকে বেশী দূরে থাকে বা সফর সঙ্গীদের ক্ষতির আশংকা করে তবে মাসজিদে না গেলেও চলবে। কেননা সাধারণ দলীলসমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, আযান বা ইক্বামাত শুনলেই জামা'আতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।

নফল বা সুন্নাত সলাতের ক্ষেত্রে মুসাফির যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নাত ছাড়া সব ধরনের নফল ও সুন্নাত আদায় করবে। রাতের নফল (তাহাজ্জুদ), বিতর, ফজরের সুন্নাত, চাশত, তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, সফর থেকে ফেরত এসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ ধীরস্থিরভাবে মাসজিদে আগমন করা।

www.pathagar.com

দু'সলাত একত্রিত করার বিধান হচ্ছে ঃ সফর যদি চলমান থাকে তবে উত্তম হচ্ছে দু'সলাতকে একত্রিত করা। যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একত্রিত আদায় করবে। প্রথম সলাতের সময়ই দু'সলাত একত্রিত আদায় করবে অথবা দ্বিতীয় সলাতের সময় দু'সলাতকে একত্রিত করবে। যেভাবে তার জন্য সুবিধা হয় সেভাবে করবে।

কিন্তু সফরে গিয়ে কোন জায়গায় যদি অবস্থান করে তবে উত্তম হচ্ছে দু'সলাতকে একত্রিত না করা। একত্রিত করলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা উভয়টিই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে।

সিয়ামের ক্ষেত্রে মুসাফিরের জন্য উত্তম হচ্ছে সওম পালন করা। সওম ভঙ্গ করলেও কোন অসুবিধা নেই। পরে উক্ত দিনগুলোর কাযা আদায় করে নিবে। তবে সওম ভঙ্গ করা যদি বেশী আরামদায়ক হয় তাহলে সওম ভঙ্গ করাই উত্তম। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যে ছাঁড় (সুবিধা) দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তিনি পসন্দ করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

প্রশ্ন ঃ (৪০৩) সফর অবস্থায় কষ্ট হলে সওম রাখার বিধান কি?

উত্তর ঃ সফর অবস্থায় যদি এমন কষ্ট হয় যা সহ্য করা সম্ভব, তবে সে সময় সওম রাখা মাকরূহ। কেননা একদা সফরে নবী ﷺ দেখলেন জনৈক ব্যক্তির পাশে লোকজন ভীড় করছে এবং তাকে ছায়া করছে। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে? তারা বলল, লোকটি সওম পালনকারী। তখন তিনি বললেন, لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ "সফর অবস্থায় সওম পালন করা কোন পুণ্যের কাজ নয়।"[১]

কিন্তু সফরে সওম রাখা যদি অধিক কষ্টদায়ক হয় তবে ওয়াজিব হচ্ছে সওম ভঙ্গ করা। কেননা সফর অবস্থায় লোকেরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল যে তাদের কষ্ট হচ্ছে তখন তিনি সওম ভঙ্গ করলেন। অতঃপর বলা হল, কিছু লোক এখনও সওম রেখেছে। তিনি বললেন, أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ "ওরা নাফরমান, ওরা নাফরমান।"[২]

---

[১] . বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ কঠিন গরমে যাকে ছায়া দেয়া হচ্ছিল তার সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বাণী ঃ "সফর অবস্থায় সওম পালন করা কোন পুণ্যের কাজ নয়।" মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পাপের সফর না হলে রামাযানে মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

[২] . মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পাপের সফর না হলে রামাযানে মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

www.pathagar.com

কিন্তু সওম রাখতে যার কোন কষ্ট হবে না, তার জন্য উত্তম হচ্ছে নবী ﷺ-এর অনুসরণ করে সওম পালন করা। কেননা সফর অবস্থায় তিনি সওম রাখতেন। আবূদ্ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةَ.

"একদা রামাযান মাসে কঠিন গরমের সময় আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ছাড়া আর কেউ সওম রাখেননি।"[১]

প্রশ্ন ঃ (৪০৪) আধুনিক যুগের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ও আরামদায়ক হওয়ার কারণে সফর অবস্থায় সওম রাখা মুসাফিরের জন্য কষ্টকর নয়। এ অবস্থায় সওম রাখার বিধান কি?

উত্তর ঃ মুসাফির সওম রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫)

সাহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ-এর সাথে সফরে থাকলে কেউ সওম রাখতেন কেউ সওম ভঙ্গ করতেন। কোন সওম ভঙ্গকারী অপর সওম পালনকারীকে দোষারোপ করতেন না, এবং সওম পালনকারীও সওম ভঙ্গকারীকে দোষারোপ করতেন না। নবী ﷺও সফর অবস্থায় সওম রেখেছেন। আবূদ্ দারদা (রাঃ) বলেন, "একদা রামাযান মাসে কঠিন গরমের সময় আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ছাড়া আর কেউ সওম রাখেনি।"[২]

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ নং ৩৫। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সফরে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা ইচ্ছাধীন।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ নং ৩৫। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সফরে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা ইচ্ছাধীন।

www.pathagar.com

মুসাফিরের জন্য মূলনীতি হচ্ছে, সে সওম রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। কিন্তু কষ্ট না হলে সওম রাখাই উত্তম। কেননা এতে তিনটি উপকারীতা রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ -এর অনুসরণ।

দ্বিতীয়তঃ সওম রাখতে সহজতা। কেননা সমস্ত মানুষ যখন সওম রাখে তখন সবার সাথে সওম রাখা অনেক সহজ।

তৃতীয়তঃ দ্রুত নিজেকে দায়মুক্ত করা।

কিন্তু কষ্টকর হলে সওম রাখবে না। এ অবস্থায় সওম রাখা পুণ্যেরও কাজ নয়। কেননা এক সফরে নবী দেখলেন জনৈক ব্যক্তির পাশে লোকজন ভীড় করছে এবং তাকে ছায়া দিচ্ছে। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে? তারা বলল, লোকটি সওম পালনকারী। তখন তিনি বললেন, لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ "সফর অবস্থায় সওম পালন করা কোন পুণ্যের কাজ নয়।"[১]

এ ভিত্তিতে আমরা বলব, বর্তমান যুগে সাধারণতঃ সফরে তেমন কোন কষ্ট হয় না। তাই সওম পালন করাই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ (৪০৫) সওম অবস্থায় মুসাফির যদি মক্কায় পৌছে। তবে উমরা আদায় করতে শক্তি পাওয়ার জন্য সওম ভঙ্গ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ নবী মক্কা বিজয়ের সময় রামাযান মাসের বিশ তারিখে মক্কায় প্রবেশ করেন। সে সময় তিনি সওম ভঙ্গ অবস্থায় ছিলেন। সেখানে দু' দু' রাক'আত করে সলাত কসর আদায় করেছেন। আর মক্কাবাসীদের বলেছেন, "হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা সলাত পূর্ণ করে নাও। কেননা আমরা মুসাফির।"[২] সহীহুল বুখারীতে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে, তিনি মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো সওম ভঙ্গ অবস্থাতেই অতিবাহিত করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন মুসাফির।

তাই উমরাকারী মক্কা পৌছলেই তার সফর শেষ হয়ে যায় না। যদি সওম ভঙ্গ অবস্থায় মক্কা পৌছে থাকে, তবে দিনের বাকী অংশ পানাহার ত্যাগ করা আবশ্যক নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে যেহেতু সফর আরামদায়ক তাই সওম

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ কঠিন গরমে যাকে ছায়া দেয়া হচ্ছিল তার সম্পর্কে নবী -এর বাণী ঃ "সফর অবস্থায় সওম পালন করা কোন পুণ্যের কাজ নয়।" মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পাপের সফর না হলে রামাযান মাসে মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

[২], বুখারী, অধ্যায় ঃ মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ।

www.pathagar.com

রাখাও তেমন কষ্টকর নয়। সেহেতু কেউ যদি সওম রেখে মক্কায় পৌঁছে অত্যধিক ক্লান্তি অনুভব করে, তখন চিন্তা করে আমি কি সওম পূর্ণ করে ইফতারের পর উমরার কাজ শুরু করবো? নাকি সওম ভঙ্গ করব এবং সর্বপ্রথম উমরা আদায় করে নিব?

এ অবস্থায় আমরা তাকে বলব, আপনার জন্য উত্তম হচ্ছে, সুস্থাবস্থায় উমরা পালন করার জন্য সওম ভঙ্গ করা। কেননা হাজ্জ-উমরা আদায়কারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, উক্ত উদ্দেশে মক্কা আগমন করলে, সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই হাজ্জ-উমরার কাজে আত্মনিয়োগ করা। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় মক্কা আগমন করলে দ্রুত মাসজিদে হারামে গমন করতেন। এমনকি আরোহীকে মাসজিদের নিকটবর্তী স্থানে বসাতেন।

অতএব উমরাকারীর জন্য উত্তম হচ্ছে, দিনের বেলায় কর্মশক্তি পাওয়ার উদ্দেশে সওম ভঙ্গ করে উমরা পালন করা। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করা।

সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের জন্য যখন সফরে ছিলেন এবং তিনি সওম অবস্থায় ছিলেন, তখন কতিপয় লোক এসে অভিযোগ করল, সওম রাখতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি কি করছেন এটা দেখার অপেক্ষায় আছে তারা। তখন সময়টি ছিল আসরের পর। নবী ﷺ পানি চাইলেন এবং পান করলেন। লোকেরা সবাই দেখল।[১] অতএব নবী ﷺ সফর অবস্থায় দিনের শেষ প্রহরে সওম ভঙ্গ করলেন। এ কাজ যে জায়েয, এ কথা প্রমাণ করার উদ্দেশে তিনি এরূপ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সফরে কষ্ট স্বীকার করে কিছু লোক যে সওম পালন করতেই থাকে নিঃসন্দেহে তা সুন্নাহ্ বিরোধী কাজ। তার ব্যাপারেই নবী ﷺ বলেছেন ঃ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ "সফর অবস্থায় সওম পালন করা কোন পুণ্যের কাজ নয়।"[২]

প্রশ্ন ঃ (৪০৬) সন্তানকে দুগ্ধদানকারিণী কি সওম ভঙ্গ করতে পারবে? ভঙ্গ করলে কিভাবে কাযা আদায় করবে? নাকি সওমের বিনিময়ে খাদ্য দান করবে?

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পাপের সফর না হলে রামাযান মাসে মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ কঠিন গরমে যাকে ছায়া দেয়া হচ্ছিল তার সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বাণী ঃ "সফর অবস্থায় সওম পালন করা কোন পুণ্যের কাজ নয়।" মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পাপের সফর না হলে রামাযান মাসে মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বাধা।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ দুগ্ধদানকারিণী সওম রাখার কারণে যদি সন্তানের জীবনের আশংকা করে- অর্থাৎ সওম রাখলে স্তনে দুধ কমে যাবে ফলে শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে মায়ের সওম ভঙ্গ করা জায়েয। কিন্তু পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করে নিবে। কেননা এ অবস্থায় সে অসুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ।

যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫)

অতএব সওম রাখার ব্যাপারে যখনই বাধা দূর হবে তখনই কাযা আদায় করবে। চাই তা শীতকালে অপেক্ষাকৃত ছোট দিনে হোক অথবা সম্ভব না হলে পরবর্তী বছর হোক। কিন্তু ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ মিসকীন খাওয়ানো জায়েয হবে না। তবে ওযর যদি চলমান থাকে অর্থাৎ সার্বক্ষণিক সওম রাখায় বাধা দেখা যায় যা বাধা দূর হওয়ার সম্ভবনা না থাকে, তখন প্রতিটি সওমের বদলে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াবে।

প্রশ্ন ঃ (৪০৭) কঠিন ক্ষুধা ও পিপাসায় অতিরিক্ত ক্লান্তির সাথে যদি সওম পালনকারী দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে, তবে সওমের বিশুদ্ধতায় কি এর কোন প্রভাব পড়বে?

উত্তর ঃ সওমের বিশুদ্ধতায় এর কোন প্রভাব পড়বে না। বরং এতে অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "তোমার ক্লান্তি ও কষ্ট অনুযায়ী তুমি সাওয়াব পাবে।"[১] অতএব আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের ক্লান্তি যত বেশী হবে ততই তার প্রতিদান বেশী হবে। তবে সওমের ক্লান্তি দূর করার জন্য মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা বা ঠাণ্ডা শীতল স্থানে আরাম গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ (৪০৮) রামাযানের প্রত্যেক দিনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কি নিয়্যাত করা আবশ্যক? নাকি পূর্ণ মাসের নিয়্যাত একবার করে নিলেই হবে?

উত্তর ঃ রামাযানের প্রথমে পূর্ণ মাসের জন্য একবার নিয়্যাত করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা সওম পালনকারী যদি প্রতিদিনের জন্য রাতে নিয়্যাত না করে, তবে তা রামাযানের প্রথমের নিয়্যাতের শামিল হয়ে তার সওম বিশুদ্ধ

---

[১] . বুখারী, অধ্যায় ঃ উমরাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ক্লান্তি অনুযায়ী উমরার সাওয়াব। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ নিফাস বিশিষ্ট নারীদের ইহরাম করা।

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। কিন্তু সফর, অসুস্থতা প্রভৃতি দ্বারা যদি মাসের মধ্যখানে বিচ্ছিন্নতা আসে, তবে নতুন করে আবার নিয়্যাত আবশ্যক। কেননা মাসের প্রথমে সে যে সিয়ামের নিয়ত করেছিল তা সফর বা অসুস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভঙ্গ করে ফেলেছে।

প্রশ্ন ঃ (৪০৯) খানা-পিনা গ্রহণ না করে সওম ভঙ্গের জন্য অন্তরে দৃঢ় নিয়ত করলেই কি সওমকারীর সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সওম হচ্ছে নিয়্যাত এবং পরিত্যাগের সমষ্টির নাম। অর্থাৎ- সওম বিনষ্টকারী যাবতীয় বস্তু পরিত্যাগ করে সওম পালনকারী সওমের দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের নিয়্যাত করবে। কিন্তু সত্যিই যদি এটাকে সে ভঙ্গ করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলে তবে তার সওম বাত্বিল হয়ে যাবে। আর এটা রামাযান মাসে হলে দিনের অবশিষ্ট অংশ তাকে পানাহার ছাড়াই কাটাতে হবে। কেননা বিনা ওযরে যে ব্যক্তি রামাযানে সওম ভঙ্গ করবে তাকে যেমন দিনের বাকী অংশ সওম অবস্থাতেই কাটাতে হবে, অনুরূপভাবে তার কাযাও আদায় করতে হবে।

কিন্তু যদি দৃঢ় সংকল্প না করে বরং দ্বিধা-দ্বন্দে থাকে, তবে তার ব্যাপারে বিদ্বানদের মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ বলেছেন, তার সওম বাত্বিল হয়ে যাবে। কেননা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দৃঢ়তার বিপরীত।

কেউ বলেছেন, বাত্বিল হবে না। কেননা আসল হচ্ছে, নিয়্যাতের দৃঢ়তা অবশিষ্ট থাকা, যে পর্যন্ত তা আরেকটি দৃঢ়তা দ্বারা বিচ্ছিন্ন না করবে। আমার দৃষ্টিতে এ মতই বিশুদ্ধ। (আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (৪১০) ভুলক্রমে পানাহার করলে তার সিয়ামের বিধান কি? কেউ এটা দেখলে তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ রামাযানের সওম রেখে কেউ যদি ভুলক্রমে খানা-পিনা করে তবে তার সওম বিশুদ্ধ। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বিরত হওয়া ওয়াজিব। এমনকি খাদ্য বা পানীয় যদি মুখের মধ্যে থাকে এবং স্মরণ হয়, তবে তা ফেলে দেয়া ওয়াজিব। সওম বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল হচ্ছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস।

তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি সওম রেখে ভুলক্রমে পানাহার করে, সে যেন তার সওম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্ই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।"[১] তাছাড়া ভুলক্রমে নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৬)

হাদীসে আছে এ দু'আর জবাবে আল্লাহ বলেন, আমি তাই করলাম।[২]

কেউ যদি দেখতে পায় যে ভুলক্রমে কোন মানুষ খানা-পিনা করছে, তবে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, তাকে বাধা দেয়া এবং সিয়ামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। কেননা এটা গর্হিত কাজে বাধা দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। নবী ﷺ বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ হতে দেখবে, সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে, যদি সম্ভব না হয় তবে যবান দ্বারা বাধা দিবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা তা ঘৃণা করবে।"[৩]

সন্দেহ নেই সওম রেখে খানা-পিনা করা একটি গর্হিত কাজ। কিন্তু ভুলক্রমে হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা দেখবে তার জন্য তাতে বাধা না দেয়ার কোন ওযর থাকতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ (৪১১) সওম রেখে সুরমা ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর ঃ সওমকারীর জন্য সুরমা ব্যবহার করায় কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে চোখে বা কানে ঔষুধ (ড্রপ) ব্যবহার করতেও কোন অসুবিধা নেই, যদিও এতে গলায় ড্রপের স্বাদ অনুভব করে। এতে সওম ভঙ্গ হবে না। কেননা এটা খাদ্য বা পানীয় নয় বা খানা-পিনার বিকল্প হিসেবেও ব্যবহৃত নয়। এ

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে পানাহার করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে পানাহার করলে সওম ভঙ্গ হবে না।

[২] সহীহ বুখারী।

[৩]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ গর্হিত কাজে বাধা দেয়া ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

কথার দলীল হচ্ছে, সিয়ামের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা তা হচ্ছে খানা-পিনা করা। সুতরাং যা খানা-পিনার অন্তর্ভুক্ত নয় তা এ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে গণ্য হবে না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। আর এটাই বিশুদ্ধ মত।

কিন্তু যদি নাকে ড্রপ ব্যবহার করে এবং তা পেটে পৌঁছে, তবে সওম ভঙ্গ হবে- যদি সওম ভঙ্গের উদ্দেশ্য করে থাকে। কেননা নবী ﷺ বলেন,

وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

"সওম অবস্থায় না থাকলে ওযূর ক্ষেত্রে নাকে অতিরিক্ত পানি নিবে।"[১]

প্রশ্নঃ (৪১২) সওম অবস্থায় মিসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে দিনের প্রথম ভাগে যেমন শেষ ভাগেও তেমন মিসওয়াক করা সুন্নাত। কেননা নবী ﷺ বলেন,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা ও প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।"[২]

তিনি আরো বলেন,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.

"আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে আমি প্রত্যেক সলাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৩]

অনুরূপভাবে আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করাও পালনকারীর জন্য জায়েয। চাই তা দিনের প্রথম ভাগে হোক বা শেষ ভাগে। চাই উক্ত সুগন্ধি ভাপ হোক বা তৈল জাতীয় বা সেন্ট প্রভৃতি হোক। তবে ভাপের সুগন্ধি নাকে টেনে নেয়া জায়েয নয়। কেননা ধোঁয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুভবযোগ্য কিছু অংশ আছে যা নাক দ্বারা গ্রহণ করলে নাকের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে পেটে পৌঁছায়।[৪]

---

[১]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ নাক ঝাড়া, ১৪২। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা। নাসায়ী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ নাকে পানি নেয়ায় বাড়াবাড়ি করা। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা।

[২]. বুখারী মুআল্লাক সনদে, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পালনকারীর কাঁচা ও শুকনা মেসওয়াক ব্যবহার করা।

[৩]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পালনকারীর কাঁচা ও শুকনা মেসওয়াক ব্যবহার করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ মেসওয়াক করা।

[৪]. ধুমপানের ক্ষেত্রে যেহেতু ধুঁয়াটাই নাকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এজন্য তা দ্বারা সওম ভঙ্গ হবে। অবশ্য ধুমপান মূলতঃ হারাম কাজ। যা থেকে বেঁচে থাকা মুসলমান তো অবশ্যই প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এজন্য নবী ﷺ লাক্বীত বিন সাবুরা (রাঃ)-কে বলেছেন, بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "সওম অবস্থায় না থাকলে ওযূর ক্ষেত্রে নাকে অতিরিক্ত পানি নিবে।"[১]

প্রশ্ন ঃ (৪১৩) সওম ভঙ্গকারী বিষয় কি কি?

উত্তর ঃ সওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

ক) স্ত্রী সহবাস।

খ) খাদ্য গ্রহণ।

গ) পানীয় গ্রহণ।

ঘ) উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত করা।

ঙ) খানা-পিনার অন্তর্ভূক্ত এমন কিছু গ্রহণ করা। যেমন সেলাইন ইত্যাদি।

চ) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা।

ছ) শিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করা।

জ) হায়েয বা নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর দলীল নিম্নরূপঃ

সহবাস ও খান-পিনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"অতএব এক্ষণে তোমরা (সওমের রাত্রেও) তাদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর। এবং প্রত্যুষে (রাতের) কাল রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা সওম পূর্ণ কর।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৭)

উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত সওম ভঙ্গের কারণ। দলীল, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা সওমকারীর উদ্দেশ্যে বলেন, "সে খানা-পিনা ও

[১]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ নাক ঝাড়া, ১৪২। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা।

www.pathagar.com

উত্তেজনা পরিত্যাগ করে আমারই কারণে।"[১] উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত করার ক্ষেত্রে নবী ﷺ বলেন,

﴿وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا﴾

"স্ত্রী সঙ্গমেও তোমাদের জন্য সাদকার সওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের একজন তার উত্তেজনার চাহিদা মেটাবে, আর এতে ছওয়াবের হকদার হবে এটা কেমন কথা? তিনি জবাবে বললেনঃ তোমরা কি মনে কর, সে যদি এই কাজ কোন হারাম স্থানে করত তবে পাপের অধিকারী হত না? তেমনি হালাল স্থানে ব্যবহার করার কারণে অবশ্যই সে পুরস্কারের অধিকারী হবে।"[২] আর উত্তেজনার চাহিদা মেটানোর মাধ্যম হচ্ছে স্ববেগে বীর্য নির্গত হওয়া। এজন্য বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, মযী[৩] বের হলে সওম বিনষ্ট হবে না, যদিও তা উত্তেজনা, চুম্বন ও স্পর্শ করার কারণে হয়।

খানা-পিনার অন্তর্ভূক্ত এমন কিছু গ্রহণ করা সওম ভঙ্গের কারণ। যেমন, খানা-পিনার অভাব পূর্ণ করবে এ রকম সেলাইন গ্রহণ করা। কেননা এটা যদিও সরাসরি খানা-পিনা নয় কিন্তু এটা খানা-পিনার কাজ করে এবং তার প্রয়োজন মেটায়। একারণেই তো এটা দ্বারা শরীরের গঠন প্রকৃতি ঠিক থাকে, খানা-পিনার অভাব অনুভব করে না।

কিন্তু খানা-পিনার কাজ করে না এ রকম ইন্‌জেকশন গ্রহণ করলে সওম ভঙ্গ হবে না। চাই তা রগের মধ্যে প্রদান করা হোক বা পেশীতে বা শরীরের যে কোন স্থানে।

ইচ্ছাকৃত বমি করা। অর্থাৎ- বমির মাধ্যমে পেটের মধ্যে যা আছে তা মুখ দিয়ে বাইরে বের করা। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,

﴿مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ﴾

---

১. ইবনু মাজাহ্‌, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সিয়ামের ফযীলত।

২. মুসলিম, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক সৎকাজকে সাদকা বলা হয় তার বর্ণনা।

৩. মযীঃ, স্ত্রী শৃঙ্গার করার কারণে বা যে কোন ভাবে উত্তেজিত হলে লিঙ্গের আগায় যে আঠালো পানি বের হয় তাকে আরবীতে মযী বলা হয়। এতে ওযূ আবশ্যক হয় গোসল নয়।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে সে যেন সওম কাযা আদায় করে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত যার বমি হয় তার কোন কাযা নেই।"[১] এর কারণ হচ্ছে, মানুষ বমি করলে তার পেট খাদ্যশুন্য হয়ে যায়। তখন তার এই শুন্যতা পূরণের প্রয়োজন পড়ে। এ কারণে আমরা বলব, সওম ফরয হলে কোন মানুষের বমি করা জায়েয নয়। কেননা বমি করলে তার ফরয সওম বিনষ্ট হয়ে যাবে। তবে অসুস্থতার কারণে অনিচ্ছাকৃত বমি হলে সওম নষ্ট হবে না। কিন্তু অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সওম ভঙ্গ করা আবশ্যক হলে তো ভিন্ন কথা।

শিঙ্গা লাগানো। অর্থাৎ শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত বের করা। নবী ﷺ বলেন, أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগায় ও যার শিঙ্গা লাগানো হয় উভয়ের সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে।"[২]

হায়েয বা নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া। নবী ﷺ নারীদের সম্পর্কে বলেন, أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ "সে কি এমন নয় যে, ঋতুবতী হলে সলাত পড়বে না ও সওম রাখবে না।"[৩]

উল্লেখিত বিষয়গুলো নিম্ন লিখিত তিনটি শর্তের ভিত্তিতে সওম ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য হবেঃ

১) জ্ঞান থাকা ২) স্মরণ থাকা। ৩) ইচ্ছাকৃতভাবে করা।

প্রথম শর্তঃ জ্ঞান থাকা। অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অথবা সিয়ামের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা।

যদি শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে তার সওম বিশুদ্ধ হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারা- ২৮৬) আল্লাহ বলেন, আমি তাই করলাম।

---

[১]. আবু দাউদ, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাকৃত বমি করা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাকৃত বমি করার বর্ণনা।

[২]. বুখারী সনদ বিহীন মুআল্লাক বর্ণনা করেন। অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পালনকারীর শিঙ্গা লাগানো ও বমি করা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পালনকারীর শিঙ্গা লাগানো ঠিক না।

[৩]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতীর সওম পালন না করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ নেক কাজ কম হলে ঈমানও কমে যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহ্যাব-৫)

সুন্নাহ্ থেকে সিয়ামের ক্ষেত্রে বিশেষ দলীল হচ্ছে, সহীহ হাদীসে আ'দী বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি সওম রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে উট বাঁধার দু'টো রশী বালিশের নীচে রেখে দিলেন। একটি কালো রঙের অন্যটির রং সাদা। এরপর খানা-পিনা করতে থাকলেন। যখন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সাদা ও কালো রশী চিনতে পারলেন তখন খানা-পিনা বন্ধ করলেন। সকালে নবী ﷺএর দরবারে গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি তাকে বললেন, কুরআনের আয়াতে সাদা ও কালো সুতা বলতে আমাদের পরিচিত সূতা বা রশী উদ্দেশ্য নয়। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাদা সুতা বলতে দিনের শ্রভ্রতা (সুবহে সাদেক বা ফজর হওয়া) আর কালো সূতা বলতে রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য। কিন্তু নবী ﷺ তাকে সওম কাযা আদায় করার আদেশ করেন নি।[১] কেননা বিষয়টি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অজ্ঞ। ভেবেছিলেন এটাই আয়াতের অর্থ।

আর সিয়ামের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও তার সওম বিশুদ্ধ। দলীলঃ সহীহুল বুখারীতে আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা একদা নবী ﷺ এর যুগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে ইফতার করে নিয়েছিলাম। তার কিছুক্ষণ পর আবার সূর্য দেখা গিয়েছে।" কিন্তু নবী ﷺ তাদেরকে উক্ত সিয়ামের কাযা আদায় করার আদেশ করেন নি। কেননা কাযা আদায় করা ওয়াজিব হলে তিনি অবশ্যই সে আদেশ প্রদান করতেন। আর সে আদেশ থাকলে আমাদের কাছেও তার বর্ণনা পৌঁছতো। কেননা আল্লাহ্ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "নিশ্চয় আমি যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি আর আমিই তার সংরক্ষণকারী।" (সূরা হিজ্‌র- ৯) অতএব প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যখন এক্ষেত্রে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তাই বুঝা যায় যে, তিনি তাদেরকে এর কাযা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন নি। অতএব অজ্ঞতা বশতঃ দিন থাকতেই পানাহার করে ফেললে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। জানার সাথে সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকবে এবং দিনের বাকী অংশ সওম অবস্থায় অতিবাহিত করবে।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী, 'প্রত্যুষে (রাতের) কালো রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর।' মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ফজর উদিত হলেই সওম শুরু হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে কোন লোক যদি খানা-পিনা করে এই ভেবে যে এখনও রাত আছে- ফজর হয়নি। কিন্তু পরে জানলো যে সে ফজর হওয়ার পরই পানাহার করেছে, তবে তার সওম বিশুদ্ধ হবে। তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা সে ছিল অজ্ঞ।

দ্বিতীয় শর্তঃ স্মরণ থাকা। অর্থাৎ সে যে সওম রেখেছে এ কথা ভুলে না যাওয়া। অতএব সওম রেখে ভুলক্রমে কোন মানুষ যদি খানা-পিনা করে ফেলে, তবে তার সওম বিশুদ্ধ এবং তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (রা বাক্বারা- ২৮৬)

আল্লাহ বলেন, আমি তাই করলাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

﴿مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ﴾

"যে ব্যক্তি সওম রেখে ভুলক্রমে পানাহার করে, সে যেন তার সওম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্ই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।"[১]

তৃতীয় শর্তঃ ইচ্ছাকৃত করা। অর্থাৎ- সওম পালনকারী নিজ ইচ্ছায় উক্ত সওম ভঙ্গের কাজে লিপ্ত হবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে হলে তার সওম বিশুদ্ধ হবে চাই তাকে জোর জবরদস্তী করা হোক বা না হোক। কেননা বাধ্য করে কুফরীকারীকে আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যার উপর জবরদস্তী করা হয়েছে এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।" সূরা নাহাল- ১০৬)

বাধ্য অবস্থায় কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পাপ যদি ক্ষমা করা হয়; তবে তার নিম্ন পর্যায়ের পাপে বাধ্য হয়ে লিপ্ত হলে ক্ষমা হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে পানাহার করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে পানাহার করলে সওম ভঙ্গ হবে না।

www.pathagar.com

তাছাড়া হাদীসে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল ক্রমে করে ফেলা এবং আবশ্যিক বিষয় করতে ভুলে যাওয়া ও বাধ্য অবস্থায় করে ফেলা পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।”[১]

যার ভিত্তিতে কারো নাকে যদি ধুলা ঢুকে পড়ে এবং তার স্বাদ গলায় পৌঁছে ও পেটের ভিতর প্রবেশ করে, তবে তার সওম ভঙ্গ হবে না। কেননা সে এটার ইচ্ছা করেনি।

অনুরূপভাবে কাউকে যদি ইফতার করতে জবরদস্তি করা হয় আর সে বাধ্য হয়ে ইফতার করে ফেলে, তবে তার সওম বিশুদ্ধ। কেননা সে অনিচ্ছাকৃতভাবে একাজ করেছে।

এমনিভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হলে, তার সিয়ামও বিশুদ্ধ। কেননা সে ছিল ঘুমন্ত, ইচ্ছাও ছিল না তার একাজে। কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে তার সাথে সহবাস করতে বাধ্য করে এবং স্ত্রী বাধ্যগত হয়ে সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে তার (স্ত্রীর) সওম বিশুদ্ধ। কেননা একাজে তার কোন এখতিয়ার ছিল না।

একটি মাসআলা ঃ খুবই সতর্ক থাকা উচিত। কোন মানুষ যদি রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে নিম্ন লিখিত পাঁচটি বিধান তার ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবেঃ

১) সে গুনাহগার হবে। ২) দিনের বাকী অংশ তাকে সওম অবস্থায় কাটাতে হবে। ৩) তার উক্ত সওম বিনষ্ট হবে। ৪) তাকে কাযা আদায় করতে হবে। ৫) কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

সহবাসে লিপ্ত হলে কি ধরনের কাফ্ফারা দিতে হবে এ সম্পর্কে জানা থাক বা নাজানা থাক কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি রামাযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হল- সওমও তার উপর ফরয-[২] কিন্তু তার এই জ্ঞান নেই যে, একাজ করলে তাকে এত কাফ্ফারা দিতে হবে, তবুও তার উপর উল্লেখিত বিধান সমূহ প্রজোয্য হবে। কেননা সে ইচ্ছাকৃতভাবে সওম ভঙ্গ করেছে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে সওম ভঙ্গের কাজে লিপ্ত হলে, তার উপর যাবতীয় বিধান প্রজোয্য হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি

---

১. ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ভুল ক্রমে এবং বাধ্য করে তালাক।

২. অর্থাৎ- রোযা ভঙ্গের বৈধ কোন কারণ তার সামনে নেই। যেমন সে সফরেও নয়, অসুস্থও নয়।

www.pathagar.com

বললেন, "কিসে তোমাকে ধ্বংস করল?" সে বলল, রামাযানের সওম রেখে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। তখন নবী ﷺ তাকে কাফ্ফারা আদায় করার আদেশ করলেন।[1] অথচ লোকটি জানতো না যে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে কি হবে না।

আমরা বলেছি, তার উপর সওম ফরয। অর্থাৎ- সে মুসাফির নয় নিজ গৃহে মুক্বীম হিসেবে অবস্থান করছে। যদি সফরে থেকে কোন ব্যক্তি সওম ভঙ্গ করে এবং স্ত্রী সহবাস করে তবে কাফ্ফারা দিতে হবেনা। কেননা সফর অবস্থায় সওম রাখা ফরয নয়। সওম ভঙ্গ করা ও রাখার ব্যাপারে সে স্বাধীন। তবে ভঙ্গ করলে পরে কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪১৪) সওম অবস্থায় শ্বাসকষ্টের কারণে স্প্রে (nabulijer) **ব্যবহার করার বিধান কি? এ দ্বারা কি সওম ভঙ্গ হবে?**

উত্তর ঃ এই স্প্রে নাকে প্রবেশ করে কিন্তু পেট পর্যন্ত পৌঁছে না। তাই সওম রেখে এটা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। এতে সওম ভঙ্গও হবে না। কেননা এটা এমন বস্তু যা উড়ে বেড়ায় নাকে প্রবেশ করে এবং বিলীন হয়ে যায়, এর অংশ বিশেষ পেটের মধ্যে প্রবেশ করে না। তাই এদ্বারা সওম ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪১৫) বমি করলে কি সওম ভঙ্গ হবে?

উত্তর ঃ কোন লোক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে তার সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে সওম ভঙ্গ হবেনা। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

﴿مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করবে সে যেন সওম কাযা আদায় করে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত যার বমি হয় তার কোন কাযা নেই।"[2]

কিন্তু বমি যদি আপনাকে পরাজিত করে ফেলে- বমি বের হয়েই যায়, তবে সওম ভঙ্গ হবেনা। মানুষ যদি পেটের মধ্যে খিচুনী অনুভব করে, মনে হয় যেন ভিতর থেকে সব কিছু বের হয়ে আসবে, তখন তাতে বাধা দিবেনা। সাধারণভাবে থাকার চেষ্টা করবে। ইচ্ছা করে কোন কিছু বের করার চেষ্টা করবে না। নিজে নিজে বের হয়ে আসলে কোন ক্ষতি হবেনা এবং সওমও নষ্ট হবেনা।

---

[1] বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে..। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পালনকারীর রামাযানের দিনে স্ত্রী সহবাস কঠোরভাবে হারাম।

[2]. আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করার বর্ণনা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪১৬) সওম পালনকারীর দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হলে কি সওম নষ্ট হবে?

উত্তর ঃ দাঁত থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে সওমের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু সাধ্যানুযায়ী রক্ত গিলে নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। অনুরূপভাবে নাক থেকে রক্ত বের হলেও সওম নষ্ট হবে না। কিন্তু রক্ত ভিতরে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। নাক বা দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়া সওম ভঙ্গের কারণ নয়। অতএব কাযা আদায় করার প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন ঃ (৪১৭) ঋতুবতী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে, তবে তার সওমের বিধান কি?

উত্তর ঃ ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়েছে এব্যাপারে নিশ্চিত হলে, তার সওম বিশুদ্ধ হবে। কেননা নারীদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, ধারণা করে যে পবিত্র হয়ে গেছে অথচ সে আসলে পবিত্র হয়নি। এই কারণে নারীরা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসতেন তাদের লজ্জাস্থানে তুলা লাগিয়ে উক্ত তুলার চিহ্ন দেখানোর জন্য যে, তারা কি পবিত্র হয়েছেন? তখন তিনি বলতেন, لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ 'তোমরা তাড়াহুড়া করবে না যতক্ষণ না তোমরা কাছ্ছা বাইযা (বা সাদা পানি) না দেখ।' অতএব নারী অবশ্যই ধীরস্থীরতার সাথে লক্ষ্য করবে এবং নিশ্চিত হবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে কিনা। যদি পবিত্র হয়ে যায় তবে সিয়ামের নিয়ত করে নিবে। ফজর হওয়ার পর গোসল করবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সলাতের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত গোসল সেরে নেয়ার চেষ্টা করবে, যাতে করে সময়ের মধ্যেই ফজর সলাত আদায় সম্ভব হয়।

আমরা শুনতে পাই অনেক নারী ফজরের পূর্বে বা পরে ঋতু থেকে পবিত্র হয়, কিন্তু তারা গোসল করতে দেরী করে সলাতের সময় পার করে দেয়। পরিপূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার যুক্তিতে সূর্য উঠার পর গোসল করে। কিন্তু এটা মারাত্মক ধরনের ভুল। চাই তা রামাযান মাসে হোক বা অন্য মাসে। কেননা তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সময়মত সলাত আদায় করার জন্য দ্রুত গোসল সেরে নেয়া। সলাতের স্বার্থে গোসলের ওয়াজিব কাজগুলো সারলেই যথেষ্ট হবে। তারপর দিনের বেলায় আবারো যদি পরিপূর্ণরূপে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করে, তবে কি অসুবিধা আছে?

ঋতুবতী নারীর মত অন্যান্য নাপাক ব্যক্তিগণ (যেমন স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্ন দোষের কারণে নাপাক) নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামের নিয়ত করতে পারবে। এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে সলাত আদায় করবে। কেননা নবী ﷺ কখনো কখনো স্ত্রী সহবাসের কারণে নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামের নিয়ত

www.pathagar.com

করতেন এবং ফজর হওয়ার পর সলাতের আগে গোসল করতেন।[১] (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্ন ঃ (৪১৮) সওম অবস্থায় দাঁত উঠানোর বিধান কি?

উত্তর ঃ সাধারণ দাঁত বা মাড়ির দাঁত উঠানোতে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাতে সওম ভঙ্গ হবে না। কেননা এতে শিঙ্গা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে না। তাই সওমও ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪১৯) সওম রেখে রক্ত পরীক্ষা (Blood test) **করার জন্য রক্ত প্রদান করার বিধান কি? এতে কি সওম নষ্ট হবে।**

উত্তর ঃ ব্লাড টেষ্ট করার জন্য রক্ত বের করলে সওম ভঙ্গ হবে না। কেননা ডাক্তার অসুস্থ ব্যক্তির চেক আপ করার জন্য রক্ত নেয়ার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু এই রক্ত নেয়া অল্প হওয়ার কারণে শিঙ্গা লাগানোর মত এর কোন প্রভাব শরীরে দেখা যায় না, তাই এতে সওম ভঙ্গ হবেনা। আসল হচ্ছে সওম ভঙ্গ না হওয়া- যতক্ষণ পর্যন্ত সওম ভঙ্গের জন্য শরীয়ত সম্মত দলীল না পাওয়া যাবে। আর সামান্য রক্ত বের হলে সওম ভঙ্গ হবে এখানে এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না।

কিন্তু মানুষের শরীরে রক্ত প্রবেশ করার জন্য বেশী পরিমাণে রক্ত প্রদান করা সওম ভঙ্গের অন্যতম কারণ। কেননা এর মাধ্যমে শিঙ্গা লাগানোর মত শরীরে প্রভাব পড়ে। অতএব সওম যদি ওয়াজিব হয় তবে সওম রেখে দিনের বেলায় এভাবে বেশী পরিমাণে রক্ত দান করা জায়েয নয়। তবে রোগীর অবস্থা যদি আশংকা জনক হয়, মাগরিব পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে এবং ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত যে, এই সওম পালনকারীর রক্তই শুধু তার উপকারে আসবে ও রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভবপর হতে পারে, তবে এই অবস্থায় রক্ত দান করতে কোন অসুবিধা নেই। রক্ত প্রদানের মাধ্যমে সওম ভঙ্গ করে পানাহার করবে। অতঃপর এই সওমের কাযা আদায় করবে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্ন ঃ (৪২০) সওম পালনকারীর হস্ত মৈথুন করলে কি সওম ভঙ্গ হবে? তাকে কি কোন কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ সওম পালনকারী হস্ত মৈথুন করে যদি বীর্যপাত করে তবে তার সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। দিনের বাকী অংশ তাকে সওম অবস্থায় কাটাতে হবে। এ

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ পালনকারীর গোসল করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে গেলেও সওম বিশুদ্ধ হবে।

www.pathagar.com

অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করতে হবে এবং উক্ত দিনের সওম কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে না। কেননা কাফ্‌ফারা শুধুমাত্র সহবাসের মাধ্যমে সওম ভঙ্গ করলে আবশ্যক হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪২১) পালনকারীর জন্য আতর-সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়ার বিধান কি?

উত্তর ঃ পালনকারীর আতর-সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। চাই তৈল জাতীয় হোক বা ধোঁয়া জাতীয়। তবে ধোঁয়ার সুঘ্রাণ নাকের কাছে নিয়ে শুঁকবে না। কেননা এতে একজাতীয় পদার্থ আছে যা পেট পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন পানি বা তদানুরূপ বস্তু। কিন্তু সাধারণ ভাবে তার সুঘ্রাণ নাকে ঢুকলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (৪২২) নাকে ভাপ টানা এবং চোখে বা নাকে ড্রপ দেয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নাকে ধোঁয়া টানা নিজ ইচ্ছায় হয়ে থাকে। যাতে করে ধোঁয়ার কিছু অংশ পেটে প্রবেশ করে, তাই এতে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ড্রপ ব্যবহার করে তা পেটে পৌঁছানোর ইচ্ছা করা হয় না; বরং এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে নাকে বা চোখে শুধু ড্রপ ব্যবহার করা।

প্রশ্ন ঃ (৪২৩) পালনকারীর নাকে, কানে ও চোখে ড্রপ ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নাকের ড্রপ যদি নাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে তবে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা লাক্বীত বিন সাবুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ তাঁকে বলেন, وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "সওম অবস্থায় না থাকলে ওযূর ক্ষেত্রে নাকে অতিরিক্ত পানি নিবে।"[১] অতএব পেটে পৌঁছে এ রকম করে পালনকারীর নাকে ড্রপ ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু পেটে না পৌঁছলে কোন অসুবিধা নেই।

চোখে ড্রপ ব্যবহার করা সুরমা ব্যবহার করার ন্যায়। এতে সওম নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে কানে ড্রপ ব্যবহারেও সওম বিনষ্ট হবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কোন দলীল নেই। এবং যে সব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এগুলো তারও অন্তর্ভূক্ত নয়। চোখ বা কান দ্বারা পানাহার করা যায় না। এগুলো শরীরের অন্যান্য চামড়ার লোমকুপের মত।

---

[১]. আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ নাক ঝাড়া, ১৪২। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা। নাসায়ী, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ নাকে পানি নেয়ায় বাড়াবাড়ি করা। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা।

www.pathagar.com

বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন, কোন লোকের পায়ের তলায় যদি তরল কোন পদার্থ লাগানো হয় এবং এর স্বাদ গলায় অনুভব করে, তবে সওমের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা তা খানা-পিনা গ্রহনের স্থান নয়। অতএব সুরমা ব্যবহার করলে, চোখে বা কানে ড্রপ ব্যবহার করলে সওম নষ্ট হবে না- যদিও এগুলো ব্যবহার করলে গলায় এর স্বাদ অনুভব করে।

অনুরূপভাবে চিকিৎসার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যদি কেউ তৈল ব্যবহার করে, তাতেও সওমের কোন ক্ষতি হবে না।

এমনিভাবে শ্বাস কষ্ট দূর করার জন্য যদি মুখে পাইপ লাগিয়ে অক্সিজেনের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে চলমান করা হয়, এবং তা পেটে পৌঁছে, তাতেও সওমের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা তা পানাহার অন্তর্ভূক্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ (৪২৪) সওম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি সওম বিশুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তার সওম বিশুদ্ধ হবে। কেননা স্বপ্নদোষ সওম বিনষ্ট করে না। স্বপ্নদোষ তো মানুষের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। আর নিদ্রা অবস্থায় সংঘটিত বিষয় থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি সতর্কতাঃ বর্তমান যুগে অনেক মানুষ রামাযানের রাতে জেগে থাকে। কখনো আজেবাজে কর্ম এবং কথায় রাত কাটিয়ে দেয়। তারপর গভীর নিদ্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। বরং মানুষের উচিত হচ্ছে, সওমের সময়টাকে যিক্‌র, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি আনুগত্যপূর্ণ ও আল্লাহর নৈকট্যদানকারী কাজে অতিবাহিত করা।

প্রশ্ন ঃ (৪২৫) পালনকারীর ঠান্ডা ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ঠান্ডা-শীতল বস্তু অনুসন্ধান করা সওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য জায়েয, কোন অসুবিধা নেই। রাসূল ﷺ সওম রেখে গরমের কারণে বা তৃষ্ণার কারণে মাথায় পানি ঢালতেন।[১] ইবনু ওমর (রাঃ) রোযা রেখে গরমের প্রচন্ডতা অথবা পিপাসা হ্রাস করার জন্য শরীরে কাপড় ভিজিয়ে রাখতেন। কাপড়ের এই সিক্ততার কোন প্রভাব নেই। কেননা তা এমন পানি নয়, যা নাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

প্রশ্ন ঃ (৪২৬) সওম পালনকারী কুলি করা বা নাকে পানি নেয়ার কারণে যদি পেটে পৌঁছে যায়, তবে কি তার সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ সওম পালনকারী কুলি করা বা নাকে পানি নেয়ার কারণে যদি অনিচ্ছাকৃত পানি পেটে পৌঁছে যায়, তবে তার সওম ভঙ্গ হবে না। কেননা এতে তার কোন ইচ্ছা ছিল না।

---

১. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ তৃষ্ণায় পালনকারীর মাথায় পানি ঢালা।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাব-৫)

প্রশ্ন ঃ (৪২৭) পালনকারীর আতরের সুঘ্রাণ ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ৪২১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

প্রশ্ন ঃ (৪২৮) নাক থেকে রক্ত বের হলে কি সওম নষ্ট হবে?

উত্তর ঃ নাক থেকে রক্ত বের হলে সওম নষ্ট হবে না- যদিও বেশী পরিমাণে বের হয়। কেননা এখানে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা থাকে না।

প্রশ্ন ঃ (৪২৯) রামাযানের কোন কোন ক্যালেন্ডারে দেখা যায় সাহুরের জন্য শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে একটি এবং তার প্রায় দশ/পনের মিনিট পর ফজরের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সুন্নাতে কি এর পক্ষে কোন দলীল আছে নাকি এটা বিদআত?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে এটা বিদআত। সুন্নাতে নববীতে এর কোন প্রমাণ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত কিতাবে বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"এবং প্রত্যুষে (রাতের) কাল রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৭)

নবী ﷺ বলেন,

﴿أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ﴾

"নিশ্চয় বেলাল রাত থাকতে আযান দেয়, তখন তোমরা খাও ও পান কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শোন। কেননা ফজর উদিত না হলে সে আযান দেয় না।"[১] ফজর না হতেই খানা-পিনা বন্ধ করার জন্য লোকেরা সময় নির্ধারণ করে যে ক্যালেন্ডার তৈরী করেছে তা নিঃসন্দেহে

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর বাণী তোমাদেরকে যেন বাধা না দেয়...। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ফজর হলেই সওম শুরু হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরযের উপর বাড়াবাড়ী। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের মাঝে অতিরঞ্জন। নবী ﷺ বলেন,

﴿ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ﴾

"অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক। অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক। অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক।"[১]

প্রশ্ন ঃ (৪৩০) এয়ারপোর্টে থাকাবস্থায় সূর্য অস্ত গেছে মুআয্‌যিন আযান দিয়েছে, ইফতারও করে নিয়েছে। কিন্তু বিমানে চড়ে উপরে গিয়ে সূর্য দেখতে পেল। এখন কি পনাহার বন্ধ করতে হবে?

উত্তর ঃ খানা-পিনা বন্ধ করা অনাবশ্যক। কেননা, জমিনে থাকাবস্থায় ইফতারের সময় হয়ে গেছে সূর্যও ডুবে গেছে। সুতরাং ইফতার করতে বাধা কোথায়?

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন,

﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ﴾

"এদিক থেকে যখন রাত আগমন করবে এবং ঐদিক থেকে দিন শেষ হয়ে যাবে ও সূর্য অস্ত যাবে, তখন সওম পালনকারী ইফতার করে ফেলবে।"[২]

অতএব এয়ারপোর্টের জমিনে থাকাবস্থায় যখন সূর্য ডুবে গেছে, তখন তার দিনও শেষ হয়ে গেছে তাই সে শরীয়তের দলীল মোতাবেক ইফতারও করে নিয়েছে। সুতরাং শরীয়তের দলীল ব্যতীরেকে আবার তাকে পানাহার বন্ধ করার আদেশ দেয়া যাবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৩১) পালনকারীর কফ অথবা থুথু গিলে ফেলার বিধান কি?

উত্তর ঃ কফ বা শ্লেষা যদি মুখে এসে একত্রিত না হয় গলা থেকেই ভিতরে চলে যায় তবে তার সওম নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি গিলে ফেলে তবে সে ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দু'টি মত রয়েছেঃ

১ম মতঃ তার সওম নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তা পানাহারের পর্যায়ভুক্ত।

২য় মতঃ সওম নষ্ট হবে না। কেননা তা মুখের সাধারণ থুথুর অন্তর্গত। মুখের মধ্যে সাধারণ পানি যাকে থুথু বলা হয় তা দ্বারা সওম নষ্ট হয় না। এমনকি যদি থুথু মুখের মধ্যে একত্রিত করে গিলে ফেলে তাতেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

আমরা জানি আলিমগণ মতবিরোধ করলে তার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ্‌ থেকে খুঁজতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাতে সুস্পষ্ট কোন উক্তি নেই। এ

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ইলম, অনুচ্ছেদ ঃ "অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক।"

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সফরে রোযা রাখা ও সওম ভঙ্গ করা।

www.pathagar.com

বিষয়ে যখন সন্দেহ হয়ে গেল, তার ইবাদাতটি নষ্ট হয়ে গেল না নষ্ট হল না। তখন আমাদেরকে মূলের দিকে ফিরে যেতে হবে। মূল হচ্ছে দলীল ছাড়া ইবাদাত বিনষ্ট না হওয়া। অতএব কফ গিলে নিলে সওম নষ্ট হবে না।

মোটকথা কফ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবে। তা গলার নীচে থেকে মুখে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে না। কিন্তু মুখে এসে পড়লে বাইরে ফেলে দিবে। চাই সওম পালনকারী হোক বা না হোক। কিন্তু গিলে ফেললে সওম নষ্ট হবে এর জন্য দলীল দরকার।

প্রশ্ন ঃ (৪৩২) খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করলে কি সওম নষ্ট হবে?

উত্তর ঃ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে যদি তা গিলে না ফেলে, তবে সওম নষ্ট হবে না। কিন্তু একান্ত দরকার না পড়লে এরূপ করা উচিত নয়। এ অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত যদি পেটে ঢুকে পড়ে তবে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৩৩) রামাযানের সওম রেখে হারাম বা অশ্লীল কথাবার্তা উচ্চারণ করলে কি সওম নষ্ট হবে?

উত্তর ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করলেই জানতে পারি সওম ফরয হওয়ার হিকমত কি? আর তা হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন করা ও আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সওম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৩) তাক্বওয়া হচ্ছে হারাম কাজ পরিত্যাগ করা। ব্যাপক অর্থে তাক্বওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিষয় বাস্ত াবায়ন করা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। নবী ﷺ বলেন,

﴿مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ﴾

"যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যা অভ্যাস ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।"[১] অতএব এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, সওম পালনকারী যাবতীয় ওয়াজিব বিষয়

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সওম রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তার কারবার পরিত্যাগ করে না। হাদীসটির বাক্য ইবনু মাজাহ্ থেকে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন করবে এবং সবধরনের হারাম থেকে দূরে থাকবে। মানুষের গীবত করবে না, মিথা বলবে না, চুগলখোরী করবে না, হারাম বেচা-কেনা করবে না, ধোঁকাবাজী করবে না। মোটকথা চরিত্র ধ্বংসকারী অন্যায় ও অশ্লীলতা বলতে যা বুঝায় সকল প্রকার হারাম থেকে বিরত থাকবে। আর একমাস এভাবে চলতে পারলে বছরের অবশিষ্ট সময় সঠিক পথে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

কিন্তু আফসোসের বিষয় অধিকাংশ সওম পালনকারী রামাযানের সাথে অন্য মাসের কোন পার্থক্য করে না। অভ্যাস অনুযায়ী ফরয কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করে, হালাল-হারামে কোন পার্থক্য নেই। গর্হিত ও অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত থাকে। মিথ্যা, ধোঁকাবাজী প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাকে দেখলে বুঝা যাবে না তার মধ্যে সিয়ামের মর্যাদার কোন মূল্য আছে। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় সিয়ামকে ভঙ্গ করে দিবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার সওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৩৪) মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়ার বিধান কি? এটা কি সওম নষ্ট করে?

উত্তর ঃ মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়া অন্যতম কাবীরা গুনাহ্। আর তা হচ্ছে না জেনে কোন বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া অথবা জেনে শুনে বাস্তবতার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করা। এতে সওম বিনষ্ট হবে না। কিন্তু সিয়ামের সওয়াব কমিয়ে দিবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৩৫) সিয়ামের আদব কি কি?

উত্তর ঃ সিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে, আল্লাহ্ভীতি অর্জন করা তথা আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা।

কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সওম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৩)

নবী ﷺ বলেন,

﴿مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ﴾

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যা কাজ-কারবার ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।"[১]

সিয়ামের আরো আদব হচ্ছে, বেশী বেশী দান-খায়রাত করা, নেককাজ, জনকল্যাণ মূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। রামাযান মাসে যখন জিবরীল (আঃ) তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন, তখন তিনি আরো বেশী দান করতেন।[২]

আরো আদব হচ্ছে, আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। যাবতীয় মিথ্যাচার, গালিগালাজ, ধোকা, খিয়ানত, হারাম অশ্লীল বস্তু দেখা বা শোনা প্রভৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা প্রতিটি মানুষের উপর ওয়াজিব। বিশেষ করে পালনকারীর জন্য তো অবশ্যই।

সওমের আদব হচ্ছে, সাহুর খাওয়া। এবং তা দেরী করে খাওয়া। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً "তোমরা সাহুর খাও। কেননা সাহুরে রয়েছে বরকত।"[৩]

সিয়ামের আদব হচ্ছে, দ্রুত ইফতার করা। সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিত হলে বা অস্ত যাওয়ার অনুমান প্রবল হলেই সাথে সাথে দেরী না করে ইফতার করা। কেননা নবী ﷺ বলেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "মানুষ কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে।"[৪]

ইফতারের আদব হচ্ছে, কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, সম্ভব না হলে যে কোন খেজুর দ্বারা। খেজুর না পেলে পানি দ্বারাই ইফতার করবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৩৬) ইফতারের জন্য কোন দু'আ কি প্রমাণিত আছে? সওম পালনকারী কি মুআয্যিনের জবাব দিবে নাকি ইফতার চালিয়ে যাবে?

উত্তর ঃ দু'আ কবূল হওয়ার অন্যতম সময় হচ্ছে ইফতারের সময়। কেননা সময়টি হচ্ছে ইবাদাতের শেষ মূহূর্ত। তাছাড়া মানুষ সাধারণতঃ ইফতারের সময় অধিক দুর্বল হয়ে পড়ে। আর মানুষ যত দুর্বল হয় তার অন্তর তত নরম ও

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সওম রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তার কারবার পরিত্যাগ করে না। হাদীসটির বাক্য ইবনু মাজাহ্ থেকে নেয়া হয়েছে।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ রামাযানে সর্বাধিক দানশীল হতেন।

[৩]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সাহুরের বরকত। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সাহুরের ফযীলত।

[৪]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত ইফতার করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সাহুরের ফযীলত।

www.pathagar.com

বিনয়ী হয়। তখন দু'আ করলে মনোযোগ আসে বেশী এবং আল্লাহ্‌র দিকে অন্তর ধাবিত হয়।

ইফতারের সময় দু'আ হচ্ছেঃ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ "হে আল্লাহ আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।"[১]

নবী ﷺ ইফতারের সময় এই দু'আ পাঠ করতেনঃ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ "তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা তরতাজা হয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো প্রতিদান সুনিশ্চিত হয়েছে।"[২] হাদীস দু'টিতে যদিও দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিদ্বান উহাকে হাসান বলেছেন। মোটকথা এগুলো দু'আ বা অন্য কোন দু'আ পাঠ করবে। ইফতারের সময় হচ্ছে দু'আ কবূল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূহুর্ত। কেননা হাদীসে এরশাদ হয়েছে নবী ﷺ বলেন, إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ "সওম পালনকারীর ইফতারের সময়কার দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।"[৩]

আর ইফতারের সময় মুআয্যিনের জবাব দেয়া শরীয়ত সম্মত। কেননা নবী ﷺ বলেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ "মুআয্যিনের আযান শুনলে তার জবাবে সে যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বল।"[৪] এ হাদীসটি প্রত্যেক অবস্থাকে শামিল করে। তবে দলীলের ভিত্তিতে কোন অবস্থা ব্যতীক্রম হলে ভিন্ন কথা।

প্রশ্ন ঃ (৪৩৭) কারো সওম কাযা থাকলে তার জন্য শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখার বিধান কি?

উত্তর ঃ নবী ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

---

[১]. আবূ দাঊদ, অনুচ্ছেদ ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ইফতারের দু'আ। তবে এই দু'আটির সনদ (সূত্র) দুর্বল তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। (দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৬-৩৯ পৃঃ যঈফ আবূ দাউদ, আলবানী)

[২]. আবূ দাঊদ, অনুচ্ছেদ ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ইফতারের দু'আ। (এ হাদীসটি সহীহ, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হাঃ ৯২০)

[৩]. [হাদীস সহীহ] ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ সওম হাঃ ১৭৪৩, ১৭৫৩।

[৪]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ আযান শুনলে কি বলতে হয়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ মুআয্যিনের অনুরূপ জবাব দেয়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি রামাযানের সওম রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সওম রাখবে, সে সারা বছর সওম রাখার প্রতিদান লাভ করবে।"[১] কোন মানুষের যদি সওম কাযা থাকে আর সে শাওয়ালের ছয়টি সওম রাখে, সে কি রামাযানের পূর্বে সওম রাখল না রামাযানের পর।

উদাহরণঃ জনৈক লোক রামাযানের ২৪টি সওম রাখল। বাকী রইল ছয়টি। এখন সে যদি কাযা আদায় না করেই শাওয়ালের ছয়টি সওম রাখে, তাকে কি বলা যাবে সে রামাযানের সওম পূর্ণ করার পর শাওয়ালের ছয়টি সওম রাখল? কেননা সে তো রামাযানের সওম পূর্ণই করেনি। অতএব রমযানের সওম কাযা থাকলে শাওয়ালের ছয় সওমের প্রতিদান তার জন্য প্রমাণিত হবে না।

অবশ্য আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, কারো রোযা কাযা থাকলে তার জন্য নফল রোযা জায়েয কি না? কিন্তু আমাদের এই মাসআলাটি এই মতবিরোধের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা শাওয়ালের ছয়টি সওম রামাযানের সাথে সম্পর্কিত। যে ব্যক্তি রামাযানের সওম পূর্ণ করেনি তার জন্য উক্ত ছয় সওমের সওয়াব সাব্যস্ত হবেনা।

প্রশ্ন ঃ (৪৩৮) জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি রামাযানে সওম কাযা করেছে। কিন্তু পরবর্তী মাস শুরু হওয়ার চারদিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। তার পক্ষ থেকে কি কাযা রোযাগুলো আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ তার এই অসুখ যদি চলতেই থাকে সুস্থ না হয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করে তবে তার পক্ষ থেকে কাযা আদায় করতে হবেনা।

কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৫)

অতএব অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সুস্থ হলেই কাযা রোযাগুলো দ্রুত আদায় করে নেয়া।

কিন্তু সওম রাখতে সমর্থ হওয়ার পূর্বেই যদি মৃত্যু বরণ করে, তবে সওমের আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে তো এমন কোন সময় পায়নি যাতে সে রোযাগুলো কাযা আদায় করতে পারে। যেমন একজন লোক রামাযান আসার পূর্বেই শাবানে মৃত্যু বরণ করল। অতএব রামাযানের সওম রাখা তার

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু অসুস্থতা যদি এমন হয় যা সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তবে তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৩৯) জনৈক ব্যক্তির রামাযানের একটি সওম বাকী ছিল। তার কাযা না করেই পরবর্তী রামাযান এসে যায়। সে এখন কি করবে?

উত্তর ঃ এ কথা সবার জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৫)

অতএব এ লোকটি যখন শরীয়ত সম্মত দলীলের ভিত্তিতে সওম ভঙ্গ করেছে, তখন আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে তা কাযা আদায় করা উচিত। পরবর্তী রামাযান আসার পূর্বেই তা কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমার রামাযানের কিছু সওম বাকী রয়ে যেত। কিন্তু শাবান মাস না আসলে আমি তা কাযা আদায় করতে পারতাম না।'[১] আর তার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর সাথে তাঁর ব্যস্ততা। সুতরাং আয়েশা (রাঃ)এর উক্ত বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তী রামাযান আসার পূর্বে তা অবশ্যই কাযা আদায় করতে হবে।

কিন্তু সে যদি পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত দেরী করে এবং রোযাটি রয়েই যায়, তবে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ্র কাছে তওবা ইস্তেগফার করা, এই শীথিলতার জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়া এবং যত দ্রুত সম্ভব তা কাযা আদায় করে নেয়া। কেননা দেরী করলে কাযা আদায় করার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায় না।

প্রশ্ন ঃ (৪৪০) শাওয়ালের ছয়টি সওম পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ শাওয়ালের ছয়টি সওম পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, ঈদের পর পরই তা আদায় করা এবং পরস্পর আদায় করা। বিদ্বানগণ এভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে রামাযানের পওে পরেই বাস্তবায়ন হয়। হাদীসে বলা হয়েছে "যে ব্যক্তি রামাযানের অনুসরণ করে শাওয়ালের ছয়টি সওম রাখে..।" তাছাড়া এতে নেক কাজ সম্পাদনে তাড়াহুড়া করা হল, যে

---

[১] . বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ কাযা সওম কখন আদায় করবে।

www.pathagar.com

ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া এতে বান্দার দৃঢ়তার প্রমাণ রয়েছে। দৃঢ়তা মানুষের পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সচেতন বান্দা সুযোগ হাতছাড়া করে না। কেননা মানুষ জানে না পরবর্তীতে কি তার জন্য অপেক্ষা করছে। অতএব বান্দা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইলে তাকে প্রতিটি নেক কর্মের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৪১) শাওয়ালের ছয়টি সওম রাখার জন্য কি ইচ্ছামত দিন নির্ধারণ করা জায়েয? নাকি তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা আছে? এ দিনগুলো সওম রাখলে কি তা ফরযের মত হয়ে যাবে এবং প্রতি বছর আবশ্যিকভাবে সওম পালন করতে হবে?

উত্তর ঃ নবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে তিনি বলেন,

﴿مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ﴾

"যে ব্যক্তি রামাযানের সওম রাখার পর শওয়াল মাসে ছয়টি সওম রাখবে, সে সারা বছর সওম রাখার প্রতিদান লাভ করবে।"[১] এ ছয়টি সওমের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা নেই। মাসের যে কোন সময় রোযাগুলো রাখা যায়। চাই মাসের প্রথম দিকে হোক বা মধ্যখানে বা শেষের দিকে। লাগাতার হোক বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হোক- সবই জায়েয। বিষয়টি প্রশস্ত আল্ হামদুল্লিাহ্। তবে রামাযান শেষ হওয়ার পর পরই মাসের প্রথম দিকে দ্রুত করে নেয়া বেশী উত্তম। কেননা এতে নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা হল, যা কাম্য।

কোন বছর এ সওম পালন করবে কোন বছর করবে না তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ সওম নফল ফরয নয়।

প্রশ্ন ঃ (৪৪২) আশুরা সিয়ামের বিধান কি?

উত্তর ঃ নবী ﷺ হিজরত করে মদীনা আগমন করে দেখেন ইহুদীরা মুহার্‌রামের দশ তারিখে সওম পালন করছে। নবীজি ﷺ বললেন,

فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه

"আমরা মূসার অনুসরণ করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে অধিক হকদার। তিনি নিজে সে দিনের সওম রাখলেন এবং সাহাবীদেরকেও নির্দেশ দিলেন।"[২] বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনু আব্বাসের হাদীসে বলা হয়েছে, নবী

---

[১] . মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব।

[২] . বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ আশুরার রোযা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ আশুরার রোযা।

www.pathagar.com

ﷺ আশুরা দিবসে সওম রেখেছেন এবং সাহাবীদেরকে সওম রাখার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সওমের ফযীলত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে, নবী ﷺ বলেন, أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ "আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি তিনি বিগত এক বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।"[১] কিন্তু ইহুদীদের বিরোধিতা করার জন্য তিনি এর একদিন পূর্বে ৯ তারিখ অথবা এক দিন পরে ১১ তারিখ সওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং আশুরার সওমের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, মুহার্‌রমের দশ তারিখের সাথে ৯ তারিখ অথবা ১১ তারিখের সওম রাখা। অবশ্য ১১ তারিখের চেয়ে ৯ তারিখ সওম রাখা অধিক উত্তম।

প্রশ্ন ঃ (৪৪৩) শাবান মাসে সওম রাখার বিধান কি?

উত্তর ঃ শাবান মাসে সওম রাখা এবং অধিক হারে রাখা সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ "শাবান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় আমি নবী ﷺকে এত বেশী সওম রাখতে দেখিনি।"[২] এ হাদীস অনুযায়ী শাবান মাসে অধিকহারে সওম রাখা উচিত।

বিদ্বানগণ বলেন, শাবান মাসে সওম রাখা সুন্নাতে মুআক্কাদা সলাতের অনুরূপ। এই সওম যেন রামাযান মাসের ভূমিকা। অর্থাৎ রামাযানের পূর্বের সুন্নাত রোযা। অনুরূপভাবে শাওয়ালের সওম রামাযানের পরের সুন্নাত স্বরূপ। যেমন ফরয সলাতের আগে ও পরে সুন্নাত রয়েছে।

তাছাড়া শাবান মাসে সওমের উপকারিতা হচ্ছে, নিজেকে রামাযানের সওম রাখার ব্যাপারে প্রস্তুত করা, রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। যাতে করে ফরয সওম রাখা তার জন্য সহজসাধ্য হয়।[৩]

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক মাসে তিনটি এবং আরাফার দিবসে রোযা রাখা মুস্ত াহাব।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ শাবানের রোযা।

৩. কিন্তু নির্দিষ্ট আকারে শুধুমাত্র মধ্য শাবানে অর্থাৎ ১৫ তারিখে রোযা রাখা বিদআত। আমাদের দেশে এটাকে শবে বরাতের রোযা বলা হয়। কেননা এর ভিত্তি সহীহ সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত নয়। ইবনু মাজার বর্ণনায় বলা হয়ঃ "মধ্য শাবান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদাত করবে ও দিনে রোযা পালন করবে..।" এ হাদীসটি জাল। কেননা এর সনদে ইবনু আবী সাবরাহ্ নামক জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছে। সে হাদীস জাল করত। (আহকামু রজব ওয়া শাবান।)

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪৪৪) কোন লোকের যদি অভ্যাস থাকে নফল সওম একদিন রাখা একদিন ছাড়া। কিন্তু তার সওমের দিন শুক্রবার পড়ে গেল। তার জন্য উক্ত দিন সওম রাখা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কোন মানুষ যদি এক দিন পর পর সওম রাখার অভ্যাস করে থাকে এবং তার সওমের দিন শুক্রবার হয় বা শনিবার বা রোববার হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। তবে সে দিন যেন এমন না হয় যখন সওম রাখা হারাম। যেমন দু'ঈদের দিন, আইয়্যামে তাশরীকের দিন (কুরবানী ঈদের পরের তিন দিনকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়)। তখন সওম পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। নারীদের ক্ষেত্রে ঋতু বা নেফাসের দিনগুলো সওম রাখা হারাম।

প্রশ্ন ঃ (৪৪৫) বিসাল সওম বা অবিচ্ছিন্ন সওম কাকে বলে? এটা কি শরীয়ত সম্মত?

উত্তর ঃ সওমে বিসাল বা অবিচ্ছিন্ন সওম হচ্ছে, ইফতার না করে দু'দিন একাধারে রোযা রাখা। নবী ﷺ এ রকম সওম রাখতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, কেউ যদি অবিচ্ছিন্ন করতে চায়, তবে শেষ রাতে সাহুরের সময় পর্যন্ত মিলিত করতে পারে।"[১] সাহুর পর্যন্ত রোযাকে মিলিত করণ জায়েয, সুন্নাত নয় কোন ফযীলতপূর্ণ কাজও নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করাকে কল্যাণের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ﴾

"মানুষ ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে।"[২] কিন্তু সাহুরের সময় পর্যন্ত রোযাকে চালিয়ে যাওয়া বৈধ করেছেন। লোকেরা যখন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো ইফতার না করেই সওম চালিয়ে যান? তিনি বললেন, "আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে আমার পালনকর্তা খাওয়ান ও পান করান।"[৩]

প্রশ্ন ঃ (৪৪৬) বিশেষভাবে জুমু'আর দিবস সওম নিষেধ। এর কারণ কি? কাযা সিয়ামও কি এদিন রাখা নিষেধ?

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সাহুরের সময় পর্যন্ত সওম মিলিত করা।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত ইফতার করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সাহুর খাওয়ার ফযীলত।

[৩]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ সাহুর খাওয়ার বরকত; কিন্তু সাহুর খাওয়া ওয়াজিব নয়। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ মিলিতভাবে রোযা রাখা নিষেধ।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ নবী থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ ولا ليلتها بقيام "এককভাবে শুধুমাত্র জুমু'আর দিনে সওম রাখবে না এবং জুমু'আর রাতে ক্বিয়াম করবে না।"[১] সওম রাখার জন্য এককভাবে এ দিনকে বেছে নেয়া নিষেধের হিকমত হচ্ছে, জুমু'আর দিন সপ্তাহিক ঈদের দিন। জুমু'আ ইসলামের তৃতীয় ঈদ হিসেবে গণ্য। প্রথম ঈদ হচ্ছে রামাযান শেষে ঈদুল ফিতর। দ্বিতীয়টি কুরবানীর ঈদ। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, সাপ্তাহিক ঈদ জুমু'আর দিন।[২] একারণেই আলাদাভাবে এদিনে সওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

তাছাড়া এদিনে পুরুষদের জন্য উচিত হচ্ছে আগেভাগে জুমু'আর সলাতে যাওয়া, দু'আ যিক্‌র ও কুরআন তেলাওয়াতে মাশগুল হওয়া। এদিনটি আরাফার দিবসের অনুরূপ। আরাফার দিবসে হাজ্জপালনকারী সাহেব সওম রাখবেন না। কেননা এদিন তিনি দু'আ ও যিক্‌রে মাশগুল থাকবেন। একটি মূলনীতি হচ্ছেঃ কয়েকটি ইবাদাত যদি একত্রিত হয়, তখন যেটা পিছানো সম্ভব হবে না সেটা তাৎক্ষণিক আদায় করবে এবং যেটি পিছানো সম্ভব হবে তা পিছিয়ে দিয়ে পরে আদায় করবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, জুমু'আর দিন সাপ্তাহিক ঈদের দিন হওয়ার কারণে যদি সওম রাখা নিষেধ হয়ে থাকে, তবে তো অপর দু'টি ঈদের মত এদিনে অন্যান্য রোযা রাখাও হারাম হয়ে যায়?

উত্তরে আমরা বলবঃ এদিনটির বিধান অন্য দু'ঈদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা এটা প্রতি মাসে চারবার আগমন করে। একারণে এদিনে সওম রাখার নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে হারাম নয়। তাছাড়া দু'ঈদের মাঝে আরো বিশেষ যে বৈশিষ্ট রয়েছে তা জুমু'আর দিনে নেই।

কিন্তু যদি জুমু'আর পূর্বে একদিন ও পরে একদিন সওম পালন করে, তখন বুঝা যাবে যে, এককভাবে জুমু'আর দিবস সওম পালন করার উদ্দেশ্য ছিল না। আর এটা জায়েয।[৩]

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ছিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ এককভাবে জুমু'আর দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

২. রসূলুল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় জুমু'আর দিন ঈদের দিন।" (আহমাদ হাঃ ৭৬৮২)

৩. রাসূলুল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের কেহ যেন শুধুমাত্র জুমু'আর দিবসে রোযা না রাখে। তবে এর পূর্বে একদিন বা পরে একদিন মিলিয়ে রোযা রাখতে পারে।" (বুখারী, অধ্যায় ঃ সওম হাঃ ১৮৪৯)

www.pathagar.com

এককভাবে জুমু'আর দিনে সওম রাখার নিষেধাজ্ঞা নফল এবং কাযা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। কেননা হাদীসের নিষেধাজ্ঞা থেকে সাধারণভাবে এ কথাই বুঝা যায়। তবে যদি কোন মানুষ এ রকম ব্যস্ত থাকে যে, তার কাযা সওম জুমু'আর দিবস ছাড়া অন্য সময় আদায় করা সম্ভব নয়, তখন তার জন্য এককভাবে সে দিন সওম পালন করা মাকরূহ্ নয়। কেননা তার ওযর রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ (৪৪৭) কোন মানুষ যদি নফল সওম ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করে ফেলে, তবে কি গুনাহ্গার হবে? যদি সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করে, তবে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ কোন মানুষ নফল সওম রেখে যদি পানাহার বা স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করে ফেলে, তবে কোন গুনাহ্ নেই। নফল সওম শুরু করলেই তা পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। তবে হাজ্জ-উমরার কাফ্ফারার সওম পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু নফল সওম শুরু করার পর পূর্ণ করাই উত্তম। তাই নফল সওম রেখে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা তা পূর্ণ করা আবশ্যক নয়।

কিন্তু সওম যদি ফরয হয় এবং স্ত্রী সহবাস করে তবে তা নাজায়েয। কেননা বিশেষ প্রয়োজন না দেখা দিলে ফরয সওম ভঙ্গ করা জায়েয নয়। তবে রামাযানের রোযা যদি তার উপর ফরয থাকে এবং দিনের বেলা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে কাফ্ফারা দিতে হবে। "রামাযানের রোযা যদি তার উপর ফরয থাকে" এ কথার অর্থ হচ্ছেঃ যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সফরে থাকে, দু'জনেই সওম রাখে, তারপর সহবাসের মাধ্যমে সওম ভঙ্গ করে, তবে তারা গুনাহ্গার হবে না। তাদেরকে কাফ্ফারা দিতে হবেনা। অবশ্য তাদেরকে উক্ত দিনের সওম কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৪৮) ই'তিকাফের বিধান কি? ই'তিকাফকারীর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা পানাহার বা ঔষধ সেবনের জন্যে বাইরে যাওয়া কি জায়েয? ই'তেকাফের সুন্নাত কি? নবী ﷺ থেকে ই'তেকাফের সহীহ্ পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ ই'তেকাফ হচ্ছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য মাসজিদে অবস্থান করা। লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্য ই'তিকাফ করা সুন্নাত। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"মাসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৭)

www.pathagar.com

সহীহুল বুখারীতে প্রমাণিত আছে, নবী ﷺ ই'তিকাফ করেছেন, তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও ই'তিকাফ করেছেন।[১] ই'তিকাফির এই বিধান শরীয়ত সম্মত। তা রহিত হয়ে যায়নি। সহীহুল বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন, এমনকি আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীরা ই'তিকাফ করেছেন।"[২]

ছহীহ্ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রামাযানের প্রথম দশকে ই'তিকাফ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় দশকে ই'তিকাফ করেছেন। অতঃপর বলেন,

إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ

"নিশ্চয় আমি রামাযানের প্রথম দশকে ই'তিকাফ করে এই রাত্রি (লায়লাতুল কদর) অনুসন্ধান করেছি। তারপর দ্বিতীয় দশকে ই'তিকাফ করেছি। অতঃপর আমি ই'তিকাফ করেছি। আমাকে বলা আসমানীদূৎ কর্তৃক হয়েছে, নিশ্চয় তা শেষ দশকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ই'তিকাফ করতে চায়, সে যেন ই'তিকাফ করে।"[৩] অতঃপর লোকেরা তাঁর সাথে ই'তিকাফ করেছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'ই'তিকাফ করা যে সুন্নাত সে সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আমার জানা নেই।'

তাই কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইজমার দলীলের ভিত্তিতে ই'তিকাফ করা সুন্নাত।

ই'তিকাফ করার স্থান হচ্ছে, যে কোন শহরে অবস্থিত মাসজিদ। যেখানে জামাতে সলাত অনুষ্ঠিত হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ "মাসজিদ সমূহে ই'তিকাফ করা অবস্থায়..।" উত্তম হচ্ছে জুমু'আর মাসজিদে ই'তিকাফ করা। যাতে করে জুমু'আ আদায় করার জন্য বের হতে না হয়। অন্য মাসজিদে ই'তিকাফ করলেও কোন অসুবিধা নেই, তবে জুমু'আর জন্য আগে ভাগে মাসজিদে চলে যাবে।

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ করা।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দশকে ই'তিকাফ করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা।

৩. বুখারী, অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দশকে ই'তিকাফ করা।

www.pathagar.com

ই'তিকাফ কারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যপূর্ণ কাজ তথা কুরআন তেলাওয়াত, যিক্‌র, নফল সলাত প্রভৃতিতে মাশগুল থাকা। কেননা এ'তেকাফির উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটা। মানুষের সামান্য কথাবার্তায় কোন অসুবিধা নেই বিশেষ করে কথা যদি উপকারী হয়।

ই'তিকাফকারীর জন্য স্ত্রী সহবাস ও স্ত্রী সোহাগ বা শৃঙ্গার প্রভৃতি হারাম।

মাসজিদ থেকে বের হওয়া তিন ভাগে বিভক্তঃ

১) জায়েয। শরীয়ত অনুমদিত ও অভ্যাসগত যরূরী কাজে বের হওয়া। যেমন জুমু'আর সলাতের জন্য বের হওয়া, পানাহার নিয়ে আসার কেউ না থাকলে সে উদ্দেশ্যে বের হওয়া। ওযূ, ফরয গোসল, পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া।

২) ওয়াজিব নয় এমন নেকীর কাজে বের হওয়া। যেমন, রুগী দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া। তবে ই'তিকাফ শুরু করার সময় এসমস্ত কাজের জন্য বের হওয়ার যদি শর্ত করে নেয়, তবে জায়েয হবে। অন্যথায় নয়।

৩) এ'তেকাফির সুন্নাত বিরোধী কাজে বের হওয়া। যেমন বাড়ী যাওয়া বা কেনা-বেচার জন্য বের হওয়া। স্ত্রী সহবাস করা। এ সমস্ত কাজ কোনভাবেই ই'তিকাফকারীর জন্য জায়েয নয়।

www.pathagar.com

فتاوى

فتاوى الحج

হাজ্জ বিষয়ক ফাতাওয়া

www.pathagar.com

كتاب الحج

অধ্যায় ঃ হাজ্জ

প্রশ্ন ঃ (৪৪৯) যে ব্যক্তি সলাত পড়ে না সওম রাখেনা তার হাজ্জের বিধান কি? যদি এ ব্যক্তি তওবা করে, তবে সমস্ত ইবাদাত কি কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ সলাত পরিত্যাগ করা কুফরী। সলাত ছেড়ে দিলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। এ কথার দলীল হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি। অতএব যে লোক সলাত পড়ে না তার জন্য মক্কা শরীফে প্রবেশ করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে।" (সূরা তাওবা- ২৮)

যে ব্যক্তি সলাত পড়ে না, তার হাজ্জ বিশুদ্ধ হবেনা এবং কবূলও হবেনা। কেননা কাফিরের কোন ইবাদাতই সঠিক নয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

"আর তাদের দান-খায়রাত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, তারা শৈথিল্যের সাথে ছাড়া সলাত আদায় করে না। আর তারা দান করে না, কিন্তু অনিচ্ছার সাথে করে।" (সূরা তাওবা- ৫৪)

যে সমস্ত আমল তারা পূর্বে পরিত্যাগ করেছে তা কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾

"(হে নবী ﷺ!) আপনি কাফিরদেরকে বলে দিন, তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে (এবং আল্লাহর দ্বীনে ফিরে আসে) তবে পূর্বে যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।" (সূরা আনফাল- ৩৮)

www.pathagar.com

সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ অন্যায় করেছে সে যেন আল্লাহর কাছে খাঁটিভাবে তওবা করে। নেক কাজ চালিয়ে যায়। বেশী বেশী তওবা ইস্তেগফার ও অধিকহারে ভাল কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুণাহ্ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা যুমার- ৫৩)

যারা তওবা করতে চায় আল্লাহ তাদের জন্য এই আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। সুতরাং বান্দা যে পাপই করে না কেন- যদি শির্কও হয় এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহই সরল সঠিক পথে হেদায়াতদানকারী।

প্রশ্ন ঃ (৪৫০) ব্যাপকভাবে দেখা যায় অনেক মুসলমান বিশেষ করে অনেক যুবক ফরয হাজ্জ আদায় করার ব্যাপারে শীথিলতা প্রদর্শন করে। এবছর নয় ঐ বছর এভাবে বিলম্ব করে। কখনো কর্ম ব্যস্ততার ওযর পেশ করে। এদেরকে আপনার নছীহত কি?

কখনো দেখা যায় কোন কোন পিতা যুবক ছেলেদেরকে ফরয হাজ্জ আদায় করতে বাধা দেয় এই যুক্তিতে যে, এখনো তাদের বয়স হয়নি, হাজ্জের ক্লান্তি সহ্য করতে পারবে না। অথচ হাজ্জের পূর্ণ শর্ত তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। পিতার এ কাজের বিধান কি? এ ধরনের পিতার আনুগত্য করার বিধান কি?

উত্তর ঃ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, হাজ্জ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন এবং বিরাট একটি ভিত। হাজ্জের শর্ত পাওয়া গেলে হাজ্জ আদায় না করলে মানুষের ইসলাম পূর্ণ হয় না। হাজ্জ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ তাৎক্ষণিক আদায় করতে হবে। মানুষ জানে না ভবিষ্যতে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। হতে পারে অর্থ শেষ হয়ে যাবে বা অসুস্থ হয়ে যাবে বা মৃত্যু বরণও করতে পারে।

হাজ্জ আদায় করার শর্ত পূর্ণ হলে এবং হাজ্জের সফরে ধর্মীয় ও চারিত্রিক দিক থেকে নির্ভরযোগ্য সাথী থাকলে, সন্তানদেরকে হাজ্জ আদায় করতে বাধা দেয়া পিতা-মাতার জন্য জায়েয নয়।

www.pathagar.com

হাজ্জ ওয়াজিব হলে, হাজ্জ ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নির্দেশ মান্য করা চলবে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টিকুলের আনুগত্য করা যাবে না। তবে বাবা-মা যদি তাদেরকে নিষেধের ব্যাপারে কোন শরঈ কারণ উপস্থাপন করে, তখন তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক।

আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সবাইকে কল্যাণ ও সংশোধনের কাজে তাওফীক দিন।

প্রশ্ন ঃ (৪৫১) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির কি হাজ্জ করা আবশ্যক?

উত্তর ঃ মানুষের উপর যদি এমন ঋণ থাকে যা পরিশোধ করার জন্য তার সমস্ত সম্পদ দরকার, তবে তার উপর হাজ্জ ফরয নয়। কেননা আল্লাহ তো শুধুমাত্র সামর্থবান মানুষের উপর হাজ্জ ফরয করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً "মানুষের উপর আল্লাহ্র অধিকার এই যে, যারা এই ঘর পর্যন্ত আসার সমর্থ রাখে তারা তার হাজ্জ পালন করবে।" (সূরা আল ইমরান- ৯৭)

সুতরাং ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি তো সামর্থবান নয়। অতএব প্রথমে সে ঋণ পরিশোধ করবে তারপর সম্ভব হলে হাজ্জ আদায় করবে।

কিন্তু ঋণ যদি কম হয় এবং ঋণ পরিশোধ করে হাজ্জে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করার সমান খরচ বিদ্যমান থাকে, তবে হাজ্জ করবে। হাজ্জ চাই ফরয হোক বা নফল। কিন্তু ফরয হাজ্জ আদায় করার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়। আর নফল হাজ্জ তো ইচ্ছাধীন। মনে চাইলে করবে মনে চাইলে করবে না, কোন গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৫২) মায়ের পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করার জন্য জনৈক লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে; কিন্তু পরে জানা গেল এ লোক আরো কয়েকজনের হাজ্জ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছে। এ সময় করণীয় কি? এ লোকের বিধান কি?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মানুষের উচিত হচ্ছে, যে কোন কাজ করার পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া। ধর্মীয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য না হলে তাকে কোন কাজের দায়িত্ব দিবে না। লোকটি বিশ্বস্ত কিনা, যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা, তার নিকট সে ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিনা প্রভৃতি যাচাই বাছাই করবে।

www.pathagar.com

হাজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। তাই আপনার পিতা বা মাতার পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করার জন্য এমন লোক নির্বাচন করবেন, যিনি জ্ঞান ও ধর্মীয় দিক থেকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। কেননা অনেক মানুষ হাজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞ। যথাযোগ্য নিয়মে হাজ্জ আদায় করে না। যদিও তারা নিজেদের ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। কিন্তু তারা ধারণা করে এটুকুই তাদের উপর ওয়াজিব। অথচ তারা অনেক ভুল করে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এ ধরনের মানুষের কাছে হাজ্জের দায়িত্ব প্রদান করা উচিত নয়।

আবার অনেক লোক এমন আছে, যারা হয়তো হাজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখে কিন্তু তারা আমানতদার নয়। ফলে হাজ্জের কার্যাদি আদায় করার ক্ষেত্রে কথা ও কাজে কোন গুরুত্বারোপ করে না। শুধুমাত্র দায়সারা গোছের কাজ করে। এ ধরনের লোকের কাছে হাজ্জ পালনের আমানত অর্পন করা উচিত নয়। সুতরাং হাজ্জের দায়িত্ব প্রদান করার জন্য দ্বীন ও আমানতদারীতে নির্ভর করা যায় এ রকম লোক অনুসন্ধান করা জরূরী।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যে কয়জনের হাজ্জের দায়িত্ব নিয়েছে- হতে পারে সে অন্য লোকদের দ্বারা তাদের হাজ্জগুলো আদায় করে দিবে। কিন্তু এরূপ করাও কি তার জন্য জায়েয হবে? অর্থাৎ- হাজ্জ বা উমরা আদায় করে দেয়ার জন্য কয়েক জনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেয়ার পর সারাসরি তা নিজে আদায় না করে অন্য লোককে দায়িত্ব দেয়া কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ এটা জায়েয বা বৈধ নয়। এটা বাত্বিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ। কেননা এটা হাজ্জ-উমরা নিয়ে ব্যবসা করা। মানুষের হাজ্জ-উমরা আদায় করে দেয়ার নাম করে তাদের নিকট থেকে পয়সা নেয়; অতঃপর কম মূল্যে অন্য লোককে নিয়োগ করে। এতে সে বাত্বিল পন্থায় কিছু সম্পদ কামাই করল। কেননা হতে পারে হাজ্জের দায়িত্ব প্রদানকারী এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করা উচিত। মানুষের অর্থ নিজের পকেটে ঢুকানোর আগে চিন্তা করা উচিত এটা কি ঠিক হল না বেঠিক?[১]

প্রশ্ন ঃ (৪৫৩) অতিবৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছার পর উমরা আদায় করতে অপারগ হয়ে গেছে এখন সে কি করবে?

---

[১]. উল্লেখ্য যে, হাজ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় যদি তাকে বলে নেয় যে, আমি নিজে না পারলে আমার দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য কোন লোককে দিয়ে আপনার এই হাজ্জ পালন করিয়ে দিব। এ কথায় যদি দায়িত্ব প্রদানকারী রাজি হয়, তবে অন্য লোক দ্বারা হাজ্জ করানোতে কোন অসুবিধা নেই।- অনুবাদক।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে, অতঃপর উমরা আদায় করবে। কিন্তু যদি ইহ্‌রাম বাঁধার সময় শর্ত করে থাকে, তবে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে, তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। উমরা পূর্ণ করতে হবে না বিদায়ী তওয়াফও করতে হবে না। ইহ্‌রামের সময় শর্ত করার নিয়ম হচ্ছেঃ এই দু'আ পাঠ করবেঃ [আল্লাহুম্মা ইন হাবাসানী হাবেস ফা মাহেল্লী হায়সু হাবাসতানী] "হে আল্লাহ্! কোন কারণে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই (হাজ্জ-উমরার কাজ সমাধা করতে না পরি), তবে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হব, সেটাই আমার হালাল হওয়ার স্থান।"[১]

কিন্তু যদি উক্ত শর্ত না করে আর উমরা আদায় কোন ক্রমেই সম্ভব না হয়, তবে সে ইহ্‌রাম খুলে ফেলে হালাল হয়ে যাবে এবং ফিদ্‌ইয়া হিসেবে একটি কুরবানী করে দিবে যদি সামর্থ থাকে। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ-উমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাগ্রস্থ হও তবে যা সহজপ্রাপ্য তাই কুরবানী কর। আর কুরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুন্ডন করবে না।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৬)

নবী ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরা পালন করতে গেলে হুদায়বিয়া নামক এলাকায় মক্কার কাফিরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানেই কুরবানী যবেহ করেন এবং হালাল হয়ে যান।

প্রশ্ন ঃ (৪৫৪) বদলী হাজ্জ সম্পাদন করার পর যদি কিছু অর্থ রয়ে যায়, তবে সেটা কি ফেরত দিতে হবে? না নিতে পারবে?

উত্তর ঃ বদলী হাজ্জ করার জন্য যদি অর্থ নিয়ে থাকে, আর হাজ্জ সম্পাদন করার পর কিছু অর্থ তার কাছে রয়ে যায়, তবে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক নয়। তবে অর্থ দাতা প্রদান করার সময় যদি এরূপ বলে যে, 'এই অর্থ থেকে যা লাগে তা দিয়ে হাজ্জ করবেন।' তবে হাজ্জ শেষে কোন কিছু বাকী থাকলে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক। সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা ফেরত নাও নিতে পারে, ইচ্ছা করলে ফেরত নিতে পারে। কিন্তু অর্থ দেয়ার সময় যদি এরূপ বলে, 'এই অর্থ দ্বারা আপনি হাজ্জ করবেন।' তাহলে যা বাকী থাকবে তা ফেরত দেয়া

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ হাঃ ৪৬৯৯। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ হাঃ ২১০১।

www.pathagar.com

আবশ্যক নয়। অবশ্য এভাবে প্রদান করার সময় প্রদানকারী যদি না জানে যে হাজ্জের খরচ কত লাগতে পারে তাই তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দেয়, তখন তার পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদনকারীর এ কথা বলা ওয়াজিব যে, আপনার অর্থ দ্বারা আমি হাজ্জ সম্পাদন করেছি ঠিকই; কিন্তু তাতে এই পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে। বাকীটা আমার কাছে রয়ে গেছে। এখন সে যদি তাকে তা গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অন্যথা তা ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৫৫) পুত্র যদি পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ বা উমরা সম্পাদন করে, তবে নিজের জন্য দু'আ করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সে হাজ্জ বা উমরা অবস্থায় নিজের জন্য তার পিতার জন্য এবং সমস্ত মুসলিমদের জন্য দু'আ করতে পারবে। কেননা কারো পক্ষ থেকে হাজ্জ-উমরার আদায় করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার পক্ষ থেকে নিয়ত করে বাহ্যিক ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত কর্ম সমূহ আদায় করা।

কিন্তু দু'আর বিষয়টি হাজ্জ বা উমরার কোন ফরয বা ওয়াজিব বা শর্ত নয়। তাই যার জন্য হাজ্জ বা উমরা করছে তার জন্য, নিজের জন্য, সমস্ত মুসলিমদের জন্য দু'আ করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৫৬) হাজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করার বিধান কি?

উত্তর ঃ বদলী হাজ্জ বা উমরা করার দু'টি অবস্থাঃ

প্রথম অবস্থাঃ তার পক্ষ থেকে ফরয হাজ্জ বা উমরা আদায় করবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ তার পক্ষ থেকে নফল হাজ্জ বা উমরা আদায় করবে।

ফরয হাজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। তবে কোন বাধার কারণে যদি মক্কা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব না হয়- যেমন, কঠিন অসুখ যা ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই অথবা অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছে ইত্যাদি, তাহলে তার পক্ষ থেকে কাউকে দিয়ে বদলী হাজ্জ করাবে। কিন্তু অসুস্থতা যদি এমন হয় যে তা থেকে আরোগ্য পাওয়ার আশা আছে, তবে অপেক্ষা করবে এবং সুস্থ হলে নিজেই নিজের হাজ্জ-উমরা সম্পাদন করবে। কেননা কোন বাধা না থাকলে হাজ্জ বা উমরার ব্যাপারে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

www.pathagar.com

"মানুষের উপর আল্লাহ্‌র অধিকার এই যে, যারা এই ঘর পর্যন্ত আসার সমর্থ রাখে তারা ইহার হাজ্জ পালন করবে।" (সূরা আল ইমরান- ৯৭)

ইবাদাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ তা নিজে বাস্তবায়ন করবে; যাতে করে আল্লাহ্‌র জন্য তার দাসত্ব-গোলামী ও বিনয়ের পূর্ণতা লাভ করে। আর নিঃসন্দেহে অন্যকে দায়িত্ব দিলে ইবাদাতের এই মহান উদ্দেশ্য সঠিকভাবে আদায় হবে না।

কিন্তু সে যদি নিজের ফরয হাজ্জ ও উমরা আদায় করে থাকে, অতঃপর আবার তার পক্ষ থেকে নফল হাজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করে, তবে জায়েয হবে কি না? এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতবিরোধ করেছেন।

কেউ বলেছেন, জায়েয।

কেউ বলেছেন, নাজায়েয।

আমার মতে যেটা সঠিক মনে হয়, তা হচ্ছে নাজায়েয। অর্থাৎ- নফল হাজ্জ আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা ইবাদাতের মূলনীতি হচ্ছে, ব্যক্তি নিজে তা আদায় করবে। যেমন করে নিজের পক্ষ থেকে রোযা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। অবশ্য ফরয সওম কাযা রেখে যদি কেউ মৃত্যু বরণ করে, তবে তার পক্ষ থেকে পরিবারের যে কেউ তা আদায় করে দিবে। অনুরূপ হচ্ছে হাজ্জ। এটি এমন একটি ইবাদাত যা আদায় করার জন্য শারিরীক পরিশ্রম আবশ্যক। এটা শুধুই আর্থিক ইবাদাত নয়। আর ইবাদাত যদি শারিরীক হয়, তবে তা অন্যকে দিয়ে আদায় করলে বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে যেটুকু অনুমতি পাওয়া যায় তার কথা ভিন্ন। আর বদলী নফল হাজ্জ আদায় করার ব্যাপারে হাদীসে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ইমাম আহমাদ থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার একটি বর্ণনা আমাদের কথার সমর্থক। অর্থাৎ নফল হাজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে নিয়োগ করা যাবে না। চাই তার সামর্থ থাক বা না থাক।

আমাদের এই মতানুযায়ী সম্পদশালী লোককে নিজেই নিজের হাজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কেননা অনেক মানুষ এমন আছে, বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে অথচ কখনো তারা মক্কা সফর করে নি। এই যুক্তিতে যে, সে তো প্রতি বছর তার পক্ষ থেকে হাজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে না কাউকে প্রেরণ করে থাকে। অথচ তাদের জানা নেই যে, এদ্বারা ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য আদায় হয় না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪৫৭) মৃতের পক্ষ থেকে উমরা আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ মৃতের পক্ষ থেকে হাজ্জ বা উমরা আদায় করা জায়েয। অনুরূপভাবে তওয়াফ এবং যাবতীয় নেক আমল তার পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েয। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, যে কোন নৈকট্যপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করে যদি তার সওয়াব জীবিত বা মৃতের জন্য দান করে দেয়, তবে সে উপকৃত হবে। কিন্তু সওয়াব দান করার চাইতে মৃতের জন্য দু'আ করা বেশী উত্তম। দলীল হচ্ছে রাসূল ﷺএর বাণীঃ তিনি বলেন,

﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾

"মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তিনটি আমল ছাড়া তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১) সাদকায়ে জারিয়া ২) উপকারী ইসলামী বিদ্যা ৩) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করবে।"[১] এই হাদীসে নবী ﷺ এরূপ বলেন নিঃ সৎ সন্তান, যে তার জন্য ইবাদাত করবে বা কুরআন পড়বে বা সলাত পড়বে বা উমরা করবে বা সওম রাখবে ইত্যাদি। অথচ হাদীসটিতে প্রথমে দু'টি আমলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মৃতের জন্য আমল করা উদ্দেশ্য হত, তবে নবী ﷺ অবশ্যই বলতেন, "এবং সৎ সন্তান, যে তার জন্য আমল করবে।"

কিন্তু মানুষ যদি কোন নেক আমল করে তার সওয়াব কারো জন্য দান করে দেয়, তবে তা জায়েয।[২]

প্রশ্ন ঃ (৪৫৮) মাহরাম ছাড়া কোন নারী যদি হাজ্জ সম্পাদন করে, তবে কি তা বিশুদ্ধ হবে? বুদ্ধিমান বালক কি মাহরাম হতে পারে। মাহরাম ব্যক্তির মধ্যে কি কি শর্ত আবশ্যক?

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ওছিয়ত, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর পর মানুষের কাছে যে সওয়াব পৌঁছে থাকে তার বর্ণনা।

[২]. কিন্তু সম্মানিত শায়খ সাহেবের এই কথাটি স্ববিরোধী। কেননা সলাত, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি তো নেক আমল। তাহলে কি সলাত পড়ে, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি নেক আমল করে মৃতের জন্য হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করা যাবে? কখনই নয়। কেননা এগুলোর পক্ষে কোন দীলল নেই। কিন্তু হাজ্জ আদায় করা, রোযা বাকী রেখে মৃত্যু বরণ করলে তার পক্ষ থেকে রোযা করা, দান-সাদকা করা প্রভৃতির পক্ষে দলীল বিদ্যমান। অতএব এটাই কি ইনসাফ নয় যে, আমরা প্রতিটি বিষয়কে দলীলের সাথে সম্পৃক্ত করে কথা বলব? যেটার পক্ষে দলীল পাওয়া যাবে সেটা জায়েয, দলীল না পাওয়া গেলে নাজায়েয। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। - অনুবাদক

www.pathagar.com

উত্তর ঃ তার হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু মাহরাম ছাড়া সফর করা হারাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর নাফরমানী। কেননা তিনি এরশাদ করেন, "নারী কোন মাহরাম ছাড়া যেন সফর না করে।"[১]

বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি এমন বালক মাহরাম হতে পারে না। কেননা তার নিজেরই তো অভিভাবক ও তত্ত্বাবধান দরকার। অতএব এ ধরনের মানুষ কি করে অন্যের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হতে পারে?

মাহরাম ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে, সে মুসলিম হবে, পুরুষ হবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হবে এবং বিবেক সম্পন্ন হবে। এগুলো শর্তের কোন একটি না থাকলে সে মাহরাম হতে পারবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আফসোসের সাথে লক্ষ্য করা যায়, অনেক নারী মাহরাম ছাড়া একাকী উড়োজাহাজে সফর করে থাকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, মাহরাম পুরুষ তাদেরকে এয়ারপোর্টে বিমানে তুলে দেয় এবং পরবর্তী এয়ারপোর্টে আরেক মাহরাম তাদেরকে রিসিভ করে থাকে। আর সে তো উড়োজাহাজের মধ্যে নিরাপদেই থাকে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তিটি অসাড়ঃ কেননা তার মাহরাম তো এরোপ্লেনে তাকে উঠিয়ে দিতে পারে না। খুব বেশী তাকে ওয়েটিং হল বা ইমিগ্রেশন পর্যন্ত ছেড়ে আসতে পারে। কখনো প্লেন ছাড়তে দেরী হতে পারে। কখনো কারণ বশতঃ গন্তব্য এয়ারপোর্টে প্লেন অবতরণ করা সম্ভব হয় না। তখন এ নারীর কি অবস্থা হবে? কখনো হয়তো গন্তব্য এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করল ঠিকই কিন্তু মাহরাম ব্যক্তিটি তাকে রিসিভ করতে পারল না। হয়তো সে অসুস্থ হয়ে গেল, কোন সড়ক দুর্ঘটনা হল ইত্যাদি যে কোন কারণ ঘটতে পারে।

উল্লেখিত কারণগুলো কোনটিই হল না। ঠিকঠাক মত প্লেন উড়ল, গন্তব্য এয়ারপোর্টে মাহরাম তাকে রিসিভ করল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে- প্লেনের মধ্যে তার সিটের পাশে এমন লোক বসেছে, যে আল্লাহকে ভয় করে না, ফলে সে নারীকে বিরক্ত করতে পারে বা নারীই তার প্রতি আসক্ত হতে পারে। তাহলেই তো নিষিদ্ধ ফেতনার বীয বপন হয়ে গেল- যেমনটি কারো অজানা নয়।

অতএব নারীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং কোন মাহরাম ছাড়া কখনো সফরে বের না হওয়া। অভিভাবক পুরুষদের উপরও

---

[১]. বুখারী অধ্যায় ঃ শিকারের জরিমানা, অনুচ্ছেদ ঃ নারীর হাজ্জ। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জের সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা।

www.pathagar.com

ওয়াজিব হাজ্জে তাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা, নারীদের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় না দেয়া, নিজেদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা। প্রত্যেকে তার পরিবার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা এদেরকে আল্লাহ তাদের কাছে আমানত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"হে ঈমানদরগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।" (সূরা তাহরীম- ৬)

প্রশ্ন ঃ (৪৫৯) জনৈক নারীর কথা হচ্ছে, আমি রামাযানে উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। কিন্তু আমার সাথে থাকছে আমার সহদোর বোন, তার স্বামী ও আমার মা। এই উমরায় যাওয়া কি আমার জায়েয হবে?

উত্তর ঃ এদের সাথে উমরায় যাওয়া আপনার জন্য জায়েয হবে না। কেননা বোনের স্বামী আপনার মাহরাম নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি শুনেছি নবী ﷺ খুতবায় বলেন,

﴿لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ﴾

"কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জন না হয়। মাহরাম ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে।" তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমার স্ত্রী হাজ্জ আদায় করার জন্য বের হয়ে গেছে। আর আমি উমুক উমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি? নবী ﷺ বললেন, "তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হাজ্জ পালন কর।"[১] নবী ﷺ তার কাছে কোন ব্যাখ্যা চাইলেন না তোমার স্ত্রীর সাথে কি অন্য কোন নারী আছে না নেই? সে কি যুবতী না বৃদ্ধা? রাস্তায় সে কি নিরাপদ না নিরাপদ নয়?

---

১. বুখারী অধ্যায় ঃ শিকারের জরিমানা, অনুচ্ছেদ ঃ নারীর হাজ্জ। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জের সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা।

www.pathagar.com

প্রশ্নকারী এই নারী মাহরাম না থাকার কারণে যদি উমরায় না যায়, তবে তার কোন গুনাহ্ হবে না। যদিও ইতোপূর্বে সে কখনো উমরা না করে থাকে। কেননা হাজ্জ-উমরা ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে নারীর মাহরাম থাকা।

প্রশ্ন ঃ (৪৬০) হাজ্জের মাস কি কি?

উত্তর ঃ হাজ্জের সময় শুরু হয় শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং শেষ হয় জিলহাজ্জের দশ তারিখে তথা ঈদের দিনে বা জিলহাজ্জের শেষ তারিখে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা আল্লাহ বলেন, ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ "হাজ্জের মাস সমূহ সুনির্দিষ্ট জানা।" এখানে বহুবচন أشهر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা হাকীকী অর্থে ব্যবহার হবে। অর্থাৎ এই তিনটি মাসে হাজ্জের কাজ চলবে। এ কথার অর্থ এটা নয় এ তিন মাসের যে কোন দিনে হাজ্জের কাজ করতে হবে। [অর্থাৎ- শাওয়ালের প্রথমেই কেউ যদি হাজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধে এবং তওয়াফ সাঈ করে, তবে তা হাজ্জের জন্যই হল। কিন্তু আরাফাত এবং তৎপরবর্তী কাজের জন্য তো সময় নির্ধারণ করাই আছে।] আর জিলহাজ্জের শেষ নাগাদ হাজ্জের সময় প্রলম্বিত এ কথার অর্থ হচ্ছে, হাজ্জের তওয়াফ এবং সাঈ জিলহাজ্জের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয আছে। এর পর আর বিলম্বিত করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি কোন ওযর থাকে সে কথা ভিন্ন। যেমন হাজ্জের তওয়াফ করার পূর্বে কোন নারীর নেফাস শুরু হয়ে গেল। নেফাস অবস্থা শেষ হতে হতে জিলহাজ্জ মাস পার হয়ে গেল। তার এই ওযর গ্রহণযোগ্য নেফাস শেষ হলেই সে তওয়াফ ও সাঈ সম্পাদন করবে।

উমরার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। বছরের যে কোন সময় তা সম্পাদন করা যায়। কিন্তু রামাযানে উমরা করলে হাজ্জের সমান সওয়াব লাভ করা যায়। হাজ্জের মাস সমূহেই নবী ﷺ যাবতীয় উমরা আদায় করেন। হুদায়বিয়ার উমরা জিলকা'দ মাসে। কাযা উমরা আদায় করেছেন জিলকা'দ মাসে, জে'রানার উমরাও ছিল জিলকা'দ মাসে। আর বিদায় হাজ্জের সাথের উমরাও ছিল জিলকা'দ মাসে। এতে বুঝা যায় হাজ্জের মাস সমূহে উমরা করার আলাদা বৈশিষ্ট ও ফযীলত রয়েছে। কেননা নবী ﷺ উমরা আদায় করার জন্য এ মাসগুলোকেই নির্বাচন করেছেন।

প্রশ্ন ঃ (৪৬১) হাজ্জের মাস সমূহ আসার পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধার বিধান কি?

উত্তর ঃ হাজ্জের মাস সমূহ আসার পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

www.pathagar.com

কেউ বলেন, এটা বিশুদ্ধ হবে এবং হাজ্জের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে। তবে হাজ্জের মাস আগমন করার পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধা মাকরূহ।

দ্বিতীয় মতঃ তার এই ইহরাম হাজ্জের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে না। তবে তা উমরা হয়ে যাবে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ "উমরা হাজ্জের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।"[1] তাছাড়া নবী ﷺ উমরাকে ছোট হাজ্জ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি আমর বিন হাযমের বিখ্যাত মুরসাল হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। যা লোকেরা সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে।[2]

প্রশ্ন ঃ (৫৬২) হাজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান সমূহ কি কি?

উত্তর ঃ হাজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান সমূহ হচ্ছে পাঁচটিঃ ১) যুল হুলায়ফা ২) জুহ্‌ফা ৩) ইয়ালামলাম ৪) কারণে মানাযেল ৫) যাতু ঈরক্ব।

১) যুল হুলায়ফা ঃ যাকে বর্তমানে আবা'রে আলী বলা হয়। এটা মদীনার নিকটবর্তী। মক্কা থেকে এর অবস্থান ১০ মারহালা দূরে (বর্তমান হিসেবে প্রায় ৪০০ কিঃ মিঃ)। মক্কা থেকে এটি সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। এটি মদীনাবাসী এবং সেপথ দিয়ে গমণকারী অন্যান্যদের মীক্বাত।

২) জুহ্‌ফা ঃ শাম তথা সিরিয়াবাসীদের মক্কা গমনের পথে পুরাতন একটি গ্রামের নাম জুহ্‌ফা। সেখান থেকে মক্কার দূরত্ব ৩ মারহালা তথা প্রায় ১৮৬ কিঃ মিঃ। এটা এখন আর গ্রাম নেই। বর্তমানে লোকেরা এর বদলে পার্শবর্তী স্থান রাগেব থেকে ইহরাম বাঁধে।

৩) ইয়ালামলাম ঃ ইয়ামানের লোকদের মক্কা আগমনের পথে একটি পাহাড় বা একটি স্থানের নাম ইয়ালামলাম। বর্তমানে এস্থানকে সা'দিয়া বলা হয়। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা তথা প্রায় ৯২ কিঃ মিঃ।

৪) কারণে মানাযেল ঃ নজদ তথা পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের মক্কা গমনের পথে তায়েফের কাছে একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে একে সায়লুল কাবীর বলা হয়। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা তথা প্রায় ৭৮ কিঃ মিঃ।

৫) যাতু ইরক্ব ঃ ইরাকের অধিবাসীদের মক্কা আগমনের পথে একটি স্থানের নাম। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা তথা প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ।

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জের মাস সমূহে উমরা করা জায়েয।

[2]. দারাকুতনী ২/২৮৫ হাঃ (১২২)

প্রথম চারটি মীক্বাত রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত।[১] শেষেরটিও আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী ﷺ কর্তৃক নির্ধারণকৃত মীক্বাত। যেমনটি নাসায়ী ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।[২] কিন্তু যাতু ইরক্বের ব্যাপারে সহীহ সূত্রে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি তা কূফা ও বস্‌রার অধিবাসীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তারা এসে অভিযোগ করল, হে আমীরুল মু'মেনীন! নবী ﷺ নজদবাসীদের জন্য কারণে মানাযেলকে (তায়েফ) মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে অনেকটা পথ ঘুরে সেখানে যেতে হয় এবং আমাদের অনেক কষ্ট হয়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের পথে ঐ মীক্বাতের বরাবর কোন স্থান তোমরা অনুসন্ধান কর। তখন যাতু ঈরক্ব মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।[৩]

মোটকথা, যদি নবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয় তবে তো কোন প্রশ্ন নেই। যদি প্রমাণিত না হয়, তবে তা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সুন্নাত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি চার খলীফার মধ্যে অন্যতম। যাঁরা ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত এবং তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ওমরের সমর্থনে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কয়েকটি বিধান নাযিল করেছেন। আয়েশা বর্ণিত হাদীসটি যদি সহীহ হয়, তবে এটাও তাঁর প্রতি নবী ﷺএর সমর্থন। তাছাড়া ওমরের নির্দেশ যুক্তি সংগত। কেননা কোন মানুষ যদি মীক্বাত থেকে ভিতরে যেতে চায় তবে সেখান থেকেই তাকে ইহরাম বাঁধতে হবে। কিন্তু এ স্থানের বরাবর কোন পথ দিয়ে ভিতরে যেতে চাইলে মীক্বাত অতিক্রমকারী হিসেবে উক্ত স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

ওমর (রাঃ)এর এই হাদীসে বর্তমান যুগে আমাদের জন্য বিরাট ধরনের উপকার বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, কোন মানুষ যদি বর্তমান যুগে এরোপ্লেনযোগে হাজ্জ বা উমরা করতে আসতে চায়, তবে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যে মীকাতের উপর দিয়ে যাবে তার বরাবর হলেই তাকে ইহরাম বাঁধতে হবে। বিলম্ব করা বৈধ হবে না এবং জেদ্দায় গিয়ে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না- যেমনটি অনেক লোক করে থাকে। কেননা স্থল পথে হোক, বা আকাশ পথে

---

[১]. বুখারী অধ্যায় ঃ হাজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জ উমরার জন্য মক্কাবাসীদের মীক্বাত। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জ উমরার জন্য মীক্বাতের স্থান।

[২]. নাসায়ী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ ইরাকবাসীদের মীকাত। আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ হাজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ মীকাতের বর্ণনা।

[৩]. বুখারী অধ্যায় ঃ হাজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত হচ্ছে যাতু ইরক্ব।

www.pathagar.com

হোক বা সমুদ্র পথে হোক কোন পার্থক্য নেই- মীকাতের বরাবর হলেই ইহরাম বাঁধতে হবে। এজন্য হাজ্জ যাত্রী যে দেশেরই হোক সমুদ্র পথে মক্কা আসতে চাইলে ইয়ালামলাম বা রাবেগের বরাবর হলে তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৬৩) বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমকারী দু'প্রকারের লোক হতে পারেঃ

১) হাজ্জ বা উমরা আদায় করার ইচ্ছা করেছে। তাহলে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে হাজ্জ বা উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে আসা। যদি এরূপ না করে তাহলে একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে বিদ্বানদের মতে ফিদ্ইয়া বা জরিমানা দিতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া।

২) হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা। এ অবস্থায় তার কোন অসুবিধা নেই। চাই মক্কায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করুক বা স্বল্প সময়। কেননা এ অবস্থায় যদি ইহরাম আবশ্যক করা হয় তবে প্রতিবার আগমনে হাজ্জ বা উমরা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবনে একবারের বেশী হাজ্জ বা উমরা আবশ্যক নয়। এর বেশী হলে সবই হবে নফল। বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমের ব্যাপারে বিদ্বানদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ (৪৬৪) 'লাব্বাইক' বলাটাই কি ইহরামে প্রবেশ করার নিয়ত?

উত্তর ঃ হাজ্জ বা উমরার কজে প্রবেশ করার জন্য অন্তরে নিয়ত (ইচ্ছা বা সংকল্প) করে পাঠ করবেঃ 'লাব্বাইকা উমরাতান' অথবা হাজ্জের জন্য বলবে, 'লাব্বাইকা হাজ্জান্'। কিন্তু এরূপ বলা জায়েয নয়ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা' অথবা আ'তমিরা উমরাতান'। বা নাওয়াইতু আন আ'তামিরা উমরাতান। বা নাওয়াইতু আন আহুজ্জা হাজ্জান। কেননা নবী ﷺ থেকে এগুলো প্রমাণিত নেই।

প্রশ্ন ঃ (৪৬৫) আকাশপথে আগমণকারী কিভাবে ইহরাম বাঁধবে?

উত্তর ঃ হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে আকাশ পথে আগমণকারী যে স্থানের উপর দিয়ে যাবে সে এলাকার মীকাতের বরাবর হলে ইহরাম বাঁধবে। তাই গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রথমে বাড়িতেই প্রস্তুতি নিবে। তারপর মীকাত

www.pathagar.com

পৌঁছার পূর্বে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। মীকাতের বরাবর পৌঁছলেই অন্ত রে নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে ফেলবে। দেরী করবে না। কেননা এরোপ্লেন দ্রুত চলে। মিনিটেই অনেক পথ এগিয়ে যায়। অনেক মানুষ এক্ষেত্রে ভুল করে। পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। "আমরা মীকাতের বরাবর পৌঁছেছি" প্লেনের ক্রুর এঘোষণা শোনার পর তাড়াহুড়া শুরু করে। পরনের কাপড় খুলে ইহরামের কাপড় পরিধান করে। এটি মারাত্মক ভুল।

অবশ্য প্লেনের দায়িত্বশীল অফিসারের উচিত হচ্ছে, মীকাতের বরাবর পৌঁছার কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে ঘোষণা দেয়া। যাতে করে লোকেরা সতর্ক হয় এবং ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। তবে হাজ্জপালনকারী সাহেবগণ যদি প্লেনে উঠার পূর্বে ইহরামের কাপড় পরিধান করে নেন, তাহলে এটা তাদের জন্য অতি উত্তম হয়। মীকাতের বরাবর হলে সংকেত বা ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথেই তারা ইহরামের দু'আ পড়ে ইহরাম বেঁধে ফেলবেন।

প্রশ্ন ঃ (৪৬৬) উমরার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মীকাত অতিক্রম করতে চায় সে যেন ইহরাম ছাড়া অতিক্রম না করে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, "মদীনাবসীগণ ইহরাম বাঁধবে যুল হুলায়ফা থেকে..।"[১] অর্থাৎ তাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম না করা। যদি করেই ফেলে তবে ওয়াজিব হচ্ছে মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা গমন করা। এতে তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু যদি ফিরে না আসে এবং মীকাত অতিক্রম করার পর ইহরাম বাঁধে তবে বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া।

একটি পত্রঃ

মানুষ কিভাবে উড়োজাহাজে সলাত আদায় করবে? এবং কিভাবে ইহরাম বাঁধবে?

উত্তর ঃ

প্রথমতঃ উড়োজাহাজে সলাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

[১] . বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত।

www.pathagar.com

১) নফল সলাতের পদ্ধতি হচ্ছে, বিমানের সিটে বসে বসেই সলাত আদায় করবে। ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সাজদা করবে। সাজদার জন্য রুকূর চাইতে একটু বেশী মাথা ঝুকাবে।

২) সময় হলেই উড়োজহাজের উপর সলাত আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু সলাতের নির্দিষ্ট সময় বা দু'সলাত একত্রিত করার সময় শেষ হওয়ার আগেই যদি বিমান অবতরণ করার সম্ভাবনা থাকে, আর জমিনে থাকাবস্থায় যেভাবে সলাত আদায় করতে হয় সেভাবে যদি বিমানের উপর সম্ভব না হয়, (যেমন- কিবলামুখী হওয়া, রুকূ', সাজদা, কওমা ও বসা প্রভৃতি করা যদি সম্ভব না হয়) তবে সেখানে ফরয সলাত আদায় করবে না। বরং অবতরণ করার পর জমিনে সলাত আদায় করবে।

যেমনঃ জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে বিমান উড্ডয়ন করল। এখন আকাশে থাকাবস্থায় মাগরিব সলাত আদায় করবে না। পরবর্তী এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করার পর সলাত পড়বে। কিন্তু যদি দেখে যে, মাগরিব সলাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে এশা সলাতের সাথে মাগরিবকে একত্রিত করার নিয়ত করে নিবে। অতঃপর অবতরণ করে মাগরিব সলাতকে দেরী করে এশার সময় একত্রিত আদায় করবে। কিন্তু যদি বিমান চলতেই থাকে- অবতরণের সম্ভাবনা না থাকে এবং এশা সলাতেরও সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে বিমানের উপরেই সময় অতিক্রম হওয়ার আগেই মাগরিব ও এশা সলাত একত্রিত আদায় করে নিবে।

৩) বিমানের উপর ফরয সলাত আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, ক্বিবলামুখী দন্ডায়মান হয়ে তাকবীর দিবে। ছানা, সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকূ করবে। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সাজদা করবে। নিয়ম মাফিক সাজদা করতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং বসাবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে সাজদা করবে। সলাত শেষ করা পর্যন্ত এরূপই করবে। আর পূর্ণ সময় ক্বিবলামুখী হয়েই থাকবে। কিন্তু ক্বিবলা চিনতে না পারলে বা নির্ভরযোগ্য কেউ তাকে কিবলার সন্ধান দিতে না পারলে নিজ অনুমান ও গবেষণা অনুযায়ী সলাত আদায় করলে কোন অসুবিধা হবে না।

৪) উড়োজাহাজে মুসাফির সলাত কসর করবে। চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাত দু' রাক'আত করে আদায় করবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ উড়োজাহাজে হাজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পদ্ধতিঃ

১) এয়ারপোর্টে আসার আগেই গোসল, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করবে। এবং এয়ারপোর্টে এসে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে।

২) প্লেন মীকাতের নিকটবর্তী হলে যদি ইহরামের কাপড় পরিধান না করে থাকে তবে পরিধান করবে।

৩) মীকাতের বরাবর হলেই অন্তরে নিয়ত করে হাজ্জ বা উমরার জন্য তালবিয়া পড়ে ইহরামে প্রবেশ করবে।

৪) মীকাতের বরাবর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বেই যদি সতর্কতা বশতঃ বা খেয়াল থাকবে না এই ভয়ে ইহরাম করে নেয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

(আল্লাহই তাওফীক দাতা)

প্রশ্ন ঃ (৪৬৭) কোন ব্যক্তি যদি নিজ দেশ থেকে জেদ্দা সফর করে অতঃপর উমরা আদায় করার ইচ্ছা করে। সে কি জেদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে?

উত্তর ঃ এ মাসআলাটির দু'টি অবস্থাঃ

প্রথমঃ লোকটি উমরার নিয়ত না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কাজে জেদ্দা সফর করেছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর উমরা করার ইচ্ছা হয়েছে, তবে সে জেদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ)এর হাদীসে মীক্বাতের আলোচনায় বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি এই মীক্বাত সমূহের মধ্যে অবস্থান করে, সে যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।"[১]

দ্বিতীয়ঃ দৃঢ়ভাবে উমরার নিয়ত করেই জেদ্দা সফর করেছে। তাহলে যে মীক্বাতের নিকট দিয়ে গমন করবে তাকে অবশ্যই সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না। কেননা জেদ্দার অবস্থান মীক্বাতের সীমানার মধ্যে। নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি মীক্বাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ "এগুলো স্থান সেখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং যারা এর বাইওে থেকে সেখান দিয়ে যেতে চায় তাদের জন্য ইহরাম বাঁধার মীক্বাত- যারা হাজ্জ ও উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে।"[২]

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জ উমরার জন্য মক্কাবাসীর মীক্বাত।
[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ মীক্বাতের ভিতরে যারা থাকে তাদের মীক্বাত। হাঃ ১৫২৯।

www.pathagar.com

যদি জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধে এবং মক্কা প্রবেশ করে, তবে বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ মক্কায় একটি কুরবানী করতে হবে এবং তার গোশত মক্কার ফক্বীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। তাহলেই তার উমরা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

জেদ্দা যাওয়ার আগে যদি উমরার নিয়ত করে থাকে এবং বিনা ইহরামে জেদ্দা প্রবেশ করে, তবে নিকটবর্তী কোন মীকাতে ফেরত গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। এতে কোন ফিদ্‌ইয়া লাগবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৬৮) ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর গোসল করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ইহরামে প্রবেশ করার পর গোসল করতে কোন বাধা নেই। কেননা এটা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। চাই একবার গোসল করুক বা দু'বার। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে জানাবাতের (নাপাকীর) গোসল করা ওয়াজিব। আর ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা সুন্নাত।

প্রশ্ন ঃ (৪৬৯) মৃত দাদার পক্ষ থেকে হাজ্জ করার বিধান কি? অবশ্য তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায়কারী নিজের হাজ্জ সম্পাদন করেছে।

উত্তর ঃ যে মৃত দাদা নিজের হাজ্জ করেনি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করা জায়েয। কেননা সুন্নাতে নবী ﷺ থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ (৪৭০) ইহরামের জন্য বিশেষ কোন সলাত আছে কি?

উত্তর ঃ ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট কোন সলাত নেই। কিন্তু কোন লোক যদি এমন সময় মীক্বাতে পৌঁছে যখন ফরয সলাতের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন তার জন্য উত্তম হচ্ছে ফরয সলাত সম্পাদন করার পর ইহরাম বাঁধা।

ফরয সলাতের সময় নয় কিন্তু যুহা, চাশতের সলাতের সময়ে মিক্বাতে পৌঁছলো, তাহলে প্রথমে পরিপূর্ণরূপে গোসল করবে, সুগন্ধি মাখবে, ইহরামের কাপড় পরিধান করে চাশতের নিয়তে সলাত আদায় করবে তারপর ইহরামের নিয়ত করবে। চাশত সলাতের সময় না হলে তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়ত করে দু' রাক'আত সলাত পড়ে ইহরামে প্রবেশ করা উত্তম। কিন্তু ইহরামের নিয়তে সলাত আদায় করার কোন দলীল নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই।

প্রশ্ন ঃ (৪৭১) কোন ব্যক্তি যদি হাজ্জের মাসে উমরা আদায় করে মদীনা সফর করে, অতঃপর যুলহুলায়ফা থেকে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে, তবে সে কি তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ যখন কিনা এ ব্যক্তি হাজ্জের মাসে উমরা সম্পাদন করে এবছরেই হাজ্জ আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছে, তখন সে তামাত্তুকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা উমরা ও হাজ্জের মধ্যবর্তী কোন সফর তামাত্তুকে বাত্বিল করবে না। তবে যদি উমরা আদায় করার পর নিজ দেশে ফেরত যায় এবং সেখান থেকে হাজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করে, তবে তার তামাত্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেকটি কাজ সে আলাদা আলাদা সফরে সম্পাদন করেছে। অতএব উমরা সম্পাদন করার পর যে লোক মদীনা সফর করে যুলহুলায়ফা থেকে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে, সে তামাত্তু হাজ্জকারী হিসেবে কুরবানী দিবে।

কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾

"যে ব্যক্তি হাজ্জের সাথে উমরা করার নিয়ত করবে, সে সাধ্যানুযায়ী কুরবানী দিবে।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৬)

প্রশ্ন ঃ (৪৭২) কোন ব্যক্তি যদি শাওয়াল মাসে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা পূর্ণ করে। কিন্তু সে সময় সে হাজ্জের নিয়ত করেনি। কিন্তু হাজ্জের সময় তার হাজ্জ করার সুযোগ হল। সে কি তামাত্তুকারী গণ্য হবে?

উত্তর ঃ না, সে তামাত্তুকারী গণ্য হবে না। অতএব তাকে কুরবানীও দিতে হবে না।

প্রশ্নঃ (৪৭৩) নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত তালবিয়াটি কি? উমরা এবং হাজ্জের ক্ষেত্রে কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে?

উত্তর ঃ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত তালবিয়াটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক্, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক্, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক্, লা শারীকা লাক।"[১] ইমাম আহমাদ একটু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন, "লাব্বাইকা ইলাহাল হক্ব।" এর সনদ হাসান।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া ও তার পদ্ধতি।

www.pathagar.com

উমরার ক্ষেত্রে তওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে। আর হাজ্জের ক্ষেত্রে দশ তারিখে ঈদের দিন জামরা আকাবায় পাথর মারার পূর্বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। তিরমিযীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "নবী ﷺ উমরাতে হাজরে আস্‌ওয়াদ স্পর্শ করার সময় তালবিয়া বলা বন্ধ করতেন।"[১] ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেন। কিন্তু এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর্ রহমান বিন আবূ লায়লা নামক জনৈক বর্ণনাকারী আছে। অধিকাংশ হাদীস বিশারদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, নবী ﷺ আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে তাঁর আরোহীর পিছনে উসামা (রাঃ)কে বসিয়েছিলেন। মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে ফায্‌ল বিন আব্বাস (রাঃ)কে পিছনে বসিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে (উসামা ও ফায্‌ল) বলেছেন, তিনি ﷺ জামরা আকাবায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থেকেছেন।[২]

ইমাম মালেকের মতে হারাম শরীফে পৌঁছার সাথে সাথে তালবিয়া বলা বন্ধ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, বায়তুল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছলে বা কাবা ঘর দেখলেই তালবিয়া বলা বন্ধ করবে।

লাব্বাইক বলার অর্থ হচ্ছেঃ আপনার আনুগত্যের কাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনার আহবানে সাড়া দিচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ (৪৭৪) ইহ্‌রাম করে কি মাথা আঁচড়ানো জায়েয আছে?

উত্তর ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা আঁচড়ানো উচিত নয়। কেননা ইহ্‌রামকারীর উচিত হচ্ছে এলোকেশ ও ধুলোমলিন থাকা। তবে গোসল করতে কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া মাথা আঁচড়ালে চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইহ্‌রামকারী মাথা বা শরীর প্রভৃতি চুলকালে যদি কোন চুল পড়ে যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে ইচ্ছাকৃত চুল উঠায়নি। জেনে রাখা উচিত যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ যদি কেউ ভুলক্রমে করে ফেলে, তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

---

[১]. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ উমরাতে কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হবে।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জে আরোহণ করা একে অপরের পিছনে আরোহণ করা। মুসলিম....

www.pathagar.com

"তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু সে ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।" (সূরা আহযাব- ৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদের ভুল হয় বা ত্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে ধৃত করবেন না।" (সূরা বাক্বারা- ২৮৬)

ইহরামের অন্যতম নিষিদ্ধ কাজ শিকার করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় বন্য শিকারকে হত্যা করো না; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক তাকে হত্যা করবে, তার উপর তখন জরিমানা ওয়াজিব হবে, যা মূল্যের দিক দিয়ে সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে। তার অনুমানিক মূল্যের মীমাংসা তোমাদের মধ্যে হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক করে দেবে।" (সূরা মায়িদা- ৯৫)

এই আয়াতে 'ইচ্ছাপূর্বক' শব্দ উল্লেখ করাতে বুঝা যায়- যদি অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে ফেলে, তবে তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। এ বিধানই ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা ইসলাম ধর্ম ক্ষমা ও সহজতার বৈশিষ্টে অনন্য।

অতএব কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ যদি কেউ অজ্ঞতা বশতঃ বা ভুলবশতঃ করে ফেলে, তবে তার বিরুদ্ধে কোন বিধান প্রজোয্য হবে না, কোন ফিদ্ইয়া আবশ্যক হবে না- এমনকি স্ত্রী সহবাস করে ফেললেও হাজ্জ বিনষ্ট হবে না। উল্লেখিত শরীয়তের দলীলের দাবী অনুযায়ী এটাই বিশুদ্ধ কথা।

প্রশ্ন ঃ (৪৭৫) জনৈক হাজী সাহেব অজ্ঞতা বশতঃ মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে হালাল হয়ে গেছে। তার উপর আবশ্যক কি?

উত্তর ঃ অজ্ঞতা বশতঃ যে হাজ্জপালনকারী সাহেব মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে হালাল হয়ে গেছে, তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা সে অজ্ঞ। তবে জানার পর তাকে পূর্ণ মাথা থেকে চুল কাটতে হবে।

এ উপলক্ষে আমি মুসলিম ভাইদেরকে নসীহত করতে চাই, কোন ইবাদাত করতে চাইলে, তার সীমারেখা ও নিয়ম-নীতি না জেনে তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যাতে করে অজ্ঞতা বশতঃ এমন কিছু না করে ফেলে যাতে ইবাদাতটিই নষ্ট হয়ে যায়।

কেননা আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺকে লক্ষ্য করে বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ আল্লাহর দিকে বুঝে-শুনে দা'ওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা ইউসুফ- ১০৮)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

"আপনি বলুন, যারা জানে এবং জানে না তারা কি এক বরাবর? বুদ্ধিমানরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" (সূরা যুমার- ৯)

অতএব একজন লোক বুঝে-সুঝে আল্লাহর সীমারেখা জেনে-শুনে তাঁর ইবাদাত করবে এটা খুবই উত্তম। অজ্ঞতার সাথে বা মানুষের অন্ধানুসরণ করে আল্লাহর ইবাদাত করা উচিত নয়। কেননা না জেনে ইবাদাত করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশী তেমনি যাদের অনুসরণ করবে তাদের মধ্যে জ্ঞান থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ (৪৭৬) মক্কার বাইরের কোন লোক যদি প্রশাসনকে ফাঁকি দেয়ার জন্য বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করে অতঃপর মক্কা পৌঁছে ইহরাম বাঁধে, তার হাজ্জ কি বিশুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ তার হাজ্জ তো বিশুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু মুসলিম শাসককে ফাঁকি দেয়ার জন্য সে হারাম কাজ করেছে।

এটা হারাম হয়েছে দু'কারণেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করেছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুসলিম শাসকের আনুগত্য করার। অবশ্য আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে তাদের অনুগত্য করা যাবে না। অতএব তার উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর কছে তওবা করা। আর

www.pathagar.com

ফিদ্‌ইয়া প্রদান করা অর্থাৎ- একটি কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। কেননা সে মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধেনি। বিদ্বানদের মতে হাজ্জ বা উমরার কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে তার জন্য ফিদ্‌ইয়া প্রদান করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ঃ (৪৭৭) তামাত্তুকারী যদি নিজ দেশে ফেরত গিয়ে আবার হাজ্জের জন্য সফর করে, তবে কি ইফরাদকারী হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তামাত্তুকারী উমরা আদায় করার পর নিজ দেশে ফেরত গিয়ে আবার সেই বছর হাজ্জের জন্য মক্কা সফর করলে সে ইফরাদকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নিজ পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে হাজ্জ ও উমরার মাঝে বিচ্ছিন্নতা করেছে। আবার সফর শুরু করার অর্থ হচ্ছে সে হাজ্জের জন্য নতুনভাবে সফর করছে। তখন তার এই হাজ্জ ইফরাদ হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তামাত্তুকারীর মত কুরবানী করা তার জন্য ওয়াজিব হবে না। কিন্তু নিজ দেশে ফিরে যাওয়াটা যদি তার কুরবানী রহিত করার বাহানা হয়, তবে কুরবানী রহিত হবে না। কেননা কোন ওয়াজিব রহিত করার বাহানা করলে তা রহিত হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৭৮) ইহরাম অবস্থায় ছাতা ব্যবহার করার বিধান কি? অনুরূপভাবে সিলাইকৃত বেল্ট ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর ঃ সূর্যের তাপ বা বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাতা ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। কোন ক্ষতি নেই। একাজ হাদীসে পুরুষের মাথা ঢাকার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এটা মাথা ঢাকা নয়; বরং তা রৌদ্র প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়া গ্রহণ করা। সহীহ মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে, বিদায় হাজ্জে নবী (ﷺ)এর সাথে উসামা বিন যায়েদ ও বেলাল (রাঃ) ছিলেন। তাদের একজন নবী (ﷺ)এর উটনির লাগাম ধরে ছিলেন। অপরজন একটি কাপড় উপরে উঠিয়ে তাঁকে ছাঁয়া করছিলেন, এভাবে চলতে চলতে তিনি জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন।[১] এ হাদীস থেকে দলীল পাওয়া যায় যে, নবী (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় হালাল হওয়ার পূর্বে কাপড় দিয়ে ছাঁয়া গ্রহণ করেছেন।

লুঙ্গি বাঁধার জন্য যে কোন ধরনের বেল্ট ব্যবহার কারাতে কোন অসুবিধা নেই। আর 'সেলাইকৃত বেল্ট' প্রশ্নকারীর এই কথাটি সাধারণ মানুষের মধ্যে

---

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন আরোহী অবস্থায় জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

প্রচলিত ভুল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তাদের ধারণা, যে কোন প্রকারের সিলাই থাকলেই তা আর পরিধান করা যাবে না। কিন্তু কথাটি ভুল। 'সিলাইকৃত কাপড় পরিধান করা যাবে না' এ কথা দ্বারা বিদ্বানগণ বুঝিয়েছেন এমন সব কাপড় পরিধান করা যা শরীরের মাপে বানানো হয়েছে। সাধারণভাবে পোষাক হিসেবে যা পরিধান করা হয়। যেমন, জামা, পায়জামা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া প্রভৃতি। একারণে কোন মানুষ যদি এমন চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করে যা জোড়া-তালি দেয়া, তবে কোন অসুবিধা নেই- এমনকি যদি তার উভয় প্রান্ত সেলাই করা থাকে তাতেও কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৭৯) শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী জনৈক ব্যক্তি ইহ্‌রামের কাপড় পরতে সক্ষম নয়। সে কি করবে?

উত্তর ঃ কোন মানুষ যদি ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করতে সক্ষম না হয়, তবে যে কাপড় পরতে সে সক্ষম হবে তাই পরিধান করবে। বিদ্বানদের মতেঃ

ক) তাকে ফিদ্‌ইয়া হিসেবে একটি কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

খ) অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' তথা সোয়া কেজি পরিমাণ খাদ্য দিবে।

গ) অথবা তিনদিন সওম পালন করবে।

রোগের কারণে মাথা মুন্ডন করতে বাধ্য হলে যে বিধান প্রজোয্য হয় তার উপর কিয়াস করে বিদ্বানগণ উক্ত সমাধান দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

"কোন লোক যদি পীড়িত হয় বা তার মাথা যন্ত্রনাগ্রস্ত হয়, তবে সে সওম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা তার বিনিময় (ফিদ্‌ইয়া) আদায় করবে।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৬)

আর সওম ও সাদকার বিষয়টি পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই নবী ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ (৪৮০) হাজ্জের ইহ্‌রাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার হাজ্জের বিধান কি?

উত্তর ঃ এ কথা সুবিদিত যে, স্ত্রী সহবাস ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম; বরং তা ইহরামের সর্বাধিক কঠিন ও বড় নিষেধাজ্ঞা।

আল্লাহ বলেন,

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

"হাজ্জের মাস সমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হাজ্জ করার ইচ্ছা করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয নয়। জায়েয নয় কোন অশোভন কাজ করা, না কোন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া।" (সূরা বাকারা- ১৯৭)

الرفث এর অর্থ হচ্ছে, সহবাস ও তার পূর্বের কাজ সমূহ। অতএব ইহরামের সর্বাধিক কঠিন নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। হাজ্জের ইহরামে থেকে কোন লোক যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে হয় তা প্রথম হালালের পূর্বে হবে অথবা প্রথম হালালের পর হবে। যদি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস হয়, তবে তার উপর নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবেঃ

প্রথমতঃ তার ঐ হাজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। চাই তা ফরয হাজ্জ হোক বা নফল হাজ্জ হোক।

দ্বিতীয়তঃ সে গুনাহগার হবে।

তৃতীয়তঃ হাজ্জের অবশিষ্ট কাজ তাকে পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ- হাজ্জ নষ্ট হওয়া সত্বেও হাজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

চতুর্থতঃ পরবর্তী বছর অবশ্যই তাকে উক্ত হাজ্জের কাযা আদায় করতে হবে। চাই তা ফরয হাজ্জ হোক বা নফল হাজ্জ হোক। হাজ্জ ফরয হলে তো কাযা আদায় করার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে সে হাজ্জের ফরযিয়াতের যিম্মা মুক্ত হতে পারে নি।

কিন্তু নফল হাজ্জ হলেও তাকে কাযা আদায় করতে হবে। কেননা হাজ্জ আরম্ভ করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ ও উমরাকে পূর্ণ কর।" (সূরা বাকারা- ১৯৬) তাছাড়া হাজ্জের কাজ শুরু করলে তা ফরয হয়ে যায়। যেমনটি পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন। "হাজ্জের মাস সমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হাজ্জ ফরয করবে...।" এই জন্য আমরা বলব, হাজ্জ নফল হোক বা ফরয হোক, যে কোন কারণে তা বিনষ্ট করে ফেললে তা কাযা আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

পঞ্চমতঃ কাফ্ফারা স্বরূপ তাকে জরিমানা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি উট যবেহ্ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দেয়া। উটের পরিবর্তে যদি সাতটি ছাগল যবেহ্ করে তাও জায়েয আছে।

এই বিধান হচ্ছে প্রথম হালালের পূর্বে হলে। (অর্থাৎ- ১০ তারিখে বড় জামরায় কংকর মেরে মাথা মুন্ডন করার পূর্বে)

কিন্তু প্রথম হালালের পর সহবাস করলে তার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবেঃ

প্রথমতঃ সে গুনাহ্গার হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহ্রাম বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ কাফ্ফারা হিসেবে নিম্ন লিখিত তিনটি বিষয়ের কোন একটি করবেঃ

ক) একটি ছাগল যবেহ্ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে। অথবা

খ) ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' পরিমাণ খাদ্য দিবে। অথবা

গ) তিন দিন সওম রাখবে।

এ তিনটির যে কোন একটি জরিমানা স্বরূপ আদায় করবে।

চতুর্থতঃ নতুন করে ইহ্রামে প্রবেশ করবে। মক্কার হারাম সীমানার বাইরে নিকটতম কোন স্থানে গমন করে সেখান থেকে ইহ্রাম বেঁধে আসবে এরপর ইহ্রাম অবস্থায় তওয়াফে এফাযা বা হাজ্জের তওয়াফ করবে। এভাবেই ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন।

যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ প্রথম হালাল হওয়ার অর্থ কি?

জবাবঃ হাজ্জপালনকারী সাহেব যখন ঈদের দিন (যিল্ হাজ্জের দশ তারিখে) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করে তখন সে প্রথম হালাল হয়ে যায়। তখন স্ত্রী সহবাস ব্যতীত ইহ্রামের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী ﷺ এর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে, এবং হালাল হওয়ার পর বায়তুল্লাহর তওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।'[১] এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হালাল হওয়ার পরেই আছে

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামকারীর ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

www.pathagar.com

বায়তুল্লাহর তওয়াফ। যেমনটি পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ঈদের দিন বড় জামরায় কঙ্কর মারার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করার মাধ্যমে প্রথম হালাল হবে। এই হালালের পূর্বে সহবাস হলে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় আবশ্যক হবে। আর এই হালালের পর সহবাস হলে, উল্লেখিত চারটি বিষয় আবশ্যক হবে।

কোন লোক যদি মূর্খতা বশতঃ এই কাজ করে অর্থাৎ- ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম এ কথা তার জানা নেই, তবে তার কোন ক্ষতি হবে না। কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। চাই প্রথম হালালের পূর্বে হোক বা পরে হোক। কেননা আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি অথবা ভুলে যাই তবে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।" (সূরা বাক্বারা- ২৮৬)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাব-৫)

যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম এ লোক যদি এ কথা জানে কিন্তু এটা জানে না যে, সহবাস করলে এত কিছু আবশ্যক হবে বা এই জরিমানা দিতে হবে, জানলে হয়তো সে একাজে লিপ্ত হতো না। তবে এর বিধান কি? তার এই অজ্ঞতার ওযর কি গ্রহণযোগ্য হবে?

জবাবঃ তার এই ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ওযর হচ্ছে, বিষয়টি সম্পর্কে সম্পর্ণরূপে অজ্ঞ থাকা। বিষয়টি যে হারাম সে ব্যাপারে তার কোনই জ্ঞান না থাকা। কিন্তু বিষয়টি হালাল না হারাম এই বিধান জানার পর, করলে কি লাভ বা না করলে কি ক্ষতি তা জানা আবশ্যক নয়। এই নাজানা ওযর হিসেবে গণ্য হবে না।

যেমন, জনৈক বিবাহিত ব্যক্তি যদি জ্ঞান রাখে যে, ব্যভিচার হারাম। সে বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। সে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে অবশ্যই তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করতে হবে। সে যদি বলে যে, ব্যভিচার করলে যে রজমের শাস্তি আছে আমি তা জানতাম না। জানলে এ অন্যায় আমি করতাম না, তার এই কথা গ্রহণ করা হবে না। তাকে রজম করতেই হবে।

এই কারণে জনৈক ব্যক্তি রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করে নবী ﷺ এর নিকট এসে তার করণীয় কি জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। অথচ সহবাস করার সময় সে কাফ্ফারা

সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এথেকে বুঝা যায়, কোন মানুষ যদি অন্যায়ে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করে, তখন উক্ত অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে। যদিও এর শাস্তি সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকে।

প্রশ্ন ঃ (৪৮১) ইহরাম অবস্থায় নারী কিভাবে পর্দা করবে? পর্দা মুখ স্পর্শ করতে পারবে না এ রকম কোন শর্ত আছে কি?

উত্তর ঃ ইহরাম অবস্থায় নারী যদি মাহরাম নয় এমন কোন পুরুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে বা তার নিকট কোন পুরুষ অতিক্রম করে, তবে অবশ্যই স্বীয় মুখমণ্ডল ঢেকে নিবে। যেমনটি মহিলা সাহাবীগণ (রাঃ) করতেন। একারণে তাকে কোন ফিদ্ইয়া দিতে হবে না। কেননা পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ঢাকা আল্লাহ্ নির্দেশ। আর নির্দেশ কখনো নিষেধ হতে পারে না।

পর্দা মুখমণ্ডল স্পর্শ করতে পারবে না এ রকম কোন শর্ত নেই। এতে কোন অসুবিধা নেই। পরপুরুষের সামনে এলেই তাকে অবশ্যই মুখ ঢাকতে হবে। কিন্তু যদি খিমা বা তাঁবুতে অবস্থান করে এবং সেখানে কোন পরপুরুষ না থাকে, তবে মুখমণ্ডল খোলা রাখবে। কেননা ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে মুখ খোলা রাখা।

প্রশ্ন ঃ (৪৮২) হাজ্জ পালনকারী জনৈক নারী বিদায়ী তওয়াফ করার পূর্বে ঋতুবতী হয়ে যায়। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ যদি সে তওয়াফে এফাযাসহ হাজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে থাকে এবং শুধুমাত্র বিদায়ী তওয়াফ বাকী থাকে, তারপর ঋতুবতী হয় তবে বিদায়ী তওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

'লোকদের আদেশ দেয়া হয়েছে, কাবা ঘরের তওয়াফ যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয়। তবে বিষয়টি ঋতুবতীদের জন্য হালকা করে দেয়া হয়েছে।'[১] যখন নবী ﷺ-কে বলা হল যে, উম্মুল মু'মেনীন ছাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ) ঋতুবতী হয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি তওয়াফে ইফাযা বা হাজ্জের তওয়াফ করে নিয়েছেন। তখন নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তোমরা বের হয়ে যাও।"[২] তিনি তার জন্য বিদায়ী তওয়াফকে রহিত করে দিলেন।

---

১. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তওয়াফ। মুসলিম অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

২. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জের তওয়াফের পর নারী ঋতুবতী হলে। মুসলিম অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

www.pathagar.com

কিন্তু তওয়াফে ইফাযা বা হাজ্জের তওয়াফ ঋতুবতীর জন্য রহিত হবে না। ঋতুবতী হয় মক্কায় থেকে অপেক্ষা করবে এবং পবিত্র হলে তওয়াফে এফাযা করবে। অথবা সে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে কিন্তু ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে এবং পবিত্র হলে মক্কায় ফিরে এসে শুধুমাত্র হাজ্জের তওয়াফ করবে। যদি নিজ দেশে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তবে সুন্দর হয়- প্রথমে উমরা করে নিবে (তওয়াফ করবে, সাঈ করবে এবং চুল খাট করবে) তারপর হাজ্জের তওয়াফ করবে।

উল্লেখিত পন্থার কোনটিই যদি সম্ভব না হয়, তবে লজ্জাস্থানে প্যাড বা এজাতীয় কোন কিছু দিয়ে বেঁধে দিবে যাতে করে স্রাবের রক্ত মাসজিদে না পড়ে, তারপর হাজ্জের তওয়াফ করে নিবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা একান্ত জরুরী অবস্থা।

প্রশ্ন ঃ (৪৮৩) জনৈক নারী স্বামীর সাথে ঋতু অবস্থাতেই ইহরাম বাঁধে। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর কোন মাহরাম ছাড়াই সে উমরার কাজ সমাধা করে। কাজ শেষ হলে আবার রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। এর বিধান কি?

উত্তর ঃ প্রশ্নের ধরণে বুঝা যায় এ নারী মাহরামের সাথে মক্কায় আগমন করেছে। কিন্তু ঋতু অবস্থাতেই সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে। ঋতু অবস্থায় তার এই ইহরাম বিশুদ্ধ। কেননা নবী ﷺ বিদায় হাজ্জে যুলহুলায়ফার মীকাতে আগমন করলে আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) প্রশ্ন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ঋতুবতী হয়ে গেছি। তিনি বললেন, اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي "গোসল করে তোমার লজ্জাস্থানে কাপড় বা নেকড়া বেঁধে দাও এবং ইহরাম বাঁধ।"[১]

মক্কায় আসার পর পবিত্র হয়ে মাহরাম ছাড়া যদি উমরার কাজ সম্পাদন করে থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে শহরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু উমরা সম্পাদন করার পর সে যে আবার রক্ত দেখেছে তাতে তার পবিত্রতার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন দাঁড় করায়। আমরা বলব, যদি সে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা দেখে থাকে তবে তার উমরা বিশুদ্ধ। কিন্তু এই পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকলে নতুন করে উমরা করে নিবে। অবশ্য এর জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধার জন্য মীকাত যেতে হবে না। শুধুমাত্র তওয়াফ, সাঈ ও চুল খাট করার কাজগুলো নতুন করে সম্পাদন করবে।

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর হাজ্জ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪৮৪) জনৈক নারী তওয়াফে এফাযা করেনি। ইতোমধ্যে সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। তার ঠিকানা সঊদী আরবের বাইরে। হাজ্জ কাফিলাও চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই দেরী করা সম্ভব হবে না। এবং পরবর্তীতে মক্কা ফিরে আসাটাও তার জন্য দুরূহ ব্যাপার। এখন সে কি করবে?

উত্তর ঃ বিষয়টি যদি এরূপই হয় যেমন প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাজ্জের তওয়াফ না করেই নারী ঋতুবতী হয়ে গেছে। পবিত্র হয়ে তওয়াফ করার জন্য মক্কায় থেকে যাওয়াটাও তার জন্য দুঃসাধ্য অথবা চলে গেলে আবার মক্কা ফেরত আসাটাও অসম্ভব, তবে এ অবস্থায় নিম্ন লিখিত দু'টি সমাধানের যে কোন একটি সে গ্রহণ করতে পারেঃ

১) ঋতু বন্ধ করার জন্য ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার করবে- যদি তাতে ক্ষতির আশংকা না থাকে- তারপর তওয়াফ করবে।

২) লজ্জাস্থানে প্যাড বা কাপড় বেঁধে দিবে যাতে করে মাসজিদে রক্ত না পড়ে। তারপর তওয়াফ করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) পসন্দ করেছেন।

এর বিপরীত সমাধান হচ্ছে, নিম্ন লিখিত দু'টির যে কোন একটিঃ

১) ইহরামের অবশিষ্ট যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা থেকে বিরত থেকে ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। অর্থাৎ- স্বামী সহবাসে লিপ্ত হবে না। অবিবাহিতা হলে কোন বিবাহের আকদ করবে না। তারপর পবিত্র হলে তওয়াফ করবে।

২) অথবা নিজেকে হাজ্জের কর্ম সমূহ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত মনে করবে, এবং হালাল হওয়া যাবে এবং ফিদ্ইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী করে দিবে। কিন্তু এ অবস্থায় তার এই হাজ্জটি হাজ্জ হিসেবে গণ্য হবে না।

সন্দেহ নেই যে, উল্লেখিত এই দু'টি বিষয়ের উভয়টিই কঠিন। কারণ, ইহরাম অবস্থায় থেকে যাওয়াটা যেমন কঠিন ব্যাপার, তেমনি হাজ্জ বাত্বিল করে দেয়াটা আরো কঠিন। এ কারণে জরূরী অবস্থা হিসেবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর মতটিই এখানে সঠিক। আর আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনের মাঝে কোন অসুবিধা রাখেননি।" (সূরা হাজ্জ- ৭৮)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন, ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কঠিন কিছু তিনি চান না।" (সূরা বাকারা- ১৮৫)

কিন্তু এ নারীর জন্যে যদি সম্ভব হয় চলে গিয়ে পবিত্র হলে আবার ফেরত এসে হাজ্জের তওয়াফ করা, তবে কোন অসুবিধা নেই। তবে এই সময়ের মধ্যে স্বামী সহবাস জায়েয হবে না। কেননা তওয়াফ না করলে হাজ্জপালনকারী সাহেব দ্বিতীয় হালাল বা পূর্ণ হালাল হয় না।

প্রশ্ন ঃ (৪৮৫) জনৈক নারী উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু ঋতুবতী হয়ে যাওয়ার কারণে উমরা না করেই মক্কা থেকে ফেরত চলে গেছে। এর বিধান কি?

উত্তর ঃ উমরার ইহরাম বাঁধার পর যদি নারীর ঋতু এসে যায়, তবে ইহরাম বাতি্বল হবে না। এ নারী উমরার ইহরাম বাঁধার পর তওয়াফ-সাঈ না করেই মক্কা থেকে বের হয়ে গেছে, সে ইহরাম অবস্থাতেই রয়েছে। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে তওয়াফ, সাঈ ও চুল ছোট করে হালাল হওয়া। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। চুল বা নখ কাটবে না, স্বামী থাকলে তার সাথে সহবাস করবে না।

তবে ইহরাম বাঁধার সময় যদি ঋতুর আশংকায় শর্ত আরোপ করে নেয় যে, যেখানেই বাধাগ্রস্থ হবে সেখানেই সে হালাল হয়ে যাবে। তবে ঋতু আসার পর ইহরাম খুলে ফেললে তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৮৬) ইহরাম অবস্থায় নারী কি স্বীয় কাপড় বদল করতে পারবে? নারীর জন্য কি ইহরামের বিশেষ কোন পোষাক আছে?

উত্তর ঃ নারী যে কাপড়ে ইহরাম করেছে তা পরিবর্তন করে অন্য কাপড় পরিধান করতে পারে। পরিবর্তন করার দরকার থাক বা না থাক কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যে কাপড় পরবে তাতে যেন বেপর্দা হওয়ার আশঙ্কা না থাকে বা পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রকাশ না ঘটে।

নারীর জন্য ইহরামের বিশেষ কোন পোষাক নেই। তার ইচ্ছামত যে কোন পোষাক পরিধান করতে পারে। তবে নেকাব পরবে না এবং হাতমোজা পরিধান করবে না। নেকাব হচ্ছে এমন পর্দা মুখমণ্ডলে ব্যবহার করা যাতে চোখের জন্য ছিদ্র করা থাকে।

আর পুরুষের ইহরামের জন্য বিশেষ পোষাক আছে। তা হচ্ছে একটি চাদর অন্যটি লুংঙ্গি। তাই সে জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া, গেঞ্জি, পাগড়ী, টুপি, মোজা প্রভৃতি পরবে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪৮৭) ইহরামকারী নারীর কি হাত মোজা এবং পায়ের মোজা পরিধান করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ হাতমোজা ব্যবহার করা জায়েয নেই। পায়ের মোজা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই।

হাত মোজার ব্যাপারে নবী ﷺ এরশাদ করেন, "নারী হাত মোজা পরিধান করবে না।"[১]

প্রশ্ন ঃ (৪৮৮) জনৈক নারী ঋতুবতী অবস্থায় মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধেছে। মক্কায় আগমন করে বিলম্ব করে পবিত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করেছে। তার এই উমরার বিধান কি?

উত্তর ঃ তার উমরা বিশুদ্ধ। যদিও একদিন বা দু'দিন বা ততোধিক দিন বিলম্ব করে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঋতু থেকে পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পরই উমরা আদায় করবে। কেননা ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা জায়েয নয়। এজন্য আয়েশা (রাঃ) উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় আগমন করলে ঋতুবতী হয়ে পড়েন, তখন নবী ﷺ তাকে বলেন,

﴿افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي﴾

"হাজ্জপালনকারীগণ যা করে তুমিও তাই করে যাও, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করো না।"[২]

যখন ছুফিয়া (রাঃ) ঋতুবতী হয়ে গেলন, তখন নবী ﷺ বললেন, সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে নাকি? তিনি ভেবেছিলেন ছুফিয়া তওয়াফে এফাযা করেন নি। তারা বলল, তিনি তো তওয়াফে এফাযা করে নিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়'।[৩]

অতএব ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা বৈধ নয়। মক্কায় এসে ঋতুবতী হয়ে পড়লে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহর ঘর তওয়াফ শেষ করে সাঈ করার পূর্বে যদি ঋতু এসে যায়, তবে উমরা পূর্ণ করবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আর সাঈ শেষ করার পর ঋতু আসলে তখন বিদায়ী তওয়াফের আবশ্যকতা নেই। কেননা ঋতুবতীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ রহিত।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ শিকারের জরিমানা অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম পরিধানকারী নারী-পুরষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী তওয়াফ ছাড়া হাজ্জের যাবতীয় কাজ করবে।

[৩]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জের তওয়াফের পর নারী ঋতুবতী হলে। মুসলিম অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৪৮৯) মীকাত থেকে ঋতুবতী অবস্থায় জনৈক নারী ইহরাম বাঁধে। মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র সে খুলে ফেলে। এর বিধান কি?

উত্তর ঃ ঋতুবতী অবস্থায় নারী যদি মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে, তারপর মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র খুলে ফেলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, কাপড় পরিবর্তন করে ইচ্ছামত যে কোন বৈধ পোষাক পরিধান করা জায়েয। অনুরূপভাবে পুরুষও পরিধেয় ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করে অনুরূপ ইহরামের কাপড় পরিধান করতে পারে। কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (৪৯০) হাজ্জের সময় নিকাব দিয়ে নারীর মুখ ঢাকার বিধান কি? আমি একটি হাদীস পড়েছি যার অর্থ হচ্ছেঃ "ইহরামকারী নারী নেকাব পরবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।" আয়েশা (রাঃ)এর অন্য একটি কথা পড়েছি। তিনি বলেন, "আমাদের সামনে কোন পুরুষ এলে আমরা মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন আমরা ওদের সামনে চলে যেতাম, তখন মুখমণ্ডল খুলে রাখতাম" সে সময় তারা হাজ্জে ছিলেন। দু'টি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য কি?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, হাদীসের মর্ম অনুযায়ী নারী ইহরাম অবস্থায় নেকাব পরবে না। পুরুষ তার সম্মুখে আসুক বা না আসুক কোন অবস্থাতেই তার জন্য নেকাব ব্যবহার করা জায়েয নয়। সে হাজ্জে থাক বা উমরায় । নেকাব নারী সমাজে পরিচিত। আর তা হচ্ছে একটি পর্দা দিয়ে মুখন্ডল ঢেকে নেয়া যাতে দু'চোখের জন্য আলাদা আলাদা দু'টি ছিদ্র থাকে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস নেকাব নিষিদ্ধের হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ নয়। কেননা আয়েশার হাদীসে এ কথা বলা হয়নি যে তারা নেকাব পরতেন। বরং নেকাব না পরে মুখ ঢেকে ফেলতেন। আর পরপুরুষ সামনে এলে নারীদের মুখ ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। কেননা মাহ্রাম নয় এমন পুরুষের সামনে নারীর মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

অতএব ইহরামের ক্ষেত্রে সবসময় নেকাব পরিধান করা হারাম। আর পরপুরুষ সামনে না এলে মুখমণ্ডল খোলা রাখা ওয়াজিব। কিন্তু সামনে এলে ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। তবে নেকাব ছাড়া অন্য কাপড় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৪৯১) কোন মানুষ যদি ভুল ক্রমে অথবা অজ্ঞতা বশতঃ ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেলে, তবে তার বিধান কি?

উত্তর ঃ ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা করে ইহরাম না বেঁধে থাকে আর নিষিদ্ধ কোন কাজ করে তবে কোন অসুবিধা নেই।

www.pathagar.com

কেননা নিয়ত করে ইহরামে প্রবেশ করাটাই ধর্তব্য। ইহরামের কাপড় পরিধান করা মানেই ইহরাম করা নয়।

কিন্তু সঠিকভাবে নিয়ত করে ইহরামে প্রবেশ করার পর যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে, তবে কোন কিছু দিতে হবে না। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা শিখিয়ে দেয়ার সাথে সাথে অজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত হবে।

উদাহরণঃ ইহরাম করার পর ভুলক্রমে জামা পরে নিয়েছে, তার কোন গুনাহ নেই। তবে মনে পড়ার সাথে সাথে তাকে উক্ত জামা খুলে ফেলতে হবে। অনুরূপভাবে ভুলক্রমে সে পায়জামা খুলে নি। নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করার পর মনে পড়েছে যে, পায়জামা তো খুলা হয় নি। তখন সাথে সাথে সে তা খুলে ফেলবে।

কোন লোক সেলাই ছাড়া শুধু গিরা দিয়ে তৈরীকৃত একটি গেঞ্জি পরিধান করে যদি মনে করে যে, ইহরামকারীর জন্য শুধু সেলাইকৃত কাপড় পরা নিষেধ। তাই আমি এটা পরিধান করেছি, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। কেননা সে অজ্ঞ। কিন্তু যখন তাকে জানানো হবে যে, শরীরের মাপে তৈরীকৃত যাবতীয় পোষাক পরিধান করা নিষিদ্ধ তখন তা খুলে ফেলা তার জন্য আবশ্যক হবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজ যদি কোন মানুষ ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ বা বাধ্যগত অবস্থায় করে, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারা- ২৮৬) আল্লাহ বলেন, আমি তাই করলাম। আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাব-৫)

ইহরাম অবস্থায় বিশেষভাবে নিষিদ্ধকৃত পশু শিকার করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তা (শিকার) হত্যা করে।" (সূরা মায়েদা- ৯৫)

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। সকল ক্ষেত্রে বিধান একই। যেমন, পোষাক পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো প্রভৃতি অথবা শিকার হত্যা করা, চুল কেটে ফেলা প্রভৃতি। আলিমদের মধ্যে কেউ

www.pathagar.com

পার্থক্য করে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ভুল বা অজ্ঞতা বা বাধ্যগত কারণে মানুষ মা'যুর বা তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ (৪৯২) জনৈক হাজ্জপানলকারী হাজ্জ আদায় করার ক্ষেত্রে ভুলে লিপ্ত হয়েছে। ভুলের কাফ্‌ফারা দেয়ার জন্য তার কাছে তেমন কিছু ছিল না। সে দেশে ফেরত চলে গেছে। উক্ত কাফ্‌ফারা কি নিজ দেশে আদায় করা জায়েয হবে? নাকি মক্কাতেই পাঠাতে হবে? যদি মক্কাতেই পাঠাতে হয়, তবে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ হাজ্জপালনকারী কি ভুল করেছেন তা নির্দিষ্টভাবে অবশ্যই জানতে হবে। যদি কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করে থাকে, তবে ফিদ্‌ইয়া হিসেবে মক্কাতে একটি কুরবানী করতে হবে। মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও প্রদান করলে জায়েয হবে না। কেননা তা হাজ্জের সাথে সম্পৃক্ত।

কিন্তু যদি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে, তবে নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারেঃ

ক) একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে। **অথবা**

খ) ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' (এক কেজি বিশ গ্রাম) পরিমাণ খাদ্য দিবে। আর তা মক্কায় হতে হবে অথবা যে স্থানে ঐ নিষিদ্ধ কাজ করা হয়েছে সেখানে। **অথবা**

গ) তিন দিন সওম রাখবে। এই তিনটি সওম মক্কা বা যে কোন স্থানে রাখতে পারে।

তবে নিষিদ্ধ কাজটি যদি হাজ্জের প্রথম হালালের আগে স্ত্রী সহবাস হয়, তবে ওয়াজিব হচ্ছেঃ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার স্থানে অথবা মক্কায় একটি উট যবেহ করবে এবং ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে।

অথবা নিষিদ্ধ কাজটি যদি কোন প্রাণী শিকার করা হয়, তবে ওয়াজিব হচ্ছেঃ তার অনুরূপ প্রাণী যবেহ করা অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা বা তিনটি সওম পালন করা। সওম পালন যে কোন স্থানে করা যায়। কিন্তু খাদ্য দান বা কুরবানী যবেহ করা অবশ্যই মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে হতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, "কুরবানী কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।"

(সূরা মায়েদা- ৯৫)

www.pathagar.com

অন্য মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে উক্ত কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয আছে। কেননা নবী ﷺ তাঁর অবশিষ্ট কুরবানীগুলো যবেহ করার জন্য আলী (রাঃ)কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ (৪৯৩) তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ তওয়াফে এফাযার পূর্বে সাঈ করা জায়েয। কেননা নবী ﷺ কুরবানীর দিন একস্থানে দন্ডায়মান হলেন, লোকেরা তাকে প্রশ্ন করতে লাগল। কেউ প্রশ্ন করল, سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ 'তওয়াফ করার পূর্বে আমি সাঈ করে নিয়েছি।' তিনি বললেন, لاَحَرَجَ "কোন অসুবিধা নেই।"[১] তামাত্তুকারী যদি তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে এবং ইফরাদকারী বা ক্বেরাণকারী তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকলে হাজ্জের তওয়াফের পূর্বে যদি সাঈ করে, তবে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (৪৯৪) রামাযানে বারবার উমরা করার বিধান কি? এ রকম কোন সময় কি নির্দিষ্ট আছে যে, এতদিন পরপর উমরা করতে হবে?

উত্তর ঃ রামাযানে বারবার উমরা করা বিদআত। কেননা এক মাসের মধ্যে বারবার উমরা করা সালাফে সালিহীন তথা সাহাবায়ে কেরামের নীতির বিপরীত। এমনকি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেছেন, সালাফে সালেহীনের ঐকমত্যে বারবার বেশী পরিমাণে উমরা করা মাকরূহ। বিশেষ করে যদি এটা রামাযানে হয়। বিষয়টি যদি পসন্দনীয় হত, তবে তাঁরা তো এব্যাপারে অধিক অগ্রগামী হতেন এবং বারবার উমরা করতেন। দেখুন না নবী ﷺ আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। নেক কাজকে সর্বাধিক ভালবাসতেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় উনিশ দিন সেখানে অবস্থান করেছেন সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু কোন উমরা আদায় করেননি।

আয়েশা (রাঃ) যখন উমরা করার ব্যাপারে পিড়াপিড়ী করছিলেন, তখন নবী ﷺ তাঁর ভ্রাতা আবদুর রহমানকে বললেন, একে তানঈম নিয়ে গিয়ে ইহরাম করিয়ে নিয়ে আস। যাতে করে তিনি উমরা আদায় করতে পারেন। কিন্তু আবদুর রহমানকে এ কথা বললেন না, তুমিও তাঁর সাথে উমরা করে নিও। যদি

---

১. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ হাজ্জ-উমরা, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জে একটি কাজের পূর্বে অন্যটি করে ফেলার বিধান। হাঃ ১৭২৩।

www.pathagar.com

বিষয়টি শরীয়ত সম্মত হতো তবে নবী ﷺ তাঁকে সে নির্দেশনা দিতেন। সাহাবায়ে কেরামের নিকট বিষয়টি শরীয়ত সম্মত হলে আবদুর রহমান তা করতেন। কেননা তিনি তো হারাম এলাকার বাইরে গিয়েছিলেন।

দু'উমরার মাঝে কত ব্যবধান হওয়া উচিত এসম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, দেখবে যে পর্যন্ত মাথা পোড়া কাঠের মত কালো না হয়। অর্থাৎ- মাথা ভর্তি চুল না হয়।

প্রশ্ন ঃ (৪৯৫) তওয়াফ চলাবস্থায় যদি সলাতের ইকামত হয়ে যায়, তবে কি করবে? তওয়াফ কি পুনরায় শুরু করবে? পুনরায় শুরু না করলে কোথা থেকে তওয়াফ পূর্ণ করবে?

উত্তর ঃ মানুষ যদি উমরা বা হাজ্জ বা বিদায়ী তওয়াফ বা নফল তওয়াফে লিপ্ত থাকে, আর ফরয সলাতের ইকামত হয়ে যায়, তবে তওয়াফ ছেড়ে দিয়ে সলাতের কাতারে শামিল হয়ে যাবে। সলাত শেষ হলে যেখান থেকে তওয়াফ ছেড়েছিল সেখান থেকে তওয়াফ পূর্ণ করবে। নতুনভাবে তওয়াফ শুরু করার দরকার নেই এবং ঐ চক্করও নতুনভাবে শুরু করবে না। কেননা সে তো শরীয়ত সম্মত বিশুদ্ধ ভিত্তির উপরই বাকী কাজ আদায় করছে। সুতরাং শরীয়তের দলীল ছাড়া তার আগের কাজকে বাত্বিল বলা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ (৪৯৬) জনৈক ওম রাক'আরী তওয়াফের পূর্বে সাঈ করেছে, তারপর তওয়াফ করেছে। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ ওম রাক'আরী তওয়াফের পূর্বে যদি সাঈ করার পর তওয়াফ করে থাকে তবে তাকে পুনরায় সাঈ করতে হবে। কেননা দু'টি কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। প্রথমে তওয়াফ তারপর সাঈ। নবী ﷺ এ রকম সিরিয়ালেই তা আদায় করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে হাজ্জ-উমরার নিয়ম শিখে নাও।"[১] আমরা নবীজীর শিখানো পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমে আমাদেরকে তওয়াফ শুরু করতে হবে। তারপর সাঈ। কিন্তু যদি বলে যে, আমি প্রথমবার সাঈ করাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা তাকে বলব, তুমি কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সাঈ কর। কিন্তু ভুলের উপর অটল থাকা চলবে না।

তাবেঈদের মধ্যে কেউ এবং কতিপয় বিদ্বান মত পোষণ করেন যে, ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ কেউ যদি উমরাতে তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদ ঃ পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফাতাওয়া দেয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করেছে।

www.pathagar.com

ফেলে, তবে তাকে কোন কিছু দিতে হবে না। যেমনটি হাজ্জের বেলায় হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ (৪৯৭) ইয্‌তেবা' কাকে বলে? এ কাজ কোন সময় সুন্নাত?

উত্তর ঃ ইয্‌তেবা' হচ্ছে গায়ের চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে তার উভয় দিক বাম কাঁধের উপর রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা।

তওয়াফে কুদূম তথা মক্কায় আগমনের পর প্রথম তওয়াফের সময় এ কাজ সুন্নাত। অন্য সময় ইয্‌তেবা' করা জায়েয নয়। (সলাতের সময় উভয় কাঁধ ঢেঁকে রাখা আবশ্যক।)

প্রশ্ন ঃ (৪৯৮) নফল সাঈ করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ নফল সাঈ করা জায়েয নয়। কেননা সাঈ শুধুমাত্র হাজ্জ-উমরার সময় শরীয়ত সম্মত। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের হাজ্জ বা উমরা করবে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দূষণীয় নয়। আর কোন ব্যক্তি সেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞাত।" (সূরা বাক্বারা-১৮৫)

প্রশ্ন ঃ (৪৯৯) অজ্ঞতা বশতঃ কেউ যদি তওয়াফে এফাযা ছেড়ে দেয়, তবে তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ তওয়াফে এফাযা (হাজ্জের তওয়াফ) হাজ্জের অন্যতম রুকন। এটা আদায় না করলে হাজ্জ সম্পন্ন হবে না। কোন মানুষ এটা ছেড়ে দিলে তার হাজ্জ পূর্ণ হল না। এটা অবশ্যই আদায় করতে হবে- যদিও এজন্য তাকে নিজ দেশে ফিরে আসতে হয়। এই অবস্থায় যেহেতু সে হাজ্জের তওয়াফ করে নি, তাই তার জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়। কেননা সে এখনো পূর্ণ হালাল হয়নি। তওয়াফে এফাযার সাথে যদি সাঈও ছেড়ে থাকে, তবে তামাত্তুকারীকে তওয়াফে এফাযা এবং সাঈ করতে হবে এবং কেরাণ ও ইফরাদকারী তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকলে, তাদেরকেও তওয়াফে এফাযার সাথে সাঈ করতে হবে, তবেই তারা পূর্ণ হালাল হবে এবং হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ঃ (৫০০) অনেক তওয়াফকারীকে দেখা যায় ভীড়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে তাদের নারীদেরকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য পাঠায়। তাদের

www.pathagar.com

জন্য কোনটি উত্তম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা? নাকি পুরুষদের ভীড় থেকে দূরে অবস্থান করা।

উত্তর ঃ প্রশ্নকারী যখন এই আশ্চর্য বিষয় দেখেছে, আমি এর চাইতে অধিক আশ্চর্য জনক বিষয় দেখেছি। আমি দেখেছি কিছু লোক ফরয সলাতান্তে এক দিকে সালাম ফেরানো হলে দ্বিতীয় সালাম ফেরানোর পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার জন্য দৌড় দেয়। এতে তো তার ফরয সলাতই বাত্বিল হয়ে গেল। যে সলাত কিনা ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন। অথচ সে এমন একটি কাজ করতে ছুটেছে যা ওয়াজিব নয়। এমনকি তওয়াফ অবস্থায় না থাকলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা শরীয়ত সম্মতও নয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরাট ধরনের দুঃখ জনক অজ্ঞতা। তওয়াফ ছাড়া হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সুন্নাত নয়। এব্যাপারে আমার কোন দলীল জানা নেই। আমি এই স্থান থেকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আমার জ্ঞানের বাইরে যদি কারো কাছে এমন কোন দীলল জানা থাকে যে, তওয়াফ না করলেও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা শরীয়ত সম্মত, তবে সে যেন আমাদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

অতএব হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা তওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্গত। তাছাড়া এটা তখনই সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে যখন তা চুম্বন করতে গিয়ে তওয়াফকারী কষ্ট পাবে না বা অন্য কাউকে কষ্ট দেয়া হবে না। যদি তওয়াফকারীর কষ্ট হয় বা অন্য কাউকে কষ্ট দেয়া হয়, তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপ অবলম্বন করবে এবং তা হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতকে চুম্বন করবে। যেমনটি নবী ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যদি একাজও কষ্ট করা ও কষ্ট দেয়া ছাড়া আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে আমরা তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়ে দূর থেকে হাজরে আসওয়াদকে এক হাত দ্বারা ইশারা করব। কিন্তু সে হাতকে চুম্বন করব না। এটাই হচ্ছে নবী ﷺএর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সুন্নাতী পদ্ধতি।

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বনের বিষয়টি আরো জটিল ও কঠিন হবে- যেমনটি প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন- নারীদেরকে পাথর চুম্বন করার জন্য ঠেলে দেয়া, হতে পারে সে নারী গর্ভবতী বা বৃদ্ধা বা দুর্বল যুবতী অথবা শিশুকে উপরে উঠিয়ে চুম্বনের জন্য এগিয়ে দেয়া, তবে এসব কাজ গর্হিত ও নাজায়েয। কেননা এতে দুবর্ল লোকদেরকে ভয়ঙ্কর এক অবস্থার দিকে ঠেলা দেয়া হচ্ছে, যেখানে আছে সংকীর্ণতা ও পুরুষদের ভীড়ের প্রচন্ডতা। তাই বিষয়টি মাকরূহ অথবা হারামের অন্তর্গত। আল্লাহ্‌র রহমতে অন্য ব্যবস্থা থাকতে কোন মানুষের

www.pathagar.com

পক্ষে এদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। আপনি যদি কঠিনভাবে ইসলামের বিধান পালন করতে চান, তবে পরাজিত হবেন।

প্রশ্ন ঃ (৫০১) জনৈক নারী স্বামীর সাথে তামাত্তু হাজ্জ করতে এসেছে। তারা উমরার তওয়াফ করার সময় ৬ষ্ঠ চক্করে স্বামী বললেন, এটাই ৭ম চক্কর। এবং তিনি নিজ মতের উপর অটল ছিলেন। এখন স্ত্রীর করণীয় কি?

উত্তর ঃ উক্ত নারী যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সে ৬ চক্কর দিয়েছে এবং তওয়াফ পূর্ণ করে নি। তবে এখন পর্যন্ত তার উক্ত উমরা পূর্ণ হয়নি। কেননা উমরার অন্যতম রুকন হচ্ছে পূর্ণ সাত চক্কর তওয়াফ করা। এরপর যদি হাজ্জের ইহরাম করে থাকে, তখন সে কেরাণকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা উমরা শেষ করার আগেই সে উমরাকে হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করে নিয়েছে।

কিন্তু স্বামীর অটলতা দেখে যদি স্ত্রী সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়, তবে কোন অসুবিধা নেই। তখন তার উমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তার সন্দেহ, আর স্বামীর নিশ্চয়তা এ অবস্থায় স্বামীর কথায় ফিরে আসবে এবং সেটাকেই প্রাধান্য দিবে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (৫০২) উমরা বা হাজ্জকারী যদি দু'আ না জানে, তবে তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতির সময় কি কোন বই হাতে নিয়ে দেখে দেখে দু'আ পাঠ করা জায়েয হবে?

উত্তর ঃ হাজ্জ বা উমরাকারী যে সমস্ত দু'আ জানে এগুলোই তার জন্যে যথেষ্ট। কেননা সাধারণতঃ সে যা জানে তা সে বুঝে। আর বুঝে-শুনেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু যদি কোন বই হাতে নিয়ে দু'আ পড়ে বা কাউকে ভাড়া নিয়ে তার শিখিয়ে দেয়া দু'আ পড়ে- যার কিছুই সে বুঝে না, তবে তাতে কোনই উপকার হবে না। তাছাড়া বাজারের এই বইগুলোতে তওয়াফ-সাঈর জন্য যে দু'আ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বিদআত এবং বিভ্রান্তি। কোন মুসলমানের জন্য এগুলো পাঠ করা জায়েয নয়। কেননা নবী ﷺ উম্মতকে প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা ও বিশেষ কোন দু'আ শিক্ষা দেননি। সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নবী ﷺ বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

www.pathagar.com

"আল্লাহর ঘরের তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করা।"[১]

তাই সকল মু'মিনের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এ ধরনের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক থাকা। আর নিজের দরকারের কথা আল্লাহর কাছে এমন ভাষায় পেশ করা যার অর্থ সে নিজে অনুধাবন করে। সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র করা। অর্থ বুঝে না এমন শব্দ ব্যবহার করার চাইতে এটাই তার জন্য উত্তম। অনেকে এমনও আছে যে অর্থ বুঝা তো দূরের কথা বইয়ের শব্দ বা বাক্যগুলোই ভালভাবে পড়তে পারে না।

প্রশ্ন ঃ (৫০৩) হাজ্জ-উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করার জন্য তওয়াফ-সাঈতে কি বিশেষ কোন দু'আ আছে?

উত্তর ঃ হাজ্জ-উমরার জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। মানুষের জানা যে কোন দু'আ পাঠ করতে পারবে। কিন্তু নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত দু'আ সমূহ পাঠ করা উত্তম। বিশেষ করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাতঃ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ্‌, ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।" অনুরূপভাবে সাফা-মারওয়ায় ও আরাফার দিবসের প্রমাণিত দু'আ পাঠ করতে পারে। সুন্নাত থেকে প্রমাণিত যে সমস্ত দু'আ জানা আছে তাই পাঠ করা উচিত। কিন্তু জানা না থাকলে তার মাথায় যে দু'আই আসে তাই পাঠ করা যাবে। কেননা এই দু'আ পাঠ করা ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং তা মুস্তাহাব।

এ উপলক্ষে আমি বলতে চাইঃ হাজ্জ-উমরার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা হাজ্জপালনকারীদের হাতে দেখা যায়। তাতে তওয়াফ-সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দু'আ নির্দিষ্ট করা থাকে। এটা বিদআত। এতে নিশ্চিতভাবে অনেক ধরনের বিপদ আছে। যেমন,

১) যারা এটা পাঠ করে ধারণা করে যে, বইয়ের দু'আগুলো নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত।

২) তারা এই দু'আর প্রত্যেকটি শব্দ পাঠ করা ইবাদাত মনে করে।

৩) তার কোন মর্ম বা অর্থ না বুঝেই তা পাঠ করে।

---

[১]. আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদ ঃ রমল করা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

www.pathagar.com

৪) প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ নির্দিষ্ট করে।

৫) ভীড়ের কারণে চক্কর পূর্ণ হওয়ার আগেই দু'আ পড়া শেষ হয়ে গেলে চুপ করে থাকে।

৬) আর দু'আ শেষ হওয়ার আগে চক্কর শেষ হয়ে গেলে দু'আ পড়া ছেড়ে দেয়। এই বিদআতী আমলের কারণে এতগুলো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

অনুরূপভাবে মাক্বামে ইবরাহীমের কাছে পাঠ করার জন্য ঐ বইয়ে যে দু'আ পাওয়া যায়, তাও বিদআত। কেননা তা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। বরং তিনি সেখানে গিয়ে পাঠ করেছেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।" (সূরা বাক্বারা- ১২৫) এবং তিনি এর পিছনে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। অতএব যারা এখানে এসে অতিরিক্ত দু'আ পাঠ করে এবং অন্যান্য মুছল্লী ও তওয়াফকারীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাদের এই কাজ দু'টি কারণে গর্হিত ও বিদ'আতঃ

ক) এ সমস্ত দু'আ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কারণে তা বিদআত।

খ) যারা মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে সলাত আদায় করে তাদের সলাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। (আল্লাহ এদের হেদায়াত করুন।)

প্রশ্ন ঃ (৫০৪) উমরা শেষ করার পর জনৈক ব্যক্তি তার ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পেল। এখন সে কি করবে?

উত্তর ঃ কোন মানুষ উমরার তওয়াফ ও সাঈ শেষ করার পর যদি ইহরামের কাপড়ে নাজাসাত বা নাপাকী দেখতে পায়, তবে তার তওয়াফ বিশুদ্ধ, সাঈ বিশুদ্ধ তথা উমরা বিশুদ্ধ। কেননা কারো কাপড়ে যদি তার অজানাতে কোন নাপাকী লেগে থাকে অথবা জানে কিন্তু তা পরিস্কার করতে ভুলে যায় এবং সেই কাপড়ে সলাত আদায় করে, তবে তার সলাত বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে ঐ কাপড়ে যদি তওয়াফ করে তবে তওয়াফও বিশুদ্ধ। এ কথার দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারা- ২৮৬)

এটি একটি আ'ম দলীল। এটা ইসলামের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এখানে একটি বিশেষ দলীল আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় সলাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ তিনি জুতা খুলে

www.pathagar.com

ফেললেন। লোকেরাও জুতা খুলে ফেললেন। সলাত শেষ করে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি হয়েছে? কেন তোমরা জুতা খুলে ফেললে? তারা বললেন, আপনি জুতা খুলে ফেলেছেন, আপনার দেখাদেখি আমরাও জুতা খুলে ফেললাম। তিনি বললেন, "জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার জুতায় নাপাকী আছে। তাই আমি এটা খুলে ফেলেছি।"[১] কিন্তু নবীজী নতুন করে আর সলাত আদায় করলেন না। অথচ তাঁর সলাতের প্রথম দিকের কিছু অংশ নাপাকী নিয়েই হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা জানতেন না। অতএব ভুলক্রমে অথবা না জানার কারণে কেউ যদি কাপড়ে নাপাকী নিয়ে সলাত আদায় করে বা তওয়াফ করে তবে তা বিশুদ্ধ হবে।

একটি মাসআলাঃ কোন মানুষ যদি ছাগলের মাংস মনে করে উটের মাংস খায় এবং এ ভিত্তিতে ওযূ না করেই সলাত আদায় করে। যখন বিষয়টি সে জানবে তখন তাকে কি সলাত পুনরায় পড়তে হবে?

হ্যাঁ, ওযূ করে তাকে সলাত পুনরায় পড়তে হবে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, এটা কেমন কথা অজ্ঞতা বশতঃ নাপাকী নিয়ে সলাত আদায় করে ফেললে তা দোহরাতে হবে না; কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ উটের মাংস খেয়ে ওযূ না করে সলাত আদায় করলে তা দোহরাতে হবে?

এর জবাবঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি (theory) হচ্ছে, *[নির্দেশ মূলক বিষয় অজ্ঞতা ও ভুলের কারণে রহিত হয় না। কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয় অজ্ঞতা ও ভুলের কারণে রহিত হয়ে যায়।]* এই মূলনীতির দলীল হচ্ছেঃ নবী ﷺ-এর বাণীঃ তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে বা ভুলে যায়, তবে স্মরণ হলেই সে যেন তা আদায় করে নেয়।"[২] কোন এক সময় নবী ﷺ ভুলক্রমে দু' রাক'আত সলাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলেন, বিষয়টি তাঁকে স্মরণ করানো হলো, তিনি তখন শুধুমাত্র ছুটে যাওয়া দু' রাক'আতই আদায় করলেন। এথেকে বুঝা যায় নির্দেশিত বিষয় ভুলে যাওয়ার কারণে রহিত হয় না। কেননা নবী ﷺ আদেশ করেছেন সলাত ভুলে গেলে স্মরণ হলেই আদায় করে নিতে হবে। তা ছেড়ে দেয়া যাবে না।

অনুরূপভাবে অজ্ঞতার কারণে নির্দেশ মূলক রহিত হয় না তার দলীল হচ্ছে, জনৈক ব্যক্তি এসে খুব তাড়াহুড়া করে সলাত আদায় করলো, তারপর

---

১. আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ সলাত , অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরে সলাত আদায় করা।
২. দেখুন ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর।

www.pathagar.com

নবী ﷺএর নিকট এসে সালাম দিলো, তিনি তাকে বললেন ঃ ফিরে যাও আবার সলাত আদায় করো, কেননা তুমি সলাতই আদায় করো নি। এভাবে তিন বার তাকে ফেরালেন। প্রতিবারই সে সলাত আদায় করে তাঁর কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, "ফিরে গিয়ে সলাত আদায় কর। কেননা তুমি সলাতই আদায় করো নি।"[১] শেষ পর্যন্ত নবী ﷺ তাকে সলাত শিখিয়ে দিলেন, ফলে সে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সলাত আদায় করল। এই লোকটি সলাতের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব 'ধীরস্থিরতা' অজ্ঞতার কারণে পরিত্যাগ করেছিল। সে বলেছিল, 'শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চাইতে সুন্দর ভাবে সলাত আদায় করতে জানি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।' অজ্ঞতার কারণে যদি ওয়াজিব রহিত হয়ে যেত, তবে নবী ﷺ তার ওযর গ্রহণ করতেন এবং বারংবার তাকে সলাত পড়তে বলতেন না।

প্রশ্ন ঃ (৫০৫) মাক্বামে ইবরাহীমে যে পদচিহ্ন দেখা যায়, তা কি প্রকৃতই ইবরাহীম (আঃ)এর পায়ের চিহ্ন?

উত্তর ঃ সন্দেহ নেই মাক্বামে ইবরাহীম সুপ্রমাণিত। কাঁচে ঘেরা স্থানটিই মাক্বামে ইবরাহীম। কিন্তু এর মধ্যে যে গর্ত দেখা যায় তাতে পায়ের কোন চিহ্ন প্রকাশিত নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, বহুকাল পর্যন্ত পাথরের উপর দু'পায়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানের এই গর্তটি শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য করা হয়েছে। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, এই গর্তই ইবরাহীম (আঃ)-এর পদদ্বয়ের চিহ্ন।

এ উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনেক ওমরাক'আরী ও হাজ্জ পালনকারী মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে এসে এমন কিছু দু'আ পাঠ করে যা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। কখনো এরা উঁচু কণ্ঠে দু'আ পাঠ করে এবং মুছল্লী বা তওয়াফকারীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মাক্বামে ইবরাহীমের জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই। মানুষ যা পাঠ করে তা মৌলবীদের তৈরীকৃত। সুন্নাত হচ্ছে তওয়াফ শেষ করে (মাক্বামে ইবরাহীমের) পিছনে এসে হালকা করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করা। (বেশী ভীড় থাকলে সেখানে সলাত না পড়ে আরো পিছনে বা যে কোন স্থানে সলাত আদায় করা যাবে।) তারপর সলাত হয়ে গেলেই সেখানে বসে থাকবে না; যারা সলাত পড়তে চায় তাদের জন্য জায়গা খালি করে দিবে।

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ক্বেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সলাত অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৫০৬) কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে দু'আ বা কান্নাকাটি করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে বরকত কামনা করা বা দু'আ বা কান্নাকাটি করা বিদআত। কেননা এ কাজ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই। মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তওয়াফ করার সময় যখন কা'বা ঘরের প্রতিটি কোণ স্পর্শ করছিলেন, তখন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতিবাদ করেছেন। মুআবিয়া বললেন, 'কা'বা ঘরের কোন অংশই ছাড়ার নয়।' তখন ইবনু আব্বাস জবাবে বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমি দেখেছি নবী ﷺ শুধু মাত্র দু'টি কর্ণার স্পর্শ করেছেন। অর্থাৎ- হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী। অতএব আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে কা'বা ঘরকে ছোঁয়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে শুধুমাত্র সুন্নাত থেকে প্রমাণিত দলীলেরই অনুসরণ করব। কেননা এতেই আমরা রাসূল ﷺএর উত্তম আদর্শকে আঁকড়ে থাকতে পারব।

অবশ্য মুলতাযিম অর্থাৎ কা'বা ঘরের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্পর্শ করে দু'আ করা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (৫০৭) উমরায় মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করার বিধান কি? এ দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম?

উত্তর ঃ উমরায় মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। কেননা নবী ﷺ বিদায় হাজ্জে মক্কায় আগমন করে তওয়াফ ও সাঈ করার পর যারা কুরবানী সাথে নিয়ে আসেনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। নবী ﷺএর এই আদেশ ওয়াজিবের অর্থ বহণ করে। অতএব চুল ছোট করা আবশ্যক। তাছাড়া নবী ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরা করার জন্য গমন করলে হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফিরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি সাহাবীদেরকে সেখানেই মাথা মুন্ডন করার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা নির্দেশ পালনে দ্বিধায় ভোগলে তিনি তাদের উপর রাগন্বিত হন।

আর মাথার চুল ছোট করার চাইতে মাথা মুন্ডন করা উত্তম।[১]

---

১. কেননা নবী ﷺ মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দু'আ করেছেন এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করেছেন। বুখারী অধ্যায় ঃ হাজ্জ হাঃ ১৬১৩। মুসলিম অধ্যায় ঃ হাজ্জ হাঃ ২২৯৫।

www.pathagar.com

তবে তামাত্তুকারী যদি শেষ টাইমে মক্কায় পৌঁছে, তবে উমরা করার পর চুল ছোট করাই ভাল, যাতে করে হাজ্জের সময় মুন্ডন করার জন্য মাথায় চুল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ (৫০৮) জনৈক হাজী তামাত্তু হাজ্জ করতে এসে, উমরার তওয়াফ ও সাঈ শেষ করে ইহরাম খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করে নিয়েছে। মাথা মুন্ডন করেনি বা চুল ছোট করেনি। হাজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ করার পর এ সম্পর্কে সে জানতে চেয়েছে। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ এ ব্যক্তি উমরার একটি ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করেছে। তা হচ্ছে, চুল খাটো করা বা মাথা মুন্ডন করা। বিদ্বানদের মতে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ফিদ্ইয়া হিসেবে একটি কুরবানী করা। তা মক্কাতেই আদায় করতে হবে এবং সেখানকার ফকীরদের নিকট তার মাংস বিতরণ করতে হবে। তবেই তার তামাত্তু হাজ্জ সম্পাদন হবে এবং উমরা বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ঃ (৫০৯) তামাত্তু হাজ্জ করার জন্য ইহরাম বাঁধার পর উমরা শেষ করে চুল ছোট করেনি বা মুন্ডনও করেনি। পরে হাজ্জের সমস্ত কাজ শেষ করেছে। তাকে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ এ ব্যক্তি উমরায় চুল ছোট করা পরিত্যাগ করেছে। যা উমরার একটি রুকন। বিদ্বানদের মতে ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে দম তথা কুরবানী ওয়াজিব হবে। তা মক্কায় যবেহ করে সেখানকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করতে হবে। আর এর মাধ্যমে হাজ্জ ও উমরা পূর্ণতা লাভ করবে। মক্কার বাইরে অবস্থান করলে যে কোন লোককে উক্ত ফিদইয়া মক্কায় আদায় করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারে। (আল্লাহ তাওফীক দাতা)

প্রশ্ন ঃ (৫১০) তামাত্তুকারী কুরবানী দিতে পারেনি। হাজ্জে সে তিনটি সওম রেখেছে। কিন্তু হাজ্জ থেকে ফিরে এসে সাতটি সওম রাখে নি। এভাবে তিন বছর কেটে গেছে। তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ তার উপর আবশ্যক হচ্ছে দশ দিনের মধ্যে থেকে অবশিষ্ট সাত দিনের সওম এখনই পালন করে নেয়া। (আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য সাহায্য চাই)

প্রশ্ন ঃ (৫১১) উমরা করে জনৈক লোক নিজ দেশে গিয়ে মাথা মুন্ডন করেছে। তার উমরার বিধান কি?

উত্তর ঃ বিদ্বানগণ বলেন, মাথা মুন্ডন করার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। মক্কা বা মক্কা ছাড়া অন্য কোন স্থানে মুন্ডন করলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মাথা মুন্ডন করার উপর ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া নির্ভর করছে। তাছাড়া মুন্ডন করার পর বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। উমরার কাজগুলোর

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতা এ রকমঃ ইহরাম, তওয়াফ, সাঈ, মাথা মুন্ডন বা ছোট করা এবং উমরার কাজ শেষ করার পর মক্কায় অবস্থান করলে বিদায়ী তওয়াফ করা। কিন্তু উমরার কাজ শেষ করে মক্কায় অবস্থান না করলে বিদায়ী তওয়াফের দরকার নেই। অতএব মক্কায় অবস্থান করতে চাইলে উমরার কাজ শেষ করে মক্কাতেই তাকে মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করতে হবে। কারণ, তাকে এরপর বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। কিন্তু তওয়াফ-সাঈ শেষ করার সাথে সাথেই যদি মক্কা থেকে বের হয়ে থাকে, তবে নিজ দেশে বা শহরে গিয়ে মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করতে পারে। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থাতেই থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ (৫১২) তামাত্তু হাজ্জ করার জন্য উমরার ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে হাজ্জের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে। তাকে কি কোন কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা তামাত্তুকারী উমরার ইহরাম বাঁধার পর উমরা পূর্ণ করে যদি হাজ্জের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা দু'টি কাজ আলাদা আলাদা ইহরামে সম্পাদন করতে হয়। হ্যাঁ, সে যদি মানত করে থাকে যে এ বছরই হাজ্জ করবে, তাবে মানত পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ (৫১৩) তামাত্তু হাজ্জের ইহরাম বাঁধার পর উমরা শেষ করে অজ্ঞতা বশতঃ হালাল হয়নি। এভাবে হাজ্জের কাজ শেষ করে কুরবানী করেছে। তার করণীয় কি? তার হাজ্জ কি বিশুদ্ধ?

উত্তর ঃ জানা আবশ্যক যে, কোন মানুষ তামাত্তু হাজ্জের ইহরাম বাঁধলে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, তওয়াফ, সাঈ শেষ করে মাথার চুল খাটো করে হালাল হয়ে যাওয়া। কিন্তু উমরার তওয়াফ শুরু করার পূর্বে যদি হাজ্জের নিয়ত করে ফেলে এবং ইহরাম খোলার ইচ্ছা না করে, তবে কোন অসুবিধা নেই। এ অবস্থায় তার হাজ্জ কেরাণ হাজ্জে পরিণত হবে। তার কুরবানীও হবে কেরাণ হাজ্জের কুরবানী।

কিন্তু যদি উমরার নিয়তেই থাকে এমনকি তওয়াফ-সাঈ শেষ করে ফেলে, তবে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, তার হাজ্জের ইহরাম বিশুদ্ধ নয়। কেননা উমরার তওয়াফ শুরু করার পর উমরাকে হাজ্জে প্রবেশ করানো বিশুদ্ধ নয়।

বিদ্বানদের মধ্যে অন্যদের মত হচ্ছে, এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে ছিল অজ্ঞ। আমি মনে করি তাকে কোন কিছু দিতে হবে না। তার হাজ্জ বিশুদ্ধ ইনশাআল্লাহ্। (আল্লাহই তাওফীক দাতা।)

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৫১৪) একদল লোক আরাফাতের ময়দান থেকে ফেরার পথে মুযদালিফার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। রাত একটার দিকে তারা মাগরিব ও এশা সলাত আদায় করে। মুযদালিফা পৌঁছার সময় ফজরের আযান হয়ে যায়। সেখানে তারা ফজর সলাত আদায় করে। এখন তাদেরকে কি কোন জরিমানা দিতে হবে?

উত্তর ঃ এদেরকে কোন ফিদ্‌ইয়া বা জরিমানা দিতে হবে না। কেননা তারা ফজরের আযানের সময় মুযদালিফায় প্রবেশ করেছে এবং সেখানে অন্ধকার থাকতেই ফজর সলাত আদায় করেছে। নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেন,

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে এই সলাতে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রস্থান করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করেছে। আর এর পূর্বে আরাফাতে রাতে বা দিনে অবস্থান করেছে, সে তার হাজ্জ পূর্ণ করে নিয়েছে এবং ইবাদাত আদায় করে নিয়েছে।"[১]

কিন্তু এরা মধ্যরাত্রির পর মাগরিব-এশা সলাত আদায় করে ভুল করেছে। কেননা এশা সলাতের শেষ সময় মধ্যরাত্রি। যেমনটি সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'ছ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে।

প্রশ্ন ঃ (৫১৫) জনৈক নারী মুযদালিফা থেকে শেষ রাত্রে রাওয়ানা দিয়েছে। এবং সামর্থ থাকা সত্বেও নিজের ছেলেকে তার পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব প্রদান করেছে। এর বিধান কি?

উত্তর ঃ হাজ্জের কার্যাদির মধ্যে অন্যতম কাজ হচ্ছে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। কেননা নবী ﷺ একাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

"আল্লাহর ঘরের তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করা।"[২] এটি একটি

[১] . তিরমিযী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, হাঃ ৮১৫।

[২] . আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদ ঃ রমল করা। তিরমিযী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

www.pathagar.com

ইবাদাত। মানুষ এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করবে। তাঁর যিক্‌রকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যেহেতু এটার ভিত্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের উপর তাই উচিত হচ্ছে, কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর জন্য ভীত হবে ও বিনয়াবনত হবে। তবে প্রথম সময়েই তাড়াহুড়া করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে যাবে না; বরং দেরী করে শেষ সময়ে নিক্ষেপ করবে। অবস্থাভেদে সিদ্ধান্তনিবে। শেষ সময়ে যদি প্রশান্তি, ধীরস্থিরতা, বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতির সাথে নিক্ষেপ করা যায়, তবে দেরী করাই উত্তম। কেননা এটা এমন বৈশিষ্ট যা ইবাদাতের বিশুদ্ধতার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যে বৈশিষ্ট ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট তা ইবাদাতের সময় ও স্থানের উপর অগ্রগণ্য। একারণে নবী ﷺ বলেন,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"খাদ্য উপস্থিত হলে এবং দু'টি নাপাক বস্তুর (পেশাব-পায়খানার) চাপ থাকলে সলাত নেই।"[১] অর্থাৎ- প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং মনের চাহিদা পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ সলাতকে প্রথম সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করবে। অতএব কঙ্কর মারার জন্য প্রথম সময়ে যদি ভীড়ের কারণে বেশী কষ্ট হয়, কঙ্কর মারার চাইতে নিজের জান বাঁচানোর দায় বেশী হয়, আর বিলম্বে কঙ্কর মারলে যদি প্রশান্তির সাথে অন্তর উপস্থিত রাখা যায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে এই ইবাদাত করা যায়, তবে বিলম্বে কঙ্কর মারাই উত্তম। এজন্য নবী ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে শেষ রাতেই মুযদালিফা ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে করে তারা ভীড়ের মধ্যে পড়ে কষ্ট না পায়।

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক সামর্থবান হলে কাউকে কঙ্কর মারার দায়িত্ব দেয়া জায়েয নয়। নিজেই কঙ্কর মারার ইবাদাতটি পালন করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।" এতে নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য নেই। তবে কোন পুরুষ বা নারী অসুস্থ হয় বা নারী গর্ভবতী হয় এবং ভীড়ের মধ্যে গেলে গর্ভের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে, তবে তারা যে কাউকে কঙ্কর মারার দায়িত্ব দিতে পারে।

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের উপস্থিতিতে সলাত পড়া মাকরূহ।

www.pathagar.com

প্রশ্নে উল্লেখিত যে নারী সামর্থ থাকা সত্বেও নিজের ছেলেকে দিয়ে কঙ্কর মারিয়েছে- আমি মনে করি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে সতর্কতা বশতঃ সে একটি কুরবানী করবে এবং তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

প্রশ্ন ঃ (৫১৬) জনৈক হাজী পূর্ব দিক থেকে জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মেরেছে। কিন্তু তা হাওয বা গর্তের মধ্যে পড়েনি। ঘটনাটি ছিল ১৩ তারিখে। তাকে কি তিনটি জামরাতেই পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে?

উত্তর ঃ সবগুলো স্থানে তাকে পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে না। বরং যে ক্ষেত্রে ভুল করেছে সেটাই শুধু পুনরায় মারবে। অতএব শুধুমাত্র জামরা আক্বাবায় পুনরায় কঙ্কর মারবে। সঠিক পদ্ধতিতে মারবে। পূর্ব দিক থেকে মারলে যদি হাওযে কঙ্কর না পড়ে তবে মারা জায়েয হবে না। কেননা কঙ্কর মারার স্থানই হচ্ছে হাওয। এই কারণে যদি ব্রীজের উপরে গিয়ে পূর্ব দিক থেকে কঙ্কর মারে এবং তা হওযে পড়ে তবে তা জায়েয হবে।

প্রশ্ন ঃ (৫১৭) সাতটি কঙ্করের মধ্যে থেকে যদি একটি বা দু'টি কঙ্কর জামরায় না পড়ে এবং এ ভাবে এক বা দু'দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে কি তাকে সবগুলো জামরায় পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে?

উত্তর ঃ যদি কারো কোন জামরায় একটি বা দু'টি পাথর নিক্ষেপ বাকী থাকে, তবে ফিক্বাহবিদগণ বলেন, যদি এটা শেষ জামরায় হয়ে থাকে, তবে শুধু বাকীটা মেরে দিলেই হয়ে যাবে, পূর্বেরগুলো আর মারতে হবে না। কিন্তু যদি প্রথম বা মধ্যবর্তী জামরার কোন একটিতে এক বা একাধিক পাথর মারা বাকী থাকে, তবে সেটা পূর্ণ করবে এবং তারপরের জামরাগুলোতে পাথর মারবে। কেননা পাথর মারার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাকী পাথরটাই মারবে। তারপরের জামরাতে আর পাথর মারতে হবে না। কেননা ভুল বা অজ্ঞতার কারণে ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাবে। এই লোক যখন মধ্যবর্তী জামরাতে পাথর মেরেছে, তার তো এই ধারণা নেই যে, এর পূর্বে কোন পাথর মারা তার বাকী আছে। সুতরাং বিষয়টি সে ভুলে গেছে অথবা তাতে সে অজ্ঞ। তাই তাকে আমরা বলব, যে কটা পাথর মারা বাকী রয়েছে তা মেরে দিন। এরপর আর কোনা পাথর মারতে হবে না।

এ জবাব শেষ করার আগে আমি সতর্ক করতে চাই যে, জামরা হচ্ছে পাথর একত্রিত হওয়ার স্থান বা পাথরের হাওয। যে লম্বা স্তম্ভ দেখা যায় সেটাই জামরা নয়। এটা শুধু চিহ্নের জন্য রাখা হয়েছে। অতএব যদি হাওযে বা গর্তের

www.pathagar.com

মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং ঐ স্তম্ভে না লাগে তাতে কোন অসুবিধা নেই তার নিক্ষেপ বিশুদ্ধ। (আল্লাহ অধিক জানেন)

প্রশ্ন ঃ (৫১৮) বলা হয়, যে কঙ্কর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা নাকি আবার নিক্ষেপ করা যাবে না। এ কথাটি কি ঠিক? এর কোন দলীল আছে কি?

উত্তর ঃ এ কথা সঠিক নয়। কেননা যারা নিক্ষিপ্ত কঙ্কর পুনরায় নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন তাদের যুক্তি হচ্ছেঃ

১) নিক্ষিপ্ত কঙ্কর মায়ে মুস্তা'মাল তথা ব্যবহৃত পানির মত। ফরয পবিত্রতায় যদি কোন পানি ব্যবহার করা হয়, তবে ব্যবহৃত পানিটা পবিত্র থাকে কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে না।

২) বিষয়টি ক্রীতদাসের মত। কাফ্ফারা প্রভৃতিতে যদি তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়, তবে তো তাকে আবার মুক্ত করা যাবে না।

৩) এতে বুঝা যায় সমস্ত হাজ্জপালনকারীর জন্য একটি মাত্র পাথর মারাই জায়েয হবে। আপনি পাথরটি মারবেন, তারপর আবার সেটা নিবেন এবং মারবেন, তারপর আবার নিবেন এবং মারবেন এভাবে সাতবার পূর্ণ করবেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে সেই পাথরটি সাতবার নিয়ে সতবার মারবে।

এ তিনটি যুক্তি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় খুবই দুর্বল।

১) ব্যবহৃত পানির যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। কেননা কোন ওয়াজিব পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ব্যবহার করা হলে পানি নিজে পবিত্র থাকবে কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারবে না এটি দলীল বিহীন একটি কথা। পানির যে প্রকৃত গুণ রয়েছে অর্থাৎ পবিত্রতা তা দলীল ছাড়া রহিত করা যাবে না। অতএব ওয়াজিব পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র অন্যকেও পবিত্র করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রথম যুক্তির খন্ডন হয়ে গেল। এবং কঙ্কর মারাকে তার সাথে তুলনা করা ভুল প্রমাণিত হল।

২) নিক্ষিপ্ত কঙ্করকে মুক্ত ক্রীতদাসের সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। কেননা উভয়ের মাঝে বিস্তর ফরাক বিদ্যমান। ক্রীতদাসকে মুক্ত করা হলে সে তো স্বাধীন হয়ে গেল। তাকে আবার মুক্ত করার সুযোগ থাকলো না। কিন্তু কঙ্কর মারা হয়ে গেলেও সেটা কঙ্করই রয়ে যায়। যে কারণে তা নিক্ষেপ করা হয়েছিল সে কারণ তাতে অবশিষ্ট রয়েছে। এই কারণে ক্রীতদাস আবার যদি কখনো শরঈ দলীলের ভিত্তিতে দাসে পরিণত হয়, তবে পুনরায় তাকে মুক্ত করা যাবে।

www.pathagar.com

৩) তৃতীয় যুক্তির জবাবে আমরা বলবঃ সমস্ত হাজ্জপালনকারীকে একটি মাত্র পাথর নিক্ষেপ আবশ্যক করা- যদি সম্ভব হয় তো হোক। কিন্তু তা অসম্ভব। অসংখ্য পাথর থাকতে কোন বুদ্ধিমান ঐ চিন্তা করতে পারে না।

সুতরাং কঙ্কর মারতে গিয়ে যদি আপনার হাত থেকে দু'একটি কঙ্কর পড়ে যায় তবে সম্মুখ থেকে সহজলভ্য কঙ্কর কুড়িয়ে নিয়ে তা মেরে দিন- চাই তা একবার মারা হয়েছে বা হয়নি তাতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ (৫১৯) তওয়াফে এফাযার পূর্বে হাজ্জের সাঈ করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ হাজ্জপালনকারী সাহেব যদি ইফরাদ বা কেরাণকারী হয়, তবে তার জন্য তওয়াফে এফাযার পূর্বে হাজ্জের সাঈ করা জায়েয আছে। তওয়াফে কুদুমের পর পরই তা আদায় করে নিবে। যেমনটি নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যারা কুরবানী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তারা করেছিলেন।

কিন্তু তামাত্তুকারী হলে তাকে দু'বার সাঈ করতে হবে। প্রথমবার মক্কায় আগমন করে উমরার জন্য। প্রথমে তওয়াফ করবে, তারপর সাঈ করে চুল খাট করে হালাল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়বার সাঈ করবে হাজ্জের জন্য। উত্তম হচ্ছে তওয়াফে এফাযা আদায় করার পর এই সাঈ করা। কেননা সাঈ তওয়াফের পরের কাজ। অবশ্য যদি তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে ফেলে তবে বিশুদ্ধ মতে কোন অসুবিধা হবে না। কেননা নবী ﷺকে জিজ্ঞেস করা হয়েছেঃ আমি তো তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, "কোন অসুবিধা নেই।"[১]

হাজ্জপালনকারী সাহেব ঈদের দিন তথা দশই জিলহাজ্জ পাঁচটি কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করবেঃ

১) জামরা আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা

২) তারপর কুরবানী

৩) তারপর মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করা।

৪) অতঃপর কা'বা ঘরের তওয়াফ করা

৫) সবশেষে ছাফা-মারওয়া সাঈ করা।

অবশ্য ইফরাদকারী ও ক্বেরাণকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ করে নিয়ে থাকে, তবে পুনরায় তাকে সাঈ করতে হবে না। উত্তম হচ্ছে উল্লেখিত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। কিন্তু যদি আগ-পিছ হয়ে

---

[১] আবূ দাউদ, অধ্যায় ঃ হাজ্জ-উমরা, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জে একটি কাজের পূর্বে অন্যটি করে ফেলার বিধান। হাঃ ১৭২৩।

www.pathagar.com

যায় বা করে ফেলে- বিশেষ করে প্রয়োজন দেখা দিলে তবে কোন অসুবিধা নেই। এটা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র করুণার একটি বড় প্রমাণ। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সারা জগতের পালনকর্তা)

প্রশ্ন ঃ (৫২০) কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলে আদায় হবে? এবং কখন মারলে কাযা মারা হবে?

উত্তর ঃ ঈদের দিন সর্বসাধারণের জন্য কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে, সূর্য উঠার পর থেকে নিয়ে শুরু হবে। আর দুর্বলদের জন্য এ সময় শুরু হবে শেষ রাত থেকে। কঙ্কর মারার শেষ সময় হচ্ছে পরবর্তী দিন ১১ তারিখ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি উক্ত সময়ের মধ্যে মারা সম্ভব না হয়, তবে আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) যে সময় কঙ্কর মারা শুরু হবে সে সময়ই বিগত দিনের জামরা আক্বাবার কাযা পাথর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ- পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার পর থেকে পাথর মারা শুরু হবে। আর শেষ হবে পরবর্তী দিন ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ তারিখ) হলে রাত্রে কঙ্কর মারা যাবে না। কেননা সেদিন সূর্য অস্ত হলেই আইয়ামে তাশরীক শেষ হয়ে গেল এবং ১৪ তরিখ শুরু হয়ে গেল। সর্বাবস্থায় দিনের বেলায় কঙ্কর নিক্ষেপ করাই উত্তম। কিন্তু এই সময়ে হাজ্জপালনকারীদের ভীড়ের প্রচন্ডতার কারণে, হাজ্জপালনকারীদের একে অপরের প্রতি বেপরওয়া হওয়ার কারণে যদি জানের ক্ষতির আশংকা করে বা কঠিন কষ্ট হয়ে উঠে, তবে রাত্রে মারলে কোন অসুবিধা হবে না। অবশ্য কোন আশংকা না থাকলেও রাতে মারলে কোন অসুবিধা নেই। তবে এই মাসআলায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং একান্ত অসুবিধা না থাকলে রাতে কঙ্কর না মারা উচিত।

প্রশ্ন ঃ (৫২১) বিশেষ করে ঈদের দিনের তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ সঠিক কথা হচ্ছে ঈদের দিন বা অন্য দিনে কোন পার্থক্য নেই সর্বাবস্থায় তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা জায়েয আছে। এমনকি ঈদের দিনের পরও যদি হয়। কেননা হাদীসের সাধারণ অর্থ এ কথাই প্রমাণ করে। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺকে প্রশ্ন করলেন, তওয়াফের পূর্বে আমি সাঈ করেছি। তিনি বললেন, "কোন অসুবিধা নেই।"

প্রশ্ন ঃ (৫২২) সাঈ আবশ্যক ছিল কিন্তু তওয়াফ করার পর সরাসরি সাঈ না করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। পরে তাকে বিষয়টি জানানো হলো, সে কি এখন শুধু সাঈ করবে? নাকি পুনরায় তওয়াফ করার পর সরাসরি সাঈ করবে?

উত্তর ঃ কোন মানুষ যদি তওয়াফ করে এই বিশ্বাসে যে তাকে সাঈ করতে হবে না। কিন্তু পরে তাকে জানানো হল যে, তাকে অবশ্যই সাঈ করতে হবে। তখন সে শুধুমাত্র সাঈ করলেই হয়ে যাবে। পুনরায় তওয়াফ করার দরকার নেই। কেননা তওয়াফের পর পরই সাঈ করতে এ রকম কোন শর্ত নেই।

এমনকি কোন মানুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সাঈ করতে বিলম্ব করে- তবুও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু উত্তম হচ্ছে তওয়াফ শেষ করার পর পরই বিলম্ব না করে সাঈ করে নেয়া।

প্রশ্ন ঃ (৫২৩) উমরা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মাথার এদিক ওদিক থেকে অল্প করে চুল কাটে, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ আমি মনে করি এ লোকের চুল খাটো করা সম্পন্ন হয়নি। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ইহরামের কাপড় পুনরায় পরিধান করে বিশুদ্ধভাবে মাথার সম্পূর্ণ অংশ থেকে চুল খাটো করা তারপর হালাল হওয়া।

এ উপলক্ষে আমি সতর্ক করতে চাই, কোন কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করতে চাইলে সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সীমারেখা জানা আবশ্যক। যাতে করে জেনে-শুনে আল্লাহ্র ইবাদাত করতে পারে। ইবাদাতটি যেন অজ্ঞতার সাথে না হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ ﷺকে বলেছেনঃ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي

"আপনি বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্র দিকে আহবান করি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে।" (সূরা ইউসুফ- ১০৮)

কোন মানুষ যদি মক্কা থেকে মদীনা সফর করতে চায়, তবে রাস্তা সম্পর্কে অবশ্যই নির্দেশনা নিতে হবে। মানুষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। যাতে করে পথভ্রষ্ঠ হয়ে গন্তব্য হারিয়ে না যায়। বাহিরের পথের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে আভ্যন্তরিণ পথ যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে সে সম্পর্কে কি জ্ঞানার্জন করতে হবেনা? সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে না?

মাথার চুল খাটো করার অর্থ হচ্ছে মাথার সমস্ত অংশ থেকে চুলের কিছু কিছু অংশ কেটে ফেলা। চুল খাটো করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মেশিন

www.pathagar.com

ব্যবহার করা। কারণ, এতে সমস্ত মাথা থেকেই চুল কাটা হয়। অবশ্য কেঁচি দ্বারা চুল কাটাতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে মাথার চতুর্দিক থেকে চুল কাটতে হবে। যেমন করে মাথা মুন্ডন করলে সমস্ত মাথা মুন্ডন করতে হয়। যেমন ওযূর সময় সমস্ত মাথাকে মাসেহ্ করতে হয়। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (৫২৪) কঙ্কর মারার সময় কি?

উত্তর ঃ জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে ঈদের দিন। সামর্থবান লোকদের জন্য এ সময় শুরু হবে ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে। আর মানুষের ভীড় সহ্য করতে পারবে না এ রকম দুর্বল, নারী, শিশু, প্রভৃতির জন্য সময় হচ্ছে ঈদের দিন শেষ রাত থেকে। আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) ঈদের রাতে চাঁদ অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করতেন। চাঁদ অস্ত গেলেই মুযদালিফা ছেড়ে মিনা রাওয়ানা হতেন এবং জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারতেন। আর এর শেষ সময় হচ্ছে ঈদের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু যদি ভীড় প্রচন্ড থাকার কারণে বা জামরা থেকে দূরে অবস্থানের কারণে রাতে কঙ্কর মারে তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু পরবর্তী দিন ১১ তারিখের ফজর পর্যন্ত যেন বিলম্ব না করে।

আইয়্যামে তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু হবে মধ্য দিনে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর থেকে তথা যোহরের সময় থেকে এবং তা চলতে থাকবে রাত পর্যন্ত। আর কষ্ট ও ভীড়ের কারণে বিলম্ব করে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা নিক্ষেপ করা যাবে। এ তিন দিন যোহরের সময়ের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয হবে না। কেননা নবী ﷺ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পূর্বে নিক্ষেপ করেননি। আর লোকদের বলেছেনঃ "তোমরা আমার নিকট থেকে হাজ্জ-উমরার বিধি-বিধান শিখে নাও।"[১] সকালের দিকে ঠান্ডা এবং সহজ থাকা সত্ত্বেও নবী ﷺ বিলম্ব করে কঠিন গরমে দুপুরের সময় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন- এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, এই সময়ের পূর্বে নিক্ষেপ করা জায়েয হবে না।

এ কথার পক্ষে আরো প্রমাণ হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলার সাথে সাথে যোহরের সলাত আদায় না করে প্রথমে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে নিক্ষেপ করা জায়েয হতো, তবে প্রথমে কঙ্কর মেরে প্রথম ওয়াক্তে যোহরের সলাত আদায় করতেন। কেননা প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করা

---

[১]. বুখারী, অধ্যায় ঃ ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদ ঃ পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফাতাওয়া দেয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করেছে।

www.pathagar.com

উত্তম। মোটকথা, আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে সূর্য ঢলার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ (৫২৫) জনৈক হাজী আরাফাত দিবসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে মীনায় রাত কাটায়নি, কঙ্কর নিক্ষেপ করেনি এবং তাওয়াফে এফাযাও করেনি। তাকে এখন কি করতে হবে?

উত্তর ঃ আরাফাতের ময়দানে যে লোকটি অসুস্থ হয়েছে, তার অসুখ যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, হাজ্জের অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করা তার জন্য অসম্ভব, আর ইহরামের পূর্বে সে শর্ত করেছে ('যদি আমি বাধাগ্রস্থ হই তবে যেখানে বাধাগ্রস্থ সেখানেই হালাল হয়ে যাব' এরূপ কথা বলেছে।) তবে সে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু এটা ফরয হাজ্জ হলে পরবর্তী বছর পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর ইহরাম বাঁধার সময় যদি শর্ত না করে থাকে এবং হাজ্জের কাজ পূর্ণ করতে সক্ষম না হয়, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে কুরবানী যবেহ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ-উমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাগ্রস্থ হও, তবে সহজ সাধ্য কুরবানী করবে।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৬) এখানে বাধাগ্রস্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা অন্য যে কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। আর বাধাগ্রস্থ হওয়া মানে, কোন কারণ বশতঃ হাজ্জ-উমরার কাজ পূর্ণ করতে সক্ষম না হওয়া।

এই ভিত্তিতে সে হালাল হয়ে যাবে এবং কুরবানী যবেহ করবে। এছাড়া তার উপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি ফরয হাজ্জ আদায় না করে থাকে তবে পরবর্তী বছর তা আদায় করবে।

আর এই অসুস্থ ব্যক্তি যদি হাজ্জের কাজ চালিয়ে যায়। আরাফাত থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় রাত কাটায় কিন্তু মিনায় রাত কাটাতে সক্ষম না হয় এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করতে না পারে, তবে প্রত্যেকটি ওয়াজিবের জন্য একটি করে কুরবানী করবে। দু'টি কুরবানী করতে হবে। একটি কুরবানী মিনায় রাত না কাটানোর জন্য অন্যটি জামরা সমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ না করার জন্য।

কিন্তু সুস্থ হলে তওয়াফে এফাযা আদায় করবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তওয়াফে এফাযা জিল হাজ্জের শেষ পর্যন্ত করা যাবে। কিন্তু বাধা

www.pathagar.com

যদি আরো বড় হয় তবে, বাধা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তারপর তওয়াফ করবে।

প্রশ্ন ঃ (৫২৬) মুযদালিফার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কেউ যদি বাইরে অবস্থান করে, তবে তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ একটি দম দিতে হবে অর্থাৎ- একটি কুরবানী যবেহ করতে হবে এবং তা মক্কার ফক্বীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। কেননা সে হাজ্জের একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করেছে।

এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত হাজ্জপালনকারী ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, হাজ্জে এসে আরাফাত ও মুযদালিফার সীমনা সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। দেখা যায়, অনেক হাজ্জপালনকারী আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থান করেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আরাফাত সীমানার মধ্যে প্রবেশ না করে সেখান থেকেই ফিরে আসেন। এদের হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে না। তারা হাজ্জ না করেই ফিরে এলেন। এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরূরী। আল্‌ হামদু লিল্লাহ্‌ এ সীমানা জানার জন্য আরাফাত ময়দানের চতুর্পাশ্বে বিশাল বিশাল বোর্ডের ব্যবস্থা আছে। তার প্রতি খেয়াল করলেই কোন সমস্যা থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ (৫২৭) এফরাদ হাজ্জকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ করে নেয়, তবে তওয়াফে এফাযার পর তাকে কি আবার সাঈ করতে হবে?

উত্তর ঃ তওয়াফে এফাযার পর তাকে আর সাঈ করতে হবে না। কেননা তার উমরা নেই। সুতরাং তওয়াফে কুদূমের সাথে সে যদি সাঈ করে থাকে, তবে এটাই হাজ্জের সাঈ হিসেবে গণ্য হবে। পরে আর সাঈ করতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৫২৮) ক্বিরাণকারীর জন্য একটি তওয়াফ ও একটি সাঈ যথেষ্ট হবে?

উত্তর ঃ কোন মানুষ যদি ক্বিরান হাজ্জ করতে চায়, তবে তার তওয়াফে এফাযা বা হাজ্জের তওয়াফ ও হাজ্জের সাঈ উমরা ও হাজ্জ উভয়টির জন্য যথেষ্ট হবে। তখন তওয়াফে কুদূম তার জন্য সুন্নাত। সে ইচ্ছা করলে হাজ্জের সাঈ তওয়াফে কুদূমের পরপরই আদায় করে নিতে পারে। যেমনটি নবী ﷺ করেছিলেন। ইচ্ছা করলে সাঈ বাকী রেখে তওয়াফে এফাযার পর করতে পারে। কিন্তু পূর্বেই করে নেয়া উত্তম। কেননা নবী ﷺ এরূপ করেছিলেন। অতঃপর ঈদের দিন শুধুমাত্র তওয়াফে এফাযা করবে। সাঈ করবে না। ক্বিরাণকারীর হাজ্জ ও উমরার জন্য একটি মাত্র তওয়াফ ও সাঈ যথেষ্ট হওয়ার দলীল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺএর বাণী। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বলেন, طَوَافُكِ

بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ "আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ তোমার হাজ্জ ও উমরার জন্য যথেষ্ট হবে।"[১] আয়েশা (রাঃ) ছিলেন ক্বিরান হাজ্জকারীনী। অতএব নবী ﷺ বর্ণনা করে দিলেন যে, ক্বেরাণকারীর তওয়াফ ও সাঈ হাজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন ঃ (৫২৯) জনৈক ব্যক্তি রাত বরোটা পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে মক্কা চলে গেছে, ফজরের পূর্বে আর মিনায় ফেরত আসেনি। তার বিধান কি?

উত্তর ঃ রাত বারোটা যদি মধ্য রাত্রি হয়, তবে তারপর মিনা থেকে বের হলে কোন অসুবিধা নেই। যদিও উত্তম হচ্ছে রাত ও দিনের পূর্ণ অংশ মিনাতেই অবস্থান করা। আর রাত বারোটা যদি মধ্য রাত্রি না হয় তবে বের হওয়া জায়েয হবে না। কেননা মিনায় অবস্থান করার শর্ত হচ্ছে রাতের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়া। যেমনটি ফিক্বাহবিদগণ (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ (৫৩০) কোন মানুষ যদি তাড়াহুড়া করার নিয়তে ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে। কিন্তু কাজ থাকার কারণে সূর্যাস্তের পর আবার মিনায় ফিরে আসে। এখন কি মিনায় রাত থাকা তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ না, মিনায় রাত থাকা তার উপর আবশ্যক হবে না। সে তাড়াহুড়াকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে হাজ্জের যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করে ফেলেছে। কাজের জন্য মিনায় ফিরে আসা তাড়াহুড়ার পরিপন্থী নয়। কেননা তার মিনায় ফিরে আসার নিয়ত নির্দিষ্ট কাজের জন্য হাজ্জের জন্য নয়।

প্রশ্ন ঃ (৫৩১) সঊদী আরবের বাইরে অবস্থান করে এমন জনৈক হাজী হাজ্জের কাজ সম্পাদন করেছে। জিলহাজ্জের ১৩ তারিখে আছর তথা বিকাল চারটার সময় তার সফরের সময় নির্দিষ্ট। কিন্তু ১২ তারিখ কঙ্কর মারার পর সে মিনা থেকে বের হয়নি। ১৩ তারিখের রাত সেখানেই অবস্থান করেছে। এখন ১৩ তারিখ সকালে কঙ্কর মেরে মিনা থেকে বের হওয়া তার জন্য জায়েয হবে কি? উল্লেখ্য যে, যোহরের পর কঙ্কর মেরে বের হলে নির্ঘাত তার সফর বাত্বিল হয়ে যাবে, ফলে সে বিরাট অসুবিধায় পড়বে।

এর উত্তর যদি না জায়েয হয়, তবে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারার ব্যাপারে কি কোন মত পাওয়া যায় না?

---

[১]. আবূ দাঊদ, অধ্যায় ঃ হাজ্জ-উমরা, অনুচ্ছেদ ঃ ক্বিরানকারীর তওয়াফ। এ হাদীসটির মূল সহীহ মুসলিমে রয়েছে

www.pathagar.com

উত্তর ঃ কোন অবস্থাতেই যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয নয়। জরুরী অবস্থা হিসেবে কঙ্কর নিক্ষেপ করা রহিত হবে না। তবে তার সমাধান হচ্ছে এ অবস্থায় কঙ্কর না মেরেই সে চলে যাবে এবং তার ফিদিয়া প্রদান করবে। আর তা হচ্ছে মক্কা বা মিনায় একটি কুরবানী করবে অথবা কাউকে এর দায়িত্ব প্রদান করবে। এবং উক্ত কুরবানী সেখানকার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। এরপর বিদায়ী তওয়াফ করে মক্কা ত্যাগ করবে।

হ্যাঁ, যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারার বৈধতার ব্যাপারে মত পাওয়া যায়, কিন্তু তা বিশুদ্ধ নয়। সঠিক কথা হচ্ছে, ঈদের পর আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে কোন অবস্থাতেই যোহরের সময়ের পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয নয়। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে ইবাদাতের (হাজ্জ-উমরার) নিয়ম শিখে নাও।"[১] আর তিনি এই দিনগুলোতে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারেননি।

কেউ যদি বলে যে, যোহরের পর নবীজির কঙ্কর নিক্ষেপ তার সাধারণ একটি কর্ম। আর সাধারণ কর্ম দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

জবাবে আমরা বলব, এ কথা সত্য যে এটি তাঁর সাধারণ কর্ম। তিনি যোহরের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। এ রকম বাচনিক নির্দেশ প্রদান করেন নি যে, 'কঙ্কর নিক্ষেপ যোহরের পরেই হতে হবে'। তাছাড়া এ সময়ের পূর্বে নিক্ষেপের ব্যাপারে কোন নিষেধও করেন নি। আর তাঁর কর্ম ওয়াজিবের অর্থ বহণ করে না। নির্দেশ সূচক শব্দ ছাড়া কোন কাজ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব হয় না বা নিষেধ সূচক শব্দ ছাড়া পরিত্যাগ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু আমি বলব, নবীজির উক্ত কর্ম যে ওয়াজিব তার পক্ষে কারণ আছে। আর তা হচ্ছে, কঙ্কর মারার ব্যাপারে যোহরের সময় পর্যন্ত নবী ﷺএর অপেক্ষা করাটাই প্রমাণ করে যে এটা ওয়াজিব। কেননা যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারা যদি জায়েয হত, তবে নবী ﷺ সেটাই করতেন। কারণ, উম্মতের জন্য এটাই সহজ। আর নবী ﷺকে যখন দু'টি বিষয়ের মাঝে স্বাধীনতা দেয়া হত, তখন তিনি উভয়টির মধ্যে থেকে সহজটি গ্রহণ করতেন- যদি তাতে কোন পাপ না থাকত। সুতরাং এখানে যখন তিনি সহজ অবস্থাটি গ্রহণ করেন নি অর্থাৎ যোহরের সময় হওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন নি, তখন বুঝা যায় এতে পাপ আছে। অতএব যোহরের সময় হওয়ার পরই কঙ্কর মারা ওয়াজিব।

---

[১] বুখারী, অধ্যায় ঃ ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদ ঃ পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফাতাওয়া দেয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করেছে।

www.pathagar.com

এ কাজটি ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, নবী ﷺ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার সাথে সাথে যোহরের সলাত আদায় করার পূর্বেই কঙ্কর মেরেছেন। যেন তিনি অধির আগ্রহে সূর্য ঢলার অপেক্ষা করছিলেন। যাতে করে দ্রুত কঙ্কর মারতে পারেন। আর একারণেই যোহর সলাত দেরী করে আদায় করেছেন। অথচ প্রথম সময়ে অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথেই সলাত আদায় করা উত্তম। এথেকেই বুঝা যায় যোহরের সময় হওয়ার পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন ঃ (৫৩২) জনৈক ব্যক্তি ১২ তারিখে কঙ্কর না মেরেই মিনা ছেড়েছে এ ধারণায় যে, এটাই অনুমদিত তাড়াহুড়া। এবং বিদায়ী তওয়াফও করেনি। তার হাজ্জের কি হবে?

উত্তর ঃ তার হাজ্জ বিশুদ্ধ। কেননা সে হাজ্জের কোন রুকন পরিত্যাগ করেনি। কিন্তু সে তিনটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করেছে- যদি ১২ তারিখের রাত মিনায় না কাটিয়ে থাকে।

প্রথম ওয়াজিবঃ ১২ তারিখের রাত মিনায় কাটানো।

দ্বিতীয় ওয়াজিবঃ ১২ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

তৃতীয় ওয়াজিবঃ বিদায়ী তওয়াফ।

তার উপর আবশ্যক হচ্ছে প্রতিটি ছেড়ে দেয়া ওয়াজিবের বিনিময়ে একটি করে দম দেয়া। অর্থাৎ মোট তিনটি কুরবানী করে তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া। কেননা বিদ্বানদের মতে কেউ যদি হাজ্জের কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করে, তবে তার বিনিময়ে কুরবানী করে তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

এ উপলক্ষে আমি হাজ্জপালনকারী সাহেবানদের সতর্ক করতে চাই, প্রশ্নকারী যে রকম ভুল করেছে অধিকাংশ হাজ্জপালনকারী এ রকমই বুঝে থাকে এবং অনুরূপ ভুল করে থাকে। আল্লাহ্র বাণীঃ "যে ব্যক্তি দু'দিন থেকে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চায়, তার কোন গুনাহ্ নেই।" তারা মনে করে এখানে দু'দিন বলতে ঈদের দিন ও ১১ তম দিনকে বুঝানো হয়েছে। তাই তারা ১১ তারিখে কঙ্কর মেরেই মিনা ত্যাগ করে। কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়। এটা একটা মারাত্মক ভুল। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَـــنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾

www.pathagar.com

"তোমরা নির্দিষ্ট কতিপয় দিনে আল্লাহর যিক্‌র কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দু'দিন থাকার পর তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চায়, তার কোন গুনাহ্ নেই।" (সূরা বাক্বারা- ২০৩) এ আয়াতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বলতে আইয়্যামে তাশরীকের দিন সমূহ (তথা জিলহাজ্জের ১১, ১২ ও ১৩)কে বুঝানো হয়েছে। আর আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দিন হচ্ছে ১১ তারিখ। অতএব উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে থেকে প্রথম দু'দিনে তাড়াহুড়া করে চলে আসবে তার কোন গুনাহ্ নেই। আর উক্ত দু'দিনের দ্বিতীয় দিন হচ্ছে ১২ তম দিন।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিত এ মাসআলাটি ভালভাবে অনুধাবন করা এবং ভুল সংশোধন করে নেয়া।

প্রশ্ন ঃ (৫৩৩) মিনায় স্থান না পাওয়ার কারণে কোন লোক যদি সেখানে শুধুমাত্র রাতের বেলায় আগমন করে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করে। তারপর মক্কা চলে যায় এবং রাত ও দিনের অবশিষ্ট অংশ তথায় অবস্থান করে তবে কি হবে?

উত্তর ঃ তার এই কাজ যথেষ্ট হবে। কিন্তু এর বিপরীত করাই উত্তম। উচিত হচ্ছে, হাজ্জপালনকারী সাহেব রাত ও দিনের পূরা সময় মিনাতেই অতিবাহিত করবে। ভালভাবে অনুসন্ধান করার পরও যদি কোন মতেই মিনার অভ্যন্তরে স্থান করতে না পারে, তবে সর্বশেষ (খীমা বা) তাঁবুর সংলগ্ন স্থানে তাঁবু করে সেখানে অবস্থান করবে যদিও তা মিনার বাইরে পড়ে। বর্তমান যুগের কোন কোন বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন মানুষ যদি মিনায় অবস্থান করার স্থান না পায়, তবে মিনায় রাত কাটানো রহিত হয়ে যাবে। তখন তার জন্য জায়েয হয়ে যাবে মক্কা বা অন্য কোন স্থানে রাত কাটানো। তাদের কিয়াস হচ্ছে, কোন মানুষের ওযূর কোন অঙ্গ যদি কাটা থাকে তখন সেটা ধৌত করা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের এই মত যুক্তি সংগত নয়। কেননা ওযূর অঙ্গের বিষয়টি ঐ ব্যক্তির পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু মিনায় রাত কাটানোর বিষয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমস্ত লোকের একস্থানে সমবেত থাকা। সকলে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে প্রকাশ ঘটানো। সুতরাং ওয়াজিব হচ্ছে, মিনার শেষ তাঁবুর পাশে তাঁবু বানিয়ে থাকা, যাতে করে সে হাজ্জপালনকারীদের সাথেই রাত কাটাতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে, সলাতের জামাতে যদি মাসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়, আর লোকেরা মাসজিদের আশে-পাশে বাইরে সলাতে দাঁড়ায়, তবে

www.pathagar.com

আবশ্যক হচ্ছে কাতার মিলিত হওয়া। যাতে করে তারা একই জামাতভুক্ত এ কথা প্রমাণ হয়। রাত কাটানোর বিষয়টি এর সাথে সামঞ্জস্যশীল, শরীরের কর্তিত অঙ্গের সাথে এর তুলনা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ (৫৩৪) জনৈক ব্যক্তি সকালে বিদায়ী তওয়াফ করে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আছরের পর সফর করার ইচ্ছা করে। তাকে কি কিছু করতে হবে?

উত্তর ঃ হাজ্জ ও উমরা উভয় ক্ষেত্রে তাকে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। কেননা নবী ﷺ বলেন,

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ না করে কেউ যেন বের না হয়।"[১] এ কথাটি নবীজি বিদায় হাজ্জে বলেছেন। সুতরাং বিদায়ী তওয়াফের বিধান সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে। এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, নবীজি তো বিদায় হাজ্জের পূর্বে উমরা করেছেন কিন্তু বিদায়ী তওয়াফ তো করেননি। কেননা বিদায়ী তওয়াফের আবশ্যকতার নির্দেশ তো বিদায় হাজ্জে পাওয়া গেছে। আর তিনি এরশাদ করেছেনঃ

وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ

"হাজ্জের মধ্যে যেভাবে কাজ করে থাক ওমারাতেও সেভাবে করো।"[২] এ নির্দেশটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু তার মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছে আরাফা, মুযদালিফা ও মিনাতে অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে একাজগুলো হাজ্জের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো ছাড়া বাকী কাজ উক্ত হাদীসের আওতাধীন থাকবে। কেননা নবী ﷺ উমরাকে ছোট হাজ্জ রূপে আখ্যা দিয়েছেন।[৩] যেমনটি আমর বিন হাযম কর্তৃক প্রসিদ্ধ দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুরসাল[৪]। কিন্তু উলামাগণ সাধারণভাবে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতীর জন্য তা রহিত।

[২]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ খালূক রং কাপড়ে লাগলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জ ও উমরায় ইহরামকারীর জন্য যা বৈধ।

[৩]. দারাকুতনী ২/২৮৫ হাঃ (১২২)

[৪]. যে হাদীসের সনদ হতে সাহাবীর নাম বাদ পড়ে যায় তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

www.pathagar.com

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।" বিদায়ী তওয়াফ যদি হাজ্জের পূর্ণতার অংশ হয়, তবে তা উমরারও পূর্ণতার অংশ হবে।

উমরাকারী মাসজিদের হারামের তাহিয়্যাত হিসেবে তওয়াফের মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশ করেছে। সুতরাং কোন তাহিয়্যাত ছাড়া চলে যাওয়াও উচিত হবে না। তাই সে বিদায়ী তওয়াফ করবে।

অতএব এই ভিত্তিতে হাজ্জের ন্যায় উমরাতেও বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব। তিরমিযীতে একটি হাদীস পাওয়া যায়ঃ বলা হয়েছে, "কোন লোক যদি হাজ্জ বা উমরা করে, সে আল্লাহর ঘরের বিদায়ী তওয়াফ না করে যেন বের না হয়।" কিন্তু এই হাদীসটি যঈফ। কেননা এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। সে দুর্বল। এ হাদীসটি দুর্বল না হলে এই মাসআলার সুস্পষ্ট দলীল হিসেবে বিবেচিত হত এবং সকল মতভেদ বিদূরীত হত। কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করার কোন ভিত্তি নেই। তবে আমরা পূর্বে যে সমস্ত মূলনীতি, দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন করেছি তার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, উমরায় বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব।

তাছাড়া এই তওয়াফ সতর্কতা ও যিম্মা মুক্তি স্বরূপও হয়ে যায়। কেননা উমরাতে আপনি বিদায়ী তওয়াফ করলে তো কেউ আপনাকে বলবে না যে আপনি ভুল করছেন। কিন্তু তা না করলে তো যারা তা ওয়াজিব মনে করে তারা বলবে, আপনি ভুল করলেন। এই কারণে তওয়াফ করাটাই সঠিক হবে। আর তওয়াফ না করলে আশংকা রয়ে যাবে এবং বিদ্বানদের কারো মতে তা ভুল হবে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞানী)

প্রশ্ন ঃ (৫৩৫) উমরাকারীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ উমরাকারী মক্কা আগমন করার সময় যদি নিয়ত করে যে, তওয়াফ, সাঈ ও মাথা মু   গুন তথা উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করার সাথে সাথে ফেরত চলে যাবে, তবে তাকে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে না। কেননা তওয়াফে কুদূমই তার জন্য উমরার তওয়াফ ও বিদায়ী তওয়াফ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু উমরা সম্পন্ন করার পর যদি মক্কায় অবস্থান করে তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব। এ কথার দীলল নিম্নরূপঃ

প্রথমত ঃ নবী ﷺ-এর ব্যাপক নির্দেশঃ

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ না করে কেউ যেন বের না হয়।"[১] এখানে أَحَدٌ বা 'কেউ' শব্দটি অস্পষ্ট। যে কেউ বরে হলেই তার জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। অর্থাৎ- তওয়াফ না করে বের হবে না। সে হাজ্জকারী হোক বা ওম রাক'আরী।

দ্বিতীয়ত ঃ উমরা হাজ্জের মতই। কেননা নবী ﷺ উমরাকে হাজ্জ রূপে আখ্যা দিয়েছেন। আমর বিন হাযম কর্তৃক প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, "উমরা হচ্ছে ছোট হাজ্জ।"[২] হাদীসটি মুরসাল। কিন্তু উলামাগণ সাধারণভাবে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয়তঃ নবী ﷺ বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত উমরা হাজ্জের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।[৩] অর্থাৎ- হাজ্জ করলে উমরাও আদায় হয়ে গেল।

চতুর্থতঃ নবী ﷺ ইয়ালা বিন উমাইয়াকে বলেন,

وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ

"হাজ্জের মধ্যে যেভাবে কাজ করে থাক ওমারাতেও সেভাবে করো।"[৪] যদি তুমি হাজ্জে বিদায়ী তওয়াফ করে থাক, তবে উমরাতেও তা কর। তবে বিদ্বানদের ঐকমত্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উক্ত নির্দেশের বাইরে থাকবেঃ আরাফা, মুযদালিফা ও মিনাতে অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ। এগুলো উমরাতে শরীয়ত সম্মত নয়।

তাছাড়া সতর্কতার জন্য এবং যিম্মা মুক্ত হওয়ার জন্য বিদায়ী তওয়াফ করে নেয়াই উচিত। (আল্লাহই তাওফীকদাতা)

প্রশ্ন ঃ (৫৩৬) জনৈক ব্যক্তি মীক্বাত থেকে হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছে সে প্রশাসন (ডিউটি পুলিশ) কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেননা সে হাজ্জের অনুমতি পত্র নেয়নি। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় মক্কা প্রবেশ করতে না পারলে সে 'মুহছার' বা বাধাগ্রস্থ বলে বিবেচিত হবে। তখন সে বাধাপ্রাপ্ত স্থানে কুরবানী যবেহ করে ইহরাম খুলে ফেলবে। যদি এটা তার প্রথম ফরয হাজ্জ হয়ে থাকে তবে পরবর্তী বছর তা আদায় করবে। আর ফরয না হয়ে থাকলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী পরবর্তী বছর তা আদায় করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা নবী ﷺ হুদায়বিয়ার

---

[১]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতীর জন্য তা রহিত।

[২]. দারাকুতনী ২/২৮৫ হাঃ (১২২)

[৩]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জের মাস সমূহে উমরা করা জায়েয।

[৪]. বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ খালূক রং কাপড়ে লাগলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জ ও উমরায় ইহরামকারীর জন্য যা বৈধ।

www.pathagar.com

বছরে বাধাপ্রাপ্ত হলে পরবর্তী বছর তা কাযা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেননি। অতএব আল্লাহ্‌র কিতাবে ও রাসূল ﷺএর সুন্নাতে বাধাপ্রাপ্ত হাজ্জ বা উমরা কাযা আদায় করার বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾

"যদি বাধাগ্রস্থ হও, তবে সহজসাধ্য কুরবানী করবে।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৬)

এখানে কুরবানী করা ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখ করা হয়নি। আর পরবর্তী বছর নবী ﷺএর উমরা আদায়কে কাযা উমরা এজন্যই বলা হয়েছে যে, তিনি কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে পরবর্তী বছর উমরা আদায় করবেন। এই কারণে নয় যে, ছুটে যাওয়া কাজের পূর্ণতার জন্য কাযা আদায় করেছিলেন। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন ঃ (৫৩৭) হাজ্জের ইচ্ছা করার পর যদি তাকে নিষেধ করে দেয়া হয়, তবে তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ যদি সে ইহরাম না করে থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। কোন কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। কেননা কোন লোক ইহরামে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত ইচ্ছা করলে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে, ইচ্ছা করলে নিজ ঠিকানায় ফেরত আসতে পারে। কিন্তু হাজ্জ যদি ফরয হয়, তবে যতদ্রুত সম্ভব আদায় করে নেয়া ভাল।

আর ইহরামে প্রবেশ করার পর বাধাগ্রস্থ হলে যদি ইহরাম করার সময় শর্ত করে থাকে এই বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হাবেস্, ফা মাহেল্লী হায়ছু হাবাস্তানী", তবে বাধাপ্রাপ্ত স্থানে ইহরাম খুলে ফেলবে। কোন কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি শর্ত করার জন্য এরূপ দু'আ পাঠ না করে থাকে, তবে উক্ত বাধা অচিরেই বিদূরিত হওয়ার আশা থাকলে অপেক্ষা করবে এবং হাজ্জ পূর্ণ করবে। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে যদি বাধা মুক্ত হয়, তবে আরাফাতে অবস্থান করে হাজ্জ পূর্ণ করবে। কিন্তু আরাফাতে অবস্থানের পর বাধা মুক্ত হলে, হাজ্জ ছুটে গেল। তখন উমরা আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলবে। ফরয হাজ্জ হয়ে থাকলে পরবর্তী বছর তা কাযা আদায় করবে।

কিন্তু অচিরেই বাধা মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং শর্ত না করে থাকলে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং কুরবানী করে দিবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ-উমরা পূর্ণ করবে। যদি বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজসাধ্য কুরবানী করবে।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৬)

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (৫৩৮) কিছু কিছু হাজী সাহেব যে পাপের কাজে লিপ্ত হয় তাতে কি হাজ্জের সওয়াব কমে যাবে?

উত্তর ঃ সাধারণভাবে সবধরনের পাপকাজ হাজ্জের সওয়াব হ্রাস করে দেয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

"যে ব্যক্তি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হাজ্জের সংকল্প করবে, সে স্ত্রী সহবাস, গর্হিত কাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে পারবে না।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৭)

বরং বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেছেন, হাজ্জ অবস্থায় পাপ কাজ করলে হাজ্জ বাত্বিল হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানদের নিকট প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছেঃ "হারাম কাজটি যদি ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে তার কারণে ইবাদাত বাত্বিল হবে না।" সাধারণ পাপ সমূহ হাজ্জের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কেননা তা হাজ্জের সময় যেমন হারাম অন্য সময়ও হারাম। এটাই বিশুদ্ধ মত। এ সমস্ত পাপকাজ হাজ্জকে বাত্বিল করে দিবে না। কিন্তু তার সওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

প্রশ্ন ঃ (৫৩৯) কেউ যদি নকল বা মিথ্যা পাসপোর্ট বানিয়ে হাজ্জ করে, তার হাজ্জ হবে কি?

উত্তর ঃ তার হাজ্জ হয়ে যাবে। হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে। কেননা পাসপোর্ট নকল করা হাজ্জের কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু একাজের কারণে সে গুনাহগার হবে। তাকে তওবা করা উচিত। কেননা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বা প্রশাসনকে ধোঁকা দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ ও বড় গুনাহর কাজ।

জেনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার ব্যবস্থা করে দিবেন, তাকে ধারণাতীত রিয্ক দান করবেন, তার সকল কাজ সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে সত্য কথা বলবে এবং সৎ পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার কর্ম সংশোধন করে দিবেন এবং তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা ছাল্লাইতা ও বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার অনুগ্রহে সৎ কর্ম সমূহ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

—: সমাপ্ত :—

www.pathagar.com

على الشركيات والبدعيات والخرافات باسم التصوف والأحاديث الضعيفة والموضوعة. قد تلقاها الناس بالقبول ثقة وتعلقًا بمؤلفيها وهم ليسوا أهلا لذلك في الحقيقة.

أرسل إلي نسخة من الترجمة مطبوعة على الكمبيوتر من مركز الدعوة المذكورة لمراجعتها فقمت بذلك ما استطعت تصحيحًا وتقويمًا وتعديلاً، ووجدت مستوى الترجمة مرضيا جدًا.

أسأل الله تعالى أن يكتب لهذا الكتاب القبول والذيوع لدى العامة والخاصة وينفعهم به كما نفع بأصله. ويجزي المؤلف الكريم والمترجمين العزيزين وكل من له إسهام ومشاركة في طباعة هذا الكتاب ونشره – أحسن الجزاء.

أكرم الزمان بن عبد السلام

مدير معهد التربية والثقافة الإسلامية -دكا

والمدير السابق لقسم الدعوة والتعليم

لجمعية إحياء التراث الإسلامي

مكتب بنغلاديش

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث معلما ومجيبا على السائلين وعلى آله وصحبه الذين فتحوا علينا طرق تحمل الدين إلى من بعدهم من المسلمين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد :

فإن الكتاب "فتاوى أركان الإسلام" لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من الكتب القيمة جدًّا في بابه مع اختصاره وخفة حجمه، فإنه يتميز عن الكتب الإسلامية الأخرى لما طرحت معلوماته بأسلوب الأسئلة والأجوبة الذي يقرب المعلومات إلى الأذهان ويحكمها في القلوب ويرسخها في العقول.

قام بترجمته إلى اللغة العربية كل من الداعية عبدالله الكافي وعبدالله شاهد العاملين بمركز دعوة الجاليات بالجبيل بالمملكة العربية السعودية. أرحب بهما وجميع القائمين على المركز والمتعاونين معه على حسن اختيارهم واحساسهم بضرورة ترجمة هذا الكتاب لسد حاجة أهل هذه اللغة العلمية إلى مثل هذا الكتاب. فإن الشعب البنغالي كما يعانون من قلة العلماء الموثوق بهم يعانون كذلك من قلة الكتب الدينية الموثوق بها، وعلى هذا لا شك في أن هذا الكتاب يعتبر زاد علمي قيم لطلبة العلم وعامة الناس.

قد يوجد في هذه اللغة بعض المؤلفات في هذا الباب إلا أنه يسيطر عليه طابع المذهبية والحزبية والصوفية والخلو عن الاستدلال بالأدلة المعتمدة. وأضف إلى ذلك ما يتضمنه الكثير منها

www.pathagar.com

www.pathagar.com

فتاوى أركان الإسلا

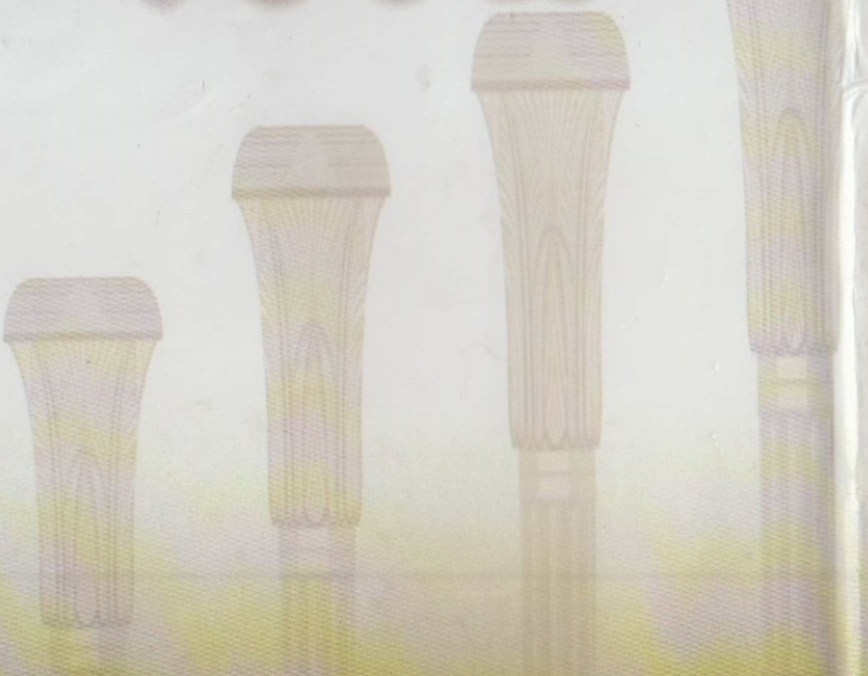

للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعال

ترجمة :

محمد عبد الله الكافي

ومحمد عبد الله شاهد

المراجعة :

أكرم الزمان بن عبد السلام